

৩২। মাটির ঘর শ্যামলীর সম্মুখে

এই ছবিটির সঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে আসে। বোধহয় ১৯৩৫ কিম্বা ৩৬ সনে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে দেয়াল চিত্র আঁকছি। সেই চিত্রগুলির মধ্যে গুরুদেবেরও একটি চিত্র আঁকতে হবে। তখন শুনতে পেলাম গুরুদেব প্রশান্ত মহলানবিশ মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করে বালী ব্রিজের নিকট গুপ্তনিবাসে অবস্থান করছেন। একদিন জোড়াসাঁকো বাড়ীতে বিকেলের দিকে প্রতিমা বৌঠানের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাকে গুপ্তনিবাসে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য নিয়ে গেলেন। যখন গুপ্তনিবাসে পৌঁছলাম তখন সূর্য্য প্রায় অস্ত যায় যায়। তখনকার গুরুদেবের পরিচর্য্যাকারী সুধাকান্তদা আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বল্লেন কারণ গুরুদেব স্নানের ঘরে গেছেন। দোতালার বারান্দায় বসে আছি এমন সময় হঠাৎ গুরুদেব ধীরে ধীরে আমদের দিকে এগিয়ে এলেন। অস্তগামী সূর্য্যকে Background করে গুরুদেবের সমস্ত অবয়বটি এক চিত্ররূপে আমার দেখা দিল। আমি সেই দৃশ্যটি দেখেই খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম, মনে পড়ে গেল আউরঙ্গজেবের একটি প্রাচীন চিত্র। ঠিক গুরুদেবের যে Pose সেইদিন দেখেছিলাম তা আমার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল। তারপর প্রায় একবছর পর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় কাগজ পেন্সিল নিয়ে খেলারছলে স্মৃতির মধ্যে ধরা গুরুদেবের সেই ছবিটি আঁকবার চেষ্টা করলাম। Sketch- টি বা প্রথম পেন্সিলের ড্রইংটি দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম কারণ সেই সন্ধ্যায় তাঁর যে রূপটি দেখেছিলাম তা এত সহজে কেমন করে আঁকা হয়ে গেল। তাঁর জামার রং কাপড়ের Texture পর্য্যন্ত যা আমার মনে ছিল ছবিটায় দেবার চেষ্টা করেছিলাম।

ছবির Pose বার্দ্ধক্যের জন্য সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়া। এটা সর্ব্বজনবিদিত যে দৈহিক বার্দ্ধক্য প্রকাশ পেলেও অন্তরে বার্দ্ধক্যকে গুরুদেব স্বীকার করতেন না। ছবিটি তাঁকে দেখালে তিনি রহস্য করে বলেছিলেন "তুই আমাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছিস মনে হচ্ছে দরজায় মাথা ঠেকে যাবে বলে।" ছবিটি মহীশূরের রাজা ক্রয় করে তাঁর কলাভবনে (চিত্রের Museum) রেখে দিয়েছেন।

— ধীরেন দেববর্ম্মা

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা

সম্পাদক

শ্রীগোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ.,এম্.এস্‌সি.,এল্.টি.

শ্রী হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এ.,ডি.ফিল্.

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ

ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সমিতি
আগরতলা

প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন, ১৩৬৮ বাং
পুনর্মুদ্রণ ঃ ফাল্গুন, ১৩৯৩ বাং
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ ইং
পুনর্মুদ্রণ ঃ বৈশাখ, ১৪১৮ বাং
মে, ২০১১ ইং

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম সার্ধ শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে
ত্রিপুরা সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তর কর্তৃক পুণর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

মূল্য-২০০(দুইশত)টাকা

মুদ্রক ও চিত্রাবলী মুদ্রক
ত্রিপুরা সরকারি মুদ্রণালয়
আগরতলা।

রাষ্ট্রপতির বাণী

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত বাংলা ভাষাতেই লিখিয়াছেন বটে কিন্তু আধুনিক কালের সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে তাঁহার রচনাবলী গভীর ও ব্যাপকভাবে রেখাপাত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় একজন মনীষী চিন্তাশীল লেখকের শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় জনসাধারণকে তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিয়া তাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে উদ্বুদ্ধ করা। তাঁহার চিন্তাধারা ও সাহিত্যের সহিত ঐকান্তিক পরিচয় লাভ এবং তাঁহার অপূর্ব উদাত্ত ভাষায় অভিব্যক্ত মহান আদর্শবাদকে অন্তত আংশিকভাবে জীবনে গ্রহণ--ইহাই তাঁহার স্মৃতির প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন।

আমি রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসবের সাফল্য কামনা করি।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ
(অনূদিত)

উপ-রাষ্ট্রপতির পত্র

উপ-রাষ্ট্রপতি, নূতন দিল্লি
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

প্রিয় শ্রীগাঙ্গুলী,

আপনার ১৭ই তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে চিরকালের জন্য প্রভাবিত করিয়াছে। তাঁহার সাহিত্যে মহান আদর্শ ও মানবতাবোধ মূর্ত হইয়াছে।

আপনাদের প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

এস্. রাধাকৃষ্ণন্
(অনূদিত)

শ্রী এইচ্. এন্. গাঙ্গুলী
আঞ্চলিক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সমিতি
ত্রিপুরা, আগরতলা।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীর শুভকামনা

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তর,
ভারতবর্ষ, নূতন দিল্লি
৮ই মার্চ, ১৯৬১

ত্রিপুরা আঞ্চলিক শতবার্ষিকী সমিতি রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি রবীন্দ্রস্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশ করছেন জেনে খুসী হলাম। আশা করি এই গ্রন্থটীতে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধ থাকবে ও পাঠকেরা সেগুলি পড়ে আনন্দ লাভ করবে।

ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহুভাবে বহুদিনের যোগ ছিল--সেই আত্মীয়তা ত্রিপুরাবাসীকে কল্যাণের পথে নিশ্চয়ই উদ্বুদ্ধ করবে। আপনাদের এ শুভ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

হুমায়ুন কবির

ত্রিপুরার চিফ্ কমিশনারের শুভকামনা

কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ত্রিপুরায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহার সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে পারিয়া আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একটি অতি ক্ষুদ্র অঞ্চল এবং দেশের এক সুদূর প্রান্তে অবস্থিত। কিন্তু বিশ্ববরেণ্য মনীষী রবীন্দ্রনাথ এই রাজ্যের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন--ত্রিপুরা এই বিশেষ গৌরবের অধিকারী। এবং ইহাও আমরা ভুলিতে পারি না যে ইহা শুধু গৌরবই নয়, ইহার দায়িত্বও সমধিক।

রবীন্দ্রনাথের রচনার বিষয়বস্তু হওয়ায় ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস অমরত্ব লাভ করিয়াছে। ত্রিপুরাবাসীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত সর্বপ্রকার ঐতিহাসিক দলিল-পত্রাদি সংরক্ষণ করা। সুতরাং রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে কবির সহিত ত্রিপুরার সম্পর্কের একটি তথ্যমূলক আনুপূর্বিক বিবরণ প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে, ইহা বিশেষ সুখের বিষয়।

এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় সাফল্য কামনা করি এবং সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি রবীন্দ্রনাথের মহান আদর্শ ত্রিপুরাবাসীকে অনুপ্রাণিত করুক।

আগরতলা
৫ই এপ্রিল, ১৯৬১

এন্. এম্. পট্টনায়ক
(ত্রিপুরার চিফ্ কমিশনার)

ত্রিপুরার মহারাজার শুভকামনা

ত্রিপুরার রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সমিতি কবিগুরুর শততম জন্মদিবসে একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন জানিয়া আমি নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকাল হইতে রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব পর্য্যন্ত ত্রিপুরার সহিত কবির গভীর ও অকৃত্রিম সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছিল। আমি জানিয়া বিশেষভাবে সুখী হইয়াছি যে এই শুভ সম্পর্কের একটি তথ্য-সম্বলিত বিবরণ এই স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত হইবে। এই গ্রন্থের সহিত নিজকে সংযুক্ত করিতে পারিয়া আমি সত্যই গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ চিরদিন ত্রিপুরাকে উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করুক ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, ইতি--

৬ই বৈশাখ,
১৩৭১ ত্রিং

শ্রী কিরীটবিক্রম মাণিক্য
(ত্রিপুরার মহারাজা)

রথীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা

রাজপুর
দেরাদুন, ইউ. পি. ভারতবর্ষ
২২শে অক্‌টোবর, ৬০

প্রীতিপূর্বক নমস্কার নিবেদন,

ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতির পক্ষ থেকে আপনারা আমার পিতৃদেবের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হয়েছেন জেনে অত্যন্ত সুখী হলুম। আরও সুখী হলুম যে মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা উক্ত সমিতির পৌরোহিত্য স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।

ত্রিপুরার রাজপরিবারের সহিত আমার পিতৃদেব রবীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠ ও সহৃদয় যোগ তা সুদীর্ঘকালের। সেই অন্তরঙ্গ সম্প্রীতির নিদর্শন তাঁর সাহিত্যে নানা ক্ষেত্রে রূপ লাভ করেছে, সেকথা আপনাদের অবিদিত নয়। ত্রিপুরী কথ্য ভাষায় তাঁর সেই সব সার্থক রচনার অনুবাদ কার্য আপনারা এই শুভ-উপলক্ষ্যে শুরু করে খুবই সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। ত্রিপুরার জনসাধারণের হৃদয়ে এই উপায়ে রবীন্দ্রনাথের আসন উত্তরোত্তর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এবং সকলের শ্রদ্ধায় ও প্রেমে সরস ও সজীব হয়ে উঠুক, আন্তরিকভাবে সেই কামনা করি।

আপনারা আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি--

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডক্‌টর হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

মুখবন্ধ

গুরুদেবের শততম জন্মবর্ষে ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে "রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা" স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হলো। কবির বিরাট ও বহুমুখী প্রতিভা বিশ্লেষণের কোনও প্রয়াস এতে করা হয়নি। ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁর যে সুদীর্ঘ, নিবিড় ও ব্যাপক আত্মীয়তার বন্ধন ছিল তার একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ, তথ্যভিত্তিক বিবরণ এতে বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে। কবির জীবনের এ অধ্যায়টি বিশদ ও প্রামাণিকভাবে ইতি-পূর্বে কোথাও আলোচিত হয়নি। আমাদের ত্রুটিবহুল প্রচেষ্টায় আংশিক সাফল্যও যদি আমরা অর্জন করে থাকি, তাহলে এই স্মারকগ্রন্থ কবির জীবন-চরিতে একটি উল্লেখ্য সংযোজন বলে পরিগণিত হবে, সন্দেহ নাই।

কবি-কৃতি এবং কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়, অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং কবি-মানসের পূর্ণ উপলব্ধির পক্ষেও হয়তো এই অপরিহার্য অধ্যায়টি বিশেষরূপে সহায়ক হবে।

সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক আরও দু'একটি বিষয়বস্তু--যথা, ত্রিপুরার সন্তান শান্তিনিকেতনের কতিপয় প্রাক্তন ছাত্রের স্মৃতিকথা, এবং ত্রিপুরার গৌরব প্রখ্যাত শিল্পী ঁরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র--গ্রন্থের সৌষ্ঠববৃদ্ধির সহায়ক হবে মনে করে এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

সামান্যতম একটি পত্রেও রবীন্দ্রনাথের মনীষাদীপ্ত মতামতের অভিব্যক্তি বিস্ময়কর। সাধারণত তাঁর প্রতিটি মন্তব্যের পেছনেই তাঁর চিন্তার একটি সামগ্রিক রূপের আভাস মেলে। পত্রের পটভূমিকা সুস্পষ্ট বলে কবি-মানসের চিত্রটিও স্বচ্ছ হয়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু যেখানে কবির মতামত পাওয়া যাচ্ছে অপরের লেখনী বা বিবৃতি থেকে, সেখানে প্রসঙ্গ থেকে বিশ্লিষ্ট হবার দরুন দু'একটি মত বিভ্রান্তিকর বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু নিষ্ঠাবান, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক এই মতটিকে দিগ্-দর্শন হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন, এই সূত্র থেকে গভীরতর গবেষণা বা তত্ত্বানুসন্ধানের পথে এগিয়ে যেতে পারেন। অতএব, একেও বর্জন করা সমীচীন মনে হয়নি।

বলা বাহুল্য, বিভিন্ন প্রবন্ধকারদের মন্তব্য বা অভিমতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁদেরই। কারও স্বাধীন চিন্তায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয়নি।

বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অকৃত্রিম, অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে আমাদের এ প্রচেষ্টা সম্ভব হতো না। তাঁদের সকলের কাছে আমাদের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

সর্বাগ্রে সুগভীর শোক ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি স্বর্গত রথীন্দ্রনাথকে যিনি মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে তাঁর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাণী প্রেরণ করে আমাদিগকে উৎসাহিত করেছিলেন। আমাদের স্মারকগ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্যের সংবাদ বিভিন্ন সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছিল। মুদ্রিত গ্রন্থ তাঁর হাতে তুলে দেবার সৌভাগ্য আমাদের হলো না--এই অপরিসীম বেদনায় আমাদের কোনও সান্ত্বনা নাই।

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায় ও শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন প্রয়োজনীয় রচনাবলী ও পত্রাদি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে এবং কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন। তাঁরা আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

ভারত সরকার, ত্রিপুরা প্রশাসন ও ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের উদার ও অকৃপণ সাহায্য আমরা পেয়েছি--এ সুযোগে আমরা তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ত্রিপুরার প্রধান শাসক রবীন্দ্রকাব্যানুরাগী শ্রীনাগরীমোহন পট্টনায়ক সর্বপ্রকার আনুকূল্য করে এবং উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাদের পথ সুগম করেছেন, তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

ত্রিপুরার মহামান্য মহারাজা শ্রীকিরীটবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পোষকতা আমরা লাভ করেছি ; বিশেষত রাজপ্রাসাদের পুরনো চিঠিপত্রাদি অনুসন্ধানে তাঁর এবং শ্রীমতী মহারাণী রাজমাতার দ্বিধাহীন অনুমতি না পেলে কিছু মূল্যবান তথ্য অনাবিষ্কৃত থেকে যেতো। তাঁদের উভয়কে সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাচ্ছি।

এ গ্রন্থ-প্রকাশের প্রথম পরিকল্পনা কবির স্নেহ-ধন্য মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা মহাশয়ের। এ প্রচেষ্টার মূল প্রেরণার তিনি উৎস। শতবার্ষিকী সমিতির পৌরোহিত্য নিয়ে তিনি আমাদের পুণ্য কর্মে উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চার করেছেন, এ কথা আজ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয়।

তথ্য-সঙ্কলন ও গ্রন্থনার কৃতিত্ব প্রায় সম্পূর্ণভাবে দাবি করতে পারেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসত্যরঞ্জন বসু ও শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। অধিকাংশ দলিল-পত্র এঁদেরই সংগৃহীত, ''রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা''র ইতিবৃত্তের মুখ্যত এঁরাই ভান্ডারী। প্রবীণ বয়সে যে যুবজনোচিত উৎসাহে নিরলস পরিশ্রম করে এঁরা রবীন্দ্র-অর্চনার অর্ঘ্য উপচার সাজিয়েছেন, ঐকান্তিক শ্রদ্ধাশীল ভক্ত পূজারীর পক্ষেই তা সম্ভব।

রাষ্ট্রীয়, আর্থিক ও সামাজিক--এককথায় বাস্তবজীবনের বিভিন্ন বিচিত্র দিকে ত্রিপুরা আজ দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই বিশেষ মুহূর্তে সত্যদ্রষ্টা ঋষি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের ক্ষুদ্র স্মারকগ্রন্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে তাঁর কাছে এই আশীর্বাদ যাচ্ঞা করি--বস্তুতান্ত্রিক বৈভব ও প্রগতি যেন আমাদের মত্ততায় আচ্ছন্ন না করে, যে বীর্য ''সারমেকম্'' সেই বীর্যের সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে, স্থৈর্যের সঙ্গে যেন আমরা আমাদের বিজয় অভিযানকে গ্রহণ করতে পারি, রবীন্দ্রস্নেহসিক্ত ভারতবর্ষের এই প্রত্যন্ত দেশ ঋষি-কবির উদাত্ত সতর্কবাণীকে, ভারতের শাশ্বত মর্মবাণীকে যেন কদাচ বিস্মৃত না হয়।

গোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক
হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক
ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সমিতি।

আগরতলা
৯ই আশ্বিন, ১৩৬৮।

'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' তৃতীয় মুদ্রণ-এর সংযোজনী

১৩৬৮ সালে (১৯৬১ ইং) ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে **'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'** প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৯৩ সালের (১৯৮৭ইং) ফাল্গুন মাসে পুনর্গঠিত ত্রিপুরা আঞ্চলিক শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। এটি সর্বার্থেই হুবহু পুনর্মুদ্রণ - এতে কোন সংযোজন, সংশোধন বা বিয়োজনের চিহ্ন নেই।

বিগত পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অজস্র গবেষনা হয়েছে এবং ত্রিপুরার রবীন্দ্র সম্পর্ক নিয়েও নতুন করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৮২ সালে শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত কুমার পাল মহোদয়ের সুগভীর অধ্যবসায় ও অকল্পনীয় নিষ্ঠার ফসল 'রবিজীবনী' প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা সম্পর্কে নানা নতুন তথ্য ও যুক্তি ও তর্ক আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। অন্যান্য গবেষকরাও এ বিষয়ে নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। এসব নতুন তথ্যের আলোকে দেখা যাবে যে ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা'র দুটি মুদ্রণেই কিছু তথ্যগত অসংগতি রয়েছে বা আরও সহজ করে বলা যায় যে প্রথম মুদ্রণের ভ্রান্তিসমূহ যথারীতি দ্বিতীয় সংস্করণেও অসংশোধিত রয়ে গেছে।

যেহেতু গ্রন্থটি সারা দেশের পাঠক ও গবেষক সমাজের কাছে একটি অত্যন্ত মূল্যবান আকর গ্রন্থ হিসাবে দীর্ঘকাল মর্যাদার সঙ্গে গৃহীত হয়ে আসছে, তাই তৃতীয় মুদ্রণের সন তারিখের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি প্রামাণ্য তথ্যের নিরীখে সংশোধিত হওয়ার প্রয়োজন বিবেচনায় নিম্নে একটি কালানুক্রমিক সংশোধনী তুলে ধরা হলো, মূল গ্রন্থটিকে 'ঐতিহাসিক দলিল' হিসেবে অবিকৃত রেখেই। উল্লেখ্য আমরা ১৩৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় মুদ্রণকে ধরে নিয়েই এই সংশোধনী প্রস্তুত করেছি।

মহারাজা বীরচন্দ্রের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথের কার্সিয়াং পরিভ্রমণ

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ ১ম খন্ড পৃঃ- ৩০৩) উল্লেখ করেছেন যে, ১৩০১ বঙ্গাব্দের 'গ্রীষ্মকালে কয়েকদিনের জন্য কবি গেলেন কার্সিয়াং-এ'। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে (দ্বিতীয় মুদ্রণ পৃ:- ১০, ১২১) উল্লেখ করা হয়েছে যে বীরচন্দ্রের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ১৩০১ বঙ্গাব্দে এবং ১৩০৩ বঙ্গাব্দে দু'বার কার্সিয়াং-এ গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ১৩০১ বঙ্গাব্দ (১৮৯৪ ইং) নয়, ১৩০৩ বঙ্গাব্দে (১৮৯৬ ইং) কার্ত্তিক মাসে মাত্র একবারই রবীন্দ্রনাথ বীরচন্দ্রের আমন্ত্রণে কার্সিয়াং গিয়েছিলেন। প্রশান্ত পাল লিখেছেন -----''বস্তুত বীরচন্দ্রের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ কার্সিয়াং-এ যান

১৩০৩ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে, সেই সম্মিলনের যথেষ্ট প্রমাণও আছে" ('রবিজীবনী' চতুর্থ খন্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ পৃঃ ৪) । আর এক বিশিষ্ট গবেষক সমীর সেনগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজন'-এ লিখেছেন "২৪শে অক্টোবর ১৮৯৬ মাধুরীলতার (বেলি) দ্বাদশতম জন্মদিন ছিল, এইদিন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কার্সিয়াং-এ' । সেখান থেকে 'বেলির জন্মদিনে উপহার /৯ কার্ত্তিক /১৩০৩ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কার্সিয়াং' লিখে নিজের একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন কন্যাকে" ('রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজন', সমীর সেনগুপ্ত ২০০৮, পৃঃ - ১৯৭) ।

মহারাজা রাধাকিশোরের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আগরতলা পরিভ্রমণ

২ (ক) 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে (দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ পৃঃ- ১৫, ১২৪, ১২৫) উল্লেখ রয়েছে যে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে বসন্তোৎসবে কবি প্রথমবার রাধাকিশোরের আমন্ত্রণে আগরতলায় এসেছিলেন । পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে ১৩০৬ বঙ্গাব্দ এবং শ্রীপঞ্চমী তিথি দুটোর একটাও ঠিক নয় ।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের শ্রীপঞ্চমী তিথি ছিল ২২শে মাঘ (রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারী)। প্রশান্ত পাল লিখেছেন "২২শে মাঘ সরস্বতী পূজার দিনে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সমাজে যান সারস্বত সম্মিলনে যোগদান করতে........ ২৩শে মাঘ (সোমবার, ৫ ফেব্রুয়ারী) রবীন্দ্রনাথ আবার প্রিয়নাথ সেনের বাড়ী যান । এই দিনেই দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে গগনেন্দ্র নাথের ছোট বোন সুনয়নী দেবীর কন্যা বীনাপাণীর বিবাহ হয়"- (রবিজীবনী চতুর্থ খন্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ পৃ -২৬০) । অতএব রবীন্দ্রনাথের সেদিন আগরতলা আগমনের তথ্যটি সঠিক নয় ।

দ্বিতীয় প্রমাণ হিসাবে প্রশান্ত পাল উল্লেখ করেছেন যে ১৩০৫ সালের ৮ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন "চৈত্রমাসের আরম্ভে ত্রিপুরার মহারাজার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আমাকে একবার ত্রিপুরায় যেতে হবে" । সেই হিসেবে ৭ চৈত্র সরকারী কেশবহিতে 'ত্রিপুরার মহারাজকে দিবার জন্য' উপহার সামগ্রী ক্রয়ের হিসেব রয়েছে । প্রশান্ত পাল সমস্ত রকম হিসেব নিকেশ করে দেখিয়েছেন যে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের শ্রীপঞ্চমী নয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের দোলপূর্ণিমার দিন অর্থাৎ ১৪ চৈত্র (সোমবার 27th March 1899) তারিখেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার ত্রিপুরায় পদার্পণ করেন ('রবিজীবনী' চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ পৃঃ - ২২২, ২২৩) ।

২ (খ) এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা ' গ্রন্থের মুদ্রণের ১৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে ১৩০৬ সনের গোড়ার দিকে ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের অকাল মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথকে একটু স্বস্তিদান করার জন্য রাধাকিশোর বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুরায় আহ্বান করেছিলেন । ঘটনাটি ঠিক নয় কেননা বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৩ ভাদ্র (১৯ আগষ্ট ১৮৯৯), আর রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১৪ চৈত্র (২৭ মার্চ ১৮৯৯ ইং) ।

মহারাজা রাধাকিশোরের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথের দার্জিলিঙ পরিভ্রমণ

৩। 'রবীন্দ্রনাথও ত্রিপুরা' গ্রন্থে (দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৯৩) ১৬, ১৮, ২০, ১২৪, ১২৮ ও ১৩০ পৃষ্ঠাতে মহারাজা রাধাকিশোরের আমন্ত্রণে ১৩০৬, ১৩০৭ ও ১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথের মোট তিনবার দার্জিলিঙ ভ্রমণের উল্লেখ রয়েছে । প্রকৃত তথ্য হলো ১৩০৬ সালের আশ্বিন মাসে কবি ও মহারাজ একসঙ্গে দার্জিলিঙ যাওয়ার কথা ছিল । কিন্তু যাত্রা পথে গোয়ালন্দে বিষম ঝড়ের কারণে মহারাজকে যাত্রা বাতিল করতে হয় । একথা দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয় একই গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন । ১৩০৭ এর জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার দুজনের দার্জিলিঙ যাওয়ার কথা হয় । রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন "মাঝে জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় দিন দশ দার্জিলিঙ এ জগদীশচন্দ্রের সহিত আনন্দেল হাউসে কাটাইয়া আসেন"- ('রবীন্দ্রজীবনী' প্রথম খন্ড পৃ- ৪৯৬) । রবীন্দ্রনাথ ঠিকই সেবার দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন কিন্তু মহারাজা রাধাকিশোরের সে যাত্রায় দার্জিলিঙ যাওয়ার কোন প্রামাণ্য তথ্য নেই ('রবিজীবনী' চতুর্থ খন্ড, চতুর্থ মুদ্রণ পৃঃ - ২৮৫) । তবে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে কবি যে মহারাজা রাধাকিশোরের আমন্ত্রণে দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে ১৩০৮ সালে বসন্তকুমার গুপ্তকে লেখা ১২ ও ১৯ বৈশাখ দুটি পত্রে । ১৯ বৈশাখ ১৩০৮ সালে তিনি বসন্তকুমারকে লিখছেন "আগামী মঙ্গলবার মহারাজের নিমন্ত্রণে দার্জিলিঙ যাইতেছি" ('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৯৩, পৃ -৩৬৩)।

কলিকাতায় রাধাকিশোরের সম্বর্ধনা

৪। ১৩০৭ সালে ১ পৌষ কলিকাতার সঙ্গীত সমাজ রাধাকিশোরকে সম্বর্ধনা প্রদান করেন । সেই উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে বিসর্জন নাটক অনুষ্ঠিত হয় বলে 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে (দ্বিতীয় মুদ্রণ পৃঃ ২০, ১২৯) উল্লেখ রয়েছে । স্থানটি উল্লেখের ত্রুটি রয়েছে, কেননা ঐ তারিখের অনেক আগেই সত্যেন্দ্রনাথ পার্ক স্ট্রীটের ভাড়া বাড়ী ছেড়ে বালিগঞ্জের Rainey Park–এর বাড়ীতে উঠে গেছেন ('রবিজীবনী' চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৪১৫, পৃঃ- ৩০৬) । রবিজীবনীকার প্রশান্ত পাল অমৃতলাল গুপ্তের লেখনীর উল্লেখ করে বলেছেন যে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার পার্ক স্ট্রীটের বাড়ীতে যে **বিসর্জন** নাটকের অভিনয়ের

কথা বলেছেন সেটি ১৮৯০ তে বিসর্জনের প্রথম অভিনয় সম্পর্কিত যাতে ত্রিপুরা-রাজ বীরচন্দ্র মানিক্য উপস্থিত ছিলেন (সূত্র তদেব)।

ব্রজেন্দ্রকিশোরকে কবি জায়ার আদর ও যত্ন

৫। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক মাসে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার আগরতলায় পরিভ্রমণে আসেন। সেবার ফেরার পথে মধ্যম রাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হোন। 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র স্মৃতি' নিবন্ধে সত্যরঞ্জন বসুর বিবরণ অনুযায়ী কবি শিলাইদহ কলিকাতা হয়ে বোলপুরে গিয়েছিলেন। শিলাইদহে কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর যত্ন ও আদরের কথাও ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্মৃতি থেকে এখানে উল্লিখিত হয়েছে ('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' ২য় সংস্করণ ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ - ৫৯)। তবে কবিগৃহিনীর এই যত্ন ও আদর রাজকুমার অবশ্যই পেয়েছিলেন সেটা শিলাইদহ নয় শান্তিনিকেতনে। একই গ্রন্থে ১৩৫ পৃষ্ঠায় 'তথ্যক্রমপঞ্জী' অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিবরণে রয়েছে "মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্মৃতি অনুসারে তিনি এবারই (১৩০৮) কবির সঙ্গে আগরতলা হইতে গমনকরতঃ কলিকাতা হইতে শিলাইদহে গিয়া তথা হইতে কবির সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে গমন করিলেন। এই সময়ে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করিয়া এবং কবিজায়ার নিকট অপত্য স্নেহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন"। দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের বিবরণে রাজকুমারের মহর্ষি ও কবিজায়ার সান্নিধ্যের স্থান যথার্থভাবেই শান্তিনিকেতনে চিহ্নিত হলেও রাজকুমারের বিস্মৃতির কারণে স্থানের উল্লেখে ভ্রান্তি ঘটেছিল। তিনি শিলাইদহ থেকে কলিকাতা এবং কলিকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে যান। রবিজীবনীকার প্রশান্ত কুমার পাল এর প্রামাণ্য তথ্য দিয়েছেন ('রবিজীবনী' পঞ্চম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ ১৪১৪, পৃঃ-৩৬)।

রবীন্দ্রনাথের সম্মানে ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়ীতে মণিপুরী নৃত্য

৬। (ক) ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১০ ফাল্গুন থেকে ১৪ ফাল্গুন অব্দি রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো ত্রিপুরা ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু তথ্যগত বিতর্ক দেখা দিয়েছে। যেমন মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সম্মানে রাস নৃত্যের অনুষ্ঠানের তারিখটি ১২ ফাল্গুন বলে সত্যরঞ্জন বসু তাঁর 'ত্রিপুরায় রবীন্দ্র স্মৃতি' নামক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন ('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ- ৮২)। আবার সেবারে কবির পরিচর্যার দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুক্ষণ সঙ্গী হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'আগরতলায় রবীন্দ্রনাথ' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে ১২ এবং ১৩ ফাল্গুন দুদিন ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়ীতে মণিপুরীদের দোলযাত্রার নাচ ও গান এবং মণিপুরী মেয়েদের রাসলীলা দেখান হয়

('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' দ্বিতীয় মুদ্রণ পৃঃ -২৮৮)। দুটি দিনই সঠিক বলে আমরা ধরে নিতে পারি কেননা দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত 'তথ্যক্রমপঞ্জী' পর্য্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে "আগরতলায় অবকাশ যাপনের কর্মসূচীর মধ্যে কবি সহরের সন্নিকটস্থ প্রতাপগড় কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন, মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের গৃহে **একাধিকবার** রাসনৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানে যোগদান ...." ('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা', দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃঃ - ১৫৪)।

ঠাকুর নবকুমার সিংহ-এর শান্তিনিকেতনে যোগদান

৬ (খ) শেষবার (১৩৩২ বঙ্গাব্দ) আগরতলায় মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়ীতে রাসনৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে শান্তিনিকেতনে তা পুনরায় প্রবর্তনের জন্য (উল্লেখ্য ইতিমধ্যে ১৩২৬ সনের অগ্রহায়ণ মাসে ত্রিপুরা থেকে নৃত্যগুরু বুদ্ধিমন্ত সিংহ ও তাঁর স্ত্রী শান্তিনিকেতনে নৃত্য শিক্ষার সূচনা করে আসেন) মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে একজন নৃত্য শিক্ষককে শান্তিনিকেতনে পাঠাবার অনুরোধ করেন এবং সেই অনুযায়ী রাজবাড়ীর নৃত্যশিক্ষক নবকুমার সিংহ শান্তিনিকেতনে যান বলে উল্লেখ রয়েছে 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, ৮৩ পৃষ্ঠায়। তথ্যটি ঠিক নয় কেননা রবীন্দ্রনাথ শেষবার আগরতলায় ছিলেন ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১০ ফাল্গুন থেকে ১৪ ফাল্গুন পর্যন্ত - আর নবকুমার সিংহ ও বৈকুণ্ঠ সিংহ শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষক রূপে নিযুক্ত হোন ১৯ কার্ত্তিক ১৩৩২ (৫ নভেম্বর ১৯২৬ ইং)। এই তথ্য আমরা পেয়েছি প্রশান্তকুমার পালের 'রবিজীবনী' গ্রন্থের ২০০৮ সালে প্রকাশিত নবম খণ্ডের তৃতীয় মুদ্রণ ২৯০ পৃষ্ঠায়। নবকুমার সিংহ মহাশয় নিজেই তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে আগরতলা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে কবি তাঁকে বলেছিলেন "নবকুমার তোমাদের আগরতলায় নৃত্য দেখে এলাম বড় ভালো লাগলো" ('রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৯৩, পৃঃ - ১৮৪)।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে একটি গুরুত্বপুর্ণ অনুল্লেখ

৭ (ক) 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে ৩১৬ - ৩১৮ পৃঃ (দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৯৩) মহারাজ রাধাকিশোরকে লেখা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠিতে 'সৌজন্যবশতঃ' একজন রাজপুরুষের নাম উহ্য রাখা হয়েছে। সেই রাজপুরুষের নাম কর্ণেল মহিম ঠাকুর। মহিম ঠাকুরের নাম উল্লেখ না করায় মহিম ঠাকুর সম্পর্কে অকারণ ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং ইতিহাসও বিকৃত হয়েছে।

মহিম ঠাকুরকে লেখা একটি চিঠির গুরুত্বপুর্ণ অংশ ছাঁটাই

৭ (খ) মহিম ঠাকুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থে ৩৪৭-৩৪৮ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে (দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৯৩) এবং সেই চিঠি থেকে ত্রিপুরার রাজমন্ত্রী উমাকান্ত দাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু ক্ষোভের কথা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সম্পাদনার কোন চিহ্ন না রেখেই যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত হয়নি এবং পাঠকের মনে যেন মহিম ঠাকুরই কবির ক্ষোভের কারণ বলে প্রতিভাত হতে পারে। ইতিহাস রক্ষার প্রয়োজনে নীচে এর সংশোধনী দেওয়া হলো চিঠিটির তৃতীয় প্যারাগ্রাফে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে তা স্থূলাক্ষরে উল্লিখিত হলো - "**বস্তুত মহারাজের মত লোকের সহিত সংস্রব রাখিলেই সাধারণ লোকে সন্দেহের চক্ষেই দেখে। এমনকি, তোমাদের বর্তমান মন্ত্রী উমাচরণ দাশ (উমাকান্ত পড়তে হবে) তাঁহার চাকরী পাওয়ার পুর্ব্বে আমার কোন বন্ধুর কাছে সন্ধিগ্ধভাবে বলিয়াছিলেন, রবিবাবুর মত লোক এখানে কেন যাতায়াত করেন ?** সাধারণের কাছে আমার প্রতিপত্তি আছে - আমি স্বার্থপরভাবে- ভিক্ষুকভাবে মহারাজের দ্বারে গমনাগমন করি এ অপবাদ গ্রহন করিতে সঙ্কোচ বোধ করি। **শুনিতে পাই তোমাদের মন্ত্রীর সেই ধারনা এখনো আছে।**" *

---

* মূল চিঠিটি মহিমঠাকুরের পৌত্র কুশাঙ্কর দেববর্মার কাছে সংরক্ষিত এবং তাঁরই সৌজন্যে কবির হস্তাক্ষরে মূল চিঠিটি বিকচ চৌধুরীর 'রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা' গ্রন্থে (ত্রিপুরা দর্পণ সংস্করণ ২০০১ ইং) পরিশিষ্ট অধ্যায়ে ছাপা হয়েছে।

প্রকাশনা উপকমিটির পক্ষে
বিকচ চৌধুরী

ভূমিকা

ত্রিপুরার আঞ্চলিক রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী-সমিতির পক্ষ হইতে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু প্রমুখ কতকগুলি উৎসাহী সাহিত্যিক ও অন্য কর্মীর চেষ্টা ও যত্নে প্রস্তুত এই বইখানিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বঙ্গদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অপূর্ব গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের এক বিরাট্ যুগন্ধর মহাপুরুষ ছিলেন, এবং নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া বলিতে হয় যে তাঁহার জীবনে প্রায় আশী বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যেন মূর্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই বিরাট্ ব্যক্তিত্বের সমগ্র রূপটি জানা তো সম্ভবপর নহে--কর্মবিপুল রবীন্দ্রজীবনের বহু ঘটনা বহু তথ্য আমাদের কাছে এখনও ধরা দেয় নাই। সূর্য্যের মতই তিনি যেখানেই প্রকাশিত হইয়াছিলেন সেখানেই তাঁহার জ্যোতির্ময় স্বরূপের কিছু না কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার পূর্ণ সংগ্রহ ও সংগ্রথন দুঃসাধ্য, হয় তো বা অসাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ অন্য নানা দেশ ও স্থানের মত ত্রিপুরাতেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যে ত্রিপুরার সহিত তাঁহার এই সংযোগ এবং এ বিষয়ে ত্রিপুরার দান একটি লক্ষণীয় ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক ও আলোচক সে সম্বন্ধে সচেতন আছেন। কিন্তু ত্রিপুরার সঙ্গে, বিশেষ করিয়া ত্রিপুরার রাজবংশের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধের কথা আমরা কতটুকুই বা জানি ? আগ্রহ থাকিলেও, এখানকার মহারাজগণ এবং রাজবংশের কতকগুলি অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে নিবিড় আত্মীয়তা ঘটিয়াছিল, যেভাবে তাঁহারা সুদূরপ্রসারী দিব্য-দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ও অন্যবিধ মহত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে সমস্ত কথা এতদিন বিলুপ্তির গর্ভে যাইতে বসিয়াছিল। ত্রিপুরার রাজবংশের অশীতিবর্ষদেশীয় শ্রদ্ধেয় মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা (লালুকর্তা) প্রমুখ রবীন্দ্র গোষ্ঠীর কতকগুলি অন্তরঙ্গ গুণজ্ঞের সহায়তায়, ত্রিপুরার রাজবংশের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে পত্রব্যবহার ছিল তাহা উদ্ধার করিয়া, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরার সংযোগের এই আশ্চর্য ইতিহাস সংকলিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের নানামুখী প্রতিভার ও ব্যক্তিত্বের একটী লক্ষণীয় দিক আমাদের সমক্ষে উদঘাটিত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনের, তাঁহার মনন ও কর্মচেষ্টার একটী অজ্ঞাতপূর্ব রূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি, বঙ্গদেশ ও ত্রিপুরার আত্মিক যোগেরও পরিচয় পাইতেছি।

এই পুস্তকখানি রবীন্দ্র-জন্ম-শত-বার্ষিকীর পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী হইয়াছে। মুলপত্রাদির পাঠ ও প্রতিলিপি ইহাতে প্রমাণপঞ্জীরূপে উদ্ধৃত হওয়ায়, এবং কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য চিত্র এই পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও অনন্যসাধারণ হইয়াছে।

এইবার ত্রিপুরায় আসিয়া এই পুস্তকের সংকলন ও প্রকাশনের আয়োজন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি এইজন্য ত্রিপুরা রবীন্দ্র-জন্ম-শত-বার্ষিকী সমিতির সদস্যগণ ও তাঁহাদের সহায়কগণের নিকট আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি, এবং বাঙ্গালা সাহিত্য ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই পুস্তকের স্বাগত করিতেছি।

ইতি--আগরতলা ৫ই বৈশাখ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। ১৮ই এপ্রিল১৯৬১।

-- প্রাক কথন --

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে গঠিত হয়েছে একটি রাজ্য ভিত্তিক পরিচালন কমিটি - যার শীর্ষে রয়েছেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার এবং ত্রিপুরার মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এই কমিটি বিভিন্ন সময়ে বসে উপযুক্ত মর্যাদায় রবীন্দ্রনাথের সার্ধ শত বর্ষ জন্মোৎসব পালন এবং ত্রিপুরার ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রকাশনা উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে, যার সভাপতির দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে বর্তমান আলোচকের উপর।

প্রকাশনা উপ-কমিটি বিভিন্ন সময়ে নানা খুটি-নাটি আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে-রবীন্দ্র জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ, 'রাজর্ষি ও বিসর্জন' এবং 'মুকুট' এর পুনর্মুদ্রণ, 'আমি তোমাদেরই লোক' শীর্ষক নির্বাচিত রবীন্দ্র রচনা সংকলন প্রকাশ এবং কক্‌বরক, মণিপুরী, বিষ্ণুপ্রিয়া-মণিপুরী, চাক্‌মা ও মগ ভাষায় নির্বাচিত রবীন্দ্র রচনা সংকলন প্রকাশ করা হবে অনুবাদের মাধ্যমে । এ ছাড়াও 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' গ্রন্থটির পুনঃ প্রকাশের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের উপর। উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও প্রকাশনার প্রস্তুতি বিষয়ে প্রকাশন উপ-কমিটির সহায়তা চাওয়ায় সে ক্ষেত্রেও আমরা সহায়তার হাত বাড়িয়েছি।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে স্মারক গ্রন্থ সহ এতগুলি গ্রন্থ প্রকাশের এবং পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্ত কেন নেয়া হয়েছে ? সে প্রসঙ্গে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন বিধায়ে প্রকাশন উপ-কমিটির পক্ষ থেকে এই সংক্ষিপ্ত 'প্রাককথন'-এর অবতারণা।

বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির এমন কোন দিক নেই যা রবীন্দ্র প্রতিভা স্পর্শে ধন্য হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবনের সাধনায় এই ভেদ-বিভেদ ও হিংসা দীর্ণ বিশ্বে এক মহামিলনের পথ রচনা করে গেছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, প্রাচীন ও নবীন, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতু নির্মাণ করে গেছেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ আপন মনন ও চেতনার সার্থক প্রয়োগে বিশ্বজনীন মানবতার স্বরূপকে তুলে ধরেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ শেষে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বিচিত্রজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে রবীন্দ্রনাথ ঘরে ফিরেছিলেন। বস্তুত এটি কেবল তাঁর ঘরে ফেরা নয়, মানুষের দিকে ফেরা। মহামানবকে তিনি মানব সংসারেই পেতে চেয়েছিলেন। যুক্তি ও বিজ্ঞান বুদ্ধির আলোকে তিনি মানব ধর্মের বিশুদ্ধ রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি অন্ত্যজদের মধ্যে মানব ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ মানব ধর্মকে সব কিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন লোক সাধারণকে দুর্বল ও শক্তিহীন করে রাখলে সামাজিক দুর্গতি বাড়ে । লোকশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশের ধনশক্তি হয়ে উঠে স্ফীতকায় ও উচ্ছৃঙ্খল। তাতেই মনুষ্যত্বের অধঃপতন ঘটে। তাই সর্বক্ষেত্রে

মানুষের জাগরণ ও মোহমুক্ত জ্ঞানের বিকাশ চেয়েছেন কবি। পূর্ণ মানবের উদ্বোধনের মধ্যেই তিনি সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। কবির দরদ ছিল নির্যাতিত মানুষের প্রতি। তাদের অপমান করার অর্থই হল মানুষের অন্তরস্থিত দেবতারই অপমান। এই শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষেরাই সভ্যতার মশালটিকে জ্বালিয়ে রেখেছেন, অথচ এরাই সমাজের অবহেলিত, লাঞ্ছিত এবং বঞ্চিত। কবি তাদেরই পাশে থেকেছেন সারাজীবন। আজকের দিনে তাই ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেবার তাগিদে এসব গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা।

আমরা ত্রিপুরার মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আমাদের আপনজন বলে দাবি করি। আমরা গর্ব করে বলি এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকেই কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বীকৃতি এসেছে। সে সব কথা মনে রেখেই কবি ত্রিপুরাকে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। ত্রিপুরার অকৃত্রিম ভালবাসার নিগড়ে বাঁধা বলেই রবীন্দ্রনাথ সাতবার এসেছেন ত্রিপুরায়। এ রাজ্যের রাজন্যবর্গ যেমন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর বিজ্ঞান সাধনাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার প্রয়াসে এবং বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রবীন্দ্র চিন্তা চেতনার বাস্তবায়নে রবি কবির হাতেই তুলে দিয়েছেন তাদের সাহায্যের ডালি। রবীন্দ্রনাথও তেমনি বার বার কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন ত্রিপুরার গৌরবময় অবদানের কথা।

ত্রিপুরার প্রতি গভীর প্রেমের বশেই রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' 'মুকুট' ও 'বিসর্জন' গ্রন্থে অমর করে রেখেছেন এ রাজ্যটিকে। ত্রিপুরার সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে রবীন্দ্রনাথের অবদান অনস্বীকার্য। আজকের প্রজন্মের কাছে এসব গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরবার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের 'সব হতে আপন'- তা পুণরোচ্চারণের তাগিদেই আমাদের বিনীত প্রয়াস।

ত্রিপুরায় বাংলা ও কক্‌বরক ভাষা দুটি রাজ্যভাষার মর্যাদা পেলেও আমরা চাই এ রাজ্যে প্রচলিত সকল ভাষাই ফুলে পল্লবে বিকশিত হোক। তাই অনুবাদের মাধ্যমে অন্য ভাষাভাষীদের মধ্যেও বিশ্ব কবির রচনা আস্বাদনের উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। গ্রন্থ সমূহ সকল অংশের মানুষের কাছে আদৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

ডঃ ব্রজগোপাল রায়
চেয়ারম্যান
প্রকাশনা উপ-কমিটি

সূচীপত্র

	চিঠিপত্র	পত্রসংখ্যা	অপ্রকাশিত
(১)	রবীন্দ্রনাথ ঃ মহারাজ বীরচন্দ্র	১	
(২)	বীরচন্দ্র ঃ রবীন্দ্রনাথ	১	
(৩)	মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যস্য চরিতম্		
(৪)	রবীন্দ্রনাথ ঃ মহারাজ রাধাকিশোর	১৫	৭
(৫)	মহারাজ রাধাকিশোর ঃ রবীন্দ্রনাথ	৯	৯
(৬)	রবীন্দ্রনাথ ঃ মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর	২	২
(৭)	রবীন্দ্রনাথ ঃ মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর	২৯	১
(৮)	রবীন্দ্রনাথ ঃ মহিমঠাকুর	১০	
(৯)	রবীন্দ্রনাথ ঃ যতীন্দ্রনাথ বসু	১	১
(১০)	রবীন্দ্রনাথ ঃ রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী	১	
(১১)	রবীন্দ্রনাথ ঃ যোগীন্দ্র দেববর্ম্মা	১	১
(১২)	রবীন্দ্রনাথ ঃ সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা	৪	
(১৩)	রবীন্দ্রনাথ ঃ ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩	১
(১৪)	রবীন্দ্রনাথ ঃ ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মা	১২	২
(১৫)	রবীন্দ্রনাথ ঃ দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত	১	১
(১৬)	রবীন্দ্রনাথ ঃ শৈলেশ দেববর্ম্মা	৭	৫
(১৭)	রবীন্দ্রনাথ ঃ গিরিজানাথ চক্রবর্ত্তী	১	১
(১৮)	রবীন্দ্রনাথ ঃ বসন্তকুমার গুপ্ত	৬	
(১৯)	আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ঃ মহিম ঠাকুর	১	১
(২০)	রবীন্দ্রনাথ ঃ নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা	১	১

চিত্র ও পাণ্ডুলিপি সূচী

অপ্রকাশিত চিত্র ও পাণ্ডুলিপি তারকাচিহ্নে সূচিত হইয়াছে।

* প্রচ্ছদ (ত্রিপুরায় রিয়াবস্ত্রের আলোকচিত্র)

* প্রবেশক (কবির স্বাক্ষরিত আলোকচিত্র)

ক্রমিক সংখ্যা

১। কার্সিয়াং এ রবীন্দ্রনাথ (১৩০৩)
*২। ঐ ঐ আবক্ষ প্রতিকৃতি (১৩০৩)
*৩। মহারাজ ঁবীরচন্দ্র মাণিক্য
*৪। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য
*৫। কবির একটি বিস্মৃত আলেখ্য (হস্তে নীল শালুক ও গোলাপ)
*৬। ট্রেনের কামরায়--রোম (১৯২৬)
*৭। আগরতলায় শেষবার (কুঞ্জবন প্রাসাদে)
৮। স্বাক্ষরিত আলোকচিত্র (১৩৩৯)
৯। কুঞ্জবন-প্রাসাদের হলঘরে (১৩৩২)
১০। রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকিশোর
*১১। ঁযতীন্দ্রনাথ বসু, কুমার ঁনবীনকিশোর ও মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর (১৩১১)
(মহিম ঠাকুরের দেশীয়রাজ্য গ্রন্থ হইতে)
১২। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ
*১৩। কলিকাতা টাউনহলে মহারাজ ঁবীরবিক্রম মাণিক্য কর্তৃক রবীন্দ্র প্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন
১৪। কিশোর সাহিত্য সমাজে (আগরতলা) কবিসম্বর্দ্ধনা
১৫। শান্তিনিকেতনে কবিসহ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর
১৬। কুঞ্জবন প্রাসাদে সদলবলে শেষবার (১৩৩২)
*১৭। বন্ধু ঁমহিমচন্দ্রের পরিবার সহ (১৩৩২)
১৮। শান্তিনিকেতনে সপারিষদ মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য
*১৯। চিত্রাঙ্কনরত মহারাজ ঁবীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য
২০। শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে মহারাজ বীরবিক্রমের সম্বর্দ্ধনা
২১। শান্তিনিকেতনে কবির "ভারত-ভাস্কর" মানপত্র গ্রহণ
২২। "ভারত-ভাস্কর" মানপত্র গ্রহণান্তর কবির প্রত্যুত্তর পাঠরত ঁরথীন্দ্রনাথ"
*২৩। 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জ্জন' বর্ণিত ভুবনেশ্বরীর মন্দির, উদয়পুর
(কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ সংরক্ষিত)
*২৪। ঐ মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের ভগ্ন রাজপ্রসাদ, উদয়পুর
*২৫। কর্ণেল ঁমহিম ঠাকুরের বর্ত্তমান বাসভবন, আগরতলা
*২৬। পুরাতন কুঞ্জবন বাংলা (মালঞ্চাবাসের পূর্ব্বতন বাড়ী), আগরতলা
*২৭। কবির প্রিয় গোলবারান্দা, কুঞ্জবন-প্রাসাদ
২৮। কুঞ্জবন- প্রাসাদ (১৩৩২)
২৯। কবির প্রতিকৃতি (এচিং--ঁরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)
৩০। নটীর পূজা (উড্‌কাট--ঁরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী)

ক্রমিক সংখ্যা

সৌজন্য

প্রচ্ছদ--সংগ্রহ ঃ-- কুমার শ্রীরমেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা ও মহারাজকুমারী শ্রীমতী কমলপ্রভা দেবী
প্রবেশক--,, --হিজ হাইনেস মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর

চিত্রসূচীর ক্রমিক

১। সংগ্রহ --হিজ হাইনেস মহারাজ শ্রীকিরীটবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর
(আলোকচিত্র--মহারাজ ঁবীরচন্দ্র মাণিক্য-
পূর্ব্বাশায় প্রকাশিত)
২। ,, --হিজ হাইনেস মহারাজ শ্রীকিরীটবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর
(আলোকচিত্র--মহারাজ ঁবীরচন্দ্র মাণিক্য)
৩। ,, --শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
৪। ,, --মহারাণী শ্রীশ্রীমতী প্রভাদেবী মহাদেবী
৫। ,, --কুমার শ্রীপূর্ণেন্দুকিশোর দেববর্ম্মা
৬। ,, --শ্রীসত্যরঞ্জন বসু (আলোকচিত্র--মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর)
৭। ,, --শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (আলোকচিত্র--শ্রীনরেন্দ্র দেববর্ম্মা)
৮। ,, --শ্রীশৈলেশ দেববর্ম্মা
৯। ,, --শ্রীসত্যরঞ্জন বসু (আলোকচিত্র--মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর)
১০। ,, --শ্রীসত্যরঞ্জন বসু
১১। ,, --শ্রীসত্যরঞ্জন বসু (আলোকচিত্র--টি, পি, সেন, কলিকাতা)
১২। ,, --শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (আলোকচিত্র--জে, কে, সান্যাল, কলিকাতা)
১৩। ,, --শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (আলোকচিত্র--শ্রীনরেন্দ্র দেববর্ম্মা)
১৪। ,, --শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (আলোকচিত্র--শ্রীধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মা)
পূর্ব্বাশায় প্রকাশিত)
১৫। ,, --শ্রীসত্যরঞ্জন বসু (আলোকচিত্র--শ্রীনরেন্দ্র দেববর্ম্মা)
১৬। ,, --শ্রীসত্যরঞ্জন বসু (আলোকচিত্র--ঁসোমেন্দ্র দেববর্ম্মা)
১৭। ,, --শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত (আলোকচিত্র--শ্রীধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মা)
১৮। ,, --শ্রীপ্রবীরচন্দ্র দেব, রূপায়নী ষ্টুডিয়ো
(মহারাণী শ্রীশ্রীমতী প্রভাবতী মহাদেবীর সৌজন্যে)
১৯। ,, --শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
২০। মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর (প্রবাসীতে প্রকাশিত)
২১। ,, ঐ ঐ ঐ
২২। ,, --ত্রিপুরা প্রশাসন, জনসংযোগ বিভাগ
২৩। সংগ্রহ--শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
২৪। ,, --ত্রিপুরা প্রশাসন, জনসংযোগ বিভাগ (সৌজন্য--সর্ব্বশ্রী রাজেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা, নরসিং দেববর্ম্মা, চন্দ্রশেখর দেববর্ম্মা প্রমুখ)
২৫। ,, --হিজ হাইনেস্ মহারাজ শ্রীকিরীটবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর
২৬। ,, --ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ, জনসংযোগ বিভাগ

চিত্রসূচীর ক্রমিক

২৭। সংগ্রহ --শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
২৮-৩১। „ --শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্ত্তী (৩০ সৌজন্য--শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক)
৩২। „ --মৈসূরের মহারাজ সংগৃহীত মুল চিত্র হইতে শিল্পী শ্রীধীরেনকৃষ্ণের আলোকচিত্র।
৩৩। „ --শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
৩৪। „ --শ্রীরণজিৎ কুমার দাস
৩৫। „ --মহারাজকুমার শ্রীআদিত্যকিশোর দেববর্ম্মা
৩৬। „ --শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
৩৭। „ --শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
৩৮। „ --মহারাজকুমার শ্রীআদিত্যকিশোর দেববর্ম্মা
৩৯। „ --উমাকান্ত একাডেমী আগরতলা
৪০। „ --শ্রীধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মা
৪১। „ --শ্রীচন্দ্রশেখর দেববর্ম্মা
৪২। „ --হিজ হাইনেস্ মহারাজ শ্রীকিরীটবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর
৪৩। „ --শ্রীরণজিৎ কুমার দাস
৪৪-৪৫। „ --উমাকান্ত একাডেমী আগরতলা
৪৬। „ --মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
৪৭। „ --কুমার শ্রীরমেন্দ্রকিশোর
৪৮। „ --শ্রীসত্যরঞ্জন বসু
৪৯। „ --মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর
৫০-৫৪। „ --শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
৫৫। „ --শ্রীসত্যরঞ্জন বসু
৫৬। „ --শ্রীশৈলেশ দেববর্ম্মা
৫৭-৫৮। „ --শ্রীধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মা
৫৯। „ --শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার

রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা

ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীসত্যরঞ্জন বসু

প্রারম্ভে

বলিয়া রাখা দরকার আমাদের এই সঙ্কলনের মধ্যে নিজেদের গবেষণার কিছুই নাই। কেবলমাত্র ত্রিপুরায় রবীন্দ্র পরিচয়কে একত্র করিয়া রাখার চেষ্টা এবং সে পরিচয়কে ফুটাইয়া তুলিতে সমসাময়িক উপাদান যাহা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে তাহার ব্যবহারে আগ্রহী সুধীজনের চিন্তার পরিবেশ রচনার প্রয়াস।

উপাদানের কথা বলিতে গেলে, প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের অমূল্য পত্রাবলী, ভাষণ ও উক্তিসমূহ। ইহার সহিত মহারাজ বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোর লিখিত কয়েকখানি পত্র, রবীন্দ্রনাথকে লিখিত, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ মহিমঠাকুরকে যে সব চিঠি লিখিয়াছেন তাহারও কয়েকখানা আমাদের ব্যবহারে আনা সম্ভবপর হইয়াছে। মহিমঠাকুর লিখিত 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে 'ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ' ও 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ দুইটিই ত্রিপুরায় রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য আলোকসম্পাত করিয়াছে। ত্রিপুরার এই বর-পুত্রটি পাঠ্যাবস্থা হইতেই ঠাকুর পরিবারে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কর্মজীবনেও সেই সুযোগ আরও রূপায়িত হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা লাভ করিয়া এবং অন্যদিকে ত্রিপুরার দুই মনীষী মহারাজ বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোরের বিশেষভাবে নির্ভরযোগ্য পার্ষদ হিসাবে। কবি-স্নেহপুষ্ট মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের আবাল্য সম্পর্ক কবির অজস্র চিঠিপত্রে ব্যক্ত হইয়াছে- সেগুলি বহুলভাবে আমরা ব্যবহার করিয়াছি। সভাসমিতিতে মহারাজকুমারের ভাষণগুলিও উপাদান সংগ্রহের মূল ভিত্তি। তাঁহার স্মৃতি-কথাগুলিও যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন-আমরা যখন এইগুলি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া সংগ্রহে সচেষ্ট, তখন ইহার অধিকাংশই স্থানচ্যুত, হস্তান্তরিত, নিখোঁজ বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার মূল্যমান নির্দ্ধারণ করার যোগ্যতা যে পত্র-অধিকারীদের ছিল না, তাহার নিদর্শন পাই-কয়েকখানা পত্র যথেচ্ছ ব্যবহারকালে উদ্ধার করার দৃষ্টান্ত হইতে। কিন্তু মহারাজ রাধাকিশোর পত্রগুচ্ছ কাগজে মুড়িয়া লাল পেন্সিলে "রবী" (বানান এইরূপ) লিখিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেন এইরূপ নিদর্শনও পাইয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে কতসংখ্যক এইভাবে রক্ষিত ও চিহ্নিত পত্রগুচ্ছ যে লয় পাইয়াছে অথবা দৃষ্টির অন্তরালে এখনও বিস্মৃত অবস্থায় রহিয়াছে-তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে উঠে কি পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কবি নিজেই পরিচয়ের কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পত্রে (১২৯৩) মহারাজ বীরচন্দ্রকে লিখিলেন, "আপনাদের রাজপরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় আছে, এইরূপ শুনিতে পাই--সেই জন্য সাহসী হইয়া মহারাজকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের পূর্ব্বকার সম্বন্ধ মহারাজের স্মরণে আসে এই আমার অভি প্রায়"। বীরচন্দ্রও উত্তরে জানাইলেন "------ সে সুখের সম্বন্ধ আমি ভুলি নাই, আপনি পুনরায় তাহার গৌরব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ আপ্যায়িত ও বাধিত হইলাম।----" আবার মহারাজ রাধাকিশোরকে লিখিত (২৮শে আষাঢ়, ১৩১২) এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানান "-----ত্রিপুরার ইতিহাসে আমার পিতামহের যে যোগ ছিল সেই যোগ আমাকেও রক্ষা করিতে হইবে বিধাতার এই অভিপ্রায়বশতই অকস্মাৎ স্বর্গীয় মহারাজ বিনা পরিচয়েই আমাকে ত্রিপুরার সহিত আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।" গুরুতর রাজনৈতিক সঙ্কটে পড়িয়া বীরচন্দ্রের পিতা মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যপ্রার্থী হন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রভাব রাজপুরুষ ও কলিকাতা সমাজে তখন অপ্রতিহত। তাঁহারই সহায়তায় কৃষ্ণকিশোর সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পান। জানা যায়, তিনি তখন বিখ্যাত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে রাজ্যের কর্ণধাররূপে পাইবার প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। এই যোগসূত্রকেই রবীন্দ্রনাথ নিবিড়তর চিরস্মরণীয় করিয়াছেন পরবর্তী কালে।

কিন্তু এই রাজপরিবারের বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ও সম্মাননাও (ত্রিপুরার রাজভাষা ছিল বাংলা), রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের অন্যতম কারণ। তাঁহার ভাষায়--"এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগ সূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।"

বাংলা ভাষার প্রতি ত্রিপুর রাজপরিবারের অনুরাগের কথাও, আমাদের মনে হয়, কবির জানিবার সুযোগ হইয়াছিল কৈলাসচন্দ্র সিংহের "রাজমালা" আলোচনা ও প্রণয়ন কালে। সিংহ মহাশয় (১২৫৮-১৩২১) এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহঃসম্পাদক ছিলেন। এবং 'রাজর্ষি' ও 'মুকুট' সম্বন্ধীয় ত্রিপুরার ঐতিহাসিক আখ্যানগুলি কৈলাসচন্দ্রের সহযোগিতায় কবি সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই তথ্য "রবীন্দ্রজীবনী"- - কারও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ১২৯১-৯২ সালের কথা যখন 'বালক' পত্রিকায় এই আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইতেছিল। ইহার পর বৎসরে ১২৯৩ সালে মহারাজ বীরচন্দ্রকে লিখিত ঐতিহাসিক পত্রখানা--যাহার কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই আলোচনায় ব্যক্তি--পরিচয়ের অবকাশ আছে বলিয়াই মনে করি। যে বীরচন্দ্র কিশোর কবিকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন তিনি একাধারে কাব্যরসিক, কবি, শিল্পী ও অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ। এহেন বীরচন্দ্রকে ঘিরিয়া তখন বাংলা তথা ভারতের বহু গুণী জ্ঞানী রাজনীতি বিশারদ। তাহাদের প্রত্যেকের বিশিষ্টতায় ত্রিপুর দরবার সমুজ্জ্বল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আওতা হইতে বহুদূরে বনানীকীর্ণ ত্রিপুরায় কি যে সাধনা করিয়া বীরচন্দ্র ইহাদের আকর্ষণ করিয়াছিলেন-- চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়। একদিকে প্রখ্যাতনামা ডঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,-- বিশিষ্ট রাজনীতিবিৎ, বৈষ্ণব সাহিত্য

রসিক ও পাশ্চাত্য দর্শনবিৎ রাধারমণ ঘোষ, সুরসিক স্বভাব কবি মদন মিত্র প্রভৃতি ও অপরদিকে সুরবীণ বাদক নিশার হোসেন, রবাব বাদক কাশেম আলী খাঁ, সুরশিঙ্গা ও এস্‌রাজ বাদক হাইদার খাঁ, সেতার বাদক নবীনচাঁদ গোস্বামী, বেহালা বাদক হরিদাস, পাখোয়াজ বাদক পঞ্চানন্দ মিত্র, কেশব মিত্র ও রামকুমার বসাক, নাট্যাচার্য্য কুলন্দর বক্‌স্ এবং গায়ক যদুনাথ ভট্ট, ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সমাবেশে বীরচন্দ্রের দরবার দেশে দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছিল। উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ডঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লিখিত Travels in Bengal : Calcutta to Independent Tipperah (1887) গ্রন্থে বীরচন্দ্রের বসিবার ঘরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহাই মহারাজের গুণগরিমা অনুধাবন করার পক্ষে যথেষ্ট।

'প্রেম মরীচিকা', 'অকাল কুসুম', 'উচ্ছ্বাস' ও 'সোহাগ' কাব্যে বীরচন্দ্রের প্রেমিক মনকে যেমন ধরা যায়, তেমনি সাধক মনকে সমাহিত দেখিতে পাই 'ঝুলন' ও 'হোরি' গীতিকাব্য দুইখানিতে ও অজস্র মনোহরসাই রাগিণীতে রচিত পদাবলী সঙ্গীত লহরীতে।

তাঁহার লিপি নিদর্শন হইতেই শিল্প-চাতুর্য্যকে ধরা যায়। দুষ্প্রাপ্য এই নিদর্শন সকলের কাছে উপস্থাপিত করিবার যোগ্য বলিয়াই আমরা গ্রন্থের অন্যত্র ইহার অবিকৃত মুদ্রণ প্রকাশ করিতেছি।

রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে নানা অশান্তির মধ্যে বীরচন্দ্রকে কাঁটাইতে হইয়াছে ; কিন্তু যে গুণী সমাবেশ তাঁহাকে ঘিরিয়া ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় (ডঃ শম্ভুচন্দ্র ছাড়াও), যথা--পঞ্চানন্দ মিত্র, ক্ষেত্রমোহন বসু, (যাঁহার উপাধি ছিল 'ধ্রুপদী') প্রভৃতি ইংরেজ গবর্ণমেন্ট-এর সহিত যোগাযোগ রক্ষায় বিশেষ তৎপর ছিলেন। কৈলাস সিংহ প্রণীত 'রাজমালা' গ্রন্থে একস্থলে আছে--"মহারাজ উর্দ্দু ভাষায় মাতৃভাষার ন্যায় আলাপ করিতে পারেন এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। তিনি পানাদি দোষবর্জ্জিত, বুদ্ধিমান ও অত্যন্ত বাকপটু। তাঁহার বাক্যন্যাসশক্তি এইরূপ প্রবল যে তৎপ্রতি ভীষণ বিদ্বেষভাবাপন্ন কোন ব্যক্তি ক্ষণকাল তাঁহার সহিত আলাপ করিলে, সেইভাব পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন না।"

রবীন্দ্রনাথের সহিত বীরচন্দ্রের পুত্র মহারাজ রাধাকিশোরের মিলন অনন্যাসাধারণ। একদিকে কবির 'সে দিনকার বহু নিন্দা-লাঞ্ছিত খ্যাতির প্রতি' রাধাকিশোরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা- অন্যদিকে বিষয়কর্মে জর্জ্জরিত প্রাণবন্ত রাধাকিশোরের নানা বিঘ্ন অপনোদনে সহায়ক সুহৃদরূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। ইহারই পটভূমির কথা আলোচনা করা দরকার। মহারাজ রাধাকিশোর সিংহাসন অধিরোহণ (১৮৯৭) করিবার পরেই ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণে অর্থাভাব। সেই সময়ে পলিটিক্যাল এজেন্টকে লিখিবার জন্য মহারাজের বাংলায় খসরা চিঠিতে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় মহারাজ খুব পারগ ছিলেন না। "রাজ্যের উন্নতিকল্পে কয়েকটি কার্য্য করিব বলিয়া মনন করিয়াছিলাম কিন্তু ভূমিকম্প হেতু আমার ঐ সকল অভিপ্রায় একপ্রকার পন্ড হইয়াছে - ------ - অর্থের অভাবে নিম্নলিখিত কতিপয় কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে না পারিলেও

অন্ততঃ আরম্ভ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিতেছি। যথা--

১। বালিকা বিদ্যালয়।
২। আখাউরার রাস্তা।
৩। টেক্‌নিকেল স্কুল।
৪। আইন প্রণয়ন।
৫। রাজধানী হইতে খোওয়াই পর্য্যন্ত রাস্তা।
৬। হাওরার পুল্--ইত্যাদি।"

এই পত্রেই দেখিতে পাই যে 'উত্তরাধিকারী সৃজন' বিষয়ে গভর্ণমেন্টের বড়ঠাকুর সমরেন্দ্র চন্দ্রকে সমর্থনের হুমকি, মহারাজ রাধাকিশোর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না। সমরেন্দ্রচন্দ্র যুবরাজ পদের জন্য পিতা বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই জ্যেষ্ঠ রাধাকিশোরের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইতেছিলেন। মহারাজ রাধাকিশোর নিজপুত্র বীরেন্দ্রকিশোরকে যুবরাজপদে নিয়োগে অভিলাষী জানিয়াই বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র গভর্ণমেন্টের শরণাপন্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন রাজকর্ম্মচারীদের সহায়তায় কলিকাতায় আইনজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণে তৎপর হইলেন। পলিটিক্যাল এজেন্টকে রাধাকিশোর তাঁহার স্বাধীন ক্ষমতার উপর গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করার প্রবৃত্তি যাহাতে না হয় সেই অভিপ্রায়ই জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার স্থির যুক্তি ও পত্রের শিষ্ট বয়ান দোদ্দন্ড প্রতাপ ইংরাজ গভর্ণমেন্টের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্ততা, পরিণতি বিষয়ে তাঁহার নিরুদ্বিগ্নতাই প্রকাশ করিতেছে। এই সঙ্কটকালে আমরা দেখিতে পাই যে তখনকার রাজধানী কলিকাতা সহরের স্বাধীনভাবে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান অভিজাত সমাজ বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও চেষ্টায়ই মহারাজের অনুসৃত পদ্ধতিকে সমর্থন করিতেছেন।

প্রতিপক্ষ তাঁহাদের চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। কাজেই মহারাজ রাধাকিশোরের অনুগত মহিমচন্দ্র কলিকাতা যাইয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সেখানে আছেন-- রাজেন্দ্র মুখার্জ্জির অতিথি হিসাবে তাঁহার বাড়ীতেই। রবীন্দ্রনাথ নিজের বলিয়াই বিষয়টি গ্রহণ করিলেন--নিজের যাহা করণীয় সবই করিলেন। মহিমঠাকুর নিম্নোক্ত কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উক্তি বলিয়া মহারাজকে চিঠিতে জানাইলেন--(কার্ত্তিক ১৩০৫) - - - - "আমি রাজখান্দান জানি না--এই মাত্র জানি সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার প্রতি অবজ্ঞার পাপ কোন মতেই প্রশ্রয় পাওয়া উচিত নহে--পৃথিবীতে জন্মিয়া সকলেই রাজা হয় না-- কিন্তু রাজভক্ত হইবার অধিকার সকলেরই আছে--এমন ক্ষেত্রে যে তাহা জানিয়া শুনিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক তাহার প্রতি আমার সহানুভূতি মাত্র নাই - - - -।" আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় স্পষ্টই মহিমঠাকুরকে জানাইলেন যে মহারাজ তাঁহাকে যেরূপ ভালবাসেন তাহাতে তিনি এরূপ গোলে যোগদান করিবেন না। নাটোরের মহারাজাও তাঁহার এই রকম অভিমত ব্যক্ত করিলেন। আনন্দমোহন বসুও অপর পক্ষে পরামর্শ দিতে নারাজ। কিন্তু 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বড়ঠাকুরের পক্ষে লিখিয়াছেন। কিন্তু অতঃপর সম্যক অবস্থা বুঝিয়া তাঁহারাও এ বিষয়ে আর অগ্রসর হন নাই। এমন কি তখনকার The Englishman -এর সম্পাদক, যিনি মহারাজকে বড়লাট দরবারে

দেখিয়াছেন, তিনি ও বিরুদ্ধপক্ষের কথা শুনিবেন না বলিয়া মহিমঠাকুরকে জানাইলেন। মনে হয় এই সমস্ত যোগাযোগ ও আলোচনার ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুণমুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ যতই রাধাকিশোরের ঘনিষ্ঠ হইতেছিলেন, ততই তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে ত্রিপুরাকে জানিবার সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহার হিতকামনায় নিজকে জড়িত করিতে কোনো বাধাকেই বাধা বলিয়া জ্ঞান করেন নাই।

এই যোগাযোগের ধারা মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর ও বীরবিক্রমকিশোরের রাজত্বকালে অব্যাহত থাকিয়া ত্রিপুরার জন্য রবীন্দ্রনাথের আশিস্ লাভ করিয়াছে। কবি সান্নিধ্যে মহারাজ বীরবিক্রমের কথা-- শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত পৃথক এক অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে মহাবাজ রাধাকিশোরের পুত্র মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে বালক কাল হইতেই তাঁহার ব্যবহারে ও আচরণে কবি নিকটে টানিয়া লইয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন "-- --আমি ত্রিপুররাজ্যের আর কোনো হিত যদি না করে থাকি, কেবলমাত্র যদি ব্রজেন্দ্রকিশোরের চরিত্রকে কর্ত্তব্যের দীক্ষায় দৃঢ় করতে পেরে থাকি, তবে তাঁর দ্বারা ত্রিপুরার স্থায়ী কল্যাণ সাধন করেছি বলে গৌরব করতে পারবো। - - - -" ইনি বহুকাল ধরিয়া ত্রিপুরারাজ্যের কর্ণধার হিসাবে স্বদেশের সেবায় রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাকে সার্থক করিয়াছেন এবং সেই কালের আভিজাত্যের নিগড়কে ছিন্ন করিয়া তাঁহার চালচলন ও ব্যবহারে জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। কবির এই স্নেহের "রাজপুত্তুর" এর কথাও এক পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হইল।

এই আলোচনায় অনেক স্থানেই 'যতি' নাম উল্লেখ আছে। পূর্ণ নাম যতীন্দ্রনাথ বসু--প্রথম তিনি যুবরাজের সহচর-শিক্ষক--পরে মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করেন। ঠাকুর পরিবারে ঘনিষ্ঠ ও 'জীবন-স্মৃতি'তে উল্লিখিত অক্ষয় চৌধুরীর জামাতা। সুপুরুষ, সুগায়ক, শিল্পী ও ইংরেজী বাংলায় বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যের কথা নানা-প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। তৎকালে গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁহারই গীত "ঘাটে ডিঙ্গা লাগাইয়া বন্ধু পান খাইয়া যাও"-- গানটি মুখে মুখে খুব প্রচারিত ছিল।

মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোবের আগ্রহ ও উৎসাহেই "ত্রিপুরায় রবীন্দ্রস্মৃতি" সঙ্কলন আরম্ভ হয়। ইহার অংশ বিশেষ স্থানীয় সাময়িক 'সমাচার' ও 'ত্রিপুরার কথা'য় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। অনেক তথ্য "রবীন্দ্র-জীবনী" হইতে আহরণ করিয়াছি-- কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করিতেছি। ব্রজেন্দ্রকিশোরের চেষ্টায় ও মহারাণী শ্রীশ্রীমতী প্রভাবতী মহাদেব্যার অনুগ্রহে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানা চিঠি আমরা পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিত আরও কয়েকখানা পত্রের প্রতিলিপি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র দেববর্ম্মার এবং মহারাজকুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত আদিত্যকিশোর দেববর্ম্মার সৌজন্যে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পত্রাদির সন্ধান ও সরবরাহ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন-- বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন। তাঁহার লিখিত পত্রাদিতে তথ্যাদি সম্পর্কেও অনেক কিছু জানিতে পারিয়াছি। রবীন্দ্রনাথকে মহারাজ রাধাকিশোর লিখিত কতিপয় পত্রের ছাপানো প্রুফ আমাদের ব্যবহারের জন্য দেওয়ায়--

এই সঙ্কলন আলোচনা বহুলভাবে সমৃদ্ধ হইয়াছে। পুলিনবাবু ইহা অযাচিতভাবেই দিয়াছেন--আমাদের সন্ধান জানিবারও সুযোগ ছিল না।

আলোকচিত্রের কয়েকটি মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের তোলা, দুইখানা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেববর্ম্মার উঠানো। পুরানো বিশেষ করিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোরের সময়ে তোলা কয়েকখানা দুর্লভ ছবি--রাজমাতা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর বিশেষ আদেশে কয়েক হাজার ছবির মধ্যে কায়িক ক্লেশে বাছাই করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।

ইঁহাদের প্রত্যেকের কাছে তাঁহাদের সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞ অন্তরে ঋণ স্বীকার করিতেছি।

এক

বীরচন্দ্র

ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিতেন এবং প্রভাতী 'রবি'র রক্তিমাভা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যে নবরূপে সজ্জিত করিতেছিল তাহা এই প্রত্যন্ত খন্ডে বসিয়াও সবিশেষ লক্ষ্য করিতেন।

নিজের কাব্যানুশীলন বিশেষভাবে বৈষ্ণবসাহিত্যের সাধকোচিত অনুধাবন বীরচন্দ্রের জীবনের বিশিষ্ট দিক। তাঁহার অসংখ্য গান আজও সমভাবে রসিক সমাজে আদরণীয় হইয়া আছে। কাব্যগ্রন্থও খোঁজ করিয়া ছয়খানা পাওয়া গিয়াছে। গুণী সমাবেশে তাঁহার দরবার ভারতে তখন ছিল সমৃদ্ধ।

এহেন বীরচন্দ্রের হৃদয় শোকাকুল হইয়া পড়িল প্রিয়তমা মহিষীর অকালমৃত্যুতে। বিরহীর মর্ম্মবেদনা কবিতার লহরে লহরে গাঁথিয়া শোকভার লাঘব করিতে তিনি সচেষ্ট। "প্রেম-মরীচিকা" কাব্যে এই শোকোচ্ছাস অভিব্যক্ত। কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের "ভগ্নহৃদয়"-এর (১) সুর কবি বীরচন্দ্রের বিরহী প্রাণে বিশেষভাবে সাড়া দিয়াছিল। কিশোর কবির ভবিষ্যৎ যেন তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তিনি সুদূর কলিকাতায় কবিকে অভিনন্দিত করিবার জন্য নিজ অমাত্যকে পাঠাইলেন। কবির নিজ ভাষা--

> "সেই সময়ে আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্পলোকেই জান্‌তেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আমার আত্মীয়স্বজন নিকটতম বন্ধু জনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন, এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা কর্‌লেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা কর্‌লাম। আপনারা হয়তো অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন--তিনি রাধারমণ ঘোষ। মহারাজ তাঁকে সুদুর ত্রিপুরা হ'তে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি কবিরূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিস্ময়ের সীমা রইল না।"

ত্রিপুরার ইতিবৃত্তের কাহিনী হইতে নানা চরিত্র কবিকে কিভাবে এবং কেন প্রেরণা দিয়াছিল বলা কঠিন। কিন্তু তাঁহার অমর লেখনী বাংলা সাহিত্যে ত্রিপুরাকে চির ভাস্বর করিয়া রাখিয়াছে। "রাজর্ষি" "মুকুট" ও "বিসর্জ্জন" ত্রিপুরার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হইয়াছে, ত্রিপুরাবাসী ধন্য মানিয়াছে। ঐতিহাসিক মাপকাঠিতে হয়ত 'রাজর্ষি' অথবা 'বিসর্জ্জন' এ ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিতে পারে, কিন্তু মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের চরিত্রের যে দিক কবিকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছিল তাহার শাশ্বত আবেদন অনস্বীকার্য্য। বিশেষতঃ

---

(১) 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত হয় ১২৮৮ সালে।
মহারাণী ভানুমতী স্বর্গারোহণ করেন ১২৮৯ সালে।
কাজেই মহিমঠাকুর লিখিত 'ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লিখিত-"এমনি সময়ে (প্রিয়তমা প্রধানা মহিষীর মৃত্যুর পরে) কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া 'ভগ্নহৃদয়' নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন"--ইহার সামঞ্জস্য হয় না। কাব্যখানি মহারাণীর মৃত্যুর পুর্ব্ব বৎসরে প্রকাশিত। তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজ বীরচন্দ্রের হাতে কাব্যখানি আসে।

কবির স্বপ্ন-লব্ধ গল্প ও কল্পনাকে ক্ষুন্ন করিতে উত্তরকালেও তিনি গররাজি ছিলেন। কথা ছিল, শেষবার যখন কবি আগরতলায় আগমন করেন, তখন তাঁহাকে গোবিন্দ মাণিক্যের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও ভুবনেশ্বরীর মন্দির ইত্যাদি দেখানো হইবে। কিন্তু কবি তাঁর মানস-লোকের দৃষ্টিকে নষ্ট করিতে স্বীকার করেন নাই।

''রাজষি''র প্রথম প্রকাশ ১২৯৩ বঙ্গাব্দে। এ সম্বন্ধে ''জীবন-স্মৃতি''তে কবি বলিতেছেন-

> ''- - -দুই এক সংখ্যা 'বালক' বাহির হইবার পর, দুই একদিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণ বাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়ীতে ভিড় ছিল ; ভাল করিয়া ঘুম হইতেছিল না- - -ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম ঘুম যখন হইবেই না, তখন এই সুযোগ বালকের জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির চিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ-ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে-- বাবা, একি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভাব করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। --জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্ন-লব্ধ গল্প। এর স্বপ্নটিই সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া ''রাজর্ষি'' গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে 'বালক' এ বাহির করিতে লাগিলাম।''

এই প্রসঙ্গের ইতিহাস পাইবার জন্য কবি মহারাজ বীরচন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। এই পত্রখানাই রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রথম পত্র বলিয়া আমরা জানিয়াছি। কবির সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তীতে কলিকাতা টাউন হলে যে সম্বর্দ্ধনা সভা হয়, তাহার সহিত একটি প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন করেন ত্রিপুরার কিশোর মহারাজ বীরবিক্রম। ত্রিপুরার শিল্প-সম্ভার ছাড়াও 'রাজ্যের রাজ-ভাষা বাংলা'-- এই পর্য্যায়ে অনেক কিছু প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এই ঐতিহাসিক পত্রখানাও ছিল। শিল্পাচার্য্য নন্দলালের নির্দ্দেশে পত্রখানির উভয় দিকেই কাঁচ দিয়া পতাকা দন্ডের মত ফ্রেম করা হইয়াছিল। মূল পত্রে কোনও তারিখ ছিল না, মহারাজ বীরচন্দ্রের উত্তরের তারিখের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ইহাতে তারিখ বসানো হইয়াছিল--২৩ বৈশাখ, ১২৯৩ সন। পত্রখানি অধুনালুপ্ত 'রবি' পত্রিকার ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় ছাপা হইয়াছিল।

> ''মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া 'রাজর্ষি' নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জ্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দ মাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিব। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য তাঁহার নির্ব্বাসন দশায় চট্টগ্রামের কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন যদি জানিতে পাই, তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের এবং ঐতিহাসিক ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের ফটোগ্রাফ যদি পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপরকার হয়। - - -''
>
> প্রণতঃ
>
> শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ''

"দেবশর্ম্মণঃ" লেখা রবীন্দ্রনাথের আর কোনও পত্র আমাদের চোখে পড়ে নাই। মনে হয়, তৎকালীন আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার পদ্ধতি "দেবশর্ম্মণঃ" লেখায় কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ "প্রণতঃ" বলিয়া লেখার কারণ বুঝা যায় না--একমাত্র বীরচন্দ্রের বয়োজ্যেষ্ঠতাকেই কবি মনে স্থান দিয়াছিলেন বলিতে হয়।

বীরচন্দ্র দীর্ঘ উত্তর দিলেন ও "রাজরত্নাকর" নামক ত্রিপুর রাজবংশের ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস হইতে গোবিন্দ মাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতা ছত্র মাণিক্যের চরিত ছাপাইয়া কবিকে পাঠাইয়া দেন। ১২৯৩ সালের মাঘ মাসে 'রাজর্ষি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার পরিশিষ্টে বীরচন্দ্র প্রেরিত 'মহারাজগোবিন্দমাণিক্যস্য চরিত্রম্' মুদ্রিত হইয়াছিল।*

এই পত্রে বীরচন্দ্র লিখিলেন--

"মুকুট" ও "রাজর্ষি" নামক দুইটি প্রবন্ধ আমি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যে যে স্খলন হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।"

১২৯৬ ত্রিপুরা--তাং ১৮ই জ্যৈষ্ঠ--১২৯৩ সাল। (১)

'বিসর্জ্জন' প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে, এই পত্র ব্যবহারের চার বৎসর অন্তে। কিন্তু 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জ্জন' এ ঘটনা পরম্পরার ও রাজচরিত্রের অঙ্কনে কবি যে কিছু কল্পনাশ্রয়ী হইয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গোবিন্দ মাণিক্যের চরিত্রকে কর্ত্তব্যে বজ্রকঠিন ও কুসুমকোমল করিয়া কবি দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ মনে হয়, কবির স্বীয় অনুভূতি অপরূপভাবে গোবিন্দ মাণিক্যের চিত্র অঙ্কনে প্রকট হইয়াছে--

"আমার ত্রিপুর রাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীব জননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্ব্বাসন দন্ড।"

অপরদিকে, সেই অনুভূতিই তৎকালীন দেশাচারের পূর্ণ স্বরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে--চন্ডাই রঘুপতির মুখে---

"-----------ঘোর কলি
এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়--সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী পরে।"

গোবিন্দ মাণিক্য চরিত্রের আখ্যানভাগ আরও মধুর হইয়াছে ভ্রাতৃ-বিরোধে বরণীয় দেশাত্মবোধে ও স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন দন্ড গ্রহণে। গোবিন্দ মাণিক্যের চরিত্র-অঙ্কন সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক সার্থক সৃষ্টি।

পত্র ব্যবহারের পরিচয়ের পর হইতে মহারাজ বীরচন্দ্র কলিকাতা গেলেই কবিকে ডাকিয়া লইতেন। সৌম্যদর্শন কবির মুখে কবিতা পাঠ ও গান শুনিয়া তিনি কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কবি বলিয়াছেন, 'মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন।'

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

(১) ত্রিপুরাব্দ ও বঙ্গাব্দে তিন বৎরের তফাৎ

তাঁহার কাছে 'গান- গাওয়া যে কতদূর সঙ্কোচের ছিল'! কেবল বীরচন্দ্রের স্নেহের প্রশ্রয় তাঁহাকে সাহস দিত।

এই সময়কার কাহিনী সঙ্কলনের উপাদান ত্রিপুরার স্বনামধন্য মহিম ঠাকুর লিখিত 'ত্রিপুর-দরবারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। মহিম ঠাকুর কলিকাতায় পঠদ্দশায় সহপাঠী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিতেন। ইহা হইতেই তাঁহার কবির সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটে এবং সারাজীবন তিনি কবির সখ্যলাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। এই সুযোগে মহিমচন্দ্র কলিকাতা অভিজাত সমাজে মিশিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন--তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

কিছুকাল যাবৎ বীরচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না। রাজকার্য্যে নানা বিঘ্ন তাঁহার মানসিক উৎকণ্ঠাও বাড়াইতেছিল। অসুস্থ হইয়া পড়িলে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে তিনি কাসিয়াং যান। রাজকার্য্য হইতে বিদেশে অবসর যাপনে স্বাচ্ছন্দ্যলাভ ও মানসিক উদ্বেগ হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি লাভই তাঁহার কাম্য। রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন।

''রবীন্দ্র জীবনী'' কারও মহারাজ বীরচন্দ্রের আমন্ত্রণে কাসিয়াং-এ ১৩০১ সনের প্রথম ভাগে কয়েকদিন কাটাইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত ''রবীন্দ্র জীবনী''--১ম খন্ড--পৃঃ ৩০৩)।

কিন্তু কবি শেষবার আগরতলায় আসিয়া কিশোর সাহিত্য সমাজে* (১৩৩২) সম্বর্দ্ধনার উত্তরে যে ভাষণ প্রদান করেন তাহাতে কাসিয়াংএ মহারাজ বীরচন্দ্রের সহিত কবির দুইবার সঙ্গী হইবার কথাই আমাদের মনে আসে। এ বিষয়ে রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমাদের পত্রালাপ হয়। তিনিও আমাদের অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। একবার ১৮৯৪ (১৩০১) গ্রীষ্মকালে ও দ্বিতীয়বার ১৮৯৬ অক্‌টোবরে অর্থাৎ ১৩০৩ সনের কার্ত্তিক মাসে কবি মহারাজের সঙ্গে যান--অগ্রহায়ণে বীরচন্দ্রের মৃত্যু হয়। প্রথমবারের অবস্থান সময়ে বীরচন্দ্র কবির লেখা শুনিতেন আর গান গাহিতে বলিতেন--''মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান গাওয়া যে কতদূর সঙ্কোচের ছিল তা' সহজেই অনুমেয়। কেবলমাত্র তাঁর স্নেহের প্রশ্রয় আমাকে সাহস দিয়েছিল।'' কিন্তু দ্বিতীয়বারে কবির সহিত সাহিত্যালোচনা করিয়া, ও কবিকণ্ঠে গান শুনিয়াই বীরচন্দ্র ক্ষান্ত ছিলেন না।--বৈষ্ণবপদাবলী প্রকাশনের পরিকল্পনাকেও রূপায়িত করিয়াছিলেন।

মহিম ঠাকুর কাসিয়াংএ মহারাজের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার উপরেই রবীন্দ্রনাথের পরিচর্য্যার ভার ছিল এই সময়কার কথা তিনি 'ত্রিপুর-দরবারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে বিবৃত করা গেল। কিন্তু কবির

*পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

কার্সিয়াংএ দুইবার উপস্থিতি তিনি একবারের বলিয়াই বর্ণনায় আনিয়াছেন--

"রাত প্রায় ১০টা বাজিয়া যাইত,অবিশ্রামভাবে মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সঙ্গীত এবং কাব্য আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন; বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেন। আলোচনান্তে প্রতি রাত্রে মহারাজ উঠিয়া রবিবাবুকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিয়া যাইতেন। মহারাজ বীরচন্দ্র অসুস্থ ; অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হাস্যমুখেই তিনি আলোচনায় যোগ দিতেন, একথা রবিবাবু জানিতেন। তিনি একদিন, মহারাজ কেন কষ্ট করিয়া সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাঁহাকে আগুয়াইয়া দেন এরূপ অনুযোগ করিলেন। তখন মহারাজ বলিয়াছিলেন--রবিবাবু, পাছে অলসতা আসিয়া কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটায়, আমি সে ভয় করি, আপনি আমাকে বাধা দিবেন না।"

(দেশীয় রাজ্য--২১১ পৃঃ)

এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিল যে তিনি বহুবার বহুভাবে ইহা বর্ণনা করিয়া রাজোচিত বিনয়, সৌজন্য, রসজ্ঞতা ও সহৃদয়তার উদাহরণ দিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেন। 'আমি অভিজাত বংশের মহিমার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম।'

একদিকে বীরচন্দ্রের সহিত কবির আলাপ আলোচনা অন্যদিকে রাধারমণ ঘোষের (১) সঙ্গ লাভ করিয়া কার্সিয়াংএ যে কয়েকটি দিন ছিলেন তাহা খুবই আনন্দে কাটিয়াছিল। সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পার হইয়া গেলেও উভয়ের বৈষ্ণব দর্শন ও পদাবলীর আলোচনায় ছেদ পড়িতে চাহিত না। মাঝে মাঝে বৈষ্ণব দর্শনের সহিত এমার্সনের লেখার তুলনামূলক আলোচনাও চলিত। মাধ্যাহ্নিক আহারের প্রয়োজনীয়তা মহিমঠাকুর স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইতেন। রাধারমণের গভীর পান্ডিত্যে কবি মুগ্ধ হইয়াছিলেন--তাহা বারংবার বলিয়াছেন।

কার্সিয়াং হইতে ফিরিবার অনতিকাল পরেই (১৩০৩) কলিকাতায় মহারাজ বীরচন্দ্র দেহরক্ষা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়কার কথায় বলিয়াছেন--

"তার মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে যখন আমি তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছিলাম, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানারকম আলাপ হতো। বৈষ্ণব পদাবলী যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে একলক্ষ টাকা ব্যয় করবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল। কিন্তু তার পরই তাঁর সহসা মৃত্যু হওয়াতে সে সঙ্কল্প সফল হতে পারেনি।"

বীরচন্দ্রের মৃত্যুতে কবি ও রাজার সম্মিলিত অভিলাষ অপূর্ণই রহিয়া গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় বীরচন্দ্রের সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্য প্রকাশের আগ্রহে বহু গ্রন্থ বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তৎকালে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ দানবীর করিয়াছিল।

---

(১) রাধারমণ ঘোষ প্রথমে রাজকুমারদের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। পরে বীরচন্দ্রের প্রাইভেট সেক্রেটরীর কাজে বৃত হন। প্রথম নিযুক্তির পর মহারাজ তাঁহার পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিতে মুগ্ধ হন। "রাধারমণ, পাশ্চাত্য দর্শন তো অনেক আলোচনা করিয়াছ, আমাদের বাংলা ভাষায় দর্শন শাস্ত্রে একটু আলোচনা কর না'- - - মহারাজ বলিলে, রাধারমণ একটু হাসিয়া বলিলেন - - -'বাংলা ভাষায় আবার দর্শন আলোচনা আছে নাকি?' **বীরচন্দ্র বেশী কিছু না বলিয়া তাঁহার হাতে "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"**

দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত সেই সময়ে (১২৯৯) সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের সমগ্র মুদ্রণ-ব্যয় মহারাজ বহন করিয়াছিলেন। পঞ্চম বৎসরে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিতেছেন-- "উপসংহারকালে আমি ত্রিপুরেশ্বর স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য মহোদয়ের মৃত্যুতে গভীর পরিতাপ প্রকাশ করিতেছি। তিনি এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন, আমার নানারূপ বিপদের মধ্যে, ৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুও অন্যতম বলিয়া গণ্য করিয়াছি। তাঁহার মৃত্যু শয্যার একপ্রান্তে আমার এই সামান্য পুস্তকখানি পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।"

বীরচন্দ্রের সাহিত্য প্রীতি ও সৎসাহিত্যে দান বিশেষভাবে দীনেশচন্দ্রকে তাঁহার সাহিত্য সাধনায় উৎসাহিত করিবার জন্য সময় সময় এককালীন দান সম্বন্ধেও অনুসন্ধানে জানা যায়।

দীনেশচন্দ্রের "বৃহৎ-বঙ্গ" গ্রন্থ তাঁহার পরিণত বয়সের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। ইহার মুদ্রণ ব্যয়ানুকূল্য করিয়াছিলেন মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর। এই পুস্তকের উৎসর্গ পত্রে দীনেশচন্দ্র যাহা লিপি করিয়াছেন তাহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

> "আমার প্রথম গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং (সম্ভবতঃ) এই শেষ গ্রন্থ 'বৃহৎ-বঙ্গ' ত্রিপুরেশ্বরদ্বয়ের নামের সঙ্গে সংযোজিত করিতে পারিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আমার সাহিত্যিক জীবনের উদয়-অস্ত ত্রিপুর সিংহাসনের উৎসাহ ও আনুকূল্যের রশ্মিপাতে বিদ্বৎ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।"

বীরচন্দ্রের সহিত কবির মিলন অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইলেও ত্রিপুরার রাজপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা দিন দিন দৃঢ় হইয়া উঠিল এবং ত্রিপুরার কল্যাণ কামনা তাঁহার হৃদয়ে স্থায়ী আসন গ্রহণ করিল।

গ্রন্থখানি দিয়া পড়িতে বলিলেন। উৎসাহী পন্ডিত ব্যক্তি কয়েকদিন পরেই কিছু পাইলেন না বলিয়া মহারাজের কাছে নিবেদন করিলেন। বীরচন্দ্র তাঁহাকে একবার একবার করিয়া দশবার গ্রন্থখানি পাঠ করাইলেন। তাহাতেই রাধারমণের অন্তরে যে অনুভূতি হইল তাহাতে তাঁহার বাকী জীবন বৈষ্ণব দর্শন আলোচনায় ভরপুর হইয়া রহিল।

দুঃখের বিষয় বহু পুরাতন তৎকালীন দরবারের আলোকচিত্র সংগৃহীত হইলেও তাঁহার প্রতিকৃতি নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহার লিখিত একখানি কাগজ হইতে হস্তাক্ষরের পান্ডুলিপি অন্যত্র মুদ্রণ করা হইল।

দুই

রাধাকিশোর

বীরচন্দ্রের দেহত্যার্গের পর কবি ভাবিলেন--

> "এই মৃত্যুতে রাজবংশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তা হয়নি। কবি বালকের প্রতি তাঁর পিতার স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধারা মহারাজ রাধাকিশোরের মধ্যেও সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেল। অথচ সে সময়ে তিনি ঘোরতর বৈষয়িক দুর্যোগের দ্বারা দিবারাত্রি অভিভূত ছিলেন। কিন্তু আমাকে এক দিনের জন্যও ভোলেননি। তারপর থেকে নিরন্তর তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছি। এবং আমার প্রতি তাঁর স্নেহ কোনদিন কুণ্ঠিত হয়নি। যদিও রাজসান্নিধ্যের পরিবেশ নানা সন্দেহ বিরোধের দ্বারা কন্টকিত। তিনি সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে ছিলেন পাছে আমাকে কোনো গোপন অসম্মান আঘাত করে। এমন কি তিনি নিজে স্পষ্টই আমাকে বলেছেন- - -আপনি আমার চারিদিকের পারিষদের ব্যবহারের বাধা অতিক্রম করেও যেন আমার কাছে সুস্থ মনে আসতে পারেন, এই আমি কামনা করি। এ কারণে যে অল্পকাল তিনি বেঁচেছিলেন কোনও বাধাকেই আমি গণ্য করিনি। যে অপরিণতবয়স্ক কবির খ্যাতির পথ সম্পূর্ণ সংশয়সঙ্কুল ছিল তার সঙ্গে কোনো রাজত্ব গৌরবের অধিকারীর এমন অবারিত ও অহৈতুক সখ্য সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ।"
>
> ("ভারত ভাস্কর"--প্রদান অনুষ্ঠানে কবির বাণী হইতে)

ত্রিপুরার রাজনৈতিক আকাশ বীরচন্দ্রের শেষ আমলে মেঘাচ্ছন্ন ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাধাকিশোর যখন সিংহাসন লাভ করিলেন তখন রাজকোষ অর্থশূন্য। পারিবারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সুপরামর্শ পাওয়ার বন্ধুর অভাব, সর্ব্বোপরি পারিষদ বলিতে যাহাদিগকে পাইলেন তাহাদের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা রাধাকিশোরের মনকে অত্যন্ত পীড়িত করিতেছিল। বিশেষতঃ আগরতলা ('নতুন হাউলী') তখনও ভালভাবে গড়িয়া উঠে নাই।

কিন্তু রাধাকিশোরের অন্তর্নিহিত সৎপ্রবৃত্তি ত্রিপুরার কল্যাণ কামনায় সব বাধা বিপত্তিকে দূরে সরাইয়া দিয়াছিল--তাঁহার প্রধান সহায় ও সহযোগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

রাজতক্তে রাধাকিশোর আসীন ছিলেন মাত্র বার বৎসর কাল। এই স্বল্পকালের মধ্যে কি পারিবারিক, কি বৈষয়িক, এমনকি রাজনৈতিক সমস্ত বিষয়েই তাঁহাকে মঙ্গলপথ দেখাইয়া দিতে কবি কোনোদিনই কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এই যোগাযোগে ত্রিপুরার কৃতী সন্তান মহিম ঠাকুরের কৃতিত্ব ছিল অনেকখানি। আগেই বলা হইয়াছে, তিনি কবির সান্নিধ্য লাভের সুযোগ কলিকাতায় পঠদ্দশাতেই লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই রাধাকিশোরের সময়ে যোগাযোগকে আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

যুবরাজী আমলে কলিকাতায় একাধিকবার দেখাশুনা হইলেও রাধাকিশোর সেই সময়ে নানা কারণে কবির সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পান নাই। স্বল্প অবসরের দেখাশুনার মধ্যেই উভয়ে উভয়ের প্রতি যে কি ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা উভয়ের পত্রাবলী ও সাক্ষাৎ ব্যবহারের মধ্যে সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছে। সেবার ১২ ফাল্গুন (১৩৩২) রাত্রিতে রাধাকিশোর সম্বন্ধে আলোচনায় কবি বলিলেন--

"তাঁর লোক চিন্‌বার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। আমি তা দেখে অবাক হ'য়ে যেতাম। মহারাজ বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোরের যে সমস্ত চিঠি আমার কাছে আছে, সেগুলি অমূল্য সম্পদ বিশেষ। এমন চমৎকার চিটি আজকালকার দিনেও লেখা অসম্ভব। তাঁদের কি রকম High Culture ছিল সেই চিঠিগুলো পড়লেই অনুমান করা যায়। রাধাকিশোর মাণিক্যের মত এত বড় নীরব দাতা পাওয়া বড়ই কঠিন।" (রবি, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ)

রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াই যুবরাজী আমলে কবির সঙ্গে স্বল্প পরিচয়কে রাধাকিশোর আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন--পত্র ব্যবহারে এবং (তাঁহার সহিত আলোচনা মুখ্য হইলেও) কলিকাতায় মাঝে মাঝে অন্য কাজ উপলক্ষ করিয়া যাওয়ায়। এইভাবেই সৌজন্যের অতিরিক্ত আরও কিছু উভয়ের মনকে খুব কাছে আসিতে সুযোগ দেয়। প্রথম সুযোগেই, প্রিয় সুহৃদকে আদর আপ্যায়ন করিবেন অভিলাষে মহারাজ কবিকে আগরতলায় আহ্বান করিলেন। সপরিবারে কবি ছিলেন শিলাইদহে। লেখা, চাষ আবাদের কাজে নিজ মনকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন-- পদ্মার কোলে ও কূলে। কিন্তু ১৩০৬ সনের গোড়ার দিকে ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকাল মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশেষ আঘাতরূপে আসিয়াছিল। তাহার উপর 'ঠাকুর কোম্পানী' নামক কুষ্টিয়ার ব্যবসায়টি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। কারবার গুটাইয়া ফেলিতে কবিকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। বিশেষতঃ পারিবারিক পীড়া--সব মিলাইয়া কবি-মন সুস্থ ছিল বলা যায় না। এই অবস্থায় তাঁহার মনে একটু স্বস্তিদান করাও বন্ধুর কর্ত্তব্য। সেই সুযোগও রাধাকিশোরের এই আহ্বানে প্রকাশ হইতেছে। সে সময়কার আগরতলার কি রূপ ছিল সহজেই অনুমেয়। রাজবাড়ীতে যে একখানি দালান ছিল তাহাও ভূমিসাৎ হইয়াছিল কিছুকাল আগেকার ভূমিকম্পে। কোনও সম্মানিত অতিথিকে তথায় রাখা সম্ভবপর ছিল না। রাজ-অনুগ্রহে মহিম ঠাকুরের বাড়ীতে কয়েকখানি কোঠা হইয়াছিল, তাহাই কবির ব্যবহারে দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। বিশেষতঃ মহিম ঠাকুরও কবির অন্তরঙ্গতা লাভ করায় কবির পরিচর্য্যা সুষ্ঠু হইবে--মহারাজ মনে করিলেন।

রেলষ্টেসন মোগরা হইতে আগরতলা আসিবার একমাত্র পথ। নৌকায়, হাতীর পিঠে অথবা পাল্কীতে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। আখাউড়া রাস্তা বা আখাউড়া ষ্টেসন তখন ছিল না। রাজধানীতে দুইটি মাত্র উল্লেখযোগ্য রাস্তা। রাজবাড়ীর পশ্চিমের দীঘির পশ্চিমপাড়বাহী শকুন্তলা রাস্তা। ইহাই বর্ত্তমান প্রাসাদ তোরণের সম্মুখ দিয়া দক্ষিণবাহী রাস্তার পূর্ব্বদিকে শ্রীপাট। মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়কে দক্ষিণে রাখিয়া পুরাতন পুলের উপর দিয়া বাজারে পৌছে। এই রাস্তা পূর্বদিকে পুরানো আগরতলার দিকে আর পশ্চিমবাহী মোগরার দিকে গিয়াছে। এরই আশে পাশে সরকারী কর্ম্মচারী ও সহরের অন্যান্য বাসিন্দা। রাজবাড়ীর পিছন দিকে ছিল মণিপুরী পল্লী রাধানগর। স্থানের নাম রাধানগর এখনও আছে, কিন্তু মণিপুরী অধ্যুষিত অঞ্চলের বিশিষ্টতা লোপ পাইয়াছে তাহাদের স্থান-ত্যাগে। রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে আর একটি রাস্তা এই মণিপুরী পল্লীকে ভেদ করিয়া শ্যামল বনানী মধ্যে সরীসৃপের মত পুরানো কুঞ্জবনে শেষ হইয়াছিল। এই পথের আশে পাশে দূরে দূরে কয়েকটি কুটীর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন গেরুয়া প্রলেপে চারিদিকের শ্যামলিমার শোভাই বাড়াইত। প্রকৃতির এই শ্যাম শোভা আজ সভ্যতার ছাপে নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে।

কবি সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইল পুরাতন কুঞ্জবনের সু-উচ্চ টীলায় শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে বসন্তোৎসবে (১৩০৬)। ত্রিপুরার আদিবাসীদের টঙ্ ঘরের নমুনায় সম্বর্দ্ধনা-মঞ্চ তৈরী হইল। মুলীবাঁশে তৈরী মঞ্চের গড়ন ও ফুল পাতায় সজ্জা পরিপাটি শিল্প শোভার নিদর্শন। মঞ্চের উপর হইতে নজরে পড়ে চারিদিকে উচ্চ নীচ পাহাড়গুলি থরে থরে ঢেউ খেলিয়া দূর দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে--আকাশের নীল চন্দ্রাতপ দিগন্তরেখাকে চুম্বন করিয়া ঋতু উৎসবকে আরও কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনকে আরও সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে দলে দলে নৃত্যগীতরত মণিপুরী শিল্পীবৃন্দ। নগ্নগাত্র, পরিধানে বাসন্তী রং-এর কাপড়, লম্বমান বাসন্তী চাদর গলায়--মাথায় বাসন্তী রংএর পাগড়ী, খোল, মন্দিরা করতালের সমতালে পদবিক্ষেপ ও দেহভঙ্গিমা--দীর্ঘলয়ে কীর্ত্তনের সুর এক মোহনয় আবেশ রচনা করিতেছিল। দর্শক যাহারা, তাহারও স্ত্রী-পুরুষ সেই বাসন্তী রংএর পরিচ্ছদে ভূষিত। এই পরিবেশের মধ্যে কবিও রাজা মঞ্চোপরি ফরাস বিছানায় আসীন। কালোপযোগী নৃত্যগীত ও পুষ্পসজ্জার উপহার--রাজা প্রজার সমব্যবহার-- কবির মনকে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দিল। ইহারই স্মৃতি মহারাজ রাধাকিশোরকে "কাহিনী" কাব্য উৎসর্গ পত্র (২০শে ফাল্গুন, ১৩০৬) বহন করে বলিয়া রবীন্দ্র-জীবনীকার মনে করেন।

এই সম্বর্দ্ধনার অনতিকাল পূর্ব্বেই কবি মহারাজকে একটি সাদা রেশমের থান উপহার পাঠাইলেন। ইহা রাজসাহী শিল্প বিদ্যালয়ে প্রস্তুত করা। উপহারের সঙ্গে মহিম ঠাকুরকে লিখিলেন--

> "- - - - - - - - শিল্প বিদ্যালয়কে উৎসাহ দিবার জন্য সেখান হইতে আমি সর্ব্বদাই রেশমের বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকি--দোষের মধ্যে লোক ও সামর্থ্য অল্প হওয়াতে তাহারা শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে কাপড় যোগাইতে পারে না,- - -বন্ধুদের নিকট আমার এই বস্ত্র উপহার কেবল আমার উপহার নহে তাহা স্বদেশের উপহার। - - - - - -"
>
> (৩০শে চৈত্র, ১৩০৫)

রাজাসনে বসিবার দুই বৎসরের মধ্যেই আপাতদৃষ্টিতে এই উপহার অকিঞ্চিৎকর অনুভূত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও কবি প্রদত্ত 'স্বদেশের উপহার'কে মহারাজ সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজেকে-গৌরবান্বিতই মানিয়াছিলেন। মহিম ঠাকুর চিঠির পাঠে 'মহিমার্ণব' ও 'আপনি' সম্বোধনের পর্য্যায়ে আছেন, পরে যদিও 'তুমি' হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। যুবরাজী আমলের নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও মহিমচন্দ্রের সদাজাগ্রত-রাজসেবা মহারাজ রাধাকিশোরের কৃতজ্ঞ অন্তরকে যেমন আকৃষ্ট করিয়াছিল, অন্যদিকে মহিমচন্দ্র তাঁহার তীক্ষ্মবুদ্ধি, প্রবল ধারণাশক্তি, রাজ্যের হিতসাধনে উৎসাহ,--সর্ব্বোপরি বাক্পটুতায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও প্রীতি সহজেই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কবি ও রাজার মধ্যে যোগ-সেতু রক্ষা করার যোগ্যতা অর্জ্জন করা তাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই। কেবল বার্ত্তাবাহী নহে, বেশীরভাগ দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাঁহাকে নিয়োজিত থাকিতেও দেখা যায়। কবিও পত্রব্যবহারে নানা বিষয়ে মহারাজকে না লিখিয়া মহিমচন্দ্রকে জানাইতেছেন। আবার পরামর্শও করিতেছেন।

কবিকে দার্জ্জিলিং-এ সঙ্গী পাইবার আশায় মহারাজ লিখিলেন--

"শ্রীমান মহিমের পত্রে আপনার দার্জ্জিলিং যাওয়ার সংবাদে প্রীত হইলাম। বিখ্যাত হিমালয়ে আপনাকে পাইলে তথাকার কয়েকদিনের বাস আমার পক্ষে যে কত সুখের হইবে বলিতে পারি না। কলিকাতার নানা অন্তরায় উচ্চ হিমশৃঙ্গে না থাকারই কথা।------ মহর্ষির নিকট আমার প্রণাম জানাইবেন। দার্জ্জিলিং যাইয়া তাঁহার সকাশে পত্র লিখিব। ইতি সন ১৩০৯ ত্রিং (১৩০৬), ২রা আশ্বিন।"

এই বৎসরে কবিকে লিখিত মহারাজের কয়েকখানা পত্রের সন্ধান বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ দিয়াছেন, কিন্তু এই সময়কার কবির লেখা কোনো চিঠিই আমাদের হাতে আসে নাই। অথচ মহারাজের চিঠিতে কবি-লিখিত পত্রাদির প্রাপ্তি সংবাদ আছে। যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের বিবাহ উপস্থিত। সমস্ত আয়োজন পূর্ণ--উৎসব সজ্জায় রাজধানী সজ্জিত। নির্দ্ধারিত তারিখের পূর্ব্বেই লোক সমাগমে সহরে হঠাৎ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। কাজেই বিবাহের দিন কয়েকদিন পিছাইয়া দিতে হইল। কবিকে মহারাজ লিখিতেছেন--

"------ মনে করিয়াছিলাম এ শুভ ব্যাপারে বিদেশীয় ভদ্রলোকগণকে নিমন্ত্রণাদি করিয়া সুখী হই কিন্তু বর্ত্তমান সময় ক্রমশঃ গরম পড়িতেছে বিধায় পাছে তাঁহাদের কষ্টের কারণ হয় ভাবিয়া দুঃখের সহিত বিরত হইলাম। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁহাদের পাইলে এই শুভ ব্যাপার আনন্দে সম্পন্ন হয় তাঁহাদের কয়েকজনকে পাইলেই সুখী হইতে পারি। তাই আপনি, জ্যোতিবাবু, গগনবাবু, আশুবাবু ও যদি সুবিধা থাকে জগদীশবাবুকে এখানে দেখিতে ইচ্ছা করি।-- ---"

এই চিঠির শেষদিকে লিখিতেছেন--

"কাহিনী গ্রন্থের সহিত আমার নাম সংস্রব রাখিতে আপনি ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহাতে আমার অমত হইতে পারে কি ? ছাপা হইবামাত্র ১০/১২ কাপি পাঠাইয়া সুখী করিবেন। এখানকার বন্ধুবান্ধবদিগকে বিতরণ করিব।------ইতি সন ১৩০৯ (১৩০৬) ত্রিং, ১৫ই ফাল্গুন।"

কয়েকদিন পরে লিখিত মহারাজের চিঠিতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ পুত্রের অসুস্থতার দরুণ যুবরাজের বিবাহোৎসবে যোগদানকরিতে পারেন নাই। কিন্তু যুবরাজ্ঞীকে কবি যে বস্ত্রোপহার পাঠাইয়াছিলেন তাহা পাইয়া জানাইলেন 'বস্ত্রখানা শ্রীমতী বধূমার উপযুক্তই হইয়াছে।" এই চিঠিতেই অন্তরঙ্গতার বিশেষ আভাস পাই ভাষার ব্যঞ্জনায়--

"------ মহিম আপনার নাম করিয়া ছুটি পাইবার ফিকিরে আছে। তাহার সম্বন্ধে আপনার হুকুম কি ? আমারও ইচ্ছা একবার তাহাকে আপনার সদনে পাঠাই। পাছে উৎপাত না জন্মায়। কিন্তু মাঝে মাঝে একটু অশান্তি ভাল লাগে বৈকি। আপনার অনুকূল উত্তর পাইলেই সে 'পাঁচ হাতিয়ার' বাঁধিতে পারে।" (১১ই চৈত্র)

অনুগ্রহপুষ্ট হইলেও মহিমচন্দ্রের উল্লেখে সৌহৃদ্যের ছাপ রহিয়াছে। ইহার পর দুই মাস মধ্যে মহারাজের আরও দুইখানা চিঠিতে দেখা যায় কবি লিখিত চারখানা চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার আছে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি--আমরা ইহার সন্ধান পাই নাই। রবীন্দ্র পরিচয়ের প্রধান উপাদানই কবি লিখিত বিভিন্ন বিষয়ে পত্রাবলী। একদিগে 'গুণানুরাগী' অথবা 'আপনার চিরন্তন'--শ্রীরাধাকিশোর বর্ম্মা--অন্যদিকে 'চিরানুরক্ত ভক্ত, অথবা

'স্নেহাসক্ত', 'স্নেহানুরক্ত'--শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রাবলীর ভাব ও বিষয় বিন্যাসের রূপ সকলেই আকর্ষন করিবে। "মাতৃভাষাকে এমন সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা এ যে তাঁদের রাজোচিত সৌজন্যেরই অঙ্গ"--বলিয়া কবি মহারাজকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

"কাহিনী" কাব্যখানা প্রকাশিত হইলে কবি তাহা পাঠাইয়া রাধাকিশোরকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে মহারাজ লেখেন--

"-----------'কাহিনী' পাইয়া সাগ্রহে পাঠ আরম্ভ করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত অর্দ্ধেকের বেশী অগ্রসর হইতে পারি নাই। সালতামামী নিকটবর্ত্তী কিনা! আর তাড়াতাড়িতে বই পড়া হয় না তার সমস্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হয়। অন্ততঃ আমার এই স্বভাব।

বন্ধুত্বেরখাতিরেই যে একটা অযথা প্রশংসা করিতে হইবে ইহার অর্থ কি? বাস্তবিক কবিতার গাম্ভীর্য্য রক্ষা বিষয়ে আপনি সিদ্ধহস্ত। অথবা ইহা আপনার স্বাভাবিক শক্তির নৈপুণ্য। এই গাম্ভীর্য্যের সহিত মধুরভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত হইয়াছি। নায়ক নায়িকার পদোচিত ভাব ও ভাষা অতি পারিপাটি হইয়াছে। পৌরাণিক প্রস্তাব প্রসঙ্গাদি অবলম্বন করিয়া আধুনিক সময়ে যে কয়খানি কাব্যাদি রচিত হইয়াছে সেগুলিতে প্রায় উক্ত পদোচিত সন্মান ও গাম্ভীর্য্য রক্ষার্থে ভাষা ও ভাবের বিশেষ কোন নৈপুণ্য দেখিতে পাই না। আপনার গ্রন্থসকল সে দোষ বর্জ্জিত। আমার বিশ্বাস ঐ সকল যথাযথ রক্ষিত হইলেই গ্রন্থের জীবন্যাস করা হইল।"

(১৩০৯ ত্রিং, ১৩০৬ সাল, ২১শে চৈত্র)

স্বল্প হইলেও কি পরিপাটি বিশ্লেষণ! গ্রন্থপাঠ, ইহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া রসগ্রহণ পদ্ধতি বিশেষ আস্বাদ্য। বিশেষতঃ সমসাময়িক সাহিত্য আলোচনায় তুলনামূলক সমালোচনা রাধাকিশোরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনেই প্রকাশ করে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে-- কিছুকাল পরের কথা। রাধাকিশোর তৎকালীন মন্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন--

"এখানে আবহমান কাল রাজকার্য্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দুরাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষতঃ আমি বঙ্গভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। ইংরেজী শিক্ষিত কর্ম্মচারীবর্গের দ্বারা রাজ্যের এই চিরপোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয় সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।"

রাজকার্য্যে ইংরেজী ব্যবহারের বাহুল্যই এই আদেশের মূল এবং মন্ত্রী মহোদয় এই সহজ ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া যে লজ্জিত হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

'কাহিনী' সম্পর্কে উল্লিখিত রাধাকিশোরের উত্তর হইতেই কবি লিখিত এই সময়কার পত্রগুলির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়। সহজ সরল ভাবে দুই সুহৃদের ঘরোয়া কথাগুলিই ফুটিয়াছে। এই পত্র ব্যবহারে 'মহিম পাঁচ হাতিয়ার বাঁধিতে পারে' বলিয়া রাধাকিশোর যে লিখিয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছেন কবির উত্তর পাইয়া--

"----------(মহিমের) সঙ্গে ক্যামারা, বন্দুক ইত্যাদি আরো কি কি আছে। ইংরেজ গোরা সিপাইদের ন্যায় মানুষ না শিকার করে, এই ভয়।-------মহিম নাকি গান টান এমনি কিছু রচনা করে।------আরো শুনিতে পাই যক্ষে ভর না করিলে তাহার রচনা ভাল আসে না।-------"

পত্রখানা বেশ হাল্‌কাভাবেই লিখিত ; সেই সময় সম্ভবতঃ কলিকাতায় প্লেগের আবির্ভাব বলিয়া 'প্লেগ নাকি চারিদিকে ছিটিয়া পড়িতেছে। তজ্জন্য চিন্তিত আছি' লিখিয়া মহারাজ চিঠির শেষ করিলেন।

বিবাহের পর হইতেই যুবরাজের সহচর-সচিব ও যুবরাজ্ঞীর সহচরী-শিক্ষিকার কথা বিশেষ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না রাধাকিশোর। ত্রিপুরার ভাবী রাজা যিনি হইবেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য কবিকেই উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচনের জন্য অনুরোধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথও অনেক চিন্তার পর মনোনয়ন করিয়া যতী বসুকে মহারাজের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। মহারাজ লিখিতেছেন--

"যতীন্দ্রবাবুকে দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আলাপে সুখী হইয়াছি। আপনি স্বয়ং যখন বাছানি করিয়া শ্রীমান ও শ্রীমতীর জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন তখন আমার আর কি বলিবার আছে। যতী ও তাঁহার স্ত্রীতে মিলিয়া একই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থাকিলে আশানুরূপ ফল প্রত্যাশা করা যায়।-------"

১৩১০, ত্রিং (১৩০৭ সাল), ১৪ই বৈশাখ।

দার্জ্জিলিং অঞ্চলে যাওয়ার অভিপ্রায় মহারাজের। 'একটা দিনস্থির হইলে অবশ্য আপনাকে লিখিব' বলিয়া কবিকে জানাইলেন। কবি তাঁহার ২২শে বৈশাখের দীর্ঘপত্রে মহারাজকে লিখিলেন---

"----------যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞীরজন্য যে লোক নির্ব্বাচন করিয়াছি তাঁহারা ভদ্রবংশীয় এবং সচ্চরিত্র--একান্ত মনে আশা করিতেছি তাঁহাদের জন্য কোন কারণে মহারাজের নিকট আমাকে অপরাধী ও লজ্জিত হইতে না হয়। তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকে বারম্বার উপদেশ দিয়াছি তথাপি যদি প্রকৃতিগত কোন ত্রুটি বশতঃ তাঁহারা স্বপদের লেশমাত্র অযোগ্য হন তবে মহারাজ যেন তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিতে তিলমাত্র কুণ্ঠিত না হন। ইহা নিশ্চয় মনে জানিবেন ইঁহাদের সহিত আমার যেটুকু বন্ধুত্বের বন্ধন আছে যুবরাজের মঙ্গল আমার নিকট তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর।------- বস্তুত, যুবরাজ্ঞীর সখী হইবার উপযুক্ত শিক্ষিত ভদ্র হিন্দুমহিলা পাওয়া বড় কঠিন; সাধারন ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ভাল মেয়ে পাওয়া যাইতে পারিত কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্তঃপুরে আচার ব্যবহারের হয়ত অসুবিধা ঘটিত---সেইজন্য এই একমাত্র সম্ভবপর হিন্দুমহিলার কথা আমার মনে উদয় হইবামাত্র মহিম ঠাকুরকে জানাইয়াছি-- এক্ষণে সেখানে তাঁহারা স্বস্থানের উপযুক্ত হইতে পারিলে আমি পরম নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

দীর্ঘ ষাট বৎসর পূর্ব্বেকার সমাজ বন্ধন। বিশেষ করিয়া এই ত্রিপুরায়। তখন পর্য্যন্ত সমতল ত্রিপুরায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহের সমাজ এই রাজ্যের সমাজ ব্যবস্থাকে নিজেদের বলিয়া গ্রহণ করিতে বহু অন্তরায় আবিষ্কার করিতেন। পক্ষান্তরে হিন্দু রাজপরিবারে ব্রাহ্ম পরিবারের অনুপ্রবেশ সহনীয় হইবে না বলিয়াই কবির মনে সহজাত সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। অথচ মহারাজের অন্তরঙ্গতা ও নির্ভরতা কবিকে যে ব্যাকুল করিয়াছিল তাহা উপরোক্ত পত্রেই অভিব্যক্ত। কাজেই রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কতদূর গভীর ও নির্ব্বাচন কত দায়িত্ববোধপূর্ণ! ১৩ই ভাদ্র তারিখে মহারাজ কবির প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ নির্ভরতা ব্যক্ত করিয়াছেন চিঠিতে। সম্ভবতঃ তখন যুবরাজ ও যুবরাজ্ঞী কুমিল্লায় ছিলেন--সেখান হইতেই এই চিঠি লেখা।

"যতীর নিকট আপনার পত্রখানা দেখিয়াছি। শ্রীমানের উন্নতিকল্পে আপনি যেরূপ বিশদভাবে শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে আপনার ঐকান্তিকতা প্রতিফলিত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বন্ধুরূপে যিনি এমন সহৃদয়তা দেখাইতে পারেন জগতে তাঁহার মত বন্ধু দুর্ল্লভ। আপনার ন্যায় বন্ধুর অবিশ্রান্ত সহায়তার সহিত যতী ও তাঁহার পরিবারকে এসময়ে এইভাবে পাওয়া বাস্তবিক চিরস্মরণীয়।"

মহারাজ যেন সুযোগ পাইয়া "বন্ধুর অবিশ্রান্ত সহায়তার" কথা উল্লেখ করিয়া প্রীতিমাখানো অন্তরের কৃতজ্ঞতাকে রূপ দিতে পারিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। কবি ও রাজার এই সমভূমিতে মিলন অপূর্ব্বই বলিতে হয়। কি পারিবারিক বিষয়ে, কি রাজ্য পরিচালনায়, এমন কি যখন নানা জটাজাল ইংরেজ প্রভুদের কৃপায় মহারাজকে জড়াইয়া ফেলিতে পারিত-- সব সময়ই কবির 'অবিশ্রান্ত সহায়তা' রাধাকিশোরকে আপ্লুত করিয়া দিত। বন্ধু-বলকে তিনি সমস্ত বলের উপরে স্থান দিতেন। কারণ যুবরাজী আমল হইতে যে অভিজ্ঞতা তাঁহাতে উপজাত হইয়াছিল--তাহাই স্বল্প রাজত্বভোগ কালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। রাজ্যের বাহিরে যখনই যাওয়ার সুযোগ হইত তখনই তিনি জ্ঞানী গুণী সমাজে যোগদানের অবসরের অনুসন্ধান করিতেন। ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্রনাথের যোগেই বাংলার খ্যাতনামা যাঁহারা ছিলেন রাধাকিশোরের নিরভিমানতা ও গুণগ্রাহিতায় আকৃষ্ট হইলেন। আজীবন তিনি আশুতোষ চৌধুরী, জগদীশচন্দ্র, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাটোরের জগদীন্দ্রনাথ, ঠাকুর বাড়ীর সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, লর্ড সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ও বহু সাহিত্যিক বন্ধুদের লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সহায়তায় নানা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা তাঁহার সৌজন্যে বঙ্গ-হৃদয় জয় করিলেন। ত্রিপুরার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

সেবার (১৩০৭) শীতকালে ত্রিপুরার মহারাজা কলিকাতা আসিতেছেন--কবিও শিলাইদহ হইতে সেখানে পৌঁছিয়াছেন। কলিকাতার অভিজাত সমাজ প্রস্তুত হইলেন রাধাকিশোরকে সন্মান প্রদর্শনের জন্য। 'সঙ্গীত-সমাজ' এই আয়োজনের ব্যবস্থা করিলেন। 'বিসর্জ্জন' নাটকের অভিনয় হয় এই উপলক্ষ্যে। ত্রিপুরাধিপতির অভ্যর্থনায় কবি একটি গান রচনা করিলেন ঃ তাহা এই ঃ--

"রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা,
ত্রিপুর-পুর লক্ষ্মী বহে তব বরণ ডালা,
গুণী-রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে,
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে,
তরুন তব মুখচন্দ্র করুন-রস ঢালা।
দীন-জন দুখহরণ নিপুণ তব পাণি,
ক্ষীণ-জন ভয়-তারণ অভয় তব বাণী,
গুণ অরুন কিরণে তব সব ভুবন আলা।"

পাখোয়াজ সহযোগে গানটি গাইলেন নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ। ত্রিপুরাধিপতিকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিলেন তিনিই। 'বিসর্জ্জন' অভিনয় হয় ১লা পৌষ, ১৩০৭, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্ক ষ্ট্রীট-এর বিরাট বাড়ীতে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে কবি তখন যে চিঠি দেন তাহাতে লিখিলেন--''বিসর্জ্জন নাটকের অভিনয় হইবে; আমি রঘুপতি সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীত-সমাজের অনুরোধে পড়িয়া শিলাইদহের বিরহ স্বীকার করিয়া এই পাষাণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়াছি।'' পত্রের শেষ ছত্রেও ''বিসর্জ্জন নাটকের রিহার্সাল আমাকে তাগিদ করিতেছে--অতএব বিদায়''---লিখিলেন। সমসাময়িক এক দর্শক লিখিয়াছিলেন, ''রবীন্দ্রবাবু রঘুপতি সাজিয়া এমন চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন যে সঞ্জীবনী-সম্পাদক মহাশয় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।'' কারণ সঞ্জীবনী-সম্পাদক মহাশয় অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন, লঘু সাহিত্য ও অভিনয়াদির ঘোর বিরোধী; তৎসত্ত্বেও তিনি যে প্রশংশা করিয়াছিলেন, ইহা অভিনয়ের উৎকর্ষরে পরিচায়ক'--বলিয়া রবীন্দ্র-জীবনীকার মন্তব্য করিয়াছেন। রাধাকিশোরের এই সম্বর্দ্ধনা ব্যক্তিগত গৌরব লাভ না হইয়া ত্রিপুরার গৌরবই বৃদ্ধি করিল। বাংলা ত্রিপুরাকে আরও আপন করিয়া লইল। রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব রাধাকিশোরকে বাংলাদেশের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে এইভাবেই সংযুক্ত করিল। 'বিসর্জ্জন' অভিনয় মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, কলিকাতার অভিজাত বনিয়াদ পরিবারের শিক্ষিত যুবকগণই এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেরই এমন কি নারীর অংশ গ্রহণকারী যুবকেদেরও অভিনয় সর্ব্বাংশে সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল।

পরবর্ত্তী বৈশাখে (১৩০৮) মহারাজ-এর আহ্বানে কবি তাঁহার সহিত দার্জ্জিলিং যাওয়ায় সম্মত হইয়াছেন। মহারাজ লিখিলেন, 'হিমালয়ের মহান্ সৌন্দর্য্যের সহিত আপনার কবিতা ও সঙ্গীত সংযোগে আমার অবসর কালের বিশ্রাম যে কত মধুময় হইবে তাহাই ভাবিয়া উৎসাহিত আছি। আপনার কবিতার খাতা ও দুই একখানা বই সঙ্গে লইবেন।' রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে; রাধাকিশোর আশা করিতেছেন কুষ্ঠিয়ায় পৌছিয়া 'একত্রে যাইতে পারি'। এই পত্রে মহারাজ আরও লিখিতেছেন--

''বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের পুনঃ প্রকাশের সংবাদ অতি সুসংবাদ। প্রসিদ্ধ লেখকদের উৎসাহ আরো সুসংবাদ। আমার মতে আপনি অগৌণে এবং অবিচারিত চিত্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করুন এবং আমাকে কি কি করিতে হইবে বলুন। আমি সর্ব্বতোভাবে ইহার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।''

কবির যে চিঠির উত্তরে ইহা লেখা, ঐ চিঠিখানা আমাদের হাতে আসে নাই। মহারাজের সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গদর্শন সম্পাদনায় উৎসাহিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজদরবারে এই প্রসঙ্গে নানা আলোচনা কবির কানে পৌছিয়াছে। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত মনে মহিম ঠাকুরকে লেখেন--

''বঙ্গদর্শন সমন্ধে যদি তোমাদের মনে লেশমাত্র দ্বিধা থাকে আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিয়ো না--তোমাদের প্রতিশ্রুতি হইতে আমি তোমাদিগকে প্রসন্নমনে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দান করিব--আমি মহারাজকে কোন বিষয়ে লেশমাত্র সঙ্কটে ফেলিতে চাই না।''

---------পরের চিঠিতেও পুনরায় লিখিলেন--

"বঙ্গদর্শন যখন আমার হাতে আসিল তখন উহাকে সর্ব্বাংশে প্রথম শ্রেণীর কাগজ করিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। সেজন্য যে ব্যয় এবং চেষ্টার প্রয়োজন দুর্ভাগ্যক্রমে আমার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। সেই ব্যগ্রতায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই আমি বঙ্গদর্শন চালনায় মহারাজের সাহায্য চাহিয়াছিলাম। নানা কারণে ধারণা হইয়াছে যে তোমরা ইহাতে আমার স্বার্থাভিসন্ধি কল্পনা করিয়াছ। আমি ভাবিলাম তোমরা রাজপরিষদ। লোকের সাধু উদ্দেশ্যে তোমাদের বিশ্বাস নাই--সকলকেই তোমরা সন্দেহ চক্ষে দেখ--মহারাজের স্বাভাবিক ঔদার্যকে তোমরা আচ্ছন্ন করিয়া আছ।"

(পূর্ব্বাশা--রবীন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা)

কবির প্রথমা কন্যা শ্রীমতী বেলার বিবাহ হয় আষাঢ়ের (১৩০৮) গোড়ার দিকে। জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে--"আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না, মহিম ঠাকুরকে পাঠাইবেন' বলিয়া মহারাজ লিখিলেন। ২৪শে শ্রাবণ কবির দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী রেণুকার বিবাহ। এই দিনই রবীন্দ্রনাথ মহারাজকে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন--

"---------মহারাজের সহিত আমি এমন কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না যাহাতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির অপবাদ দিতে পারে। আমার সাধ্য যৎসামান্য হইলেও এবং উদ্দেশ্য লোকহিতকর হইলেও, যে কাজ নিজের হাতে লইয়াছি সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য লইব না ইহা আমি স্থির করিয়াছি। কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন মহৎ কর্ম্মের মূল্য থাকে না--আমার যতদূর সাধ্য আছে বঙ্গদর্শন পরিচালনায় তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গৌরব লাভ করিব। এবারে জগদীশবাবুর পত্র পড়িয়া এই বিষয়ে আমি মনে মনে বল লাভ করিয়াছি--জগদীশবাবুর প্রতিভায় পান্ডিত্য এবং সহৃদয়তার আশ্চর্য্য মিলন হইয়াছে বলিয়া এ সকল ব্যাপারে তাঁহার মত আমার কাছে সর্ব্বাগ্রগণ্য।"*

বঙ্গদর্শনের সাহায্য সম্পর্কে স্বার্থভিসন্ধির অপবাদ কবিকে যে রূঢ় আঘাত হানিয়াছিল তাহা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিল মহিম ঠাকুর ও মহারাজকে লেখা পত্রদ্বয়ে। কিন্তু রাধাকিশোর ইহাতে মোটেই গুরুত্ব দিতে চাহেন নাই। কিছুকাল পরের একটি চিঠিতে তিনি বলিতেছেন--"আগরতলা একটি দায়িত্ববিহীন গুজব প্রধান স্থান। তাহার একমাত্র কারণ বাহিরের অকর্ম্মণ্য লোক এখানে আসিয়া তাহাদের আড্ডা বাঁধিয়া বসিয়াছে। আপনি যদি এই সব লোকের কু-কথার অর্থ গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমার উপর অবিচার করা হয়।"

এই চিঠিতে অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিয়া আবার বলিতেছেন--"বঙ্গদর্শনের দরুন যে সহায়তা আমি করিতেছি তাহা আপনার প্রতি ব্যক্তিগত বন্ধুতার দরুন নহে--বঙ্গভাষার প্রতি কি আমার কোনরূপ কর্ত্তব্য নাই, কি ইহাতে অধিকার নাই ? বোলপুর বেদবিদ্যালয় সমন্ধেও আমার একই কথা--কাজেই আপনি এসব বিষয়ে আমার সম্বন্ধ

*পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। পত্রসূচী (খ) ৬

থাকা দরুন কোনরূপ দ্বিধা মনে করিবেন না। বরং ইহাতে আমাদের উভয়ের উপর একটি অনর্থক দুর্বলতার ভাব আরোপিত হইতে পারে। সেটা কিছুতে যেন প্রশ্রয় না পায়।"--এই খসড়া পত্রটি অনুজ প্রতিম দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত ও সযত্নে রক্ষিত অনুসন্ধান ও অনুমানে ইহা ১৩১২ সনের যে কোন সময়ে লিখিত। কাজেই রবীন্দ্রনাথ 'আর্থিক সাহায্য লইব না' বলিলেও রাধাকিশোর নিজ কর্ত্তব্যে অবিচলিত থাকিয়া সমানভাবে সাহায্য প্রেরণ করিয়া আসিতেছিলেন। কবির ও মহারাজের উপরোক্ত পত্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে সঙ্গত কারণেই আরও পত্র ব্যবহার অনুমান করা যায়,যদিও আমাদের হাতে তাহা আসে নাই।

কবি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ৭ই পৌষ, ১৩০৮ সালে। বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার পূর্ব্বে হইতেই বন্ধুস্থানীয়দের সহিত আলাপ আলোচনা ও পত্রব্যবহারও চলিতেছিল। ইহাকে প্রথম 'বোর্ডিং বিদ্যালয়' করিবেন বলিয়াই ভাবিয়াছিলেন। তাহা মহিম ঠাকুরকে লেখা এক চিঠি হইতে জানা যায় (রবীন্দ্র স্মৃতি--পূর্ব্বাশা,পৃঃ ১০৮)। কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ কি হইবে সে সমন্ধে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষীর চিত্তে কল্পনায় অনেক কিছু আসিয়া ভীর জমাইতেছিল। প্রায় সেই সময়ে জগদীশচন্দ্রকে কবি লিখিতেছেন--

"শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ বাসের মতো সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না--ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। ---ছেলেবেলা হইতে না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রকৃতি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে--দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্য আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে।----"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩৫-৩৬)

কার্ত্তিকের গোড়ায় কবি রাধাকিশোর-সন্নিধানে আগরতলায়। বিদ্যালয় সম্পর্কে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা হইয়াছে ইহা অনুমান করা কঠিন নয়। ইহাকেই মহারাজ বোলপুর বেদবিদ্যালয় অভিহিত করিয়াছেন-- পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই বিদ্যালয়ের সাহায্য বাবদ বাৎসরিক ১০০০ এক হাজার টাকা মহারাজ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা মনে করি। কবি জগদীশচন্দ্র পুনরায় লিখিলেন--

"------- পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এখানে (শান্তিনিকেতন) একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষমাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।"

(চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৩৮)

নিজপুত্র রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যালয়ে দিতেছেন বলিয়া কবি মহিম ঠাকুরকে জানাইয়াছেন। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরও বিদ্যালয়ে যোগদান করিবেন স্থির হইয়াছিল। অন্তরায় দাঁড়াইল অনেক। ১লা অগ্রহায়ণ তারিখের পত্রে কবি মহিম ঠাকুরকে লেখেন--

"মহারাজকে শান্তিনিকেতনের সমস্ত সংবাদ দিয়াছ--আশা করি তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পিতাঠাকুর (মহর্ষি) রাজকুমারের আগমন সংকল্পে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি

এ কয়দিন প্রত্যহ প্রাতে এই বিদ্যালয় লইয়া আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন । পাছে শীঘ্র বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ না হইলে তাঁহার জীবিতকাল অতিক্রান্ত হয় এই তাঁহার আশঙ্কা । এই কাজটিকে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্যরূপে দেখিয়া যাইতে চান । মহারাজ তাঁহার এই কাজে আত্মীয়ভাবে যোগ দিয়াছেন বলিয়া তিনি অন্তরের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন ।"

মহারাজের প্রেরণাও যে কবির ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বল দান করিয়াছে তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন--

"আজ বিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল (১৩৩২ সাল) শান্তিনিকেতনে বিদ্যায়তন স্থাপন করেছি । সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোকের মধ্যে একমাত্র রাধাকিশোর মানিক্যের কাছ থেকে আমি নিয়মিত আনুকুল্য পেয়েছি । তিনি স্বয়ং আমাদের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করে, আমাদের আনন্দিত ও সম্মানিত করেছেন । সে সময় আমার এই প্রতিষ্ঠান দৈন্য-পীড়িত ও অধিকাংশের অপরিজ্ঞাত ছিল । অথচ তখনই রাধাকিশোর কেবল যে বার্ষিক অর্থদানের দ্বারা এই শুভ-কর্ম্মের সাহায্য করেছিলেন তা নয়, ত্রিপুরার অনেক বালককে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন ।"

(রবি, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

ত্রিপুরায় সেইকালে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাদান ছিল অবৈতনিক । শুনিয়াছি মহারাজ রাধাকিশোর বলিতেন ' হিন্দু রাজারা শিক্ষা দান-ই করে, বিক্রি করে না ।' তখনকার যে রাজকীয় কলেজ ছিল তাহাতে ও অবৈতনিক শিক্ষা-দানই ছিল । কিন্তু তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তক্ষেপে নানা কারণে কলেজ স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই । কলেজ বন্ধ হইয়া গেলে বিজ্ঞানাগারে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ছিল সে সমস্তই প্রায় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দান করা হয় । বিদ্যালয় স্থাপনের তিন চার বৎসরের মধ্যেই সম্ভবতঃ কোন এক সময়ে শান্তিনিকেতনে কবির আতিথ্য ভোগ করিয়া মহারাজ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ককে প্রগাঢ় করিয়া তোলেন । তখনকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার প্রতিকূলতা ও রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের প্রতি দেশের শাসকদের শ্যেন-দৃষ্টিতে মহারাজ যে বিচলিত ছিলেন না ইহা তাহারই নিদর্শন বলিলে বোধ হয় ভুল করা হইবে না । নানা মঙ্গলকর্ম্মে মহারাজ রাধাকিশোর কবির নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন । তাই দেখিতে পাই, সে সময়কার, 'জাতীয়শিক্ষা পরিষদ'-এর অন্তর্গত যাদবপুর Bengal Technical Institute-এ সাহায্য দান । এই কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবল সাহায্য দান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই--ইহার শিক্ষা পদ্ধতি ও বিদেশে শিক্ষার্থী প্রেরণ সম্বন্ধে নিজে তথায় যাইয়া সব জানিয়াছিলেন । এই পরিষদ যোগেই ত্রিপুরা হইতে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী জাপানে প্রেরিত হইয়াছিলেন--রেশন-শিল্পে পারদর্শী হইবার জন্য । যদিও সমগ্র ব্যয় রাধাকিশোর বহন করিয়াছিলেন, তবুও 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'কে ডিঙ্গাইয়া কিছু করিতে তাঁহার মন চায় নাই । ইহারই পরিণতি আগরতলার সন্নিকটে রেশম বাগান' প্রতিষ্ঠায় । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়--রাজসাহী হইতে অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় কবিকে কতগুলি রেশমকীট দিয়াছিলেন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি তাঁহাকে কতদূর উদ্ব্যস্ত রাখিত তাহা নানা চিঠিতে উল্লেখ করিয়াছেন কবি । ইহাই কিভাবে মহারাজকে সংক্রামিত করিল তাহা অন্য এক অধ্যায় । আজও আগরতলার সেই পল্লীর নাম, রেশম-বাগিচা', যদিও রেশম বা বাগিচার কোনও চিহ্নই নাই ।

রাধাকিশোরের জনহিতকর কার্য্যে আনুকূল্য ছিল অনেক। ইহার মধ্যে সাহিত্যসেবীদের সহায়তার কথা মহিম ঠাকুর বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার 'দেশীয় রাজ্য' পুস্তকে। তিনি লিখিয়াছেন,-- ''সঞ্জীবনী পাঠে মহারাজ কবিবর (হেমচন্দ্র) যখন অন্ধ এবং অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন জানিতে পারিলেন, তখন নিজ তহবিল হইতে মাসিক ৩০, টাকা বৃত্তি তাঁহার সাহিত্যসাধনার প্রতিদান স্বরূপ দিবার প্রস্তাব, রবিবাবুর মারফত কবিবরের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং এ সংবাদ গোপন রাখিবার ভার গ্রহণ করিতে রবিবাবুকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন।'' এই প্রসঙ্গে কবি মহিম ঠাকুরকে পত্রে জানাইলেন--

''হেমবাবুর সাহায্যার্থে মহারাজ যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে এখানে চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়াছে। একথা গোপন রাখা আমার সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে হেমবাবুও অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা বোধ করিতেছেন। মাঝে হইতে মহারাজের কল্যাণে যশের কিয়দংশ আমার কপালেও পড়িয়াছে। আমার পিতাঠাকুর, হেমবাবুর জন্য মাসিক ২০, এবং গগন ১০, বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।''

হেমবাবু এই আনুকূল্য লাভে কতদূর স্বস্তি লাভ করিয়াছেন তাহা মহিম ঠাকুর প্রত্যক্ষ করিয়া সে সংবাদ মহারাজকে জানাইলে তিনি 'কাঁদ কাঁদ স্বরে' বলিয়াছিলেন--

''আমি বাংলার ক্ষুদ্র রাজা হইলেও আমি বর্ত্তমানে--তাঁহাকে যদি কবি মাইকেল মধুসূদনের মত দাতব্য চিকিৎসালয়ে পড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয়, তবে দেশের পরম দুর্ভাগ্য। তোমরা, আমার পারিষদেরা নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে, আর আমাকে যে কতদুর যাইতে হইবে তাহা জানি না। তোমাদের চক্ষুকর্ণ যেন এইরূপ ব্যাপারে বন্ধ না থাকে এবং মুখ যেন সদাসর্ব্বদা খোলা থাকে।''

(মহিম ঠাকুর প্রণীত ' দেশীয় রাজ্য')

এইরূপ ঔদার্য্যের উদাহরণ আজ বিরল। আমরা সরকারের কাঁধেই সব এখন ফেলিয়া নিষ্কৃতি পাইতেছি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে আছে--''ত্রিপুরার স্বর্গীয় নৃপতি রাধাকিশোর মাণিক্য দেববর্মন বাহাদুর জ্যোতিবাবুকে সঙ্গীত বিষয়ক আর একখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধক্রমেই জ্যোতিবাবু তখন ' ভারত সঙ্গীত-সমাজ' হইতে 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' নামে সঙ্গীত বিষয়ক একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। মহারাজ বাহাদুর তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক ৫০ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেন। কাগজখানি দশ বৎসর ছিল।''

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিত অমূল্য গ্রন্থ ''বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'' বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পর্যায়ে আদি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বীরচন্দ্র মাণিক্যের অর্থানুকূল্যেই ইহার প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল। সেন মহাশয়ের এই কৃচ্ছসাধনার স্বীকৃতি হিসাবে মহারাজ রাধাকিশোর তাঁহার জন্যও মাসিক ২৫, টাকা বৃত্তি দিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী মহারাজের এই সমস্ত অর্থানুকূল্যের পিছনে যে রবীন্দ্রনাথের শুভকামনা কতখানি কার্য্যকরী হইয়াছিল তাহা বলিবার নয়। অখ্যাত ত্রিপুরার নবযুগ প্রবর্ত্তনকারী রাধাকিশোরের অন্তর্নিহিত মঙ্গলকর তন্ত্রীগুলিকে সচেতন করিবার পন্থা নির্দ্ধারণ রবীন্দ্র পরিচয়ের এক নূতন দিক।

কবিচিত্ত কল্পনায় বহু কিছু সৃষ্টি করিয়া চলে, কিন্তু মনীষা কল্পনাকে জনহিত নিয়োজিত করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ হইয়া উঠে। তাই উপযুক্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া সেইগুলি রূপায়িত হয়।

১৩০৮ সনের কার্ত্তিক মাসে কবি আগরতলায়। এখান হইতেই জগদীশচন্দ্রকে 'আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি'---বলিয়া চিঠি আরম্ভ করেন। এই কাজকে মুখ্য করিলেও কবির সেই সময়কার আরব্ধ কর্ম্মাবলী ও চিন্তাধারার সহিত মহারাজকে পরিচিত রাখাও অন্যতম লক্ষ্য ছিল বলিয়াই আমাদের ধারণা। নব-পর্য্যায় বঙ্গদর্শন আরম্ভ হইয়াছে, সমস্ত লেখায় নূতন ভাবের দ্যোতনা-প্রাচীন ভারতের ভাব-সম্পদ ও তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তাহাকে খাপ খাওয়ানো--নানাভাবে আদর্শবাদকে জনমানসে তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস। তাই রাজধর্ম্ম ও ক্ষাত্রধর্ম্ম সম্বন্ধে দেশীয় নৃপতিকে ও যুবকদের সজাগ করিবার প্রয়োজনীয়তা, অন্যদিকে মাস দুই মধ্যেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প--এই সমস্ত যে মহারাজের সঙ্গে আলোচিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালীন দুইখানা পত্রের বিষয়বস্তু হইতেই বেশ অনুমান করা যায়। রাধাকিশোরকে লেখা পত্রখানায় তারিখ না থাকিলেও 'শ্রাবণ মাসের আগামী সংখ্যক বঙ্গদর্শনে "হিন্দুত্ব" প্রবন্ধ' (শ্রাবণ ১৩০৮) উল্লেখ হইতেই দু'এক মাস পূর্বেকার বলিয়াই ধরা যাইতে পারে।

"অনেক দিন পর মহারাজের প্রণয়লিপি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। - - - - -

মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্রে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে যে পরিচ্ছেদ আছে তাহাতে হিন্দুরাজার কর্ত্তব্যের আদর্শ দেওয়া আছে। ঐশ্বর্য্য ও সিংহাসন অধিকার যে রাজার চরম কর্ত্তব্য নহে তাহা সংহিতা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়---আমাদের রাজার রাজত্ব, কর্ত্তব্যে অধিকার, ঐশ্বর্য্যে অধিকার নহে---প্রাচীন বয়সে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া বানপ্রস্ত অবলম্বনের প্রথা দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। জীবনের এক এক ভাগে রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে---রাজত্বভার কেবল তাহার প্রকাশ মাত্র। য়ুরোপে রাজত্বই রাজার সমস্ত। প্রাচীন ভারতে ভোগ এবং ক্ষমতার হিসাবে না দেখিয়া রাজত্বকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য হিসাবে দেখা হইত।"

পত্রখানা শেষ করিবার পূর্ব্বে আবার বলিতেছেন---

"আমাদের স্মৃতিসকল হইতেই সারোদ্ধার করিয়া তাহার সাময়িক অংশ বর্জ্জন ও নিত্যকালীন অংশ গ্রহণ করিয়া হিন্দুর 'রাজধর্ম্ম' সম্বন্ধে মহারাজ যদি কিছু আলোচনা করেন ত সে অত্যন্ত উপাদেয় হইবে।"- - - -

(বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪৯)

কবি রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে মহারাজকে লিখিয়া চৈত্রের শেষের দিকে রাধাকিশোরের পুত্র মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লেখেন--- "- - - ভারতবর্ষের আদর্শকে কোন মতেই হৃদয় হইতে ম্লান হইতে দিয়ো না।" এবং "আগামী নববর্ষে তুমি নবতেজে নববলে ভারত সন্তান হইবার ব্রত গ্রহণ কর--- সেই ব্রতকে প্রাণের চেয়ে বড় করিয়া মরণান্ত কাল পালন করিয়ো"---এই বলিয়া পত্র সমাপ্তি করিলেন। পরবর্ত্তী বৎসর (১৩০৯) বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই আর একখানা পত্র লেখেন ব্রজেন্দ্রকিশোরকে ক্ষত্রিয়সন্তানের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে।

চিঠির আরম্ভ---

"বৎস, তুমি ক্ষত্রিয় তাহা কদাপি বিস্মৃত হইয়ো না।- - -ভারবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে- - -দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শুদ্র হইয়া পড়িয়াছি। এই দুই সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিলেই- - - ভারতবর্ষ পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিতে পারিবে। আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো। - - - যাহারা সমস্ত সমাজের আশ্রয় ছিল তাহারা আজ পশুর মত হীনতা ও অবমাননায় লুণ্ঠিত হইয়া দিন যাপন করিতেছে। ইহা অপেক্ষা কি মৃত্যু শ্রেয় নহে? ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ জীবন কি চরম দুর্গতি নহে? বাঁচিয়া কি হইবে যদি এমন করিয়াই বাঁচিতে হয়? নিজকে ও নিজের সমাজকে বীর্য্য দাও, আশ্বাস দাও, ধর্ম্মরক্ষা ও আর্ত্তত্রাণ ব্রতে দীক্ষিত করো---তোমার জীবন চরিতার্থ হউক---ঈশ্বর তোমার ললাটে ক্ষাত্র মাহাত্ম্যের তিলক স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়া দিন।"

(প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৮)

ক্ষাত্রধর্ম্ম ও রাজধর্ম্মের মহৎ আদর্শ অন্ততঃ বাংলাদেশের এই রাজ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবে---এই কল্পনাকে রূপদান করার জন্য রবীন্দ্রনাথের অবিরত আলোচনা ও পত্রব্যবহার। ইহার সহিত মহারাজ রাধাকিশোরের শুভবুদ্ধির যোগ দেশের হিতে নানাভাবে নিয়োজিত হইল---ত্রিপুরার সৌভ াগ্য ও গৌরব এইখানেই ।

সমগ্র বৎসরটি বলিতে গেলে চিন্তাধারার সংঘাতে ও কর্ম্মে জর্জ্জরিত কবিকে ক্লান্ত ও পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। ইহাই তাঁহার পরবর্ত্তী বৎসরে শ্রাবণ মাসে (১৩০৯) মহারাজকে লিখিত পত্রে পরিস্ফুট হয়।

"- - - - একই সময়ে দুঃসময় অস্বাস্থ্য বিদ্যালয় বঙ্গদর্শন ও বিষয়ের ভারে আমি মাথা তুলিতে পারিতেছিলাম না। - - - -শরীরটাকেও অনেকটা খাড়া করিয়াছি --কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আমার কাজ করিবার তেমন ক্ষমতা নাই--লেখাপড়ায় তেমন উৎসাহ পাই না, সেজন্য মনটা কিছু বিমর্ষ হইয়া পড়ে।- - - - -"

শারীরিক ও মানসিক বিপর্য্যয়ের এই চিত্র সুহৃদজনকে ছাড়া আর কাহাকে বলা চলে ! কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বীর্য্যবান পুরুষ দীনতা ও অবসাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবেন কি করিয়া? এই ক্ষণিক স্থৈর্য্যের, বিরতির ভাব---কর্ম্ম বা চিন্তা বিমুখতা নহে---ইহা সদা ক্রিয়াশীল কল্পনাময় কবিচিত্তের বিশেষ এক অভিব্যক্তি। আত্মশক্তির উপর আস্থা হারাইলে তখনই লিখিতে পারিতেন না---

"- - - - এখন মাঝে মাঝে কেবলি মনে হয় যেন জীবনটাব উপসংহার ও পরিশিষ্ট লইয়া আছি। কিন্তু বৃথা আক্ষেপ করিতেছি---এ মেঘ কাটিয়া যাইবে ---আমার কাজ বাকি আছে---আমার যাহা সঞ্চয় আছে এখনো তাহার বিতরণ শেষ হয় নাই---ঈশ্বর আমাকে অসময়ে অকৃতার্থ করিবেন না---আমার যে সকল গান গাহিবার আছে তাহা দুঃখ রজনীর অবসান প্রতীক্ষা করিতেছে---নূতন উষালোকের আভাস পূর্ব্বদিক্ প্রান্তে দেখা দিবে---আমি নূতন বলে নূতন আনন্দে নূতন গান আরম্ভ করিব। সে সমস্ত আমার হৃদয়ে আছে---এখনো কণ্ঠে আসে নাই।"

(শারদীয়া সেশ, ১৩৫৯)

এদিকে দুঃখকর গ্লানিকে বন্ধু-চিত্ত হইতে মুছাইয়া দিবার জন্যই যেন জগদীশচন্দ্রকে তখন যে মহারাজ পাঁচ হাজার টাকা আবার সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া 'মহারাজের উদার মহত্ত্বকে' অভিনন্দিত করিতেছেন। এবং আরও বলিতেছেন 'মহারাজ যে সকল ব্যাঘাত ভোগ করিতেছেনে তাহা নিঃসন্দেহেই বিধাতার আশীর্ব্বাদে মহারাজের দ্বিগুণতর মঙ্গলের কারণ হইবে।' পরিশেষে—'বিরলতা ও বিশ্রামের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দাবদাহের ত্রস্ত হরিণ যেমন জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে আমি পদ্মার গর্ভে ঝাঁপ দিলাম। পদ্মার শীতল ক্রোড় আমার চিরপরিচিত।' এই বলিয়া পত্র সমাপন করিয়াছেন।

(শারদীরা দেশ, ১৩৫৯)

পত্রে রবীন্দ্রনাথ মহারাজের ব্যাঘাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রাধাকিশোরের জীবন অর্থাৎ রাজ্যভার গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই পারিবারিক নানা বাদ বিসম্বাদ তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। গৃহের শান্তি বলিতে যাহা—তাহা তাঁহার নাই বলাও চলে। প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের অন্তর্ধান,—অথচ, মুখ ফুটিয়া কাহাকেও মনের কথা বলিবার সাহসও যেন রাধাকিশোরের তখন ছিল না। কিন্তু দেশ ও সমাজের কথা ভুলিয়া থাকিবার মানসিক বৃত্তি না থাকায় সেই সব উন্নতিকর কাজে কোনও বাধাকেই তিনি বাধা বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। এমন কি সিংহাসনের দাবী লইয়া যখন অপর পক্ষ ইংরেজের আদালতে হাজির হইলেন তখনও রাধাকিশোর কোনও প্রকার স্থৈর্য্য হারান নাই।

ঘরের দিকে এই খবরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার যোগাযোগকে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট যে সুনজরে দেখিবেন না ইহা খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ তখন ঘোরতরভাবে দেশ ও সমাজের কথা চিন্তা করিয়া নানাভাবে নানা প্রবন্ধে প্রকাশ করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পল্লী উন্নয়ন কর্ম্মে নিজ শক্তি যথাযথভাবে নিয়োজিত রাখিতে বদ্ধপরিকর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়—রাধাকিশোরকে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট 'রাজা' আখ্যায় অভিহিত করিত, ভুলেও "মহারাজা" লেখে নাই। রাধাকিশোর বলিতেন, 'দেশের লোক আমাকে মহারাজ বলিয়াই জানে, অন্যে তাহা স্বীকার না করিলে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি আছে কি ?' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ ও প্রেরণা রাধাকিশোরের চিন্তাধারাকে কতদুর উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ব এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"শ্রাবণ মাসের (১৩০৮) আগামী সংখ্যক বঙ্গদর্শনে 'হিন্দুত্ব' প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি সমাজই হিন্দুর হিন্দুত্ব এবং রাজ্য ব্রাহ্মণ বণিক্ শূদ্র সেই সমাজকেই নানাদিক হইতে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য।" ---- "স্মৃতি সকল হইতে 'হিন্দুর রাজধর্ম্ম' সম্বন্ধে মহারাজ যদি কিছু আলোচনা করেন ত সে অত্যন্ত উপাদেয় হইবে" বলিয়া এই পত্রেই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি কবির শুভাকাঙ্ক্ষা—ত্রিপুরাকে আদর্শ রাজ্য করিয়া গঠন করার একান্ত অভিলাষই এই পত্র-ব্যবহারে প্রকাশ পাইতেছে।

ভারতে তখন বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্য ছিল, ক্ষুদ্র এই ত্রিপুরার উন্নতি যে বাংলার গৌরবকে বাড়াইবে, ইহা কবি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। ইহারই অভিব্যক্তি

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত "দেশীয় রাজ্য" প্রবন্ধে। অধিকন্তু তৎকালীন বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলিই যে আমাদের আসাস্থল তাহাও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, নিজস্ব ভঙ্গী ও ভাষাতে।

বহুকাল যাবৎ স্থানিক সাহিত্য পরিষদ স্থাপনার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তখনও কোথাও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ত্রিপুরাই এই কাজে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল এবং "ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনী" প্রতিষ্ঠায় পৌরোহিত্য করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের নিকট আহবান পৌঁছিল বলিয়া রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখিয়াছেন। সম্মিলনীর উদ্বোধনে কবি এই "দেশীয় রাজ্য" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দেন।

সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল স্থানীয় 'উমাকান্ত একাডেমী' হলে—১৩১২ সনের ১৭ই আষাঢ় তারিখে। সংখ্যার দিক হইতে বিপুল না হইলেও আগরতলার গুণগ্রাহী সমাজ তো উপস্থিত ছিলেনই, আর এক শ্রেণী ছিলেন কবি-দর্শণ-প্রার্থী জনগণ। মহিম ঠাকুরের ভাষায় সভার কথা উল্লেখ করিতেছি—"সে বিরাট সভার মঞ্চোপরি একটি আসন মহারাজ রাধাকিশোরের জন্য, অপরটি সভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সভারম্ভে রবিবাবুকে সভাপতি পদে বরণ করিয়া, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য সর্ব্বসাধারণের সমসূত্রে আসন গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সসঙ্কোচে মহারাজকে নির্দ্দিষ্ট আসনে বলিতে অনুরোধ করিলে, মহারাজ বলেন—"সাহিত্য ক্ষেত্রে আপনার স্থান সর্ব্বোপরি, আপনি সাহিত্যের রাজা, আমি আপনার ভক্ত বন্ধু মাত্র, এ উচ্চ মঞ্চ আমার স্থান নহে।" দর্শক এবং উপস্থিত প্রজাবৃন্দ মহারাজের বিনয়নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ এবং গৌরবান্বিত বোধ করিল, কবি রবীন্দ্রনাথ এ দৃশ্য দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।" (দেশীয় রাজ্য,২২৪-২৫ পৃঃ)। সেদিনকার অভিভাষণে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি মমতা ও আকষর্ণের কথাগুলি হইতে কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

> "এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে— একটি সংস্কৃত বাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি—"কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকং"—বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেন্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্য্যই সার। এই বীর্য্য দেশ-কাল-পাত্রভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয়—কেহ বা শাস্ত্রে বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্ম্মে বীর, কেহ বা কর্ম্মে বীর।"

* * * *

> "দেশীয় রাজ্যের ভুলত্রুটি—মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই কারণেই এখানকার রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে যে সকল অভাব ও বিঘ্ন দেখিতে পাই, তাহাকে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। এই কারণে, এখানকার রাজ্যশাসনের মধ্যে যদি কোনো অসম্পূর্ণতা বা শৃঙ্খলার অভাব দেখি, তবে তাহা লইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আলোচনা করিতে আমার উৎসাহ হয় না—আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়।"

এই দীর্ঘ অভিভাষণ সমাপ্তিতে বলেন—

> "আমাদের মন্দভাগ্য আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিদেশী অফিসের ছাঁচের মধ্যে চালিয়া তাহাদিগকে কলরূপে বানাইয়া না তোলে— এই সকল স্থানেই আমরা স্বদেশ লক্ষ্মীর স্তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষস্থলের সজীব কোমল মাতৃস্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি, এই আমাদের কামনা।"

দীর্ঘকাল দেশ স্বাধীন হইয়াছে—শত শত দেশীয় রাজ্যের শাসন প্রণালী অস্তিত্ব হারাইয়াছে, কিন্তু বৃটিশ শাসনের যে রূপকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে সশঙ্কচিত্তে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা কতদূর ভারতীয় হইতে পারিয়াছি সেই কথাই আজ গভীরভাবে চিন্তনীয়। বলাই বাহুল্য যে ত্রিপুরারাজ্যে আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনই উক্ত অভিভাষণের মূল উৎস। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে 'ভারত-রাজন্য সভা' নামে একটি প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ পেশ করেন মহারাজ রাধাকিশোর সমীপে। প্রস্তাবটি ঠিক কবে করেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইলেও দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে আলোচনারই যে অঙ্গীভূত ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৩০৮ সনে ত্রিপুরার রাজনৈতিক আকাশে বেশ মেঘ জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই আভাষ দিয়াছি। বিশেষভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তখন ইংরেজ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যুবরাজের শিক্ষাদান সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথই উদ্যোগী হইয়া কোচবিহারের মহারাজের সহিত সম্মিলন ঘটাইয়া লিখিয়াছিলেন "দুই মহারাজের মধ্যে বন্ধুত্ব হইলে মন্ত্রণাদি দ্বারা উভয়ে বললাভ করিবেন।" শিক্ষা বিষয়ক আলোচনায় ইহা বিস্তারিত পরে উল্লেখ করা যাইবে।

প্রস্তাবটিতে তারিখ লিখিত না থাকিলেও—ইহা ১৩০৮ হইতে ১৩১২ সনের মধ্যেই উপস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের মনে হয়। মূল লেখা 'ভারত রাজন্য সভা' শান্তিনিকেতন 'রবীন্দ্র সদন' এ পাঠান হইয়াছে। এই বিশেষ উল্লেখযোগ্য লেখাটি রবীন্দ্রনাথের কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এবং সেকারণেই সম্ভবতঃ যথেষ্ট প্রচার লাভ করে নাই। কিন্তু আগরতলা হইতে প্রকাশিত অধুনা-লুপ্ত ত্রৈমাসিক 'রবি' পত্রিকার রবীন্দ্র সম্মিলন সংখ্যায় (২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিং) পত্রস্থ করা হইয়াছিল।

কবি ১৩০৮ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখিতেছেন—"হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপের ছাঁচে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।" ইহার সহিত বিশেষভাবে এই প্রস্তাবে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর পটভূমি তুলনীয়।

"ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যে সঙ্কোচ প্রকাশ করেন, ইহা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মাহাত্ম্য। অথচ ধর্ম্ম ও সমাজে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে অথবা কোন সংশোধনের প্রয়োজন হইলে, এ পর্য্যন্ত রাজারাই মনোযোগী হইয়া যথাকর্তব্য বিধান করিয়াছেন।" কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তন ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মত ও ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও বহু দোষ "চোরের মত সুরঙ্গদ্বার দিয়া সমাজের

ভিত্তি খনন করিয়া প্রবেশ করিতেছে। মিথ্যা ব্যবহার, কপটাচরণ, নির্লজ্জভাবে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, দেশ-কালোচিত সামাজিক পরিবর্ত্তনগুলি হিন্দু রাজার অনুমতি ও সহায়তা পাইতেছে না।" রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়া বলিতেছেন যে বিলাত ফেরতাবাঙ্গালী প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহার ছেলের পৈত্রিক ধনে অধিকার ও হিন্দুমতে বিবাহ সিদ্ধ হইবে কিনা ইহার বিচার আদালতের উপর নির্ভরশীল। "অথচ বর্ত্তমানকালে জ্ঞান, শিক্ষা ও সাংসারিক উন্নতিলাভের জন্য বিলাতযাত্রা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ স্থলে বিলাতযাত্রাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলে তাহাতে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না। কিন্তু কে বিধান দিবে যে, বিলাতযাত্রায় হিন্দুত্ব নাশ হয় না।" ব্রাহ্মরা হিন্দু কিনা সেই মতবাদও কবির মনে ক্রিয়া করিতেছিল কিনা বলা যায় না। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করিলেন যে রাজশক্তি যখন এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী নয়, নানা লোকের নানা স্বার্থ থাকায় ঐক্য হওয়াও সম্ভবপর নয়—

> "এরূপ স্থলে একটিমাত্র সদুপায় আছে। ভারতবর্ষের হিন্দু রাজন্য মন্ডলীকে এই ভার দিতে হইবে। তাঁহারা যে প্রথাকে হিন্দুচিত বলিয়া গণ্য করিবেন, গবর্মেন্ট তাহাকেই যদি হিন্দু আচার বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে গবর্মেন্টের সঙ্কোচের কারণ থাকে না, অথচ সমাজকে নিশ্চল, নির্জ্জীব হইয়া থাকিতে হয় না।
>
> "প্রথমতঃ এই রাজসভাগুলি পাঁচভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। কারণ, ভারতবর্ষে দেশভেদে প্রথার অনৈক্য অত্যধিক, বাঙ্গালা-বিহার উড়িষ্যা এক, উত্তর-পশ্চিম দুই, পঞ্জাব-সিন্ধু তিন, গুজরাটি-মারাঠি চার এবং মাদ্রাজ পাঁচ।"

প্রস্তাবিত এই বিভাগের দেশীয় নৃপতিবৃন্দের ধর্ম্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে একযোগে সমস্বার্থে কাজ করিবার সুযোগ হইবে, অধিকন্তু ইহা দ্বারাই, এই সম্মিলিত সভাযোগেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিজেদের বক্তব্যকে ও দৃঢ় করিবার সুযোগ ঘটিবে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ আশা। বস্তুতঃ সর্ব্ব-ভারতীয় মঙ্গল কামনার রূপই কবির চোখে তখন ভাসিতেছিল।

বর্ত্তমান ভারতরাষ্ট্র শাসনতন্ত্রে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে "আঞ্চলিক পরিষদ" এর যে রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত কাঠামোকেই সমর্থন করিতেছে—যদিও বর্ত্তমানে ইহা চারিটি পরিষদে সীমিত। কিন্তু এই আঞ্চলিক পরিষদের কর্ম্মপরিধি ধর্ম্মীয়, সামাজিক ও বিভিন্ন রাজ্যের সমস্যাকে সহজ সমাধানে কতদুর সহায়ক হইয়াছে বা হইতেছে তাহা বিবেচ্য।

রবীন্দ্রনাথের একমাত্র চিন্তা,—

> "স্বদেশের হিতসাধনে দেশীয় রাজাদের অধিকার যত বিস্তৃত হইবে, ততই তাঁহাদের দায়িত্ব ও আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পাইবে। গৌরবকর কার্য্যে যত তাঁহাদের যোগ থাকিবে, ততই স্বভাবতঃ তাঁহাদের বিচারশক্তি, বহুদর্শিতা ও চরিত্র গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। বহুলোকের মঙ্গলসাধনের জন্য চিন্তা করা, একত্র হইয়া করা, লোকহিতকর কর্ত্তব্য সাদনে মনোনিবেশ করা—ইহাই রাজোচিত মহত্ত্ব লাভের সাধনা। প্রভুত্ব, বিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতার চর্চ্চা রাজধর্ম্মের বিকার। স্বরাজ্যে

পারিষদবর্গ কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকিয়া স্বেচ্ছাধীন রাজকার্য্যে যথার্থ মাহাত্ম্য লাভ করা কঠিন। কিন্তু যদি সাধারণ ভারতবর্ষের কোন মঙ্গল কার্য্যভার রাজাদের হস্তে থাকে এবং তাহা যদি বিচার ও পরামর্শ দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্পন্ন করিতে হয়, যদি সভার নিয়ম রক্ষাপূর্ব্বক বিশ্বজনের উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে এই সকল বিশেষ কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, ইহার দ্বারা রাজন্যগণের বিচার শক্তি, শুভবুদ্ধি ও সংযমের চর্চ্চা হইতে পারে এবং স্বদেশের কর্ত্তব্য পালন করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করিতে পারেন।"

কবি প্রস্তাবটি সাধারণভাবে করিলেও ইহার সমীচীনতা বিবেচনা করিবার জন্যই যে মহারাজ রাধাকিশোরকে দিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই প্রস্তাবের বহুকাল পরে দেশীয় রাজন্যবর্গের Chamber of Princes স্থাপিত হয় ব্রিটিশ শাসকদের প্রয়োজনেই। দেশীয় রাজন্যবর্গের যে কল্যাণ কামনায় রবীন্দ্রনাথ 'ভারত রাজন্য সভা' প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার কল্যাণকর অধ্যায়ই আমাদের মনে হয় Chamber of Princes অনুষ্ঠানপত্রে অলিখিত ছিল। অলমিতি বিস্তরেণ।

* * * * *

যুবরাজ ও রাজকুমারদের সুশিক্ষিত করিতে রাধাকিশোর কোনো ত্রুটি করেন নাই। সর্ব্ববিষয়েই তিনি যেমন রবীন্দ্রনাথের পরমার্শকে শীর্ষ স্থান দিয়া আসিতেছিলেন এ বিষয়েও কবির উপরই নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথও শিক্ষক নির্ব্বাচনে জগদীশকে ভার দেন। মহারাজকে —কলিকাতা হইতে মহিম ঠাকুর এক চিঠিতে (১৩০৫) লেখেন "জগদীশবাবু যুবরাজের এত পক্ষপাতী—যাহাতে তাঁহার সৎশিক্ষা হয়—ইহার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে নিতান্ত অভিলাষী।" প্রথমতঃ অধ্যাপক নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ অল্পকালের জন্য এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি কার্য্যান্তরে গেলে অতঃপর মোক্ষদাকুমার বসুর মত শিক্ষকের নিয়োগ (১৩০৬ বৈশাখ) সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়া মহিম ঠাকুর উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়েই জগদীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। তাঁহাদের যোগ্যতা ও স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে নিজে জানিতেন বলিয়াই নির্ব্বাচনে জগদীশচন্দ্রের কোনও দ্বিধা ছিল না। এই শিক্ষকদ্বয়ের শিক্ষা ও সাহচর্য্য রাজকুমারদের জীবনে যে স্থায়ী রেখাপাত করিয়াছিল তাহা আজও শ্রদ্ধাভরে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর স্মরণ করিয়া থাকেন। কারণ, শেষোক্ত শিক্ষক মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন।

এহেন উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে পুত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থা করিলেও ইংরেজ গভর্ণমেন্টের তাহা মোটেই মনঃপূত ছিল না। বড়লাটের তরফ হইতে রাজকুমারদের বিশেষ করিয়া যুবরাজকে আজমীর মেয়ো কলেজে য়ুরোপীয় অভিভাবকত্বে শিক্ষা-ব্যবস্থায় পীড়াপীড়ি চলিতে লাগিল। রাধাকিশোর রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইলেন।

এই সময়ে মহারাজ দার্জ্জিলিং যাইবেন, কবিকেও সঙ্গে যাইতে আমন্ত্রণ করিলেন— কবি সম্মত হওয়ায় খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া চিঠি দিলেন (১৩০৮, ১৪ই বৈশাখ)। আর জানাইলেন— 'পলিটিকেল এজেন্টের পরামর্শে মহিম ও যতীকে তাড়াতাড়ি আজমীর পাঠাইলাম না। ভালই হইয়াছে। আপনার সহিত পরামর্শ করিবার সুবিধা পাইয়াছি।' দার্জ্জিলিং—এ কবির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল এ বিষয়ে সঠিক উপদেশ পাওয়া

যাইবে কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে। কোচবিহারের মহারাজাও তখন দাৰ্জ্জিলিংএ। এই দুই দেশীয় নৃপতির মধ্যে ইহার পূর্ব্বে পরিচয় অথবা দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু বিশেষ কাজে তিনি সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন না—কলিকাতা আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার চিন্তা ছিল এই সম্মিলনের ফল সম্বন্ধে। তিনি কলিকাতা পৌঁছিবার পরই মহারাজাকে লিখিলেন—

"কোচবিহারের মহারাজের সহিত মহারাজের কিরূপ সম্মিলন ও পরামর্শ হইল তাহা জানিবার জন্য আমি নিরতিশয় উৎসুক আছি। দুই মহারাজের মধ্যে বন্ধুত্ব হইলে মন্ত্রণাদি দ্বারা উভয়ে বল লাভ করিবেন। ইহা মনে করিয়া আমি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলাম এবং করুণা ও নির্ম্মলের (কেশব সেনের ছেলে) সহায়তায় এই অভিলষিত মিলন সংঘটনের উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলাম। এই মিলনে আমি উপস্থিত থাকিতে পারিলে বড়ই আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, ঠিক সময়টিতে আমাকে চলিয়া আসিতে হইল। রাজকার্য্য সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের সহিত কোন গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইলে নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ ও মহারাজের সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শযোগে মহারাজের সেই অভাব মোচন হইবে কল্পনা করিয়া আমি আশ্বস্ত হইতেছি।"

(দেশীয় রাজ্য, পৃঃ ২১৫)

কবির সহিত রাধাকিশোরের পূর্ব্ব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কোচবিহারের মহারাজেরও অভিমত বিলাত হইতে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করাই বিধেয়। রাধাকিশোর পত্রে জানাইলেন—

"ছেলের শিক্ষা বিষয়ে আপনার ও কুচবিহারের মতই L.G. (লেফটেনান্ট গভর্ণর) গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইয়াছিল। তিনি কুচবিহারের কোন ভাল একজন ইংরাজ টিউটার নিযুক্তের জন্য পরামর্শ দিতেছেন। তদনুসারে কুচবিহারের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিয়াছি। বোধ হয় তিনি বিলাতে শীঘ্রই চিঠি লিখিবেন।"

শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপরই অর্পিত হইল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তখন বিলাত-প্রবাসী। কবি তাঁহাকে ১৯০১ মে মাসে যে চিঠি লেখেন তাহাতে বলিলেন—

"যুবরাজের জন্য বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। যুবরাজ ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিৎ হইলেই ভাল হয়। এরূপ গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিবে, আমি জানি; কিন্তু তবু তোমাকে লইতে হইবে। অবশ্য, তুমি যাহাকে ভাল মনে করিয়া বাছিয়া দিবে ভারতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে দুইদিনেই সে মন্দ হইয়া দাঁড়াইতে পারে—মহারাজা সেজন্য তোমাকে দোষী করিবেন না। বর্ত্তমানে তুমি যাঁহাকে রাখিতে যোগ্য এবং ভাল মনে করিবে, যিনি যুবরাজকে যথোচিত সংযমে রাখিতে পারিবেন, অথচ অনাবশ্যক উদ্ধত হইবেন না— এমন একটি লোক দেখিয়া, তাঁহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে পারে জানিয়া লিখিবে।"

(চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪)

ভারতে ইংরেজদের চালচলন সম্বন্ধে কবি বিশেষ সন্দিহান, বন্ধু -পুত্র ত্রিপুরার ভাবী কর্ণধারকে সুশিক্ষিত করার দায়িত্ব কবিকে বিশেষভাবে চিন্তিত করিয়াছে। মহারাজের

উৎকণ্ঠা হইতে রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা যে কোনো অংশে কম নহে, তাহা উপরোক্ত চিঠিই প্রকাশ করে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখিয়াছেন-"জগদীশচন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া লিখিয়াছিলেন যে রাজ্য মধ্যে খাল কাটিয়া কুমীর আনিবার প্রয়োজন'কী।" তিনি ইংরেজ শিক্ষক নিয়োগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইংরেজ শিক্ষক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ছিল কারণ নিজ পুত্রকন্যাদের জন্য তিনি লরেন্সকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মেয়ো কলেজে যুবরাজকে যোগদান করাইবার ব্যবস্থা হইতে লেঃ গভর্ণরকেনিবৃত্ত করাইতে পারিয়া রাধাকিশোর যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টায় Mr. T. R. Williams, M.A. (Oxon) নামকএক বিশিষ্ট শিক্ষাবিৎ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি তদানীন্তন সরকারী সংস্কার হইতে মুক্ত থাকিয়া রাজকুমারদের শিক্ষা পরিচালনা করিয়াছিলেন--ইহা এখনও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর বলিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ জড়িত থাকিয়া বন্ধু রাধাকিশোরকে যে ছেলেদের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্বেগ হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন তাহাই প্রতিভাত হইতেছে।

শিক্ষক মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন লইয়াই যে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যোগে মহারাজ রাধাকিশোরের নিকট পরিচিত হইলেন তাহা নহে। পূর্ব্ব হইতেই রাধাকিশোরের অনুসন্ধিৎসু মন বিজ্ঞানীর গবেষণার-বিবরণ আগ্রহ সহকারে অনুধাবন করিয়া আসিতেছেন। কবিও সর্ব্বদা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারাদির কথা আগ্রহ করিয়াই মহারাজের গোচরে আনিতেন। যুবরাজের বিবাহে যে সব বন্ধু-বান্ধবদের পাইতে মহারাজ অভিলাষী তাহাদের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের নামও চিঠিতে (১৩০৬) কবিকে জানাইয়া উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না--

> "--------জগদীশবাবুর বিজ্ঞানশালা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আমার স্মরণ আছে। ভরসা করি উপরি উক্ত শুভ ব্যাপারে আপনি ত নিশ্চয়ই আসিবেন, সেই সময় আপনার সহিত আলাপ করিয়া যাহা সাব্যস্ত হয় সেরূপ করিতে প্রস্তুত রহিলাম। জগদীশ্বর সমীপে যাচিঞা করি জগদীশবাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভারতের মহিমা বৃদ্ধি করুন।"

এই সময়েই মহারাজ মহিম ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন----

> "বর্ত্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দু এক পদ অলঙ্কার না ই বা হইল, তৎপরিবর্ত্তে জগদীশবাবু সাগরপার হইতে যে অলঙ্কারে ভারতমাতাকে ভূষিত করিবেন, তাহার তুলনা কোথায়।"
>
> (দেশীয় রাজ্য, পৃঃ ২১৯)

যুবরাজের বিবাহ ফাল্গুনে। পৌষ মাসে মহারাজ কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন (১৮৯৯।১৯০০)। জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কার লইয়া দ্বিতীয়বার বিলাতে বিজ্ঞানবিজয় যাত্রার প্রাক্কাল। কলেজের বিজ্ঞানাগার আচার্য্য বসু স্বীয় গবেষণা কার্য্যে ব্যবহার করিবেন, ইহা শাসক প্রভুদের অপছন্দ। ভারতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞান আলোচনায় যশস্বী হইবেন--

যাইবে কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে। কোচবিহারের মহারাজাও তখন দার্জ্জিলিংএ। এই দুই দেশীয় নৃপতির মধ্যে ইহার পূর্ব্বে পরিচয় অথবা দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু বিশেষ কাজে তিনি সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন না—কলিকাতা আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার চিন্তা ছিল এই সম্মিলনের ফল সম্বন্ধে। তিনি কলিকাতা পৌঁছিবার পরই মহারাজাকে লিখিলেন—

"কোচবিহারের মহারাজের সহিত মহারাজের কিরূপ সম্মিলন ও পরামর্শ হইল তাহা জানিবার জন্য আমি নিরতিশয় উৎসুক আছি। দুই মহারাজের মধ্যে বন্ধুত্ব হইলে মন্ত্রণাদি দ্বারা উভয়ে বল লাভ করিবেন। ইহা মনে করিয়া আমি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলাম এবং করুণা ও নির্ম্মলের (কেশব সেনের ছেলে) সহায়তায় এই অভিলষিত মিলন সংঘটনের উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলাম। এই মিলনে আমি উপস্থিত থাকিতে পারিলে বড়ই আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য, ঠিক সময়টিতে আমাকে চলিয়া আসিতে হইল। রাজকার্য্য সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের সহিত কোন গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইলে নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ ও মহারাজের সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শযোগে মহারাজের সেই অভাব মোচন হইবে কল্পনা করিয়া আমি আশ্বস্ত হইতেছি।"

(দেশীয় রাজ্য, পৃঃ ২১৫)

কবির সহিত রাধাকিশোরের পূর্ব্ব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কোচবিহারের মহারাজেরও অভিমত বিলাত হইতে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করাই বিধেয়। রাধাকিশোর পত্রে জানাইলেন—

"ছেলের শিক্ষা বিষয়ে আপনার ও কুচবিহারের মতই L.G. (লেফটেনান্ট গভর্ণর) গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইয়াছিল। তিনি কুচবিহারের কোন ভাল একজন ইংরাজ টিউটার নিযুক্তের জন্য পরামর্শ দিতেছেন। তদনুসারে কুচবিহারের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিয়াছি। বোধ হয় তিনি বিলাতে শীঘ্রই চিঠি লিখিবেন।"

শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপরই অর্পিত হইল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তখন বিলাত-প্রবাসী। কবি তাঁহাকে ১৯০১ মে মাসে যে চিঠি লেখেন তাহাতে বলিলেন—

"যুবরাজের জন্য বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। যুবরাজ ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিৎ হইলেই ভাল হয়। এরূপ গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিবে, আমি জানি; কিন্তু তবু তোমাকে লইতে হইবে। অবশ্য, তুমি যাহাকে ভাল মনে করিয়া বাছিয়া দিবে ভারতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে দুইদিনেই সে মন্দ হইয়া দাঁড়াইতে পারে—মহারাজা সেজন্য তোমাকে দোষী করিবেন না। বর্ত্তমানে তুমি যাঁহাকে রাখিতে যোগ্য এবং ভাল মনে করিবে, যিনি যুবরাজকে যথোচিত সংযমে রাখিতে পারিবেন, অথচ অনাবশ্যক উদ্ধত হইবেন না— এমন একটি লোক দেখিয়া, তাঁহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে পারে জানিয়া লিখিবে।"

(চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৪)

ভারতে ইংরেজদের চালচলন সম্বন্ধে কবি বিশেষ সন্দিহান, বন্ধু -পুত্র ত্রিপুরার ভাবী কর্ণধারকে সুশিক্ষিত করার দায়িত্ব কবিকে বিশেষভাবে চিন্তিত করিয়াছে। মহারাজের

উৎকণ্ঠা হইতে রবীন্দ্রনাথের উৎকণ্ঠা যে কোনো অংশে কম নহে, তাহা উপরোক্ত চিঠিই প্রকাশ করে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখিয়াছেন-"জগদীশচন্দ্র এই সংবাদ পাইয়া লিখিয়াছিলেন যে রাজ্য মধ্যে খাল কাটিয়া কুমীর আনিবার প্রয়োজন'কী।" তিনি ইংরেজ শিক্ষক নিয়োগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইংরেজ শিক্ষক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা ছিল কারণ নিজ পুত্রকন্যাদের জন্য তিনি লরেন্সকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মেয়ো কলেজে যুবরাজকে যোগদান করাইবার ব্যবস্থা হইতে লেঃ গভর্ণরকেনিবৃত্ত করাইতে পারিয়া রাধাকিশোর যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টায় Mr. T. R. Williams, M.A. (Oxon) নামকএক বিশিষ্ট শিক্ষাবিৎ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি তদানীন্তন সরকারী সংস্কার হইতে মুক্ত থাকিয়া রাজকুমারদের শিক্ষা পরিচালনা করিয়াছিলেন--ইহা এখনও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর বলিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ জড়িত থাকিয়া বন্ধু রাধাকিশোরকে যে ছেলেদের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্বেগ হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন তাহাই প্রতিভাত হইতেছে।

শিক্ষক মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন লইয়াই যে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যোগে মহারাজ রাধাকিশোরের নিকট পরিচিত হইলেন তাহা নহে। পূর্ব্ব হইতেই রাধাকিশোরের অনুসন্ধিৎসু মন বিজ্ঞানীর গবেষণার-বিবরণ আগ্রহ সহকারে অনুধাবন করিয়া আসিতেছেন। কবিও সর্ব্বদা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারাদির কথা আগ্রহ করিয়াই মহারাজের গোচরে আনিতেন। যুবরাজের বিবাহে যে সব বন্ধু-বান্ধবদের পাইতে মহারাজ অভিলাষী তাহাদের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের নামও চিঠিতে (১৩০৬) কবিকে জানাইয়া উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না--

> "---------জগদীশবাবুর বিজ্ঞানশালা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আমার স্মরণ আছে। ভরসা করি উপরি উক্ত শুভ ব্যাপারে আপনি ত নিশ্চয়ই আসিবেন, সেই সময় আপনার সহিত আলাপ করিয়া যাহা সাব্যস্ত হয় সেরূপ করিতে প্রস্তুত রহিলাম। জগদীশ্বর সমীপে যাচিঞ্চা করি জগদীশবাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভারতের মহিমা বৃদ্ধি করুন।"

এই সময়েই মহারাজ মহিম ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন----

> "বর্ত্তমানে আমার ভাবী বধূমাতার দু এক পদ অলঙ্কার না ই বা হইল, তৎপরিবর্ত্তে জগদীশবাবু সাগরপার হইতে যে অলঙ্কারে ভারতমাতাকে ভূষিত করিবেন, তাহার তুলনা কোথায়।"
>
> (দেশীয় রাজ্য, পৃঃ ২১৯)

যুবরাজের বিবাহ ফাল্গুনে। পৌষ মাসে মহারাজ কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন (১৮৯৯।১৯০০)। জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কার লইয়া দ্বিতীয়বার বিলাতে বিজ্ঞানবিজয় যাত্রার প্রাক্কাল। কলেজের বিজ্ঞানাগার আচার্য্য বসু স্বীয় গবেষণা কার্য্যে ব্যবহার করিবেন, ইহা শাসক প্রভুদের অপছন্দ। ভারতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞান আলোচনায় যশস্বী হইবেন--

ইহা তাহাদের পক্ষে অসহনীয়। কাজেই গবেষণাগার তাঁহার অন্যত্র করিতে হইবে। সুহৃৎ বিজ্ঞানীর নিরঙ্কুশভাবে গবেষণা চালাইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে মনে সঙ্কল্প করিয়া ফেলিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বেই খুব সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়ে কলিকাতার জ্ঞানী গুণী সমাজে, এই সময়ে জগদীশচন্দ্রের নব আবিষ্কার সকলকে পরিচিত করিবার ব্যবস্থা হইল। মহারাজের সহিত মহিম ঠাকুরও কলিকাতায় । কবি তাঁহাকে একদিন জানাইলেন--"আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর নূতন তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সী কলেজে অদ্য রাত্রে Experiment হইবে। যদি তুমি পার, উপস্থিত হইও ।" মহিম ঠাকুর এই প্রসঙ্গে তাঁহার লিখিত 'ত্রিপুরা-প্রসঙ্গ'এ(দেশীয় রাজ্য, পৃঃ ২৪১) যাহা সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা আমরা আনুপূর্ব্বিক এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই টোকাখানা (রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত আহ্বান) লইয়া আমি মহারাজ সকাশে উপস্থিত হইলাম এবং বিদায় চাহিলাম। তিনি অভিমানভরে বলিলেন, 'তুমি যাইবে আর আমি যাইতে পারিব না ? আমিও অদ্য রাত্রে যাইব।' যথাসময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের Laboratory-তে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বিজ্ঞলোকের সমাবেশ হইয়াছে । রবিবাবু মহারাজকে দেখিয়া পুলকিত হইলেন এবং আচার্য্য জগদীশ বসুর সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন (ইহাই সাক্ষাৎ পরিচয়)। তখন মহারাজ সুমধুরস্বরে অথচ অভিমানভরে ডাক্তার বসুকে বলিলেন, 'আমি যে আপনার ছাত্র, আমাকে কেন তামাসা দেখিতে দিবেন না? আমি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা পাঠ করিয়া থাকি। কাজেই আপনার নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু পাঠ করিয়াছি।' তখন সমবেত জনমন্ডলীর সঙ্গে মহারাজা বসিয়া গেলেন এবং Experiment দেখিতে লাগিলেন। প্রায় দুইঘন্টাকাল লাগিয়াছিল।-- Experiment শেষ হইয়া গেলে ডাক্তার বসু (স্বর্গীয়) মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি ইংরেজীতে বলিয়াছি, আপনি কিছু বুঝিয়াছেন কি? তখন স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি ইংরেজী জানি না । তবে যদি আপনি আমাকে আপনার যন্ত্র দেখিতে দেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারিব, বুঝিতে পারিয়াছি কিনা।' জগদীশবাবুর যন্ত্রে হস্তক্ষেপ করা জগদীশবাবু সাবধানতার সহিত নিষেধ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি ঐ যন্ত্রের নিকট মহারাজকে নিয়া গেলেন এবং পরীক্ষার নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। তখন মহারাজ একখানা পুঁথি লইয়া যন্ত্রের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন এবং ডাক্তার বসুকে অনুরোধ করিলেন, আপনি এক্ষণে shock দিয়া দেখুন, কিন্তু respond করিতেছে না। তখন মহারাজ বহিখানা উল্‌টাইয়া দিলেন এবং shock দিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ঠিক যন্ত্রে respond করিয়া গেল। জগদীশবাবু পুলকিত হইয়া গেলেন এবং বলিলেন, মহারাজ, আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম। Lord Elgin কে আমি বুঝাইতে পারি নাই; আমার এম্-এ ক্লাসের ছাত্রবর্গও বুঝিতে পারে না। আপনি আমাকে অবাক করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।"

উপস্থিত সকলে রাধাকিশোরের নিরভিমানিতায় যেমন চমৎকৃত হইলেন, অপরদিকে ইংরেজী অনভিজ্ঞ মহারাজের তীক্ষ্নবুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং প্রবল ধারণা- শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন । ত্রিপুরার গৌরববৃদ্ধিকল্পে রবীন্দ্রসুহৃদ রাধাকিশোরের আর এক বিজয় সন্দেহ নাই।

বাস্তবিক পক্ষে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার প্রতি একদিকে যেমন রাধাকিশোরের মন আকৃষ্ট অন্যদিকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ তাঁহার মন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ভারতীয়

সত্য-প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে নিজের দ্বারা সম্ভবপর যাহা করণীয় তাহা অনুসরণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। জগদীশচন্দ্র তখনও বিদেশ যাত্রা করেন নাই, রাধাকিশোর কবিকে লিখিলেন.....

"........জগদীশবাবুর কথা আমার স্মরণে আছে। তাঁর বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বকথিত সাহায্য করিব......জগদীশবাবুর সহিত এবিষয়ে কোনও আলাপ হয় নাই। অতএব আপনার বরাবর মণিঅর্ডার করিতে ইচ্ছা করি। আর বোধ হয় ইহাই সুবিধা হইবে। .... অধ্যাপক বসুর নূতন তত্ত্বালোচনার বিষয় মহিমের প্রমুখাৎ কতক বুঝিতে পারিয়াছি। এবং তাঁর প্রেরিত একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রেও কতক আভাষ পাইয়াছি। মহিমের ভাষায় এবং তাহার ব্যাখ্যায় ইহার স্পৃহা কি পূর্ণ হয় ?........."

(১৪ বৈশাখ--১৩০৭।১০ত্রিং)

রাধাকিশোরের বিজ্ঞান-পিপাসু মন জগদীশচন্দ্রের সত্যানুসন্ধানে কতদূর আগ্রহান্বিত ও উৎসাহী! (১৩০৭) ২১শে বৈশাখের চিঠিতে মহারাজকে কবি জানাইলেন--

" .... জগদীশবাবুর সেই টাকা আমার নিকট পাঠাইলে আনন্দ সহকারে যথাস্থানে যথাসময়ে পাঠাইয়া দিব। ইতিমধ্যে দিন দুয়েকের জন্য কলিকাতা গিয়াছিলাম-- সেখানে জগদীশবাবুর সহিত অনেক আলাপ-আলোচনা হইল। তিনি সম্প্রতি বিলাতের পন্ডিতদের নিকট হইতে মহোৎসাহপূর্ণ যে সমস্ত পত্র পাইয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। তাঁহারা লিখিয়াছেন .... আপনার নূতন আবিষ্কারগুলি পরমাশ্চর্য্যজনক। ...."

দু'এক মাস পরে সম্ভবত জগদীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন----

"............ত্রিপুরার মহারাজকে আপনার সমস্ত খবরই আমি পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্য্যের সহায়তার জন্য তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।--"

উল্লিখিত বিলাত যাত্রা সময়ে কবির মানসিক অবস্থা আমরা জানিতে পারি জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাঞ্জলি ভাষণ (১৩৪৪) হইতে। ....

"------------তারপর আচার্য্য তাঁর পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব ও সহধর্ম্মিণীকে নিয়ে সমুদ্রপারের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হলেন। স্বদেশের প্রতিভা বিদেশের প্রতিভাশালীদের কাছ থেকে গৌরব লাভ করবে, এই আগ্রহে দিনরাত্রি আমার হৃদয় ছিল উৎফুল্ল। এই সময় যখন জানতে পারলুম যাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয়নি, তখন আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে। সাধনার আয়োজনে অর্থাভাবের শোচনীয়তা যে কত কঠোর, সে কথা দুঃসহভাবেই তখন আমার জানা ছিল। জগদীশের জয়যাত্রায় এই অভাব লেশমাত্রও পাছে বিঘ্ন ঘটায়, এই উদ্বেগ আমাকে আক্রমণ করলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পুরো ভাঁটা । লম্বা লম্বা ঋণের গুণ টেনে আভূমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন কর্ম্মতরী। অগত্যা সেই দুঃসময়ে আমার একজন বন্ধুর শরণ নিতে হোলো। সেই মহদাশয় ব্যক্তির ঔদার্য্য স্মরণীয় বলে জানি। সেই জন্যই এই প্রসঙ্গে তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি। তিনি ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর দেব মাণিক্য। আমার প্রতি তাঁর প্রভূত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা চিরদিন আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। ঠিক সেই সময়টাতে তাঁর পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ চলছিল। আমি তাঁকে জানালুম শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে আমি দানের প্রার্থী, সে দানের প্রয়োগ হবে পুণ্যকর্ম্মে। বিষয়টা কী শুনে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, 'জগদীশচন্দ্র

এবং তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানিনে, আমি যা দেব, সে আপনাকেই দেব, আপনি তা নিয়ে কী করবেন আমার জানবার দরকার নেই।' আমার হাতে দিলেন পনেরো হাজার টাকার চেক। সেই টাকা আমি আচার্য্যের পাথেয়ের অন্তর্গত করে দিয়েছি। সেদিন আমার অসামর্থ্যের সময় যে বন্ধুকৃত্য করতে পেরেছিলুম, সে আর এক বন্ধুর প্রসাদে।"

(চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১২৬)

বিলাতে থাকাকালে জগদীশচন্দ্র মহারাজের সহিত পত্রব্যবহার করিতেন, তাহার নিদর্শন পাই কবিকে লেখা রাধাকিশোরের পত্রে......

.........ইতিমধ্যে স্বনামখ্যাত প্রফেসার শ্রীযুক্ত জগদীশবাবুর দুইখানা পত্র পাইয়াছি। তাঁহার আবিষ্কার চমৎকার। 'জড়ের অনুভবশক্তি'। তাঁহার বক্তৃতা ইলেকট্রিসিয়ানে দেখিয়াছি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।" (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ ত্রিং)

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি যে বহু চেষ্টা করিয়াও জগদীশচন্দ্রের মহারাজকে লেখা একখানা পত্রও সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। বলিতে কি, কবি মহারাজকে যেসমস্ত মূল্যবান পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও যেখানে সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে মহারাজের মৃত্যুর পর। কিন্তু এই পত্রসম্পদ তিনি লেবেল আঁটিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেন, তাহার নিদর্শনও পাইয়াছি।

বিলাতে বিজ্ঞানী সমাজে নব-আবিষ্কারকে স্বীকার করাইতে জগদীশচন্দ্রের বিশেষ আয়াস গ্রহণ করিতে হয়। অবস্থানুযায়ী সরকারী কাজ হইতে ছুটির মেয়াদও ফুরাইয়া আসিতেছে। জগদীশচন্দ্র যে ইহাতেও অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন--- সন্দেহ নাই। কিন্তু কবি অনবরত তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া পত্র ব্যবহার করেন, আচার্য্যের আরব্ধ কাজে যাহাতে আর্থিক চিন্তা অন্তরায় না হয়-- তাহার ভারও তিনি গ্রহণ করিবেন জানাইলেন।

ইহার পর কবি আরও জানান যে ত্রিপুরার মহারাজ একটি কর্ম্মচারী পাঠাইয়া জানাইয়াছেন--- জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিতে চাহিতেছেন। মহারাজের সহিত আলোচনার বিবরণ বিস্তারিত জানা না গেলেও রবীন্দ্রনাথ মহিম ঠাকুরকে 'জগদীশবাবুর সেই টাকাটা সুরেনকে ১৯নং ষ্টোর রোড্ বালিগঞ্জের ঠিকানায় অবিলম্বে পাঠাইয়া দিয়ো' বলিয়া জানান। ইহার চারদিন বাদেই জগদীশচন্দ্রকে জানান (৫ অগ্রহায়ণ, ১৩০৭)--

" ত্রিপুরার মহারাজ এখন কলকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কিরকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বল্‌ব। বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে শ্রদ্ধা করেন এতেই তিনি বিশেষরূপে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেছেন। আজ তোমার চিঠি নিয়ে তাঁর ওখানে যাব-- তিনি খুব খুসি হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন। কোনরূপে তোমাকে সহায়তা করবার জন্যে তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন। -"

চিঠিখানা শেষ করিবার পূর্ব্বেই মহারাজের নিকট হইতে ফিরিয়া লেখেন---

"মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম---তাঁকে তোমার চিঠি শোনালুম----তিনি ভারি খুসি হলেন-। আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সকলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে ? কাজ করে তুমি সামান্য টাকা পাও সেটা যদি আমরা পুরিয়ে দিতে না পারি

তাহলে আমাদের ধিক্। কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তুতি কি গ্রহণ করবে? পায়ে বন্ধন জড়িয়ে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন ? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি সেটা সাধন আমাদের পক্ষে যে দুরূহ হবে তা আমি মনে করি নে। তুমি কি বল?"

(চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৬-১৭ পৃঃ)

জগদীশচন্দ্রের নিরঙ্কুশ গবেষণা চালাইবার কথাই রবীন্দ্রনাথের মনে তখন বিশেষ ক্রিয়া করিতেছে। বিলাতে তাঁহার আবিষ্কার স্বীকারে বাধা বিপত্তি - দেশে সরকারী চাকুরীতেও লাঞ্ছনা নানারূপে কবির মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছে। রাধাকিশোর আচার্য্যকে সহায়তা করিবার জন্য ব্যগ্র ইহা কবিকে যে কতদূর উৎসাহিত করিয়াছে-বলিবার নয়। পরের চিঠিতেই তিনি জগদীশচন্দ্রের কাছে জানিতে চান পাঁচ ছয় বৎসর সেখানে থাকিলে কি পরিমাণ সাহায্যের দরকার । 'লেশমাত্র সঙ্কোচ' যেন না করেন জানাইতে। বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি যদি তিনি নেন তাহার জন্য সাহায্য কত পরিমাণ দেওয়া দরকার-তাহার ব্যবস্থাও করিতে পারিবেন বলিয়াই কবি লিখিলেন! রবীন্দ্রনাথের এই পরামর্শের পিছনে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানী সমাজে প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ না হয় এই চিন্তাই প্রবল। তাঁহার ভাষায় "য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো-তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না।"

এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের মনের অবস্থা পরপর কয়েকখানি পত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁহাকে মহারাজের কাছে আসা যাওয়া করিতে হয়। ইহা পারিষদবর্গের ক্ষুদ্র মনে ভাল লাগিতেছেনা --ইহাকে মর্য্যাদা দেওয়ার মত মনোবৃত্তি যে তাহাদের নাই--সকলকেই যে তাহারা সন্দেহের চক্ষে দেখে- তাহা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মহাপ্রাণ ও লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সহজে ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক সঙ্কোচ ও অভিমানকে জগদীশচন্দ্রের জন্য বিসর্জ্জন দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। তাই মহারাজকে বিস্তারিত লিখিলেন--

"...জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে । তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চেব দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনা দোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত না থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্ব্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্য্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক- এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত। --আমি মহারাজের নির্জ্জন খাস দরবারের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশী-- আমি মহারাজের প্রতি নিতান্তই উপদ্রব করিব, মন্ত্রীবর্গ দ্বারা আমি প্রতিহত হইব না । মহারাজের পরিচরবর্গ নানা কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সঙ্কুচিত করিবে, কিন্তু আমি তাহা শিরোধার্য্য করিব।

মহারাজের নিকট পূর্ব্ব হইতেই আমার এই নিবেদন রহিল। মহারাজের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই আমি অকুণ্ঠিতভাবে সকল কথা বলিলাম। যদি ধৃষ্টতা হইয়া থাকে তবে মার্জ্জনা করিবেন। এবং আমাকে ব্যক্তিগত হিসাবে মার্জ্জনা করিয়া আমার একান্ত আন্তরিক মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি রক্ষা করিবেন।" ২৪শে শ্রাবণ, ১৩০৮(বিশ্বভারতী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩৪৯)

বঙ্গদর্শন পত্রিকার সাহায্য ও জগদীশচন্দ্রের জন্য অর্থানুকূল্যে মহারাজের পরিচয়বর্গের স্বার্থাভিসন্ধির কল্পনা সত্ত্বেও কবি মহারাজকে উপরোক্ত চিঠি লিখিয়া, মহারাজের পরিচয়-প্রধান ও কবির বন্ধু মহিম ঠাকুরকেও জানাইলেন---

"... জগদীশবাবুর কার্য্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত, ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব- ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য্য নহে, স্বদেশের কার্য্য। সুতরাং ভিক্ষুভাবেই আমি এবার অসঙ্কোচে মহারাজের দ্বারে দাঁড়াইব। আমি ধনীর পুত্র ধনী নহি অন্তরে ঈশ্বর যে সকল শুভ সঙ্কল্প প্রেরণ করেন তাহা সাধনের ক্ষমতা আমার হাতে দেন নাই- সুতরাং শুভকর্ম্মের অন্তরায় স্বরূপ সমস্ত অভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। জগদীশবাবুর জন্য তাহাই দিব। তাহার পরে যদি পারি তবে সংসারের সমস্ত স্তুতিনিন্দা হইতে নিজকে দূরে লইয়া গিয়া শান্তচিত্তে স্বচেষ্টায় নিজের কর্ত্তব্য পালন করিব।"

(পূর্ব্বাশা রবীন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা)

পত্রখানিতে তারিখ না থাকিলেও পূজার সময়ে যে আগরতলা যাওয়ার কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কার্ত্তিকে কবি আগরতলায় আসিয়া জগদীশচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন তাহাই এখন আমরা আলোচনা করিব। কবি আগরতলায় আসিলেন বটে কিন্তু মানসিক দ্বিধা তাঁহার মনকে উদ্বেলিত করিতেছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। রাধাকিশোরের স্বাভাবিক ঔদার্য্যে সাদর আপ্যায়ন কবি চিত্তকে দৃঢ়রূপে আকর্ষণ করিয়াছিল। চিঠিতে তাঁহার মানসিক উদ্বেগের কোন লক্ষণই পাওয়া যায়না, অপর পক্ষে ছত্রে ছত্রে রাধাকিশোরের প্রতি সহৃদয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জগদীশচন্দ্রকে তাঁহার আরদ্ধ কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিবার জন্য উৎসাহ জ্ঞাপন করিলেন। সাহায্যাদির কথা বিস্তারিত লিখিয়া- 'মহারাজ তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন'--বলিয়া রাধাকিশোরের চরিত্রকে আরো মহনীয় করিয়া পত্র শেষ করিয়াছেন। আমরা চিঠিখানা উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক কবি-মনের সহিত পরিচিত হইবেন সহজে।

ওঁ

আগরতলা

কার্ত্তিক ১৩০৮

"বন্ধু,

আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েকদিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা ত জানই--সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার টাকা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে

পারিবে। প্রাসাদ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুব্যয়সাধ্য কার্য্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়তররূপে আকর্ষণ করিয়াছেন- স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই। তুমি অবসাদ হইতে নিজকে রক্ষা কর। ফল লাভ করিতে তোমার যতই বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক প্রীতি সর্বদাই ধৈর্য্য সহকারে তোমার পার্শ্বচর হইয়া থাকিবে। তোমাকে আমরা লেশমাত্র তাঁড়া দিতেছিনা; যাহাতে কর্ম্মসম্পূর্ণ করিবার জন্য তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি — আমাদের প্রতি সেই আস্থা তুমি দৃঢ় রাখিও। তোমার কাছে আমরা আরও কত দাবি করিব; তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্যই যদি আমরা কৃতজ্ঞ না হইতে পারি তবে আমাদিগকে ধিক্। তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার প্রতিদান কিছুই দিতে পারিনা। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কী? এইটুকু দিয়া তোমার উপরে দাবী চালাইতে পারিনা। তোমাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতি ছাড়া আর কিছুই দিই নাই জানিবে, সে প্রীতি ধৈর্য্য ধরিতে জানে এবং প্রীতি ছাড়া আর কিছুই ফিরিয়া চাহেনা। মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয় জানিয়ো তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করেন নাই, তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উদ্যম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন।

তোমার রবি ''

(চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪০ ৪১ পৃঃ)

কয়েকমাস পরের চিঠি ---''আজ তোমার জয় সংবাদ পাইয়া নবমেঘ-গর্জ্জন পুলকিত ময়ূরের মত আমার হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মাতাল মদের বোতলের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন পান করে তোমার চিঠির ভিতর হইতে আমি সমস্ত মত্ততাটুকু একেবারে উপুর করিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।--'' কবি তাঁহার অন্তরের আনন্দের অভিনব রূপকে লেখনী রেখায় রূপায়িত করিয়া ধরিতেছেন। দূর হইতে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া যেন কবির মনে লাগিতেছে না। তাই 'আমাদের আশ্রমবৃক্ষ হইতে কালিদাসের শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম' ---বলিয়া পত্র শেষ করিলেন।

দুঃখের বিষয় জগদীশচন্দ্রের জয়বার্ত্তা রাধাকিশোরের মনে কিভাবে সাড়া দিয়াছিল তাহা আমাদের ধরিবার উপায় নাই। কারণ এই সময় হইতে কবি অথবা মহারাজের কাহারও লেখা পত্রাদি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে দেশে ফিরিলে কবি-রাধাকিশোর--জগদীশচন্দ্রের স্বাক্ষাৎকার এক অভিনব রূপ পাইয়াছিল, যাহা আমাদের কল্পনাকে মাতাইয়া তোলে।

কবি বহুদিন পূর্বেকার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন ১৩৩২ সনে ---''অধিকাংশ মানুষেরই যতটুকু গোচর তার বেশী আর ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম। আমি গর্ব্ব করি এই যে, প্রমাণের পূর্ব্বেই আমার অনুমান সত্য হয়েছিল।'' কিন্তু রাধাকিশোরের উক্তি না পাওয়ায় আমাদের এই প্রসঙ্গের আলোচনা অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল।

বিদেশে থাকা কালে জগদীশচন্দ্রের মনের নানা দ্বন্দ্ব কবির নিকট যাহা পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃতি বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কর্ম্মজীবনে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বহু বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে এবং বিদেশে তাঁহার গবেষণালব্ধ সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেও প্রভূত বেগ পাইতে হইয়াছে। এই সময়ে জগদীশচন্দ্রের উদ্বিগ্ন চিত্তের রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথকে লেখা বহু পত্রে।---

"------আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না যে, কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে থিওরি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহার অর্দ্ধ পরিস্ফুটিত প্রতি কথায় কি আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এখন সব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি যে, ঘোর অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে। যেদিকে দেখি, সেই দিকেই অনন্ত আলোক-রেখা। জন্মজন্মান্তরেও আমি ইহা শেষ করিতে পারিব না।"

* * * *

"তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসন পরিহিতা মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সে-সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে।"

* * * *

"আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে।"

* * * *

"জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না,--- ---জীবন অনিত্য বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে হইতেছে।"

* * * *

"আমি কেবল এক কাজ বুঝি, আর বাকী সব তোমরা আমার হইয়া কর। আমি এমনভাবে আবিষ্ট হইয়া আছি।-----এই দেখ, এইমাত্র একটি আশ্চর্য্য Experiment করিয়া আসিলাম, জন্তু এবং অ-জীবের মধ্যে ভয়ানক মস্ত একটা ব্যবধান, তাই সেতু বাঁধিবার জন্য উদ্ভিদের জীবন - স্পন্দন-রেখা আছে কিনা তার চেষ্টা করিতেছিলাম। এইমাত্র অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষার ফল পাইলাম--এক! এক! সব এক!---- বন্ধু, আমি শত জীবনে ইহার চিন্তা করিতে পারিব না--- আমি সব দেখিতেছি--কেবল সময়াভাব।"

বিজ্ঞানী, দেশপ্রেমিক ও সুহৃদ্‌বৎসল জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরিলেন বিদেশ হইতে জয়মাল্য লইয়া। বিলাতে অবস্থানকালেই উদ্ভিদের জীবন-স্পন্দন নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। দেশে নানা পত্র পত্রিকায় অধ্যাপক বসুর আবিষ্কার বিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছিল। দেশে ফিরিয়া উদ্ভিদ -বিষয়কগবেষণায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিছুকাল মধ্যেই উদ্ভিদের বর্দ্ধন পরিমাপের যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া গভীরভাবে এই তত্ত্ব আলোচনা করিতেছিলেন। উপযুক্ত গাছ কলিকাতায় পাওয়া না-গেলে অধ্যাপক বসুর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ মহারাজকে লিখিলেন--

"ত্রিপুরায় যে মুলীবাঁশ জন্মে --শিশু অবস্থায় তাহার বৃদ্ধি অতিশয় দ্রুত। এই গাছের চারা তাঁহার পরীক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক হইয়াছে। সদ্য অঙ্কুরিত মুলীবাঁশের চারা মহারাজ যদি সত্বর

তাঁহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া দেন তবে তাঁহার বিশেষ উপকার হইবে। পথের মধ্যে অঙ্কুরাগ্র দলিত হইয়া গাছগুলি মরিয়া না যায় সেজন্য প্যাকবাক্‌সে শিকড় সমেত গাছগুলি মাটিতে বসাইয়া তাহার উপরে খাঁচার আবরণ দেওয়া আবশ্যক হইবে। আপাততঃ প্রায় ২০।২৫টি গাছ তাঁহার প্রয়োজন হইবে। পরীক্ষার উপদ্রবে এ গাছগুলি মারা গেলে অন্য তাজা গাছের পুনশ্চ প্রয়োজন হইবে-তখন মহারাজ পুনর্ব্বার আদেশ করিয়া দিবেন। কলিকাতার নিকটে এই গাছের সন্ধান করিয়া না পাওয়াতে তাঁহার পরীক্ষা অসমাপ্ত হইয়া আছে।"

(২রা আষাঢ়, ১৩১২)

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ অনুযায়ী যে চারাগাছগুলি যথাযথভাবে প্রেরিত হইয়াছিল ইহা বলাই বাহুল্য এবং আচার্য্যের পরীক্ষাও সফলতা লাভ করিয়াছিল। বিজ্ঞানীকে সহায়তার আর একটি সুযোগ রবীন্দ্রনাথ এইভাবে সৃষ্টি করিয়া আচার্য্য বসু ও মহারাজকে আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া দিলেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ১৯১৮ সনে যখন 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন তাহার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বেই মহারাজ রাধাকিশোর অমরলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। এই সংবাদ যখন জগদীশচন্দ্রের কাছে পৌছে--তখন তিনি আমেরিকার বিজ্ঞসমাজে তাঁহার আবিষ্কারবাণী পৌছাইতেছিলেন। সেখানেও তিনি রাধাকিশোরের নীরবদান তাঁহার গবেষণাকে কিভাবে অগ্রসর হইতে মুখ্যভাবে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা প্রচার করেন।

'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা সময়ে যে ভাষণ আচার্য্য দিয়াছিলেন তাহা রাধাকিশোরের প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ। ভাষণের বিবরণী ১৯১৮ সনের ১২ই মার্চ্চ তারিখের Englishman পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহা মহিম ঠাকুর তাঁহার 'ত্রিপুরা-দরবারে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে সঙ্কলন করিয়া বঙ্গানুবাদও দিয়াছেন। তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি---

"---আচার্য্য বসু তখন জড়জগতে অনুভূতির স্পন্দন বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিতেছিলেন এবং তাঁহার এই চিন্তাধারা যখন নানাভাবে তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, তখন একদিন ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর বিজ্ঞানাচার্য্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ মাতৃভাষায় যেমন কৃতবিদ্য ছিলেন, তেমন ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞাতসার ছিলেন না। বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত শিক্ষার মাপকাঠিতে তাঁহার বিদ্যাবত্তার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু ইহা খাঁটি সত্য যে তাঁহার ইংরেজী ভাষার অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বসু মহাশয়ের ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মর্ম্মকোষে প্রবেশ করিতে তাঁহার তিলমাত্র বিলম্ব হয় নাই; কেন না, বসু মহাশয়কে তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধারা সম্পর্কে মহারাজ এরূপ সব সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা পরিচায়ক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে, সেই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর জোগাইতে আচার্য্যের মত মনীষীকেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

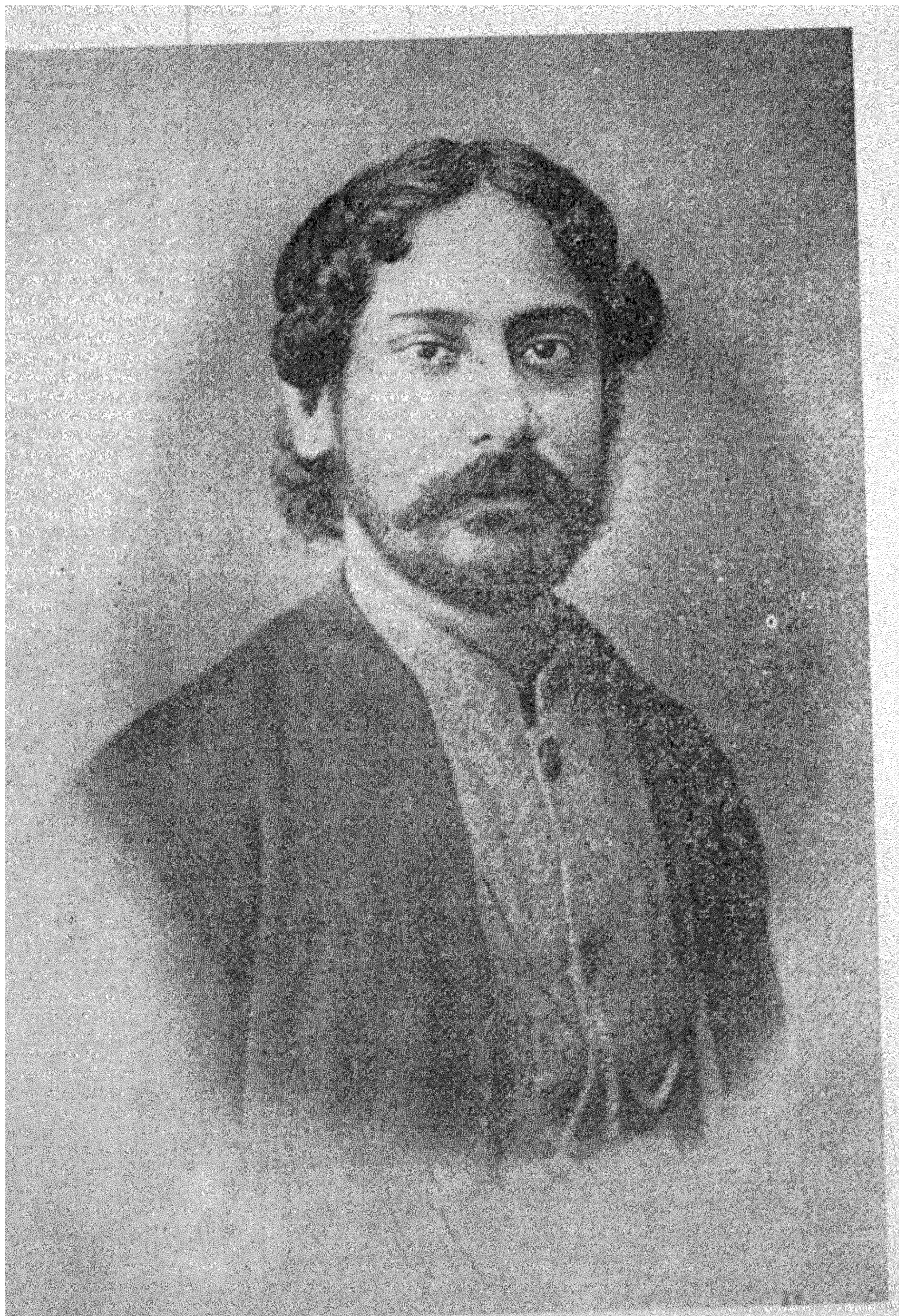
"উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে যে, আকবর বাদশাহ শিক্ষিত কি নিরেট মূর্খ ছিলেন এবং বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈঠক মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার ব্যবস্থা করিবেন কি না। ভারত-গভর্ণমেন্ট অধ্যাপক বসুকে দ্বিতীয়বারের জন্য পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার নূতন আবিষ্কার বাণী প্রচারকল্পে প্রেরণ করেন এবং তিনিও রয়েল সোসাইটিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহার

আবিষ্কার সপ্রমাণ করেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার গবেষণা জগতের বিজ্ঞানসমাজে প্রকাশিত করিবার সুযোগ হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তখন তাঁহার উভয় সঙ্কট। একদিকে তাঁহার কলেজের ছুটি শেষ হইয়া আসিতেছিল, অন্যদিকে যদি বিফল মনোরথ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন, তবে অপমানের একশেষ। অথবা বিলাতে থাকিয়া যদি নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিকের মনে ইহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ খুঁজেন, তবে চাকুরীর দায় ঘটার সম্ভাবনা ছিল। জীবনব্যাপী সাধনার এই সন্ধিস্থলে তিনি মহারাজ রাধাকিশোর হইতে উৎসাহ সূচক গভীর আশ্বাস এবং বিলাতে থাকিয়া গবেষণা প্রচারের জন্য বিপুল অর্থ সাহায্য পাইলেন। এরূপ অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তা এবং সাহায্যে আচার্য্য বসু পাশ্চাত্য দেশে আরও কিছুকাল বাস করিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে অনেক সহৃদয় বন্ধুলাভ করিলেন এবং তাঁহাদের সত্যপ্রিয়তার ফলে অবশেষে তাঁহার আবিষ্কার গৃহীত ও অনুমোদিত হইল। মহারাজের ঐকান্তিক অনুরোধ ছিল, এ সম্পর্কে তাঁহার নাম যেন ঘূণাক্ষরেও প্রকাশিত না হয়। কিন্তু মহারাজ এখন পরলোকে এবং সেই সন্ধিক্ষণে যাঁহার বন্ধুতা তাঁহার পার্শ্বে শক্তি স্তম্ভরূপে দাঁড়াইয়াছিল এক্ষণে তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার এ সুযোগ গ্রহণ করার কোন বাধা নাই।"**

**Extract Copy of the Report of
The Englishman-12th March, 1918.

"When his first experiment brought vividly before him the universal sensitiveness of matter and the outcome of this generalisation in different realms of thought, he had a visit from late Maharaja of Tipperah Radhakishore Manikya. The Maharaja was a great scholar in the Vernacular, though he was totally unacquainted with English language. According to the prevailing standard, the cultural value of his acquirements would be questioned.But the Maharaja's ignorance of English did not stand in the way of his instantly realising the significance of the lecturer's experiments. Indeed his own mind was put to its fullest activity in answering the Maharaja's most intelligent questionings as regards the trend of his work in clearing up many difficult problems. The reference to this subject may be opportune in view of the controversy whether the Great Akbar was literate or illiterate and whether the University Commission should recommend the Vernacular language as suitable vehicle for scientific instruction. The Government of India sent him on his second scientific deputation to the West to announce his discovery and he experimentally demonstrated before the meeting of Royal Society the sensitiveness of ordinary plants. The discovery was refused publication to reach the scientific world. The period of his deputation was then nearing its end, he had to make his choice of returning to India discredited or overstay in England risking his appointment or the chance of convincing some unbiased scientific men. While in this dilemma he received a communication from the Maharaja assuring him of his firm belief and also a large remittance towards the possibility of continuation of his researches. He was thus enabled to prolong his stay and thus secure many true friends among scientific men in England who stood for fair play, resulting finally in the acceptance of his work. It was the special request of the late Maharaja that he wished to remain unknown in this connection. He has now passed away and it is permissible to speak now of one who stood by him at a time when such friendship was most needed."

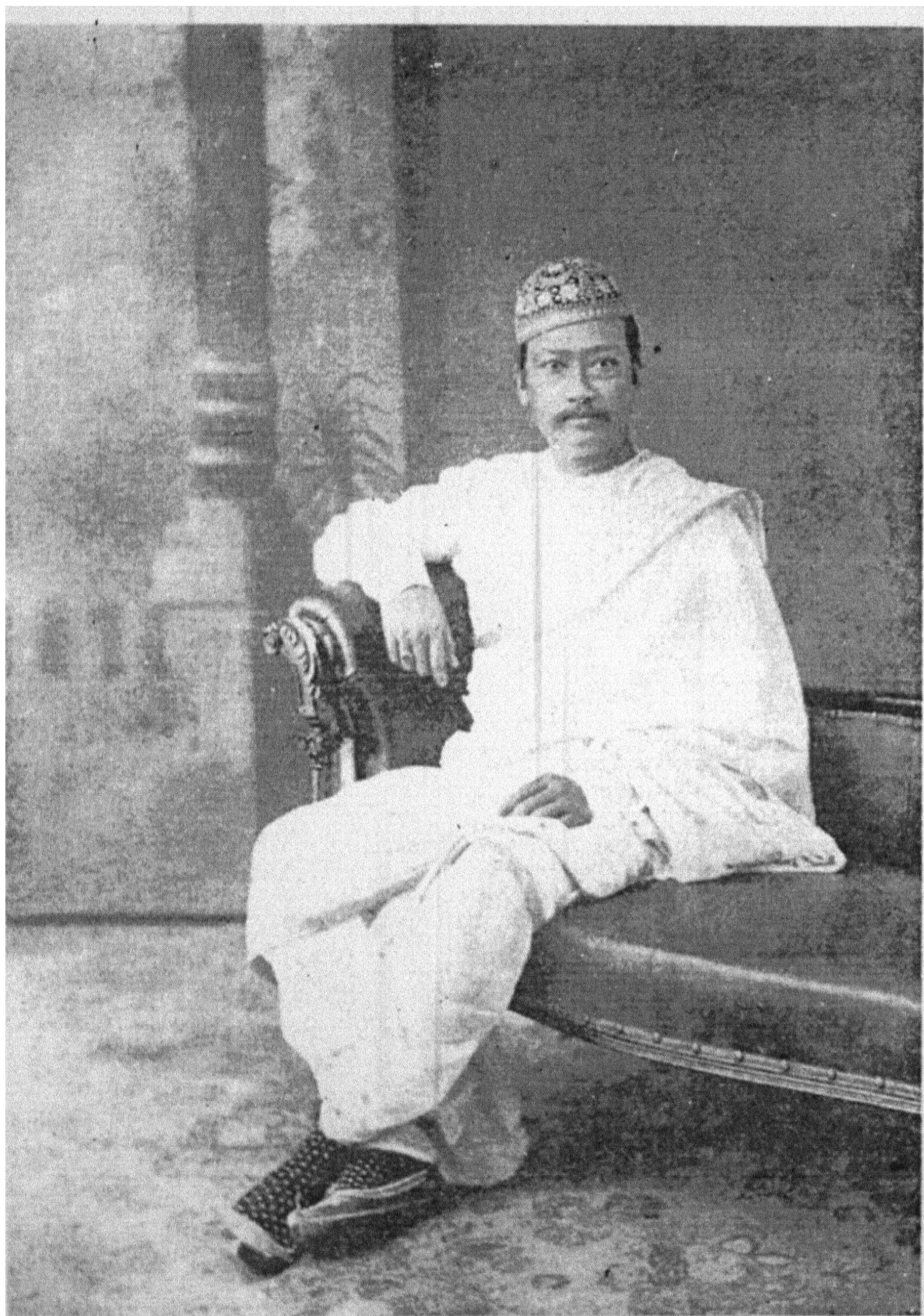
(দেশীয় রাজ্য, ২১৯-২২৩ পৃঃ)



২। কার্সিয়াং এ রবীন্দ্রনাথ (১৩০৩)



৩। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য

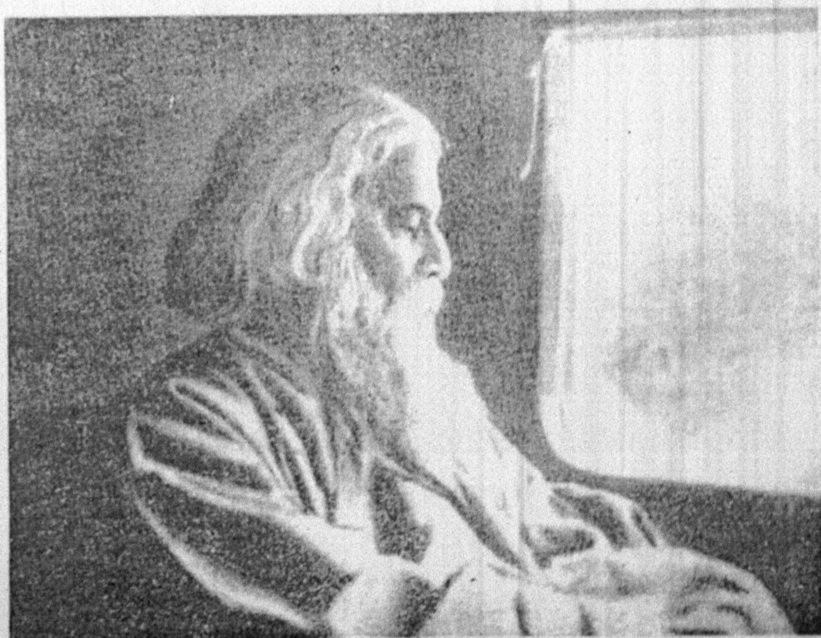


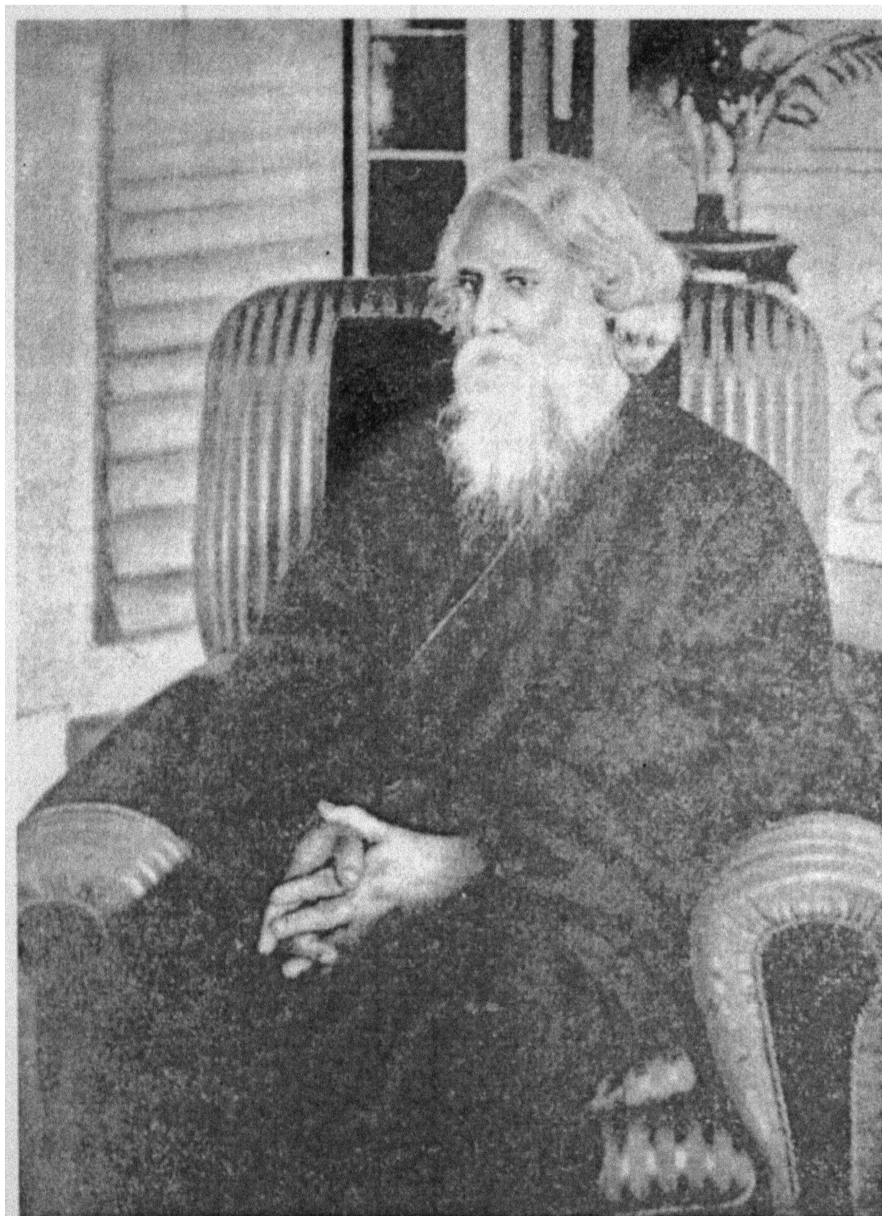
৪। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য



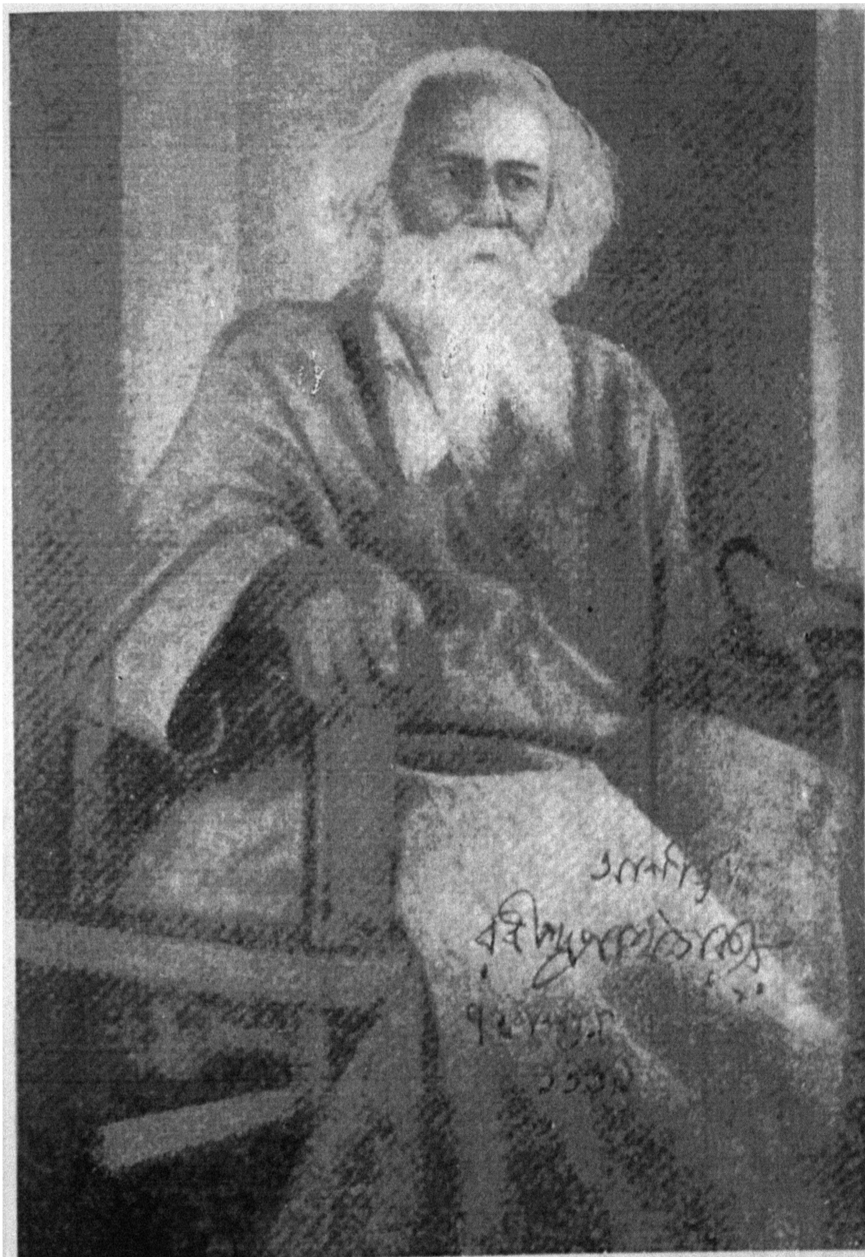
৫। কবির একটি বিস্মৃত আলেখ্য

৬। ট্রেনের কামরায় — রোম (১৯২৬)

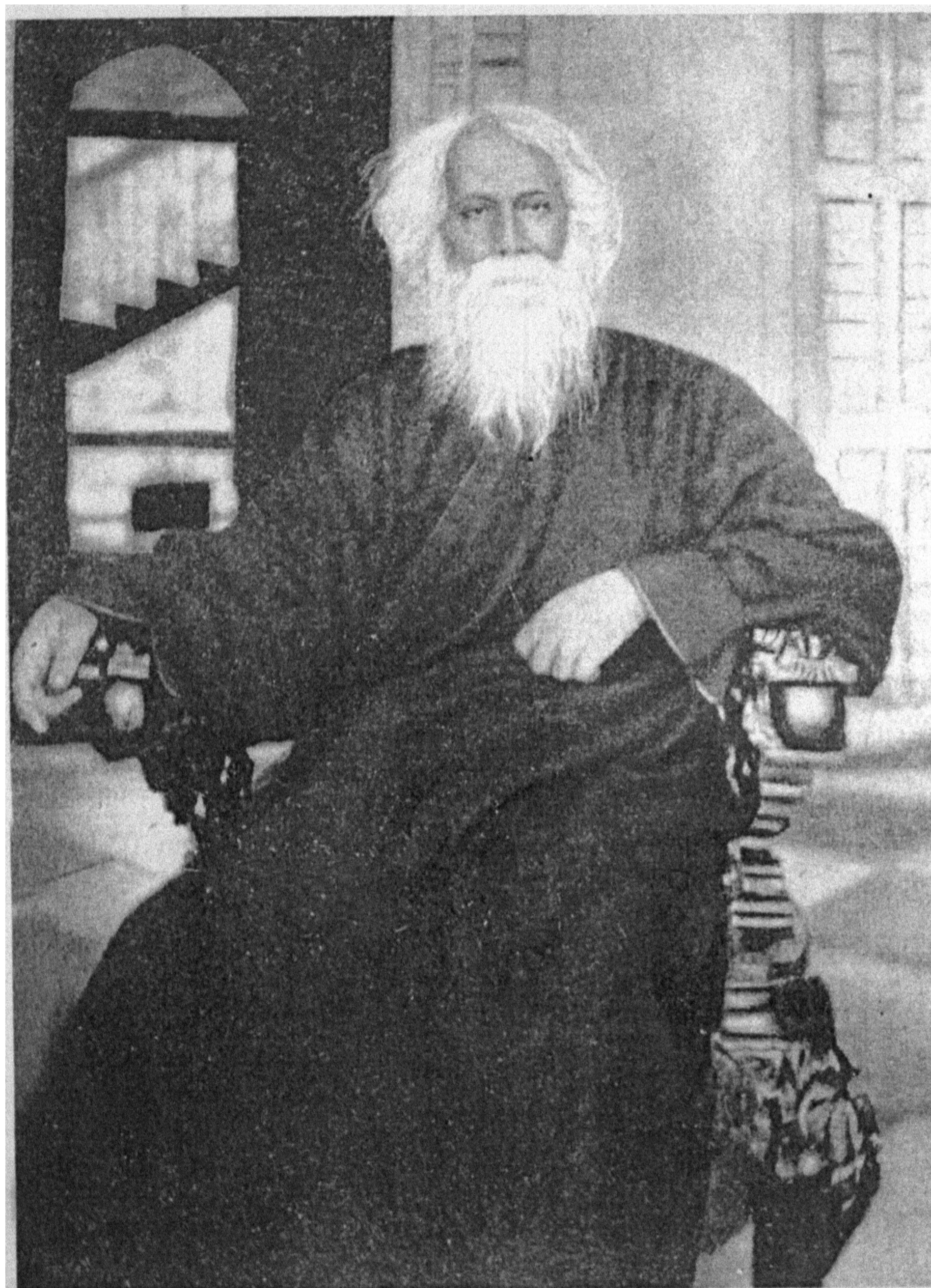




৭। আগরতলা শেষবারে (কুঞ্জবন প্রাসাদ)



৮। স্বাক্ষরিত আলোকচিত্র



৯। কুঞ্জবন প্রাসাদের হল-ঘরে (১৩৩২)

জগদীশচন্দ্রের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি রাধাকিশোরের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়াছিল। রাধাকিশোরের কল্যাণজনক কর্ম্মাবলী রাজ্যের যৎসামান্য আয়ে সঙ্কুলান হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। সেইজন্য ভারত গভর্ণমেন্টের যোগে ব্যাঙ্ক হইতে তিনি ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অবস্থার মধ্যেও আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় অর্থানুকূল্য - দেশমাতৃকার সেবার অংশ বলিয়াই তাঁহার কাছে প্রতিভাত হওয়ায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তিনি তাঁহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ঋণ গ্রহণ করিবেন মহারাজ রাধাকিশোর কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অবধি নাই। এই সময়ে কবির লেখা কয়েকখানি দীর্ঘ পত্র আমরা সংগ্রহ করিয়াছি ও দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই পত্রাবলীর মধ্যে রবীন্দ্র মানসের পরিচয় নূতন ধরনের। রবীন্দ্রনাথ কবি -- আমরা তাঁহার কল্পনারাজ্যে ঘোরাফিরার কথাই ভাবি, আনুষঙ্গিক দেশাত্মবোধের কথাও ভাবি। কিন্তু এই ঋণ গ্রহণ বিষয়ে যে সব কথার অবতারণা হইয়াছে, তাহাতে রাজনীতিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ, অর্থনীতিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ, রাজ্যপরিচালন-অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ ও লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের পূর্ণপরিচয় পাইয়া অবাক হইয়া ভাবি, একাধারে এই সমন্বয়ে ভগবানের কি অপরিসীম করুণার দান।

একদিকে কবির সৎচিন্তা প্রসূত কল্যাণকর ধী ও শক্তি, আরেকদিকে তাহাই রূপায়িত করিতে স্থির চিত্তে রাজার নীরব কর্ম্ম যোজনা ও দান।

"---মহারাজের রাজ্যে ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইবে ঈশ্বর ইহা ব্রত স্বরূপ আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন তাহা আমি অনুভব করিতেছি,"--ইহাই রবীন্দ্রনাথের মূল কথা, যাহা রাধাকিশোরকে নানাভাবে প্রকাশ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কানে গিয়াছে যে ব্যাঙ্ক অফ্ বেঙ্গল হইতে ঋণ পাওয়া যাইবে না বলিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা উদ্দেশ্য প্রসূত বলিয়াই কবি মনে করেন। মহারাজকে সহায়তা করিবার জন্য রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়-- কবির আত্মীয়কে নিয়োগ করার কথা চলিতেছে। কবির অভিপ্রায় "------রমণীকে না হউক কোনো একজন দৃঢ়চিত্ত যোগ্যলোককে মন্ত্রীপদে রাখিতেই হইবে।" কারণ---

> "যদি ঋণ গ্রহণের জন্য মহারাজকে গভর্ণমেন্টের সর্ত্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেই হয় তবে জমিদারী শাসনের জন্য গভর্ণমেন্টের লোককে অগত্যা গ্রহণ করিয়া মহারাজের নিজের নির্ব্বাচিত একজন সুদক্ষ লোককে মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন--দুইয়েতে মিশাইবেন না।
>
> "ইহা অনুভব করিতেছি একটা জাল বয়ন হইতেছে --লেশমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া মহারাজ মনস্থির করুন--দ্বিধামাত্র করিবেন না--এই জাল ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করুন। যতই বিলম্ব হইবে ততই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন।"

চিঠিখানার উপরে "ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন"---উল্লেখ আছে, কোনও তারিখ নাই। কিন্তু অধ্যাপক বসুর গবেষণা কার্য্যে এখানকার মুলীবাঁশের চারা প্রেরণের বিষয়ক চিঠিতে (২রা আষাঢ়, ১৩১২) কবি উল্লেখ করিয়াছেন---"মহারাজকে গত পরশু একখানি রেজেষ্ট্রি পত্রে কাজের কথা লিখিয়াছি বোধ করি পাইয়া থাকিবেন।" ইহা হইতেই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে এই চিঠি জ্যৈষ্ঠের শেষ তারিখে লেখা।

ঈশ্বরানুভূতিতে আপ্লুত কবির মন। অথচ নিজেদের 'বৈষয়িক সমস্ত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও মহারাজের রাজ্যের চিন্তা' তাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতেছে না। বলিতেছেন---"কেবল মহারাজকে নহে, আমার নিজকে উদ্বেগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমাকে মহারাজের কর্ম্মে চিত্ত নিয়োগ করিতে হইবে। ত্রিপুরার ইতিহাসে আমার পিতামহের যে যোগ ছিল সেই যোগ আমাকেও রক্ষা করিতে হইবে বিধাতার এই অভিপ্রায় বশতই অকস্মাৎ স্বর্গীয় মহারাজ বিনা পরিচয়েই আমাকে ত্রিপুরার সহিত আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।" (২৮শে আষাঢ়, ১৩১২)।

'ত্রিপুরা সাহিত্য সভা'য় পৌরোহিত্য করিবার জন্য কবি আগরতলায় আসেন এবং "দেশীয় রাজ্য" প্রবন্ধটি পাঠ করেন--১৭ই আষাঢ়। ফিরিবার মুখে সম্ভবতঃ একখানা পত্র উপরোক্ত পত্রের পূর্ব্বেই 'জাহাজে বসিয়া মহারাজকে পত্র লিখিতেছি' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। ঋণ গ্রহণ বিষয়ে যে সব লোক গভর্ণমেন্টের সহিত মহারাজের পক্ষে আলোচনা করিতেছেন---'মহারাজের সহিত তাহাদের অভিপ্রায়ের পার্থক্য থাকাতে সমস্তই পন্ড হইতেছে---কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মহারাজকে বিরক্তি ভাজন করা হইতেছে'---ইহাও কবি স্পষ্টই অনুভব করিতেছিলেন। কাজেই ইহাদের উপর ভার না দেওয়ার জন্যই তিনি বলিতেছেন। অধিকন্তু--'নানাদিক বিচার করিয়া মহারাজকে কাজ করিতে হয়......ইচ্ছা হইলেও তাহাকে সত্বর কার্য্যে পরিণত করা রাজনীতিতে সম্ভবপর নহে'---ইহাও উল্লেখ করিতে কবি ভুলিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের বিচার বিশ্লেষণ রাধাকিশোরের মনে কিভাবে প্রতিফলিত হইতেছে তাহার নিদর্শন আমাদের হাতে না থাকিলেও কবির সহিত আলাপ আলোচনায় তাঁহারই পরামর্শ যে মঙ্গলকর তাহা পরবর্ত্তী পত্রাদি হইতে অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়।

রমণীবাবুকে নিয়োগ করা একরকম ঠিক। রাজনৈতিক ও স্বার্থপ্রণোদিত চক্রান্তে মহারাজ যাহাতে জড়িত হইয়া অপদস্থ না হন, কবি তাহারই ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত। রমণীবাবুকে দুই বৎসরের ছুটি লইয়া মহারাজের কাজে যোগদান করিবার ব্যবস্থা তিনি করিতেছেন। রমণীবাবুর নিয়োগের পূর্ব্বে ঋণ সংগ্রহের কাজ স্থগিত রাখিলেই ভাল হয়--তাহাও জানাইতে কবি দ্বিধা করিলেন না। পূর্ব্বেই তিনি জানাইয়াছেন---

> "প্রকৃত কথা মহারাজের এমন একজন লোক চাই, যাহাকে স্বার্থপর লোকেরা ভয় মৈত্রের দ্বারা স্বপক্ষে আনিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই একমাত্র মহারাজের পক্ষে থাকিবে। এই সঙ্কটের সময় মহারাজকে এই উপায়েই সকল চক্রান্তজাল হইতে মুক্ত করা যাইতে পারে।"

এই জনাই রাজকর্ম্মে রমণীবাবুকে নিযুক্ত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এত পত্র ব্যবহার করিতেছেন। "তাঁহার বিশ্বস্ততা, দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও সহৃদয়তাগুণে মহারাজ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন এবং সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন"---ইহা কবির সুচিন্তিত অভিমত। কিন্তু ঋণ সংগ্রহ ব্যাপারে পরস্পর-বিরোধী জনশ্রুতি, বিশেষতঃ এক প্রস্তাবে ইংরেজ পরিদর্শকের হস্তে মহারাজের জমিদারী শাসন ও কতক পরিমাণের আয়ব্যয় নিয়মনের ভার অর্পিত হইবে---ইহা কবির মনে কিছুতেই খাপ খাইতেছে না। "গোড়াতেই ইংরেজের নাম শুনিয়া ভয় হয়। ঐ জাতের হস্তে নিশ্চিন্ত মনে আত্মসমর্পণ করা কোনোমতেই চলে না।

অবশ্য যদি নিতান্ত বাদ্য হইতে হয় তবে কথাই নাই।" সংস্কারবশেই হউক অথবা তাৎকালীন অবস্থার কথা চিন্তা করিয়াই হউক রবীন্দ্রনাথের মনে স্বার্থপর পরামর্শদাতাদের সম্বন্ধে আশঙ্কা হইতেছিল এবং তাহাদের কারচুপিতে মহারাজের কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করার চেষ্টা পরিস্ফুট হইতেছে বলিয়াও সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। ইহা অমূলক হইলেও 'রাজকার্য্যের বৃহৎ ব্যাপারে আনুমানিক সন্দেহও আলোচনার যোগ্য' বলিয়া এই পত্রে মন্তব্য করেন। কম পক্ষে সাত শত শব্দ সম্বলিত এই দীর্ঘ পত্রখানায় কবি রাজ্যের পরিচালন সম্বন্ধে 'সানুনয়ে' নিবেদন করিতেছেন---

> "মহারাজের রাজ্য পরিচালনার সাহায্য কার্য্যে এমন একজন অর্থনীতিজ্ঞ কর্ম্মকুশল,দূরদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, উৎসাহী লোককে নিযুক্ত করুন যাহার বুদ্ধি ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রতি মহারাজ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে পারেন। তাহার প্রতি যথার্থরূপে কর্ত্তৃত্বভার দিতে হইবে। নানা পক্ষের নানা মত নানা স্বার্থের দ্বারা রাজ্যের মঙ্গলকে প্রতিপদে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতে দিবেন না। মহারাজের হৃদয় নিতান্ত কোমল, এইজন্যই নিজের ক্ষমাগুণ হইতে নিজের ঔদার্য্য হইতে নিজকে রক্ষা করিতে একজন সুদক্ষ মন্ত্রীর সুদৃঢ় সহায়তা মহারাজের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। আমি দেখিতে পাইতেছি নানা পক্ষের নানা বিরোধ ও সংঘর্ষ মহারাজকে নিয়তই উৎপীড়িত করিতেছে, আশঙ্কা হইতেছে পাছে ক্রমশই জাল জটিল হইয়া পড়ে ও মহারাজকে কোনো প্রকার অসম্মানের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িতে হয়। পরের বন্ধনে একদিন ধরা দেওয়ার চেয়ে নিজের শাসনে নিজকে সুকঠিনভাবে বদ্ধ করা কর্ত্তব্য।" (তারিখ বিহীন ১৩১২?)

নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজ্ঞাতভাবেই আত্মপ্রকাশ হইয়া পড়ে চিঠিতে-- বিশেষতঃ বন্ধুর নিকটে। নিজের মনকে যেমন তেমনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে যেমন বাধা দেওয়া যায় না এই সব পত্র ব্যবহারে, তেমনি যাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা---তাহার চরিত্র মাধুর্য্য চিত্রিত হইয়া উঠে লেখনীমুখে। কিন্তু নিরাসক্ত অথচ বন্ধুপ্রীতিতে পরিপূর্ণ হৃদয়ে কোনও গ্লানি যদি জাগিয়া উঠে-- তাহার রূপ যদি এমনই হয় যে নিজ সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার বাহিরে অথচ কোনো বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া নানা জনশ্রুতি অপর কোনও বিশেষ বন্ধুর ব্যবহারকে কুয়াশাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে চায়---তখন অনিবার্য্য ভাবে আক্ষেপই মনকে ভরিয়া ফেলে। বন্ধু ব্যক্তির মানসিক দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থ সংঘাতের ছোট ছোট কথাগুলিও কবির মনে ত্রিপুরারাজ্যের উন্নতির পরিপন্থীভাবেই পীড়া দিতে চায়। ইহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ ও বন্ধু প্রীতিতে কোনো চিড় না ধরে তাহাই রবীন্দ্রনাথের কাম্য। তাই সমস্ত সঙ্কোচ পরিহার করিয়া মহারাজকে জানাইলেন---

> "-- -এখন আমার ঠিক কর্ম্মের সময় নহে। এখন সংসারের সমস্ত জাল গুটাইয়া লইবার জন্য মন প্রায়ই ব্যাকুল হয়। ঠিক এই সময়ে বিবিধ চক্রান্ত সঙ্কুল জটিল রাজসভার ব্যাপারে ঈশ্বর যে কেন আমাকে ক্ষণকালের জন্য আকর্ষণ করিলেন তাহা তিনিই জানেন। এই কর্ম্মের পথ যেমন দুর্গম তেমনি কণ্টকাকীর্ণ। এই পথে পা ফেলিবামাত্র চক্রান্ত কাহাকে বলে তাহার স্বাদ আমাকেও পাইতে হইল। "

কিন্তু 'স্পষ্টরূপে সমস্ত ব্যাপার বুঝিবার সময় ও সুযোগ' তাঁহার ছিল না---অথচ যেটুকু আভাস পাইতেন তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিলেও বিপদের আশঙ্কা করা মাত্র বন্ধু সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ সমস্তই মহারাজকে জানাইতেছেন। 'বস্তুত কোন্‌টা গোপনীয় কোন্‌টা প্রকাশ্য, কোন্ জিনিষ প্রয়োজনীয় কোন্‌টা তুচ্ছ, কাহার তাৎপর্য্য কি' তাহা বিচার করা কবির সাধ্যাতীত, অকপটে তাহাও বলিলেন।

বন্ধুর অগোচরে তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ অন্যায়। কাজেই লিখিলেন---

"....র ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে আমার বারম্বার সন্দেহ জন্মিলেও তাহাকে বন্ধু হিসাবে আমি পরিত্যাগ করি নাই। সুতরাং তাহার সহিত আমার বিশ্বাসের সম্বন্ধ আছে। গোপনে এই বিশ্বাসকে ভঙ্গ করা আমার পক্ষে নিরতিশয় গর্হিত কাজ হইয়াছে সেজন্য আমি অন্তর্যামীর নিকট দণ্ডভোগ করিতেছি। অতএব মহারাজ দয়া করিয়া আমার এই পত্রখানি-কে দেখাইবেন। আমি যদি অবসর পাইতাম তবে...র সম্মুখেই কোনো না কোনো দিন আমি আমার মনের সমস্ত খেদ ও সংশয় স্পষ্ট করিয়া জানাইতাম কিন্তু সেরূপ অবকাশ আমি পাই নাই।----"

বন্ধুবাৎসল্যের কি অপূর্ব্ব নিদর্শন। আরও চমৎকারিতা এই যে ত্রিপুরায় আসিয়া দলাদলি ও আনাগোনা দেখিয়াও বন্ধু সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা, কবি মনে করিতেছেন-

"তাহা সম্ভবত অমূলক ---এবং সেই অমূলকতার সম্ভাবনা মনে রাখিয়াই তাহার সহিত বন্ধুভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হয় না। কিন্তু মহারাজের কাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে এখনো এই সন্দেহ মনে রাখিয়া আমাকে কাজ করিতে হইবে। কারণ, কাজ নষ্ট হইয়া গেলে আর সুযোগ ফিরিয়া পাওয়া যায় না। এইজন্যই আমি মনে করিয়াছিলাম স্থানীয় দলাদলির সহিত সম্পর্কশূন্য নিস্বার্থ সুশিক্ষিত, সুদক্ষ লোক মহারাজের সম্প্রতি একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমি যতদূর জানি রমণীর ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি দুর্লভ এই মনে করিয়া রমণীর নাম করিয়াছিলাম।"

"কিন্তু সেজন্য আমি এখন আর ব্যগ্র নহি। আমি----সম্বন্ধে যে সকল সন্দেহ মনে পোষণ করিয়াছি তাহাকে গোপন করা আমার পক্ষে অধর্ম্ম বোধ করিতেছি। এই পত্রখানি পড়িলে আমার মনের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।" (১৬ই শ্রাবণ, ১৩১২)

ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কিত হইলেও চিঠিখানার মর্ম্মকথা সকলের অভিনিবেশের বিশেষ বিষয়। এইজন্যই একটু বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা পাওয়া গেল। অন্যূন বারশত শব্দ সম্বলিত এই সুদীর্ঘ পত্র কবি লিখিয়াছিলেন ১৬ই শ্রাবণ ১৩১২ সনে। কবি-- পরিচয় কি অদ্ভুত ও অপূর্ব্বভাবে ধরা পড়িয়াছে পত্রের প্রতি ছত্রে--মানসিক গ্লানি, খেদ, নিরাভরণ সুহৃদ-বিশ্লেষণ ও সর্ব্বোপরি ত্রিপুরার হিতকামনায় ব্যগ্রতা চমৎকৃত করিয়া দেয়, কাজেই ইহা ব্যবহার করিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না।

ঋণ সংগ্রহ উপলক্ষ করিয়া দলাদলি যেমন চলিতেছিল তাহাতে এবং রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণে রাধাকিশোর যে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিঠি পত্রাদি ও আলোচনায়--দুই সুহৃদের মধ্যে--রমণীবাবুকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল পূজার মধ্যে তিনি একবার আসিয়া যান। মহারাজ কবিকে জানাইলেন পূজার ছুটিতে কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহাদের সহিত রমণীবাবুর সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন, তাঁহারা সকলে থাকিবেন না। কাজেই, তখন আসা স্থগিত হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে তাঁহারই আত্মীয় ত্রিপুরার মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হইবেন-- ইহা একদল মোটেই পছন্দ করিতেছিলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রচারণ চলিতে লাগিল এমনভাবে যাহাতে মহারাজের কানেও উহা পৌছে। কিন্তু সেগুলি যে রাধাকিশোরকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই---তাহা রমণীবাবুর নিযুক্তি রোবকারী (ঘোষণা) প্রমাণিত করিল। এই রোবকারী প্রচারিত হয় ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩১৫ ত্রিপুরাব্দে (১৩১২ সাল)।

রমণীবাবুর কার্য্যভার গ্রহণ সময়ে এক দরবার অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। স্বল্পকাল মধ্যেই রমণীবাবুর দৃঢ়চিত্ততা বিরুদ্ধবাদীদের জল্পনা কল্পনায় মস্তবড় বাধা হইয়া পড়িল।

প্রতি বৎসর শীতের সময় কলিকাতা সফর মহারাজের একরকম নিয়মিতই ছিল। এবারও সপরিবারে রাধাকিশোরের কলিকাতা যাওয়ার কথা। কার্য্যভার গ্রহণের মাসাধিক-কাল পরে রমণীবাবু সরকারী কার্য্যে কলিকাতায় আসেন। সেখান হইতে তিনি মহারাজকে জানাইলেন পরিবারসহ মহারাজের তখন কলিকাতা না যাওয়াই সঙ্গত--একা গেলেই ভাল হয়। আগরতলায় পারিষদবর্গ রমণীবাবুর এই প্রস্তাব মহারাজের স্বাতন্ত্র্যের উপর অনধিকার হস্তক্ষেপের সামিল বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। কথাটি রমণীবাবুর কাছেও কলিকাতায় পৌঁছিল। তিনি তখন মহারাজকে তাঁহার প্রস্তাবের ভিতরকার কথা পরিষ্কার ভাবে বলিয়া ইহাও জানাইলেন---যিনি রমণীবাবুর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অনধিকার হস্তক্ষেপ ইত্যাদি রটাইতেছেন--সেই ব্যক্তিকে বিশেষভাবে জানেন বলিয়া ইহাতে তিনি মোটেই গুরুত্ব দিতে নারাজ! কিন্তু রাজ্যেশ্বরের সম্মানরক্ষা ইহা হইতে অনেক বেশী গুরু। ত্রিপুরার রাজ-অন্তঃপুরবাসিনীদের চাল-চলন বিশেষভাবে পর্দা ব্যবহার ইত্যাদি রমণীবাবু বেশ ভালভাবেই জানেন--ইহা তাঁহাদের মর্য্যাদা ও আভিজাত্যের তখন অঙ্গীভূত। তিনি কলিকাতায় জানিতে পারিয়াছেন মহারাজ সপরিবারে আসিলে বড়লাটভবনে মহারানীদেরও আমন্ত্রণ হইবে। মহিলাদের পক্ষে-কলিকাতায় উপস্থিত থাকিয়াও আমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভবপর না হইলে উহা প্রত্যাখানের সামিলই বিবেচিত হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের মর্য্যাদায় ইহা কি প্রকার আঘাত হানিবে এবং ইহার প্রতিক্রিয়াই বা কি হইতে পারে তাহাই বিবৃত করিয়া মহারাজকে রমণীবাবু জানাইলেন। গুণগ্রাহী রাধাকিশোর রমণীবাবুর বিচার বিবেচনার দৃঢ়তায় সবিশেষ মুগ্ধ হইলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্ব্বাচনে প্রাসঙ্গিকভাবে বিষয়টি উল্লেখ করা গেল।

চৈত্র মাস। সালতামামী--সম্ভাবিত আয়-ব্যয়ের আলোচনা কাল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে পাইতে মহারাজের অভিলাষ--বিশেষতঃ নূতন মন্ত্রী কার্য্যে নিয়োজিত। রবীন্দ্রনাথ মহারাজের আমন্ত্রণে আগরতলায় আসিলেন। তিনি বরিশাল যাইবেন, প্রাদেশিক সম্মেলনের সঙ্গে সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতিরূপে যোগদানের জন্য। ২৫শে চৈত্র (১৩১২) তারিখে আগরতলা হইতে কবি লিখিতেছেন--"ঘুরিয়া মরিতেছি। সম্প্রতি আগরতলায় আটকা পড়ে গেছি। বরিশালে যাইতে হইবে। তাহার পর চাটগাঁয়ে যাইবার কথা কিন্তু আমার মন বিদ্রোহী হইতেছে। বোলপুরে গিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া বসিতে ইচ্ছা করিতেছে। শনি আমাকে ঘুরাইতেছে রবি তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিল না।" (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খন্ড পৃঃ ১৩৯)

কবির আগরতলায় এই সময়ে আটকা পড়া নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য হইয়াছে শ্রীদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত রক্ষিত "বজেটের বিস্তারিত আলোচনার পূর্ব্বে কয়েকটি মূলনীতি সম্বন্ধে মহারাজের নিকট নিবেদন" শীর্ষক কবির প্রস্তাব দ্বারা। *

* প্রস্তাবের প্রতিলিপি গ্রন্থের অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে।

এই দলিলটি রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে ও রাজ্যশাসন তন্ত্রে বিচক্ষণতা প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বে আমরা "ভারত রাজন্য সভা" প্রস্তাব আলোচনা কালে যে রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়াছি তাহা হইতে ভিন্নভাবে আরও ঘনিষ্ঠভাবে রাজ্যশাসনে দক্ষ হিসাবে এখন দেখিতেছি।

রমণীবাবুর নিযুক্তিতে ব্যবস্থাপক সভার প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়াছে। উপর্য্যুপরি দুইবার যে মন্ত্রীমহাশয় কাজ করিতেছিলেন তাঁহার শাসন সংরক্ষণ মোটেই আশানুরূপ হয় নাই। "রাজ্যের সঙ্কট অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে" কবি বলিতেছেন। তখন ত্রিপুরা রাজ্য ও জমিদারীর সাকুল্য আয় দশ বার লক্ষ টাকার অধিক ছিল না। ইহার উপর ঋণ-ভার---তাহাও নির্দ্ধারিত কিস্তিবন্দীতে আদায় করিতে হইবে। রাজ্য পরিচালনা-ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কর্জ্জ পরিশোধ ব্যবস্থা-রাজ্যের আয়ের সহিত নিয়মন করা অতি দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবির চোখে ধরা পড়িল 'শাসনতন্ত্রের মধ্যে আত্মবিরোধ।' " যাঁহারা কর্ণধার ছিলেন তাঁহারা একটি হাল ধরিয়া সমস্ত রাজ্যব্যাপারকে এক পথে এবং এক লক্ষ্যাভিমুখে চালনা করিবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং তাঁহাদের অবলম্বিত কর্ম্মনীতি বারম্বার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে।" এই ভয়াবহ পরিণাম হইতে 'একটি অপ্রতিহত শাসনতন্ত্রে রাজ্যকে বাঁধিয়া তুলিতে হইবেই' বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ জোর দিতেছেন।

রাজ্যের দুইটি ভাগ--"একটি মহারাজের স্বকীয়, আর একটি রাষ্ট্রগত। উভয়কে জড়ীভূত করিয়া রাখিলে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে--এই উপলক্ষ্যে প্রভূত অনিষ্ট উৎপন্ন হয়---এবং এই দুই ভাগের সন্ধিস্থলে নানাপ্রকার দুষ্ট চক্রান্তের অবকাশ থাকিয়া যায়।" তাই, কবি তাঁহার বিচক্ষণ দৃষ্টিতে ইহার সমাধান করিতে চান---"মহারাজের স্বকীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিভাগের সীমা যদি সুনির্দ্দিষ্ট হয় তবে মন্ত্রী তাঁহার বিভাগের অর্থ ও সামর্থ্যের পরিমাণ নিশ্চিতরূপে জানিয়া তদুপযোগী ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং মহারাজের আশ্রিত ও আশ্রয় প্রত্যাশীগণ রাষ্ট্রবিভাগকে নিজের স্বার্থ সাধনক্ষেত্র নহে নিশ্চয় জানিয়া সেদিক হইতে লুব্ধদৃষ্টি প্রত্যাখান করিবে।"

স্বকীয় বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলেই মন্ত্রী রাজস্বের অবশিষ্ট অংশদ্বারা ঋণশোধ ও রাষ্ট্রচালনার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন,....ইহা মন্ত্রীর কর্ত্তব্যে দক্ষতার পরিচায়কই হইবে। ইহা রাজক্ষমতার সঙ্কোচ বলিয়া যাহারা বলে 'তাহারা স্বার্থান্বেষী ও মহারাজের শত্রুদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক।' দৃঢ়তার সহিত ইহা প্রকাশ করিয়া কবি আবার বলিতেছেন--"মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিজের নিয়মের দ্বারা নিজকে সংযত করাই রাজোচিত---তাহাই রাজধর্ম্ম।" এই নির্ভীক বিশ্লেষণ ও উক্তি ত্রিপুরার মঙ্গল কামনায় রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব হইয়াছিল। পক্ষান্তরে অনুচরবর্গের মিথ্যা, অর্দ্ধসত্য, অত্যুক্তি অনেক কিছু মহারাজকে শুনিতে হয়। কিন্তু বিচলিত না হইয়া "ছোট বড় সকল প্রকার সংশয়স্থলেই মন্ত্রীর বক্তব্য শুনিবেন--ক্ষুদ্রতম কন্টকটিকেও হৃদয়ের প্রান্ততম প্রদেশে পোষণ করিবেন না"

---ইহাও কবি নিবেদন করিয়া জানাইলেন 'মন্ত্রীর সহিত মহারাজের সম্বন্ধ উন্মুক্ত থাকিলে কোনোদিন তজ্জন্য অনুতাপ করিতে হইবে না।'

রবীন্দ্রনাথের এই অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞ ব্যবহারিক প্রস্তাবের মধ্যে ও উন্নত মনস্তত্ত্বের বিকাশ বাধা পায় নাই। তিনি আরও বলিতেছেন--'কর্ম্মে ভুল করিবে না এমন মানুষ নাই---কিন্তু একেবারেই ভুল করিতে না দিবার উপায়, কর্ম্ম করিতে না দেওয়া।' কাজেই সব রকম কপট ও অকপট সমালোচনায় অচঞ্চল চিত্তে সংশয়কে প্রতিহত করিতে পারিলেই রাষ্ট্রীয় কর্ম্মসূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া কল্যাণ সঞ্চয় করিবে। এত কর্ম্মের কথা বলিয়াও কবি 'ঈশ্বরই মঙ্গল করিবার একমাত্র কর্ত্তা'---ইহা বলিতে ভুলেন নাই এবং 'মহারাজ ধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন এবং ধর্ম্মই মহারাজকে রক্ষা করিবেন' বলিয়া সমাপ্তি করিলেন।

বলা বাহুল্য, এই মূলনীতিকে সম্মুখে রাখিয়া কবি, মহারাজ ও মন্ত্রীর মধ্যে আয়-ব্যয়ের যে নির্দ্ধারণ হইয়াছিল তাহা অর্থবিদ্‌দের বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। জটিল ও সূক্ষ্ম কল-কব্জা, দেয়াল ঘড়ি অপেক্ষা হাতঘড়িতেই বেশী। ত্রিপুরার স্বল্প আয় বন্টন সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য্য। এই সমস্ত বিধি-ব্যবস্থায় মহারাজ রাধাকিশোর তখনকার রাজনৈতিক ও স্বার্থান্ধদের দলাদলির মধ্যেও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু এই স্বস্তি তিনি বেশীদিন ভোগ করিতে পারেন নাই। যে অনিশ্চয়তা, যে অভাব অনটনের মধ্যে তাঁহার ভাগ্যে ত্রিপুরেশ্বরের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ অনিবার্য্য হইয়াছিল তাহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মত সুহৃদ লাভই ঈশ্বরের অশেষ করুণা---ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

এই আলোচনায় আর একটি কথা মনে উঠে--কবিরা কাজের লোক কিনা। অদ্ভুত, অবাস্তব, অবান্তর যা-কিছু তাহাই মনোরম শব্দ যোজনায় ছন্দে গাঁথা--ইহাই কবির কাজের স্বরূপ---এই সাধারণ সামাজিক ধারণার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ব্যতিক্রম বলিয়াই রাজনীতির বন্ধুর পথে ত্রিপুরাকে আগাইয়া নিতে তিনিই সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজনীতির খেলায় রবীন্দ্রনাথের মন কোনদিনই বসে নাই---কিন্তু ত্রিপুরার জন্য প্রকৃত রাজনীতিতে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জঞ্জালের বোঝা দেখিয়া তিনি ভয় পান নাই, সেই জন্যই অপসারণ করিবার সুষ্ঠু উপায়ের সন্ধানও দিয়াছিলেন। কিন্তু কবি-মানসকে এই কর্ম্মে প্রণোদিত ও নিয়োজিত করিতে যিনি সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহার অন্তর্নিহিত অকৃত্রিম প্রীতি ও কৃতজ্ঞ অন্তরের আকর্ষণের কথা চিন্তা করিয়া অবাক হইতে হয়। মহারাজ রাধাকিশোরের চরিত্রের এই দিকটি খুব বেশী উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এই প্রসঙ্গে। দোষগুণে ভরা মানুষ, কিন্তু সেইগুলিকে অপ্রিয় সত্যে প্রকাশ করিতে কবি যেমন দ্বিধা বোধ করেন নাই, রাধাকিশোরও প্রকৃত মানুষের মতই সেগুলিকেই অপনোদন করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। "রবিবাবু, আপনি আমাকে আমার ইচ্ছার ও প্রকৃতির প্রতিকূলেও রক্ষা করবেন"----রাধাকিশোরের এই উক্তির সার্থকতা এইখানেই।

কার্য্যকাল বৎসরাধিক পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রমণীবাবু তাঁহার আগেকার কাজ কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটিতে যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ছয় মাসের ছুটি লইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার আর ত্রিপুরার কাজে যোগদান সম্ভবপর হয় নাই।

আবার অনিশ্চয়তার মধ্যে রাধাকিশোরের মন উদ্বেলিত হইল। কবির মনও ততোধিক।

মহারাজ পুনরায় ব্যবস্থাপক সভা নিয়োগ করিবেন ভাবিলেন। আর ম্যাকমিন নামক যে সাহেব গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে জমিদারীতে ঋণ আদায় ব্যবস্থায় নিয়োজিত ছিলেন---তিনি পেন্সন পাইয়া বিদায় হইয়াছেন,---তাঁহাকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করার কথাও মহারাজের মনে উদয় হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথের মনে প্রস্তাব দুইটি মোটেই খাপ খাইতেছিল না। পরবর্ত্তী শীতকালের কথা--মহারাজ ও কবি উভয়েই কলিকাতায় আলোচনারত।

রাজ্যশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কবি মৌখিক তাঁহার বক্তব্য জানাইয়া পরদিবস মহারাজকে বিশদভাবে এক পত্র লিখিয়া--বোলপুরে সেইদিনই ফিরিতেছেন জানাইলেন। চিঠিখানা ১৪ই পৌষ, ১৩১৩ তারিখে লিখিত---লোক মারফতে প্রেরিত।

কবির প্রথম কথা---

......"কৌন্সিল দ্বারা কোথাও কাজ চলে না। কৌন্সিলকে সহায়স্বরূপ করিয়া একজন কর্ত্তা কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু সে স্থলেও কৌন্সিলের সদস্যগণকে নিস্বার্থ হিতৈষিতার সহিত অধিনায়কের বাধ্যতা স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ কূটচক্রান্ত পরস্পর বিরোধ ও উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা থাকে না। মহারাজের বর্ত্তমান পারিষদবর্গের প্রতি মহারাজের কি যথার্থ শ্রদ্ধা আছে? ইহারা কি এতবড় দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য? ইহাদের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কি মহারাজের মঙ্গল হইবে? মহারাজ নিয়ত প্রশ্রয় দিয়া ইহাদের বলবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, কোথায় ধীরে ধীরে সেই বল খর্ব্ব করিবেন, নিজেকে স্বার্থপর দীনচরিত্র ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তিদের জাল হইতে মুক্ত করিবেন, না, রাজ্যশাসনভার ইহাদের হাতে সমর্পণ করিয়া ইহাদের প্রশ্রয় শক্তিকে দুর্জ্জয় করিয়া তুলিবেন?"

দ্বিতীয় কথা ম্যাকমিন সাহেবকে শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করা.......রবীন্দ্রনাথ বলিলেন 'ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না'। কাজেই 'এমন স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অপদস্থ হইবার আশঙ্কা মাত্র না ঘটে'.......ইহাই রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত। তিনি আরও বলিলেন.....কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা 'ত্রিপুরা রাজ্যকে চিরদিনের মত দায়গ্রস্ত ও পঙ্গু হইতে দিবেন না।' চিঠির প্রথম দিককার প্রশ্নবোধক কথাগুলিকেই পরে নিজে বিশ্লেষণ করিতেছেন। পারিষদরা 'লঘুচরিত্রের লোক'......'বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকিতে পারে কিন্তু বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য নাই'....ইহাদের হাতে মহারাজ নিজকে যাহাতে ধরা না দেন তাহাই বার বার জানাইতে কবি দ্বিধা করিতেছেন না। কারণ, 'বন্ধন রচনা করা সহজ, ছেদন করা অত্যন্ত কঠিন।'

কবির মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। বন্ধুপ্রীতিতে এই উৎকণ্ঠা এতই প্রবল হইয়াছে যে মহারাজের অনুমতি ব্যতীত যেন স্থান ত্যাগও করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার শেষ বক্তব্য এই চিঠিতে.....

....."আমি আমার সংসারের জাল বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিষ্কৃতি লাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি......মহারাজের সহিত তিনিই আমার সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন, এই সম্বন্ধের দ্বারা আমার সাধ্যমত

মঙ্গল সাধন না হইলে আমার ক্ষমা নাই এইজনাই আজ আমি মহারাজের পারিষদবর্গের আলোচনার বিষয় হইয়াও এই সমস্ত জটিল ব্যাপারের মধ্যে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়াছি।"

'ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হইবে'--'মহারাজের স্নেহঋণে আমি বদ্ধ' এবং 'ঈশ্বর মহারাজের নিয়ত কল্যাণ করুন' বলিয়া সমাপ্তি করিলেন কবি পত্রখানার।

পরবর্ত্তী বৈশাখের (১৩১৪) প্রথম দিকে কবি যতীন্দ্রনাথ বসুকে লিখিতেছেন, 'বিদ্যালয়ের ভার আজকাল অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছে'। যতিবাবু তখন দরবারে দায়িত্বশীল পারিষদ। গদ্য গ্রন্থাবলীর প্রথম সংখ্যা ('বিচিত্র-প্রবন্ধ') ছাপা হইয়াছে---বইয়ের স্বত্ব 'বিশেষভাবে' বোলপুরে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে দিয়াছেন। ইহাও জানাইতে দ্বিধা করিলেন না--'যদি মহারাজকে দিয়ে কয়েক খন্ড কেনাতে পার তবে আমার উপকার হয়।' কত খন্ড মহারাজ আনাইয়াছিলেন অনুমান করা কঠিন হইলেও যদৃচ্ছা বিলি হইয়াও পঁচিশ বছর পরে লাইব্রেরীতে পঞ্চাশ খন্ডের কম নহে---আলমারীতে ছিল। ইহা আমরা দেখিয়াছি। মহারাজের পরোক্ষ সাহায্যের ইহাও একটি নিদর্শন।

সমসাময়িক আর কোন পত্রাদি সংগৃহীত না হইলেও সে সময়কার সরকারী কাগজপত্রে দেখা যায় মহারাজও রাজ্যভার হইতে মুক্ত হইবার জন্য নিজ পুত্রদের রাজ্য শাসন সংরক্ষণে অভিজ্ঞ করাইতে ব্যাকুল। যুবরাজকে রাজস্ব ও পলিটিকেল বিভাগ এবং মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে পুলিশ, মিলিটারী, নিজ তহবিল ও প্রাইভেট সেক্রেটারী আফিস সমূহের পরিচালনার শিক্ষায় নিয়োগ করিলেন। রাধাকিশোর যেন নিরাসক্তভাবে দিন কাটাইতে চাহিতেছেন। তীর্থযাত্রায় তিনি বাহির হইয়াছেন। কাশী হইতে সারনাথ যাত্রাকালে মোটর দুর্ঘটনায় আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন ফাল্গুন ১৩১৫ সনে। রাধাকিশোরের অকাল মৃত্যু রাজ্যের পক্ষে দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

"একটি দেশীয় রাজ্যের বাতায়নে বসিয়া তাঁহার মন ত্রিপুরার শৈলমালার বেষ্টনে আবদ্ধ থাকিতে পারিত এবং বহির্জগৎ তাঁহাকে জানিতে পারিত না। কিন্তু স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে স্বদেশের কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে সমগ্র বঙ্গের কল্যাণ চিন্তাও একসূত্রে গাঁথিতে পারিয়াছিলেন দেখিয়া চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না।" কি সুন্দর লেখনীচিত্র আঁকিয়াছেন সুহৃদ্বর ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার ছোটদের জন্য লিখিত "রাজমালা" গ্রন্থে 'রাজর্ষি রাধাকিশোর' অধ্যায়ে।

মহারাজের জীবিতকালে জগদীশচন্দ্রের ত্রিপুরায় আগমন, ইচ্ছাসত্ত্বেও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। কিন্তু মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরের রাজ্যাভিষেক (২৯ জানুয়ারী, ১৯২৮) কালে আগরতলায় উৎসবে যোগদান জগদীশচন্দ্রের রাধাকিশোরের প্রতি অকৃত্রিম সৌহৃদ্য ও শ্রদ্ধার প্রতীক বলিয়া মনে করি।

অকৃত্রিম সুহৃদ মহারাজের তিরোধানে ত্রিপুরায় রাজকার্য্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনে যে বাধা পড়িল কবির মনে তাহা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইলেও নবরাজ্যেশ্বর যাহাতে নিরঙ্কুশভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে সক্ষম হন, সেই চিন্তাই বিস্তারিত মহারাজকুমারের নিকট কবির লেখা পত্রে পাই।

তিন

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর
ও
মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর

রাজকার্য্যে পুরাপুরি অভিজ্ঞ হওয়ার পূর্ব্বেই যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইল মহারাজ রাধাকিশোরের আকস্মিক মৃত্যুতে। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরও সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহযোগী হইয়া রাজ্য পরিচালনায় পূর্ণভাবে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠার মত উভয়েরই জীবনধারায় দায়িত্ববোধ চাপিয়া বসিল। অথচ এই অনভ্যস্ততার সুযোগ গ্রহণকারীর সংখ্যা যে নিতান্ত কম ছিল না তাহা আমরা পূর্ব্ব আলোচনায় দেখিয়াছি।

ছোটবেলা হইতেই মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর রবীন্দ্রনাথের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং সেই হইতে কবির সহিত পত্র-ব্যবহার তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। বীরেন্দ্রকিশোর রাজত্বভার গ্রহণ করিলেও রাজকার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে কবির মনে যখন যাহা আসিত তাহা বেশীর ভাগই মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখিয়া জানাইতেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর এখনও দুঃখ করিয়া বলেন, "রাজকার্য্যের মার-প্যাঁচের মধ্যে পড়ে আমার ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ-নির্দ্দেশকে পালন করতে পারি নাই।" মহারাজ রাধাকিশোরের পরলোকগমনের অনতিকাল মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে যে অমূল্য উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন তাহা একদিকে যেমন ধর্ম্ম ও নীতি মণ্ডিত অপরদিকে রাজনীতি ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞাপক। মহারাজকুমারকে লিখিত কবির পত্রাবলীর অনেকগুলি 'প্রবাসী' ১৩৪৮ সনের আশ্বিন হইতে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল ও মূল চিঠি রবীন্দ্র সদনে প্রেরিত হইয়াছে।

কবি নববর্ষে (১৩১৫) যে চিঠি লিখিলেন তাহা এই বলিয়া শেষ করিলেন, "---অদ্য নববর্ষের প্রথম দিন। ঈশ্বর তোমার কর্ত্তব্যক্ষেত্রকে প্রশস্ত করিয়াছেন, আমি আশীর্ব্বাদ করি তিনি তোমার শক্তিকে উদ্বোধিত করুন এবং তোমার সমস্ত শুভ ইচ্ছাকে তিনি সকল বাধার উপরে জয়ী করিয়া দিন।" নূতন উৎসাহ উদ্যমে দেশের কাজে নিজেকে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিতে যাইয়াও বৎসর ঘুরিবার পূর্ব্বেই (ফাল্গুন) পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল মহারাজকুমারকে নয়, জ্যেষ্ঠ মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরকেও ব্যথিত করিয়া তুলিল। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে কবি লিখিলেন----

ওঁ

বোলপুর

"কল্যাণীয়েষু,

তোমার এই পরম দুঃসময়ে তোমার ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবেন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসিত হৃদয়েনাপরাজিতা---

ত্রিপুরায় রবীন্দ্র-স্মৃতি

সুখই হউক দুঃখই হউক প্রিয় হউক অপ্রিয় হউক যখন তাহা উপস্থিত হইবে তখন অপরাজিত হৃদয়ে তাহাকে গ্রহণ করিবে, আমাদের শাস্ত্রের এই উপদেশ। তোমার মনে সেই শক্তি আছে....তুমি সকল অবস্থাতেই অবিচলিত চিত্তে ধর্ম্মের মধ্যে মঙ্গলের মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, ইহা নিশ্চয় জানি বলিয়া আমার মন তোমার সম্বন্ধে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন আছে।

এখন তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ যে, ত্রিপুরার......রাজভার যাঁহার প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে কায়মনোবাক্যে তাঁহার আনুকূল্যে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে.....কারণ, তোমাদের রাজ্যের কল্যাণ তোমাদের সকলের কল্যাণ। রাজসিংহাসনের চারিদিকে অনেক শত্রু আছে, এই সময়ে তোমাদের নূতন রাজাকে তাহাদের কপট বন্ধুতা হইতে সাবধানে রক্ষা করিবে। এক্ষণে তুমিই তাঁহার সকলের চেয়ে নিকটতম আত্মীয়......তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মঙ্গল সম্বন্ধ যেন কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন না হয়.......তাহা হইলে বাহিরের শত্রুরা সুযোগ পাইয়া বসিবে। তোমার পিতা ও পিতামহের নিকট অকৃত্রিম স্নেহের ঋণে আবদ্ধ হইয়া আছি সেইজন্যে তোমাদের রাজ্যের কল্যাণ সম্বন্ধে কোনোদিন আমি উদাসীন থাকিতে পারি না। দূরে থাকিয়াও আমি ত্রিপুরার মঙ্গল কামনায় বিরত থাকিব না। যখন দেখিব তোমরা দুই ভ্রাতায় দৃঢ়ভাবে মিলিত হইয়া তোমাদের সিংহাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং রাজলক্ষ্মীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছ -দেখিব তোমাদের রাজকোষ সচ্ছল, তোমাদের প্রজাগণ সুখী, সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং সিংহাসনের চারিদিকে কোনো কলুষ নাই তখন আমার অনেকদিনের বাসনা পূর্ণ হইবে। তোমার প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ, সুখে দুঃখে ঈশ্বর তোমাকে মঙ্গলে দৃঢ় রাখুন, কর্ত্তব্যে অটল করুন। ইতি ১০ই চৈত্র ১৩১৫।"

বেদনাতুর হৃদয়ে কর্ম্মের মধ্যে যে দ্বিধা মহারাজকুমার পাইতেছিলেন এই চিঠি পাওয়ার পর হইতে, মনকে তাহা হইতে মুক্ত করিয়া দৃঢ় করিয়া লইলেন। মহারাজের অনুজ্ঞায় তাঁহার প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল---বিচ্ছিন্ন আত্মীয় স্বজনকে একত্র করা। মহারাজ বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোরের রাজত্বকালে সিংহাসনের দাবী লইয়া অনেকেই রাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। মহারাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র বহুকাল কুমিল্লাবাসী। সেখানে স্ব-চেষ্টায় জ্ঞানার্জ্জন করিয়া জনগণ মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'বাংলা ভাষার চারি যুগ' স্থানীয় 'রবি' পত্রিকায় ও আত্মকথা 'আবর্জ্জনার ঝুড়ি' ১৩২৪ সালে 'ত্রিবেণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার আলোচ্য বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য ও ভাষা ব্যবহারে বিশিষ্ট ভঙ্গী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নবদ্বীপচন্দ্র সপরিবারে পুনরায় আগরতলায় বাস উঠাইয়া আনিলেন।

ব্রজেন্দ্রকিশোর কলিকাতা গেলেন 'বড়ঠাকুর' সমরেন্দ্রচন্দ্রের সহিত প্রীতি সংস্থাপনের জন্য- বহুদিন যাবৎ তিনি রাজধানী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বসবাস করিতেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও লেখক। কলিকাতায় অভিজাত সমাজে বিশেষ করিয়া ঠাকুর ও চৌধুরী পরিবারে তিনিও সুপরিচিত ও সমাদৃত। তাঁহার লেখা 'ভারতীয় স্মৃতি', 'ত্রিপুরার স্মৃতি', 'জেবুন্নিসা' ও 'মহম্মদ সিরাজউদ্দীন আবুজফর বাহাদুর শাহ'--চারখানি পুস্তক। বাংলা ভাষায় পারদর্শিতার মতই তাঁহার উর্দু ভাষায় দখল ছিল। শেষোক্ত পুস্তকে সম্রাট বাহাদুর শাহের উর্দু কবিতাবলী বাংলায় অনুদিত।

কলিকাতা যাওয়ার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোর কবিকে জানাইলে তিনি পত্রোত্তরে লিখিলেন---

"তুমি যে সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছ তাহা সিদ্ধ হউক্ একান্ত মনে এই কামনা করি। আশুকে (চৌধুরী) মধ্যবর্ত্তীরূপে লইয়াছ ইহাও ঠিক হইয়াছে। তোমাদের এই সঙ্কট কাটিয়া গেলেই তোমরা জোরের সহিত কাজ করিতে পারিবে-----রাজ্যের সমস্ত জঞ্জাল দূর করিতে কোনো বাধা থাকিবে না। যেমন করিয়া হোক্ কতকটা ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই কাজটা সারিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।"

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল তিনিও কলিকাতায় উপস্থিত হন-----কিন্তু লোকে কল্পনা করিবে তিনি রাজকার্য্যে নিজকে জড়িত করিতেছেন। কাজেই কাহারও মনে কোনো অমূলক সংশয় না জন্মানই শ্রেয় বলিয়া তিনি লেখেন। ইহাও আবার জানাইলেন----

"তোমার পিতা ও পিতামহের অহেতুক বন্ধুত্ব আমি কদাচ ভুলিব না---তাহার পরে যেদিন হইতে তোমাকে জানি তোমার প্রতি আমার স্নেহ ক্রমশই প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে।"

পত্রখানি শেষ করিবার পূর্ব্বে 'তোমার দাদাকে উপদেশ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছি। পাইয়াছেন কি?' বলিয়া খোঁজ লইতেছেন। (২৬শে চৈত্র, ১৩১৫)

কবির এই স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া যখন ব্রজেন্দ্রকিশোর 'বড়ঠাকুর' সমীপে উপনীত তখন কবির মধ্যম ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে আসিয়া হাজির। ব্রজেন্দ্রকিশোরকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন---'আজ কি আনন্দের দিন, কাকা ভাইপো একত্র হয়েছেন।'

পূর্ব্ববর্ত্তী দুই মহারাজের সময় হইতে যে পারিবারিক অশান্তির দরুন সর্ব্বদাই সকলে অন্তরের মধ্যে ব্যথা অনুভব করিতেছিলেন তাহার অবসানে স্বস্তি দেখা দিল। কিন্তু রাজকার্য্যে শৃঙ্খলা বিধান সম্বন্ধে কবি নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিতেছেন না। পুত্র রথীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়াছেন, তাহাকে 'কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত' করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মন ব্যাকুল। মহারাজকুমারও রাজ্যের কাজকর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায় সর্ব্বদা কবির সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিতে পারিতেছিলেন না। অনেকদিন পরে ব্রজেন্দ্রকিশোরের চিঠি পাইয়া লিখিলেন ....

"গোড়াতেই বিঘ্নের সহিত তোমাকে যে সংগ্রাম করিতে হইতেছে ইহাতে মঙ্গলই আশা করি। পথ সহজ হইলে জড়তা আক্রমণ করে। তোমাদের মাথার উপরে প্রকাণ্ড ঋণভার আছে এবং ঘরে বাহিরে তোমাদের শত্রুর অভাব নাই----ইহাতে মহারাজকে অনেকটা সংযত ও সতর্ক করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই---এই সকল উপসর্গ না থাকিলে বাধাহীন সুযোগ হয়ত দুর্গতির পথকেই প্রশস্ত করিত।...... ত্রিপুরারাজ্যের উন্নতি চূড়াতেই তোমার জীবনের সার্থকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। .....তোমাকে আমার অন্তরের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইতে আলস্য করিব এমন কখনই ঘটিতে পারে না। ....

(২৭শে ভাদ্র ১৩১৬)"

ব্রজেন্দ্রকিশোর বলেন প্রথম সন্দর্শনেই কবি তাঁহাকে কি স্নেহডোরে বাঁধিয়াছিলেন এবং কেন বাঁধিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন। কবির সাবধানী আশীর্ব্বাণী ও রাজ্য পরিচালনার চিন্তাভার যৌবনের চাঞ্চল্যকে যে স্তিমিত করিয়া দিয়াছিল তাহার অনুভূতি তিনি আজও বিশেষভাবে স্মরণে আনেন এবং আরও বলেন, মানুষ হইবার জন্য তাঁহার চেষ্টায় ইহাই ছিল পাথেয়।

নববর্ষের আশীর্ব্বাদে (৮ই বৈশাখ, ১৩১৭) প্রথমেই কবি নিজের মানসিক অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া মহারাজকুমারকে "ঈশ্বর তোমার প্রকৃতির মধ্যে যে মঙ্গল উপকরণ দিয়া সংসারে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তোমার জীবনে প্রতিদিন তাহা সার্থক হইতে থাক্" এবং রাজকার্য্যের 'বহুতর গ্লানি' মহারাজকুমারকে যেন স্পর্শ করিতে না পারে, তিনি যেন নিয়ত মুক্ত ও পবিত্র থাকেন............এই কামনা করিয়া জানাইলেন.........

"ছাত্র এখন ১২০ জন---আর স্থান দিতে পারিতেছি না। তোমাদের স্বর্গীয় পিতার দানেই দুঃসময়ের সমস্ত আঘাত কাটাইয়া এই বিদ্যালয় আজ এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছে ....নহিলে ইহা কখনই এতদিন রক্ষা পাইত না। এই দানের সূত্রে তোমাদের সঙ্গে আমার শুভানুষ্ঠানের যোগ থাকে এই আমার ইচ্ছা। পূর্ব্বের ন্যায় এখন অভাব তেমন প্রবল নাই..........সাহায্য হিসাবে টাকার এখন তত অধিক প্রয়োজন নাই.....কিন্তু একথা মনে স্থির জানিয়ো তোমাদের স্বর্গীয় পিতার এই দানটি যদি রক্ষা কর তবে তাহাতে আমাদের উভয়েরই মঙ্গল আছে।"

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতেই মহারাজ রাধাকিশোর বার্ষিক যে এক হাজার টাকা দান করিয়া আসিতেছিলেন.........নূতন রাজ্যব্যবস্থায় যাহাতে এই শুভ-বর্ষী দানটি চলিতে থাকে তাহাই কৃতজ্ঞ অন্তরে কবি চিঠিতে স্মরণ করাইয়া দিলেন। বিদ্যালয়ের অভাব তেমন না থাকিলেও দানটিকে স্মরণীয় করিবার জনাই যেন কবি উদ্‌গ্রীব.......সেইভাবেই ব্রজেন্দ্রকিশোর এই কথাগুলি গ্রহণ করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন........আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

বিদ্যালয়ের কথাতেই মহারাজকুমার সেই বালককালের কথা, তাঁহার শিক্ষার কথা ইত্যাদি বলেন। এবিষয়ে তাঁহারই একটি ভাষণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "তখন আমার বয়স ১২।১৪ বৎসর ..... সেই সময়েই আমার রবীন্দ্র সন্দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই দীর্ঘ সৌম্য মূর্ত্তি......দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদামে কি কমনীয় দেখাচ্ছিল। বালকমনে যে এক অনির্ব্বচনীয় আবেগের সঞ্চার করেছিল, তা আজও বেশ স্মরণে আছে। মানুষের এহেন রূপ অভিনব বলেই আমার কাছে অনুভূত হয়েছিল.....আশে পাশে আর এমনটি চোখে পড়ে না। তাই অভিনব বলে ভাষার অযোগ্যতাকে আবরণ করার চেষ্টা করছি। রাজবাড়ীর আবহাওয়া থেকে দূরে সরে থাকবার জন্য মন চাইতো....ভগবৎ অনুগ্রহ সন্দেহ নেই। আমি একদিন নিঃসঙ্কোচে কবিকে বলে ফেল্‌লাম........আমাকে তাঁদের পরিবারের ভিতর টেনে নিতে। সেখান থেকে পড়াশুনো করবো। আমি যে রাজার ছেলে......অনেক বাধা বিপত্তি থাক্‌তে পারে.....কিছুই মনে ওঠেনি তখন। কবি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে আমার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বল্‌লেন.......'নিশ্চয় নেব, সব ব্যবস্থা হবে।' সেদিন থেকেই আমি আজীবন তাঁর স্নেহের ডোরে...সর্ব্ব অবস্থায়......বাঁধা থাক্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছি.......এটা আমার পরম লাভ।" তিনি খুব দৃঢ়তার সহিত ও অকপটভাবে উক্ত ভাষণে বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা জীবনের বন্ধুর পথে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং জীবনকে সরস করিয়া তুলিতে কবির পত্রাবলী....অমূল্য। মহারাজকুমার ইহাও উপলব্ধি করিয়াছেন...... যুব মনকে, যুব জীবনকে সার্থক করিতে কবি তাঁহার লেখা ও কথার উত্তর দিয়া সর্ব্বদা ইহাই বলিতে চাহিতেন......পারিপার্শ্বিক আকর্ষণ হইতে যেন তাহারা মুক্ত থাকে....কাজে জড়িত থাকিয়া।

তাহা হইলে কোনো অভিযোগের উদয় হইতে পারে না। ....আর দুর্ব্বলতা যেন মনকে অভিভূত করিয়া না ফেলে ....ইহাই ঈশ্বরের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করিতে হয়।

রাজার ছেলে, বিলাস সম্ভোগ আয়োজন সহজলভ্য; আর তথাকথিত সুহৃদ চারিদিকেই ছিল। মহারাজকুমার বলেন। এগুলি তাঁহার মনে কোনো সময়ে চাপিয়া বসিতে পারে নাই, তার একমাত্র কারণ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য এবং কবির সহিত পত্রাবলীতে যোগাযোগ রক্ষার প্রলুব্ধতা। মুগ্ধ মহারাজকুমার বলেন...উষার বিমল আলোকধারায় যেন যা-কিছু অশুভ, যা-কিছু বেদনার......তা সবই ধৌত হইয়া যাইত। তিনি জানিতেও পারেন নাই কোন্ যাদুমন্ত্রে তাঁহার মন অভিষিক্ত হইতেছিল।

রাজবাড়ীর পশ্চিমের দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণায় জুড়িবাংলা (জোড়াবাংলা)....পাশাপাশি দুইটি বাংলা ঘর পূর্ব্বদুয়ারী। ঘর দুইটিতে একটি টানা বারান্দা থাকায় পৃথক পৃথক ঘর মনে হইত না। সাম্‌নে বিরাট দীঘি। প্রাতঃকালীন সূর্য্যের অরুণ আভায় ভবনটি নিত্য সিঞ্চিত হইত। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের ব্যবহারে ছিল এই জোড়া বৈঠকখানা । এই ভবনে কবি আগরতলায় আসিয়া একাধিকবার অবস্থান করেন। ত্রিপুরার বাঁশ বেত ও কাঠে তৈরী এই ঘর ....প্রশস্ত প্রকোষ্ঠগুলিতে আলো বাতাসের অভাব ছিল না। এই স্বাচ্ছন্দ্যই বোধহয় স্মরণ থাকায় মহিম ঠাকুরকে কবি লিখিয়াছিলেন......"আমাদের বোলপুর বিদ্যালয়ের একটা বড় ঘর তোমাদের দেশের মুলিবাঁশের দরমার দ্বারা ছাউনি করিতে চাই (স্থানীয় ভাষায় ইহাকে তরজার ছাউনি বলে)।........আমাদের হেডমাষ্টারবাবু বলিতেছেন তোমাদের দেশের বাঁশের কাজ আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে অতি সুন্দর ও স্থায়ী হইবে।"

(পূর্ব্বাশা, রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা, পৃঃ ১১২)

সেবার (১৩০৮) কবি আসিয়া জুড়িবাংলায় আছেন। সন্ধ্যায় রোজই দস্তুরমত মজলিশ মিলিত। কবির কথা শুনিবার আগ্রহ সকলকেই পাইয়া বসিল। দেশীয় রাজাদের ও তাহাদের সাহায্যে দেশকে কি ভাবে গড়া যায় ....এইসব কথা ব্রজেন্দ্রকিশোরের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। কোনো সময়ে শেলী, ব্রাউনিং ইত্যাদি কবির কাব্য পাঠ করিয়া কবি উন্মাদনার সঙ্গে সেগুলি তর্জ্জমা করিয়া মহারাজকুমারকে শুনাইতেন....তিনি মুগ্ধ হইয়া নির্ব্বাক আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইতেন। মাঝে মাঝে কবি তাঁহার নূতন লেখাও তাঁহাদের শুনাইতেন। কিন্তু গল্প বলিবার অপরূপ বাক্যবিলাস ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের প্রতি কবির একান্ত নিজস্ব ভঙ্গীতে তির্য্যক দৃষ্টি সকলকে মোহিত করিয়া রাখিত। তাঁহার অনবদ্য গানের কথা মহারাজকুমার বার বারই বলিয়া থাকেন। কোনো কোনো দিন ব্রজেন্দ্রকিশোর খুব নিরিবিলি আসিয়া দেখিয়াছেন....অতি প্রত্যুষে কি আবেগময় সুরে প্রার্থনা সঙ্গীত গাহিয়া চলিয়াছেন অর্গ্যান বাজাইয়া ।আজও তিনি বলেন, চোখে ভাসে সেই প্রত্যূষের চিত্র। নির্মিলিত নেত্রে অর্গ্যানের সুরে সুর মিলাইয়া "বল দাও মোরে বল দাও" কবি কি আবেগেই গাহিতেছেন...তার মূর্চ্ছনায় চারিদিক ভরপুর.....নীরব নিথর নিশি শেষে পাখীর কাকলিকে যেন সঙ্গীত মাধুরী আরও শ্রবণ-সুখকর করিয়া তুলিতেছিল। আবার এক একদিন মহারাজকুমার প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছেন........

কবির সেই ধ্যান গম্ভীর মূর্ত্তি যেন প্রভাতী সূর্য্যকে বরণ করিয়া লইতেছে। এই সময়ে তাঁহার বিশেষ সতর্কতার সহিত নজর রাখিতে হইত কবির ধ্যানে কোনো বাধা না পড়ে। একদিকে কবির এই গুরুগম্ভীর ভাব আবার তাঁহাদের সহিত বালকোচিত ব্যবহার মহারাজকুমারকে ভাবনার মধ্যে ফেলিয়া দিত। তিনি বলেন, "এই অবস্থার মধ্যে আপনা আপনিই সংযত ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া পরিলাম.......যাহা জীবনের স্থায়ী সম্পদের একটি।"

প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বুদ্ধির খেলার কৌশল কবি আবিষ্কার করিতেন যাহা বালসুলভ চপলতাকে স্তিমিত করিয়া দিত। ব্রজেন্দ্রকিশোর এই খেলার একটি নমুনা দিলেন। উপস্থিত একজনকে দেশের খুব নামজাদা কাহারও নাম মনে মনে স্থির করিতে কবি বলিতেন। আর অন্য সকলে নানাপ্রকার গুণ উল্লেখ করিয়া সেই সব গুণ ব্যক্তিটির আছে কিনা প্রশ্ন করিত। এই পদ্ধতিতে ক্রমশঃ সেই ব্যক্তিটি এবং তাঁহার বিশেষত্বগুলিও ধরা পড়িত। ইহাতে চিন্তাশক্তির প্রসারতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যাইত আলোচনা প্রসঙ্গে।

কোনো কোনো দিন খেলা পালটাইত। একঘরে হরেকরকম জিনিষ সাজাইয়া রাখা হইত। উপস্থিত বালকদের একে একে যাইয়া নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যেই ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া প্রত্যেকে কি কি জিনিষ দেখিল তাহাই কাগজে লিখিতে হইত। কবি সবগুলি পরীক্ষা করিয়া স্বল্প সময়ে কাহার পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা অধিক তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়া দেখাইতেন। আর এক খেলা ছিল...কবি একটি শব্দ বলিয়া দিতেন। উপস্থিত এক একজনকে সেই শব্দদ্বারা বাক্য রচনা করিতে হইত। পরিশেষে বলিতেন, 'এই সব বাক্যের শব্দগুলি হইতে একটি প্রসিদ্ধ প্রবচন বাহির কর।' একদিন...যথা 'ধর্ম্ম তথা জয়' এই প্রবচনটি বাহির হইল ... সকলের সে কি উল্লাস! এই পরিণত বয়সেও এই সমস্ত কথা বালকোচিত উৎসাহে ব্রজেন্দ্রকিশোর ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

এক সন্ধ্যায় কবিকে তাঁহার বিশ্রাম ভবনে গান বাজনায় সম্বর্দ্ধনার কথা স্থির হইয়াছে। স্কুলে ভাল গান গাহিত দুই বালক....কালাচাঁদ দেববর্ম্মা ও প্রফুল্লকুমার মজুমদার। তাহারা যতিবাবুর কাছে দুইটি গান অভ্যাস করিল....কবিরই রচিত...."রাজ অধিরাজ তব ভালে জয় মালা" ও "অয়ি ভুবন মনমোহিনী...." সঙ্গত করিলেন পাখোয়াজ ও খোলে কলেজের অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়। সুললিত কণ্ঠে বালকদ্বয়ের গান ও অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গতে নির্দ্ধারিত সন্ধ্যার মজলিস খুবই জমিয়া উঠিল। কবি আনন্দে উৎফুল্ল। রাজকুমারগণ ও তাঁহাদের শিক্ষক, মহিম ঠাকুর, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যতিবাবু প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত। ছেলেদের গানের পরে মহারাজ বীরচন্দ্র রচিত ও সুর সংযোজিত "জয় জগত বন্দিনি হরি হৃদয় রঙ্গিণি, ব্রজরমণী মুকুটমণি রাধিকে....শ্রীরাধিকে" গানটি গাইলেন বীরচন্দ্রের দরবারের রামকানাই শীল। সেই বৃদ্ধ বয়সেও নিজে বেহালা বাজাইয়া বালক পুত্র রাধাচরণকে লইয়া কবিকে গান শুনাইয়া মুগ্ধ করিলেন। ইহার পর দীর্ঘ আলাপ ও সুরে সেতার বাজাইয়া শুনাইলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

তাঁহার আভিজাত্যপূর্ণ চাল চলন, যন্ত্রশিল্প বিন্যাস ও সময়োচিত রাগিণীর ব্যবহার কবিকে অত্যন্ত প্রীত করিল। এই কাহিনী শ্রীকালাচাঁদ দেববর্ম্মা এই সুদীর্ঘকাল পরেও পূর্ণভাবে বিবৃত করায় লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হইল। রামকানাই শীল বীরচন্দ্র রচিত "মন্দ মন্দ বহত পবন" গানটিও গাহিয়াছিলেন বলিয়া কালাচাঁদ দেববর্ম্মা বলেন। এত কথা তাঁহার স্মরণে আছে কিন্তু দুঃখ করিয়া বলিলেন, "কবি খুবই প্রীত হইয়াছিলেন এইটুকুই মনে আছে, কিন্তু তিনি কি কি যেন বলিয়াছিলেন....বালক বলিয়া তখন মনোযোগ দেই নাই, আজ তাই দুঃখ হইতেছে।" এই সান্ধ্য সম্মিলন সম্বন্ধে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্মৃতি তিনি লেখকের নিকট সম্প্রতি এক পত্রে জানাইয়াছেন। .....তাহাই অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে।

"জুরিবাংলায় আসরের কথা আমার স্মরণ আছে। আমার ঠাকুরদাদার গান(রাম) কানাই শীলের মুখে এবং প্রসন্ন ঠাকুরের সেতার বাজান শুনিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন......আমার ঠাকুরদাদা নাকি ব্রজবুলি ভাষার গানের প্রতি তাঁহার খুবই প্রীতি ছিল এবং এই জন্যই নাকি তিনি কারসিয়াং-এ রবী ঠাকুরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন পুরাতন বৈষ্ণব কবিদের গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশের ভার নিতে এবং বহু অর্থব্যয় করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। বহু বৎসরের কথা কাজেই সব স্মরণ নাই। একজন গোস্বামীকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন, নাম স্মরণ নাই, পাঠ ইত্যাদি করাইয়াছিলেন।"

লক্ষ্য করিবার বিষয় কবির সম্পাদনায় মহারাজ বীরচন্দ্রের বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ ও প্রকাশের অভিপ্রায় রবীন্দ্রনাথের বাচনিক ইহাই প্রথম উল্লেখ।

জুড়িবাংলায় অবস্থান সময়েই মহারাজ রাধাকিশোরের সহিত রবীন্দ্রনাথের নানা বিষয়ের আলাপ হয়। মহারাজ কবির পরিকল্পনা ও কার্য্যে সাহায্য করিতে ব্রতী হইয়াছেন........রাজপারিষদরা তাহা ভাল চোখে দেখিতেছে না। সেই সময় বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা স্থির হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে যোগদান করার অভিপ্রায় তদীয় পিতৃদেব মহারাজ রাধাকিশোরকে জ্ঞাপন করিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর......কবিও এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। তিনি মহারাজকুমারকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা আসিলেন। জোড়াসাঁকো বাড়ীতে মহর্ষিদেবের কাছে কবি তাঁহাকে লইয়া রাধাকিশোর মাণিক্যের সহিত আলোচনার সম্যক কথা বিবৃতি করিলেন। অভিজাত মন মহারাজকুমারের, তিনি বলিলেন...'অভ্যাস বশতঃ, মহর্ষির পদধূলি না লইয়া, হাত জোড় করেই প্রণাম সমাধা করলাম। মহর্ষিদেব আমার মাথায় ও শরীরে হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগদান করার কথা জেনে। যখন তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসি....তাঁর সেই সৌম্য মূর্ত্তির কাছে আপ্‌না থেকেই যেন মাথা অবনত হ'তে চাইল। আমি মাটিতে মাথা রেখে পদধূলি গ্রহণ করলাম। আমার অন্তরের দ্বিধা আভিজাত্যকে দূর করে দিয়ে আমাকে ধন্য করলো।"

বিদ্যালয় আরম্ভের প্রাক্কালে রথীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রকিশোর ছিলেন নির্ব্বাচিত শিক্ষার্থী। কলিকাতা হইতে কবি তাঁহাদের জমিদারী শিলাইদহ কুঠী বাড়ীতে সপরিবারে যাইবার সময় মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। পদ্মার চড়ায় ছেলেদের খেলা জমিয়া উঠিত।

সেদিন বৈকালে পদ্মার চড়ায় সকলে গিয়াছেন, মহারাজকুমার বলিলেন, খেলার জন্য তাঁহাদের ছাড়িয়া দিয়া কবি একাকী বসিয়া রহিলেন বালুকার উপরেই। দৌড়াদৌড়ির মধ্যে তাঁহার লক্ষ্য করিলেন কবি যেন ধ্যানমগ্ন। অস্ত রবির শেষ রশ্মিরেখা পদ্মার জলে পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকিরণ করিতেছিল। ছেলেদের খেলাও সাঙ্গ হইয়া আসিল। গোধূলির রঙিমাও মিলাইয়া গেল। বালকেরাও ঘরে ফিরিতে উচাটন মন। কবি কিন্তু নির্ব্বাক নিস্তব্ধ। যখন তাঁহার ধ্যান ভাঙিল, তখন অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে...ক্ষুধার্ত্ত বালকেরা তাঁহার কাছেই। একটু ব্যস্ত হইয়াই যেন কবি ছেলেদের লইয়া ফিরিলেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর বলিলেন, "সে এক অপরূপ অভিজ্ঞতা...অনুভূতিও।" কবি-গৃহিণীর যত্ন ও আদর তিনি ভুলিতে পারেন না। কতরকম রান্না করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন যেন নিজের ছেলেটি। কবিও মাঝে মাঝে ফরমাইশ দিতেন নানারকম তরকারীর। আরও চমৎকার, 'রান্নার পদ্ধতিও বাৎলাইয়া দিতেন কবি, গৃহিণীকে'...বলিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। কি আনন্দে নিরঙ্কুশভাবে শিলাইদহের দিনগুলি তিনি কাটাইয়াছেন তাহারই স্মৃতি আজ তাঁহাকে মোহিত করে। বিশেষ করিয়া স্বল্প মৃদুভাষী কবি-গৃহিণীর আপন-করা ব্যবহারে তিনি পরিবারের একজন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কবি রাজার ছেলেকে লইয়া জমিদারীতে আসিয়াছেন, তাঁর সম্মানের দিকটাও রক্ষা করিতে ভুলেন নাই। একরকম সভা করিয়াই একদিন মহারাজকুমারকে নিয়া সেখানে পৃথক আসনে উপবেশন করাইলেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর সঙ্কোচে আড়ষ্ট.. অথচ কবির অভিপ্রায়কে লঙ্ঘনও করিতে পারিতেছেন না। বলিলেন, "কয়েকজন কর্ম্মচারী মস্ত বড় এক থালায় অনেকগুলো টাকা এনে আমার সাম্‌নে ধরলো। আমাকে তাদের সম্মাননা প্রদর্শনে কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞাসু বয়ানে কবির দিকে চাইতেই তিনি বলে উঠ্‌লেন...তোমার ভাবনা নেই, আমিই সব ব্যবস্থা করছি।" বালক ব্রজেন্দ্রকিশোর স্বস্তির নিঃশ্বাষ ফেলিলেন। কলিকাতা ফিরিয়াই সেই সব টাকায় দোকানে দোকানে কবি নিজে বাছাই করিয়া অনেকগুলি বই কিনিয়া দিলেন। আর বিশেষ করিয়া বই পড়ার উপযোগিতা কি তাহাও বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। "সেই হইতেই আমার বই পড়ার অভ্যাস ও আগ্রহ যা আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত আছে" ...মহারাজকুমার এখনও বলেন। সেই বারই কবি তাঁহাকে প্রমথ রায় চৌধুরীর কাছে লইয়া যান। চৌধুরী মহাশয় ব্রজেন্দ্রকিশোরকে তাঁহার লেখা 'পদ্মা' ও অন্যান্য কাব্যগুলি উপহার দেন।

আগরতলায় ফিরিয়া কবির যে চিঠি পান তাহাতে "তোমার অধ্যয়নের সুব্যবস্থা জন্য আমার পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না" বলিয়াই আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহারাজকুমারের যাওয়ার পর আগরতলায় নানা কথার অবতারণা হইয়াছে। কাজেই মহারাজের কাছে কবি কোনো প্রস্তাব করিতেছেন না। তিনি ইহাকে 'বিপ্লব' আখ্যা দিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখিলেন 'যতীকে বলিয়া দিবে সেখানকার বিপ্লব শান্তি হইলে আমাকে যেন সংবাদ দেয়'। মহারাজ রাধাকিশোরকে লক্ষ্য করিয়া... " লক্ষীবান পুরুষেরা মহদাশয় হইলেও ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিদের দ্বারা এমন পরিবেষ্টিত যে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের শুভ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়,

তাঁহাদিগকে শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত করা অসম্ভব"...এই বলিয়া পত্র শেষ করিলেন। (১৮ই শ্রাবণ, ১৩০৮)

রবীন্দ্রনাথ তবুও আশা ছাড়িলেন না....১লা অগ্রহায়ণ বোলপুর হইতে আবার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে পত্রে জানাইলেন.......

"মহারাজকে পত্র লিখিয়াছি...তোমার এখানে আসিতে কোন বাধা নাই বলিয়াই ভরসা করি। রথী তোমার জন্য আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। আসিবার সময় তোমার যন্ত্রাদি অর্থাৎ Carpentry, fret work প্রভৃতির হাতিয়ার সঙ্গে আনিয়ো। বাইসিকল ও ঘরে পরিবার বই প্রভৃতিও আনিতে পার। আমরা একজন সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেছি তিনি সর্ব্বপ্রকার হাতের কাজে সুনিপুণ... তিনি ফটোগ্রাফি প্রভৃতিও ভাল জানেন। তুমি আসিলেই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করিয়া দিব। অগ্রহায়ণ মাস উত্তীর্ণ হইতে দিয়ো না।"

পরের ৭ই পৌষ বিদ্যালয়ের পত্তন হইল। কবির আগ্রহ....মহারাজকুমারের শিক্ষা নিজ তত্ত্বাবধানে দান করিবেন...ফলবতী হইল না। একেবারে ছোটবেলা হইতেই ব্রজেন্দ্রকিশোরের কারুশিল্পে দক্ষতার পরিচয় কবি আগরতলায় পাইয়াছেন। সেই জন্যই যন্ত্রপাতি সঙ্গে লইবার জন্য লিখিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কারুশিল্পের নিপুণতা অব্যাহত রহিয়াছে।

উংরেজের আমল...দেশীয় নৃপতির পুত্র যাইবে সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে পড়িতে ...ইহা হইতেই পারে না, নানা রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত হইয়া পড়িল ....ঘরে বাহিরে ইহা ইহা লইয়া নানা জটলা চলিল। মহারাজকুমারের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগদান বন্ধ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, এই ব্যাপারে বালক ব্রজেন্দ্রকিশোর হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার মনের ব্যথা অকপটে নিবেদন করিতেছিলেন পত্র-ব্যবহারে। ইতিমধ্যে মহারাজকুমারকে কুমিল্লায় সাহেবদের ক্লাবে প্রবেশ করান হইয়াছে শুনিয়া কবি দুঃখিত। ....."এই বিজাতীয় বর্ব্বরগুলার অশিষ্ট ঔদ্ধত্য এবং কদর্য্য আচার অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বিশেষতঃ তাহারা আমাদিগকে চায় না আমাদিগকে অবজ্ঞা করে, অথচ আমরা তাহাদের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াই ইহা আমাদের পক্ষে অপমানকর।......অপমানিত জাতির পক্ষে এই সাহেবের সোহাগ লইবার চেষ্টা......... এমন লজ্জাকর দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না।" ...... এক পত্রে কবি ইহাই লিখিয়া পাঠাইলেন। কবির মনোভাব স্পষ্ট।

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিণতি যে ধারা লইয়াছে তাহাতে একদিকে রবীন্দ্রনাথের দুঃখ প্রকাশ ও অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রকিশোরের নূতন পরিবেষ্টনে যথেষ্ট অস্বস্তি চলিতেছিল। "আমার বিদ্যালয়ে তোমার হয়ত না আসাই ভাল। কারণ আমি নিভৃতে লোকের আলোচনার বাহিরে আমার কাজ করিতে চাই। তুমি এখানে আসিলে সহস্র কথার সৃষ্টি হইয়া হট্টগোলের মধ্যে পড়িতে হইবে ; তাহাতে আমার কাজের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।" ...চিঠিতে ইহা বলিয়া বালক মহারাজকুমারের মনে শান্তি দিতে চেষ্টা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের আদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এই পত্রেই বিশদভাবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর্শটুকু ব্যক্ত করিলেন। ইহাতে ব্রজেন্দ্রকিশোরের শিক্ষা গ্রহণ ব্যাপারে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পরিচয় হইল।

"আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জ্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্ম্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই—তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধ মোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাহিরে না হৌক অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর। মনে দৃঢ়রূপে জান যে দারিদ্র্যে অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি আস্‌বাবের অভাবে লেশমাত্র অসভ্যতা নাই। যাহারা ধন সম্পদ বাণিজ্য ব্যবসায় আস্‌বাব আয়োজনের প্রাচুর্য্যকে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে তাহারা বর্ব্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্দ্ধা করে। শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধনমুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও। ইংরাজ শিক্ষক তোমার এই স্বাভাবিক তেজকে ম্লান ও নির্ব্বাপিত করিবার অনেক চেষ্টা করিবে সেই প্রতিকূল চেষ্টায় তোমার তেজ বর্দ্ধিত হইয়া এই দুরূহ পরীক্ষা হইতে তোমাকে উত্তীর্ণ করুক। ভারতবর্ষের আশীর্ব্বাদ তোমাকে রক্ষা করুক, ঈশ্বরের অন্তর্যামী তোমাকে রক্ষা করুক, তোমার নিজের প্রতিভা তোমাকে রক্ষা করুক। বিদেশী শ্রেষ্ঠতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়ো। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

(২৪শে চৈত্র, ১৩০৮)

আশ্রমের আদর্শ ইতিপূর্ব্বে কবি আর কোথাও ব্যক্ত করেন নাই বলিয়া রবীন্দ্র জীবনীকারও এই পত্রাংশ উদ্ধৃতি করিয়াছেন। শিক্ষা ও সঙ্গ প্রতিকূল হইলে যে সঙ্ঘাত অন্তরে সৃষ্টি হয় তাহাকে পরিষ্কাররূপে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে বুঝাইয়া দিলেন কবি এবং সেই বিরোধ হইতে তাহাকে তাঁহার অন্তর্নিহিত তেজ ও বীর্য্য যে রক্ষা করিতেছে ইহাও বলিয়া আদর্শ পন্থা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, নিজের শিক্ষা গ্রহণ ব্যাপারে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আনিয়া দিলেন।

রাজকুমারদের শিক্ষা ব্যবস্থা লইয়া মহারাজ রাধাকিশোরকে কতদূর বিব্রত হইতে হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। বিদেশী শিক্ষক তখনও মনোনীত হন নাই। কিন্তু ১৩০৬ বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই মোক্ষদাকুমার বসু শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া যুবরাজ ও মহারাজকুমারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ব্রজেন্দ্রকিশোরের হৃদয়ে যে শিক্ষার বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহা নব-নিযুক্ত শিক্ষক উপলব্ধি করিলেন সহজেই, তিনি ইহাকেই আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। মহারাজকুমারও নিজে যেন শিক্ষা গ্রহণের নূতন পথ দেখিতে পাইলেন। মহতের আশীর্ব্বাদ জীবনকে রূপায়িত করিতে কেন প্রয়োজন ব্রজেন্দ্রকিশোর উপলব্ধি করিতে পারিয়া নিজকে ধন্য মানিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা তখন যেভাবে তাঁহার কাব্য ও প্রবন্ধাদিতে রূপ পাইতেছিল, ব্রজেন্দ্রকিশোরের সহিত পত্র-ব্যবহারে তাহারই রেশ পাওয়া যাইতেছিল। তাঁহার শিক্ষা ও ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য—এই দুই বিষয়েই কবি মহারাজকুমারের চিন্তার পথকে প্রশস্ত করিতে রত। এমন কি বঙ্গদর্শনে কোন্ প্রবন্ধ ব্রাহ্মণের মনের কথা, কোন্‌টি ক্ষত্রিয়ের কথা তাহাও পত্রে উল্লেখ করিতেন। এইভাবে মনকে দূর হইতে গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব কবি গ্রহণ করিয়াছিলেন মহারাজকুমারের চরিত্রে কি দেখিয়া তাহা তিনিই জানেন।

"বৎস, তুমি ক্ষত্রিয় তাহা কদাপি বিস্মৃত হইয়ো না। কোন শিক্ষায় কোন সঙ্গে তোমার তেজবীর্য্য ও শ্রদ্ধা যেন অভিভূত না হয়। বিদেশীর উপদেশে যদি আমরা নিজেদের হীন বলিয়া মনে করি তবেই আমাদের যথার্থ পরাভব। ইংরাজের শিক্ষায় ক্রমাগতই আমাদের নিজের প্রতি বিশ্বাস ও সম্ভ্রম চলিয়া গিয়া আমাদের মন য়ুরোপের ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছে। সেইজন্য বেশভূষা আহার বিহার গৃহসজ্জা বিলাস উপকরণে আমরা কেবলই ইংরাজের উচ্ছিষ্ট ভোগ করিতেছি। অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম্ম অনাচার হইতে দেশকে সমাজকে রক্ষা করা ইহাই ক্ষত্রিয়ের কুলব্রত। এমন পবিত্র উন্নত ব্রত আর কিছুই হইতে পারে না, ভয় ত্যাগ করিয়া, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া দুঃখকে বরণ করিয়া, দৈন্যকে উপেক্ষা করিয়া, আত্মমর্য্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখিয়া ভারতবর্ষে ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শকে পুনরায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবার ভার তুমি গ্রহণ কর। সেই ভার গ্রহণ করিতে হইলে নিজের সমস্ত তেজকে হোমাগ্নির ন্যায় হৃদয়ের গোপন গুহায় অহরহ প্রজ্বলিত করিয়া রাখিতে হইবে। মহাভারতের ভীষ্ম, অর্জ্জুন ও কর্ণ ক্ষত্রিয়ের আদর্শ। সেই আদর্শটি গ্রহণ করিয়ো। মূল মহাভারতের কালে কালে অনেক বাজে জিনিষ প্রক্ষিপ্ত হইয়া এই মহাকাব্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সমস্ত বাদ দিয়া ইহার মূল কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া চলিলে প্রাচীন ক্ষত্রিয় সমাজের সহিত পরিচিত হইতে পারিবে। মহাভারত যে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।"

(৭ই বৈশাখ, ১৩০৯)

কী বীর্য্যবান আদর্শবাদের কথা। কিন্তু কি ধিক্কারই দিতেছেন কবি 'আমরা কেবলই ইংরাজের উচ্ছিষ্ট ভোগ করিতেছি' বলিয়া। রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত বাণী একদিকে যেমন ব্রজেন্দ্রকিশোরের মনকে উৎসাহ উদ্দীপনায় আলোড়ন করিতেছিল তেমনি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা চলিতেছিল গৃহশিক্ষকের সহিত। ত্রিপুরার বাহিরে গেলে শিক্ষক প্রায়ই সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহার সহিত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের কাছে যাইয়াও নানা আলাপ আলোচনায় জ্ঞান-বৃদ্ধির সুযোগ পাইতেছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। সবই যে কবির প্রেরণায় সম্ভবপর হইতেছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বাহিরে ভদ্র সমাজে এই ভাবে মেলামেশার সুযোগে তাঁহার চালচলন ও দৃষ্টিভঙ্গী বহুলভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল--তিনি বলেন। বিশেষতঃ উত্তরকালে এই পরিচিতি তাঁহাকে দেশের নানা মঙ্গলকর্ম্মের সহায়ক করিয়াছিল।

শ্রোতার আগ্রহ যেমন বক্তাকে অনুপ্রাণিত করে, বক্তাও তেমনি শ্রোতার রসানুভূতিকে রূপায়িত করিবার জন্য জীবনের নানাভাবের দ্যোতনাকে তাহার কাছে সহজ সরলভাবে তুলিয়া ধরেন। যৌবনের প্রারম্ভে চিত্তবিক্ষেপকে ঠিক পাথেয় নির্দ্দেশ--এই অমূল্য পত্রগুলির যথার্থ দান। এই কারণেই পত্রসম্ভার হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন বোধ হইতেছে।

এই বৎসর (১৩০৯) কবি বহু পত্র ব্যবহার করিয়াছেন ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে। অসুস্থ হইয়া তিনি গিয়াছিলেন শিলাইদহে। সেখান হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া লিখিতেছেন--

"আমি আমার বিদ্যালয়ের কাজ লইয়াই ব্যাপৃত আছি। বেশ শান্তির সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ চলিয়া যাইতেছে। কেবল অর্থাভাবে ও যন্ত্রাভাবে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। তুমি কাঠের কাজ অভ্যাস করিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম।

আমার এখানে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিক্ষার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার নাম হোরি--নিজকে সে চিদানন্দ নাম দিয়াছে। বড় নম্র শান্ত প্রকৃতি--তাহার অধ্যবসায় দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্বদেশ ও স্বজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া এই দূর দেশের প্রান্তে মাঠের মধ্যে একাকী সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নের কঠোর চেষ্টা বড় বিস্ময়কর। তাহার সৌম্য মূর্ত্তি ও বিনীত ব্যবহারে এখানকার ভৃত্যেরাও মুগ্ধ হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মূল সংস্কৃত গ্রন্থে অধ্যয়ন করাই তাহার উদ্দেশ্য। সংস্কৃত শিখিতে তাহার সুদীর্ঘকাল লাগিবে। কারণ সংস্কৃত শব্দ সে উচ্চারণই করিতে পারে না--বার বার বিফল হইয়াও সে হতোদ্যম হয় না। মধ্যে তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল কিন্তু তাহার উৎসাহ হ্রাস হয় নাই। তুমি যদি এখানে থাকিতে, এই জাপানী ছাত্রের সহিত নিশ্চয় তোমার বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইত।

আশা করি তোমার পড়াশুনা অগ্রসর হইতেছে। আগামী মাসের বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষের ইতিহাস নামে আমার একটি প্রবন্ধ বাহির হইবে, মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিয়ো।''

(১৩ই শ্রাবণ, ১৩০৯)

বিদেশী শিক্ষার্থীদের মধ্যে হোরি সানই ছিলেন অগ্রদূত। রবীন্দ্র-জীবনীকার তাঁহার সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা কবি লিখিত পত্রখানার পরিপূরকভাবে জ্ঞাতব্য। তখনকার জাগ্রত জাপানের তরুণ আদর্শবাদী শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরার ব্যবস্থাপনায় হোরি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যোগদান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখিতেছেন--''হোরি সান--সম্ভ্রান্ত সামুরাই বংশে তাঁহার জন্ম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রথম বিদেশী ছাত্র তিনি। হোরি না জানিতেন ইংরেজী, না জানিতেন অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা। কিন্তু কি নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জ্জন শুরু করিলেন। অকালে পাঞ্জাব ভ্রমণে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি অতি সামান্য....কিন্তু ভারতের ও পূর্ব্ব এশিয়ার বিস্তৃত আধ্যাত্মিক যোগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে জাপানের ইহাই প্রথম প্রয়াস।''

(রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, ৪২৬ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় আদর্শ ক্ষাত্রধর্ম্মে ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের মন আকৃষ্ট হইতেছিল।--ইংরাজ তত্ত্বাবধানে হইলেও, নিজে চেষ্টা করিয়া Cadet Corps-এ যোগদান করিবার সম্মতি আহরণ করিলেন পিতা মহারাজের নিকট হইতে। ইহাও তিনি যথাসময়ে কবিকে নিবেদন করিতে ভুলেন নাই। পূর্ব্বে লিখিত পত্রখানার তিনদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন-

''তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। Cadet Corps-এ প্রবেশ করিয়া তুমি ক্ষত্রিয় সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবে ইহা কল্পনা করিয়া আমার আনন্দ হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজপুত্র ইংরাজ শিক্ষক সংসর্গে আপন জাতীয়ত্ব, এমন কি, মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে--তাহারা আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়াছে, স্বদেশীর প্রতি বীতরুচি হইয়াছে, স্বজাতির ভাষা সাহিত্য শিল্পের প্রতি তাহাদের অবজ্ঞা জন্মিয়াছে।--দিবারাত্রি জুয়া খেলিয়া, মদ খাইয়া, নাচিয়া ইংরাজের প্রমোদ সভায় অহোরাত্র উন্মত্তভাবে সঞ্চরণ করিয়া নিজকে সর্ব্বতোভাবে হেয় করিয়াছে -- ইহারা বিজাতীয় স্পর্দ্ধায় স্ফীত হইয়া রক্তবর্ণ বিস্ফোটকের মত ভারতবর্ষের বক্ষশোণিত বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। তোমাকে এরূপ মত্ততা কখনই অভিভূত করিবে না, তাহা আমি নিঃসন্দেহ জানি। তুমি সংযত অপ্রমত্ত থাকিয়া সুদৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে, যাহা গ্রহণ করিবার একাগ্র মনে গ্রহণ করিবে কিন্তু সংসর্গের আকর্ষণে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়ো না। কাহারো স্তুতিনিন্দায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ধৈর্য্যের সহিত স্তব্ধভাবে নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে

ভারতবর্ষীয় পবিত্র ক্ষাত্রধর্ম্মের নির্ম্মল হোমানলকে সর্ব্বপ্রকার ইন্ধনের দ্বারা সর্ব্বদাই জাগ্রত রাখিবে। তোমার সেই চিরসঞ্চিত তেজ কেবল তোমার অন্তর্যামীর এবং তোমার অন্তর্দৃষ্টির গোচর থাকিবে সে আর কেহ জানিবে না। সেইখানেই তোমার ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠা, সেইখানেই তোমার ইষ্টমন্ত্রের সাধনা। ত্রিভুবন দেবতার যে তেজ জ্যোতিরূপে সমস্ত বিশ্বজগতে বিকীর্ণ হইতেছে এবং যে তেজ বুদ্ধি ও চেতনারূপে তোমার অন্তঃকরণে দীপ্যমান রহিয়াছে প্রাতঃকালে গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা তোমার অন্তর্বহির্ব্যাপি সেই মহাতেজকে স্মরণ করিবে, অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিবে। সেই তেজের দ্বারা প্রতিদিন তোমার অভিষেক হইবে। প্রাতঃকালে সূর্য্যের যে আলোক দেখিবে তাহা যেন প্রতিদিন তোমার অন্তঃকরণকে নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে, তাহাকে সমস্ত দিনের মত তোমার দেহমনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিবে। তোমাকে কোন পাপ স্পর্শ করিবে না, কোন গ্লানি তোমাকে আক্রমণ করিবে না, চতুর্দ্দিকের সমস্ত ধূলি পঙ্কের মধ্যেও সুরধুনিধারায়াত তরুণ দেবকুমারের মত তুমি অম্লান সুন্দর নির্ম্মলতা লইয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারিবে। তোমার গৌরব কিছুতেই ক্ষুণ্ন হইবে না। ঈশ্বরের কাছে তোমার জন্য একান্ত মনে এই প্রার্থনা করি।"

(১৬ই শ্রাবণ, ১৩০৯)

সত্যদ্রষ্টার কি উদাত্ত গম্ভীর সাবধানী আহ্বান--প্রতি তন্ত্রীতে ইহার মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত হয়। এই সমস্ত বাণী কেবলমাত্র মহারাজকুমারকে নহে সমগ্র রাজ পরিবারকে বর্ম্মরূপে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিয়াছে-- ইহাই ত্রিপুরার রাজকুলকে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ দিয়াছে। প্রতি পদক্ষেপে, বলিতে গেলে, কবির নির্দ্দেশ ব্রজেন্দ্রকিশোরকে মঙ্গলপ্রদ পথ দেখাইয়া দিয়াছে। Cadet Corps-এ তিনি যোগদান করিলেন সত্য নিজকে সেখানে সকলের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পারিলেন না। কাজেই মানসিক সঙ্ঘাত লাগিয়াই রহিল। ইংরাজ মিলিটারী শিক্ষকের মেজাজ মত নির্দ্দেশ তাঁহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। মীরাটেই বেশী দিন তাঁহাদের কাটাইতে হইল। মহারাজকুমার বলেন, তখনকার পার্ব্বত্য ত্রিপুরা হইতে আগত রাজকুমারকে মীরাটের নায়কবর্গ কোনো 'জংলী' বলিয়াই মনে করিতেছিল। সেখানে তিনি নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে নিজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই চলিতেছিলেন। সেখানকার অপমানকর আদেশাদির ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা ও কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার সার্থকরূপ উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার প্রভাবেই সেখানকার অপমানকর রীতিনীতির পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই হইতেই তিনি ভারতীয় রাজন্যবর্গের বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া ত্রিপুরাকে সুপরিচিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কার্ত্তিক মাসে লেখা ছোট একখানা চিঠিতে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে কবি অন্তরে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবনকে সার্থক করিতে কি ভাবে চিন্তা করিতেছেন তাহাই সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে।

"আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। তুমি মহৎ হইবে, বীর হইবে, তুমি আমাদের আর্য্য পিতামহদিগের ঋণ পরিশোধ করিবে এই ইচ্ছা আমি সর্ব্বদাই হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছি। আমি বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যখন কিছু লিখি তুমি আমার স্মরণপথে জাগরুক থাক। তোমাকে আমি নিকটে রাখিতে পারি নাই কিন্তু আমার হৃদয়ের স্নেহের দ্বারা তোমাকে আমি অভিষিক্ত করিয়াছি। তোমার জীবন সার্থক হউক ঈশ্বরের কাছে আমি এই প্রার্থনা করি।"

(১লা কার্ত্তিক, ১৩০৯)

এইকালে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিন কাটাইতেছেন। শিলাইদহ হইতে বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশের পর শান্তিনিকেতনে আসিলেন সপরিবারে। কবি গৃহিণী মৃণালিনী দেবী নিজে রন্ধন করিয়া অন্যাকে খাওয়াইতে বড়ই ভালবাসিতেন। বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের ছেলেদের সঙ্গে থাকে, খায়। তাই তিনি বিদ্যালয়ের সকল ছেলের জন্যই রোজ বৈকালিক আহারের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। শরীর যখন খুবই খারাপ হইয়া পড়িল কবি সকলকে লইয়া কলিকাতা আসিলেন। সেখানেও দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ওদিকে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম কবি নিজে না থাকায় শিথিলভাবে চলিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদে নানা অন্তরায় দেখা দিল অধ্যাপকদের কর্ম্মাবলীতে। দেশের তখনকার আবহাওয়ার মধ্যে কবি মনের প্রতিক্রিয়াও তাঁহাকে রূপ দিতে হয় নানা সভা সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া-বঙ্গদর্শনের চাহিদা তো আছেই। তাঁহার ব্যক্তিগত দুঃখের কথা কেইবা জানিতে চায়। অর্থাভাব খুবই বেশী। "ব্যাঙ্কে এখন আমার এক বৎসরের সঙ্গতি নাই, বৎসর শেষে বোধহয় অনেক টাকা অনটন পড়িবে। আমি নিজের লেখা-পড়ার জন্য একটি নিভৃত ঘর তৈরী করার সংকল্প করিয়াছিলাম তাহাও আপাতত স্থগিত রাখিয়াছি, যদি অর্থের সচ্ছলতা ঘটে তবে দেখা যাইবে।" (রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, ৪২ পৃঃ)

এই অবস্থার মধ্যে কবি গৃহিণী ঊনত্রিশ বৎসরে দেহ ত্যাগ করিলেন ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯ সনে। গৃহলক্ষ্মীর তিরোধান সত্ত্বেও কবির কাব্যলক্ষ্মীর সেবা অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতির অসাধারণত্বের পরিচয় বিস্ময়মুগ্ধ করে। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর কবির কাছে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে চিঠি লিখিলেন। কবি গৃহিণীর স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিল বিশেষ করিয়া, শিলাইদহে সেই কয়েক দিন অবস্থানের। তিনি বলিলেন, "কী তার স্নেহ, কী তার আপন করে নেওয়ার বাস্তবতা - আমাদের মিথ্যা আভিজাত্যের মুখোস দূর হয়ে গেল তাঁর স্নেহমঙ্গল আবরণে। তাঁর অভাব আমি নিবিড়ভাবে আজ অনুভব করছি।" কবি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর-

"তোমার পত্রখানি পাইয়া আমার হৃদয় স্নিগ্ধ হইল। তুমি অল্পদিন [illegible] তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছ। তাঁহার স্বভাব মাতৃভাবে পূর্ণ ছিল এবং তিনি [illegible] বিদ্যালয়ে তুমি আসিবে এবং তাঁহার [illegible] তিনি [illegible] প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার কাছে থাকিলে [illegible] অনুভব করিতে পারিতে না ইহা নিঃসন্দেহ।

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন সেই শোককে তিনি নিষ্ফল করিবেন না। তিনি আমাকে এই শোকের দ্বার দিয়া মঙ্গলের পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।

তোমার কল্যাণ-কামনা আমার হৃদয়ে [illegible] তুমি [illegible] দিয়া পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাক। স্বদেশের [illegible] ইহাই আমি একান্ত চিত্তে কামনা করি।"

(১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯)

কবির চিত্তের পরিধি দুর্জ্ঞেয়। শোকসন্তপ্ত হৃদয়েও ব্রজেন্দ্রকিশোরের কল্যাণ কামনায় ভুল নাই। এই চিঠিখানা পাওয়ার পর ব্রজেন্দ্রকিশোরের ব্যথিত পরাণ যে কতদূর শান্তি লাভ করিয়াছিল--তাহা তিনি আজও এই পরিণত বয়সে স্মরণ করিয়া থাকেন। মানুষের শাশ্বত শোকানুভূতির মধ্যেও যে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে--এই বাক্যগুলি মহারাজকুমারের মনে এক নূতন আলোকসম্পাত করিল সাংসারিক দুঃখ দৈন্যে। তিনি বলেন, "নিজ পরিবারে ও আত্মীয় বন্ধু বিয়োগে সর্ব্বদাই কবির এই অনুভূতির কথা মনে এসে আমাকে শান্ত সমাহিত থাকতে বলদান করতো। যতই ভাবি--আমার অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। এর চাইতে মুখে প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।"

ব্রজেন্দ্রকিশোর ক্যাডেট্ কোরে যোগ দিয়া মীরাটে যাইতেছেন শুনিয়া কবি খুবই আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি নিজে পীড়িত, দুর্ব্বল, পীড়িতা কন্যাকে লইয়া উদ্বিগ্ন। তথাপি হাজারিবাগ হইতে চিঠি লিখিলেন--'সংসারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করিয়া আমার একটি মাত্র কাজে জীবনকে উৎসর্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।' বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য অনেক লাঞ্ছনা ও কদাচিৎ মুষ্টিভিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তিনি বিশেষ করিয়া জানাইলেন--

> "শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ১৫০ টাকা মাত্র বেতন পান কলিকাতায় বাসাভাড়া করিয়া তাঁহাকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়-- তিনি একদিন বোলপুরে আসিয়া নিঃশব্দে আমাকে ১০০০ এক সহস্র টাকা দিয়া গেলেন। ঈশ্বর অক্ষমকে দিয়াই নিজের কার্য্য আশ্চর্য্যরূপে অভাবনীয়রূপে সম্পন্ন করেন ; ইহাতেই তাঁহার মহিমা প্রকাশ পায়। এই ঘটনার পর হইতে আমি ভিক্ষার ঝুলি ফেলিয়া দিয়া নিজের প্রাণপণ যত্নে প্রভুর কাজ বলিয়া আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছি।"(৭ই চৈত্র, ১৩০৯)

'অপটু শরীরে আনন্দের আবেগে' মহারাজকুমারের 'মঙ্গলের প্রতি নিষ্ঠা, স্বদেশের প্রতি ভক্তি' আছে--এই জন্যই আশা আনন্দের কথা তাঁহাকে জানাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। এই অপ্রত্যাশিত দান আসিয়াছিল অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় হইতে। তাঁহার সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থ' সুপরিকল্পিতভাবে প্রকাশ পায়। সেন মহাশয় কিছুকাল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যক্ষের কাজে দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

কবি আলমোড়া গিয়াছেন অসুস্থ কন্যাকে লইয়া--সাংসারিক দুঃখ যেমন ছাড়িতেছে না তেমনি 'বিদ্যালয়ের জন্য সর্ব্বদাই চিত্ত উদ্বিগ্ন'। কন্যার সুস্থতা লাভের পূর্ব্বেই কলিকাতা ফিরিতেছেন। বোলপুরে যাইবেন। মহারাজকুমারের কাছে পত্রে এইসব খবরের সঙ্গে জানাইতেছেন--'মহারাজকে এখান হইতে (২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০) একজোড়া ভাল চমরীপুচ্ছ পাঠাইয়াছি পাইয়াছেন কিনা খবর পাই নাই। যতীকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়ো'। নানা চিন্তা ভাবনা ও কাব্যলক্ষ্মীর ধারাবাহিক সেবার মধ্যেও মহারাজের কথা সর্ব্বদা হৃদয়ে আছে বলিয়াই সময় ও স্থানানুগ উপহার পাঠাইতে কবি ভুলিলেন না।

বীরেন্দ্রকিশোর তখন যুবরাজ। তাঁহার স্বভাবজ শিল্পবোধ সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পে রূপায়িত করিতে নিবিষ্ট। তাঁহার চারিদিকে সর্ব্বদাই শিল্পী সমাবেশ। তাঁহার বংশী

এবং সেতার, এস্‌রাজে পারদর্শিতা ছিল অনন্যসাধারণ। নিজেদের অবসর বিনোদনের পক্ষে যথেষ্ট তাঁহার বাজনার কয়েকখানা রেকর্ড করা হয়--কিন্তু সাধারণ্যে উহা প্রচার ও বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া ছিল না। বাদ্যযন্ত্রের শব্দতরঙ্গ যাহাতে অধিক অনুরণিত হয়-- তাঁহার উদ্ভাবনী নিদর্শন এখনও রাজপ্রাসাদে বিদ্যমান। বীরেন্দ্রকিশোরের অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বংশীবাদন প্রভৃতি তৈলচিত্রগুলি চিত্রশিল্পীদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু।

মহারাজ রাধাকিশোরকে যখন কলিকাতায় 'ভারত সঙ্গীত-সমাজ' এ অভ্যর্থনা উপলক্ষে 'বিসর্জ্জন' নাটক অভিনীত হয় তখন বীরেন্দ্রকিশোর ও ব্রজেন্দ্রকিশোর দুই ভাই উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ও অন্যান্যের অভিনয় বিশেষভাবে ত্রিপুর রাজবংশের ইতিহাসের কাহিনীর রূপায়ণ বীরেন্দ্রকিশোরের খুবই ভাল লাগিয়াছিল। সেই সময় হইতেই ত্রিপুরায় 'বিসর্জ্জন' অভিনয় করাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন তাঁহার সঙ্গী ও পারিষদের সহযোগে। কলিকাতায় অভিনয়ের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া 'বিসর্জ্জন'-এর প্রথম অভিনয় হইল রাজবাড়ীতে বীরচন্দ্র লাইব্রেরী গৃহে। অভিনয়োপযোগী করিয়া গৃহটিতে নানা পরিবর্ত্তনও সাধিত হইল। সাজ সজ্জার অভাব হইল না, এমন কি নারী ভূমিকায় যাহারা অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহাদের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি রাজ-অন্তঃপুর হইতে সরবরাহ করা হয়। সর্ব্বরকম পারিপাট্যে ও অভিনয়ে সকলকেই আনন্দদান করিয়াছিল। অভিনয়ে যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকালাচাঁদ দেববর্ম্মা এখনও জীবিত--তাঁহার স্মৃতি হইতেই অভিনয়ের মূল অংশগ্রহণকারীদের নাম জানা গিয়াছে। -ইহা ১৩১১ সনের কথা ।--

গোবিন্দ মাণিক্য	--	রতিরঞ্জন দেববর্ম্মা
রঘুপতি	--	অটলচন্দ্র মিত্র
জয়সিংহ	--	যাদবচন্দ্র দেববর্ম্মা
গুণবতী	--	বিপিনবাবু (শ্রীপাটে থাকিতেন)
অপর্ণা	--	শ্রীকালাচাঁদ দেববর্ম্মা।

ইহার পর "বিসর্জ্জন" নাটকটি অনেকবার অভিনীত হইয়া গোবিন্দ মাণিক্যের পুণ্য স্মৃতিকে জনমানসে জাগরূক রাখিয়াছে। সেই অবধি এখানকার অনেকের ইতিহাসের এই অধ্যায়ে ঔৎসুক্য।

এদিকে ক্যাডেট্ কোর হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেশে ফিরিয়াছেন। কবি তখন গিরিডিতে--বন্ধু শ্রীশ মজুমদার মহাশয়ের আতিথ্য ভোগ করিতেছেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধার ও নিজের কাছে কয়েকদিন রাখিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া মহারাজকে কবি অনুরোধ করিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোরকে যেন গিরিডি পাঠানো হয়। মহারাজকুমারের সেখানে যাওয়ার সংবাদ মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত (২৫ভাদ্র, ১৩১১—বিশ্বভারতী পত্রিকা—চৈত্র ১৩৪৯) কবির পত্রে জানা যায়--"আগামী সোমবার যতী ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমারকে লইয়া এখানে আসিতেছেন--তাঁহাদের জন্য একটি বাড়ি ঠিক করিয়াছি।"

গিরিডির দিনগুলি যেভাবে কাটিয়াছিল তাহার কথা রোমন্থন করিয়া আজও ব্রজেন্দ্রকিশোর কতই না আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি বিশেষ করিয়া বলেন- ''সারাদিনই বলতে গেলে কবি ইংরাজী বাংলা বইয়ের অংশ বিশেষ পাঠ বা আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করে রাখতেন। এর ওপর তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি ও গান যাঁরা শুনেছেন--তাঁরাই জানেন সে কি অপরূপ এবং মাদকতা মাখানো। আমাদের অবস্থান সময়েই কবির বিখ্যাত ''শিবাজী'' কবিতা লেখা হয়েছে আবৃত্তি করে আমাদের সকলকে শুনিয়েছেন ও সেটি বঙ্গদর্শনে ছাপবার জন্য দিয়েছিলেন। ছাপা হয়ে যেদিন এলো আমার আজও মনে পড়ে--অমন মাটির মানুষ--কেন এবং কেমন করে হঠাৎ অমন রেগে গেলেন। ব্যাপার হলো, ছাপায় কোথায় একটি 'আ'-কার বেশী পড়ে গিয়েছিলো। বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্রকে অনেক কিছু শুনতে হলো তিনি চুপ। আমরা তো সব অবাক। তাঁর সব কাজই নিখুঁত করে করবার অভ্যাস--তাই সহ্য করতে পারেন নি এই ছাপার ভুল। কবির চরিত্রের এ মস্ত একটা দিক--যা আলোচনার যোগ্য।

''কবির ছোট্ট ছেলে শমী ফিরে গেছেন কলকাতায়। তাঁর একখানা চিঠি এলো একদিন। আমাদের সকলকে ডেকে পড়ে শোনালেন। শমী গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে গঙ্গার বর্ণনা করেছেন চিঠিতে বাবার কাছে লিখে। অত ছোট্ট ছেলের কি চমৎকার ভাষা। কি বর্ণনার পারিপাট্য। কবির কি আনন্দ। বলে উঠলেন 'ও আমার নাম রাখবে'। কে জানতো তখন শমীর দিন যে ফুরিয়ে আসছে।

''আর একদিনের কথা। হঠাৎ মোহিত সেন ম'শায় এসে হাজির। গিরিডিতে কিছুদিন এসে থাকবার কথা ছিলো, তখনও হয়ে ওঠেনি। তিনি কলেজের অধ্যাপক, কলেজ খোলা। ইনিই সেই দরিদ্র শিক্ষক যিনি তাঁর সামান্য পুঁজি আশ্রমের অনটনে দান করেছিলেন। তাঁকে অসময়ে দেখেই কবি কেন যেন সন্দিগ্ধ হলেন। সকলের সঙ্গে খেতে বসলেও কবি নিজে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বললেন 'সর্বনাশ, জ্বর হয়েছে--কলকাতার বাড়ীতে খেতে দেয়নি বলে এখানে পালিয়ে এসেছেন'--ভাত খেতে দিলেন না- রুগীর পথ্য ব্যবস্থা হলো। কবি বেশ রসিয়ে রসিয়ে মোহিতবাবুর খাওয়ার প্রতি অত্যধিক প্রীতির কথা সকলকে জানিয়ে দিলেন। বেচারা অধ্যাপক--মুখ নীচু করে বসে রইলেন, কোনো কথাই বললেন না। এই ভাবেই ওখানকার দিনগুলো কাটছিল। ছোট্ট ছোট্ট কথা -ঘটনা কি করেই না আমাদের কাছে তুলে ধরতেন-বিচিত্র রূপ দিয়ে। কবি এই সব কথা, আলোচনায় নানা ভাবে দেশের কাহিনী সম্ভার আমাদের কাছে উজার করে দিতেন। এইভাবে, কত শিক্ষাই পেয়েছি--তখন জানতে পারিনি।

''কবির সঙ্গে বেড়ানো--গিরিডিতে--আর এক আনন্দ। 'পথ চলাতেই আনন্দ' উপলব্ধি হয়েছিলো। পদ-যাত্রাকে তিনিই স-রব করে রাখতেন। আশে পাশের গাছ গাছড়া, মাটির কথা--ফুল-পাতা, পাখী কারো কথা বলতে বাদ দিতেন না--চলতে চলতে। প্রকৃতিকে কি নিবিড়ভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন--তা সহজেই ধরা পড়তো; আজ খুবই অস্পষ্টভাবে অনুভব করছি। ছোট হলেও ''উশ্রী'' -প্রপাতটি সকলকে খুবই আকর্ষণ করে।

কবি তার নব-নামকরণ করলেন 'অশ্রু' -- তারই বা কত ব্যাখ্যা ! আজ এই অবসাদগ্রস্ত প্রাণ কি উচ্ছলতা এনে দেয় সেই আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলির কথা স্মরণ করে !"

গিরিডিতে নিয়মিত আহার বিহারের ফলে ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইল। সেখান হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া মহারাজকুমার তদীয় শিক্ষক মোক্ষদাকুমার বসুর সহিত বুদ্ধগয়ার পথে কবির সহযাত্রী হইলেন -- আশ্বিনের শেষ সপ্তাহে। সঙ্গীদল বেশ বড় -- মহারাজকুমার বলিলেন -- স্ব- পত্নীক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা, ঐতিহাসিক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, আনন্দমোহন বসুর দুই কন্যা, রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষ মজুমদার প্রভৃতি। মহিম ঠাকুরও সঙ্গী হইয়াছিলেন তাঁহার মনে হয়। বৌদ্ধদের কি যেন মতদ্বৈধতা হইয়াছিল -- তাহারই নিরসনের প্রয়াস এই যাত্রায় -- মহারাজকুমারের ইহাই স্মরণে আসিতেছে। মনীষীদের সমাগমে এই তীর্থ স্থানে এক অপূর্ব্ব পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিবিষ্ট মনে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ইতিহাস লইয়া জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা, অধ্যাপক যদুনাথ, কবি আরও সন্ন্যাসী কয়েকজন আলোচনা করিতেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর, রথীন্দ্রনাথ ও আর সকলে মুগ্ধ হইয়া আলোচনা শুনিয়া যাইতেন। একদিকে এই গুরুগম্ভীর আলোচনা বুঝিবার মত জ্ঞান তখনও তাঁহাদের হয় নাই -- কিন্তু অন্যদিকে নিয়মিত আরাধনায় মন্ত্র উচ্চারণে যে পবিত্রতা ও নিষ্ঠা ভিক্ষুদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার কথা কেহই তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। সন্ধ্যায় মন্দির গবাক্ষে গবাক্ষে দীপদান চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে যেন মূর্ত্ত করিয়া তুলিত -- ইহা মহারাজকুমারের মনে স্থায়ী রেখাপাত করিয়াছে। তিনি মন্দিরাদি ও সঙ্গীদের বহু আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন -- একখানিও খুঁজিয়া এখন পাইতেছেন না বলিয়া দুঃখ করিলেন।

মহিলারা যাঁহারা গিয়াছিলেন সকলেই ব্রাহ্মিকা -- তাঁহারা মহারাজকুমারকে ধরিলেন গয়ায় "বিষ্ণুপাদপদ্ম" তাঁহাদের দর্শন করাইবার জন্য। তাই, ভয়ে ভয়ে তাহাদের লইয়া মন্দিরের পথে মহাদেবের বাহনদের এড়াইয়া যাওয়ার সময় ব্রজেন্দ্রকিশোর পাণ্ডার হাতে পড়িলেন। পাণ্ডা তাঁহার চেহারা দেখিয়াই ত্রিপুরার রাজপরিবারের বলিয়া চিনিয়া ফেলে। মহারাজকুমার ব্রাহ্মিকাদের লইয়া বিব্রত হইবেন চিন্তা করিয়া পাণ্ডাকে "আমার বাবা, মা জীবিত, কাজেই আমি কোনো ক্রিয়া করবো না" বলিয়া হটাইয়া দিলেন এবং নির্ব্বিবাদে দর্শন সারিয়া ফিরিলেন।

এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রকিশোর ভগিনী নিবেদিতার কথা বিশেষ ভাবে স্মরণে আনেন। ইংরাজ মহিলা -- নিজের দেশের, নিজের জাতির আচার ব্যবহার ও এদেশে তাহাদের চালচলনে দোষগুলিকে কি ঘৃণার চোখেই দেখিতেন ; সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ব্যবহারে মানবতার পরিচয়কে কত বড় করিয়া, কত হৃদয়স্পর্শী করিয়া ব্যক্ত করিতেন তাহা অনুধাবনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কবি সঙ্গী বলিয়াই এই মহীয়সী মহিলাকে দর্শন ও জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল -- মহারাজকুমার ব্যক্ত করিলেন। "ভগিনী নিবেদিতা আমার কাছ থেকে ত্রিপুরার নারীর কথা শুনবার আগ্রহ করতেন।

দেশের অন্যান্য কথার মধ্যে দুই মহীয়সী বীরাঙ্গনার কথা বলেছিলাম। আমাদের রাজ-অন্তঃপুরে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক কাহিনী উপাখ্যান আমাদের ছোট বেলা থেকেই শোনাবার ব্যবস্থা ছিলো। মুসলমানেরা ত্রিপুরা আক্রমণ করেছে। তখনকার মহারাজ প্রতিরোধ করতে পারবেন না বলে যুদ্ধ থেকে বিরত। দেশ পরাধীন হবে--বীর প্রজাদের আকুল আহ্বানে মহারাণী বিচলিত। মহারাণী নিজে খোলা তলোয়ার নিয়ে হাতীর উপর থেকে সেনা পরিচালনা করে দেশ থেকে শত্রু বিতাড়ন করলেন। আর এক মহারাণীর কাহিনীও ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলাম। স্বামী-মহারাজ দেহত্যাগ করেছেন--সহমৃতা হওয়া প্রথা। কিন্তু অপরিনতবয়স্ক যুবরাজ। তখনই রাজ্যভার গ্রহণ করলে স্বার্থান্ধদের হাতের পুতুল হয়ে পড়বে--এই ভয়ে তখনই তিনি স্বামীর চিতায় আরোহন করেন নি। নিজের হাতে রাজ্যের শাসন সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করে ছেলেকে রাজ্যশাসন পদ্ধতি শিক্ষা দিতে লাগলেন। স্বামীর চিতা জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ছিলো। পুত্রকে যখন রাজ্যশাসনে উপযুক্ত মনে করলেন--তখনই তিনি স্বামীর সেই প্রজ্বলিত চিতায় প্রবেশ করে সহমৃতা হওয়ার প্রথা রক্ষা করে দেশাত্মবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে অমর হয়ে গেছেন । আমি কোনও রকমে কাহিনী দু'টি বলেছিলাম কিন্তু তাতেই ভগিনী নিবেদিতা যে কতখানি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন--সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও অনুভব করেছিলেন। তখনকার দিনে ভারতীয় নারীদের পরদা প্রথা দেখেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন কিন্তু কাহিনীর মহিলাদের আচরণে তাঁর কাছে ভারতীয় নারীত্বের এক অভিনবরূপ প্রকট হলো বলে আমাকে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে জানালেন।" ত্রিপুরার ইতিহাসের মহারাণী ত্রিপুরা সুন্দরী ও মহারাণী জয়াবতীর কাহিনী ভারতীয় নারীত্বের গৌরব-অধ্যায় দুইটি।

ব্রজেন্দ্রকিশোর বলিলেন, সম্ভবতঃ এইবারই কলিকাতায় ফিরিয়া একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন কবি খুব নিবিষ্টমনে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা কয়েকখানি ছবি দেখিতেছেন। ছবি কয়েকটি কবির কাব্যের কয়েক পংক্তির অলঙ্করণ চিত্র। পংক্তিগুলির অর্ন্তনিহিত ভাবের অভিব্যক্তি করিতে করিতে চিত্রগুলির বর্ণ-বিন্যাস লইয়া কবি যেভাবে আলোচনা করিলেন তাহাতে শিল্পাচার্য্যেরও যেন নুতন দিগ্‌দর্শন হইল বলিয়া মহারাজকুমার অনুভব করিলেন। যেন শিল্প--বস্তু অনুধাবনের এক নুতন ভঙ্গী তিনি লক্ষ্য করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার শিল্প-বোধের সহায়করূপে পর্য্যবেক্ষণ প্রখরতর করিবার জন্যই যেন কবির সেইদিনকার বিশদ আলোচনা। ইহার দুই যুগ পরে কবি চিত্রাঙ্কনে যে নুতন পথ ধরিবেন তাহা কি কেহই অনুমান করিয়াছেন ? কবিও শিল্পী কেহই মরজগতে নাই । এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোরের নিকট উহা সজীব হইয়া প্রতিভাত হইতেছে--বলিলেন।

ক্যাডেট্‌ কোর হইতে ফিরিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোর রাজবাড়ীর অপরাপর কুমারদের শিক্ষার যাহাতে বিশেষ ব্যবস্থা হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে ছিলেন। সেই সময়ে এখানে যে শিল্প বিদ্যালয়টি ছিল তাহার উন্নতির জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টিত হন । হাতে কলমে কাজ করার অভ্যাস ও

তাহাতে আনন্দানুভব মহারাজকুমারের চরিত্রে বিশেষ গুণ। ব্রজেন্দ্রকিশোরের প্রচেষ্টায় 'রাজকুমার বোর্ডিং, আবাসিক বিদ্যালয় কার্য্যকরী হইল। এই বিদ্যালয় ভবনটি পরে 'মন্ত্রী বাড়ী'-- অধুনা প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসারের আবাস ও আফিসে পরিবর্ত্তিত ও ব্যবহৃত হইতেছে।

তখন শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ে জাপান হইতে আগত একজন জাপানী ছুতার ছেলেদের কাঠের কাজ শিখাইতেছিলেন। তাঁহার নাম কুসুমতো সান্--আশ্রমে তাহাকে কুসুমবাবু বলিয়া ডাকিত। শিল্প বিদ্যালয়ে এই জাপানী ছুতারকে কিছু দিনের জন্য পাওয়া যায় কিনা আগ্রহ সহকারে ব্রজেন্দ্রকিশোর কবির কাছে লিখিয়া পাঠাইলেন। কবি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন

> " এখনো জাপানী ছুতারকে এখানে মাস দুই তিন রাখিতে হইবে। তাহার পরে যদি তোমাদের প্রয়োজন থাকে ত আগরতলায় পাঠাইয়া দিব। ইতিমধ্যে সে বাংলা আরো খানিকটা শিখিয়া লইবে।
>
> অরুণ* কাগজে দেখিলাম তোমাদের জন্য একটি বিশেষ বিদ্যালয়ের স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, আশা করি সেটা ভাল নিয়মে উপযুক্ত লোকের দ্বারা চালিত হইবে। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলো অব্যবহারে অনাদরে ও চৌর্য্যে যেন নষ্ট না হইয়া যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়ো তোমাদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাটা ভাল করিয়া প্রচলিত হয় এই আমার ইচ্ছা।
>
> (৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২)

নিজের বিদ্যালয়ের কাজ সুন্দর চলিতেছে তাহাও পত্রে লিখিতে কবি ভুলিলেন না কিন্তু একটি কারখানা ও ল্যাবরেটরি ভালভাবে করিতে না পারায় চিন্তিত। কিছুদিন পর জাপানী ছুতার এখানে আসিয়া শিক্ষার্থীদের কাঠের কাজ দেখাইয়াছিলেন।

এই বছরের একটি ঘটনা ব্রজেন্দ্রকিশোরের মনে খুবই জাগ্রত আছে। রাজ্যের নূতন মন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাজে যোগদান। এই উপলক্ষে এক দরবার অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথও দরবারে যোগদান করিয়া ত্রিপুরার গৌরব বৃদ্ধি করেন। এইরূপ আনুষ্ঠানিক রাজদরবারে কবির যোগদান এই একটিরই সংবাদ পাওয়া যায়। রীত্যনুযায়ী পোষাক কবি পরিধান করিলেন। মহারাজকুমারের স্মৃতির কথা--'চুড়িদার পায়জামা আর আচকান গায়ে দিলে পাগড়ী বাঁধার জন্য আমি আর তাঁর মাথা ছুঁতে পারি না। বেশ কৌতুক করে স্মিতহাস্যে একখানা কেদারায় বসলেন। মনমতো করে পাগড়ী বেঁধেছিলুম। মজা হলো নিজের মাথায় যেমন করে পাগড়ী বাঁধি তা হলো না--হলো উল্‌টো। যেখানে বাঁ কান পাগড়ীর তলায় যায়--তার জায়গায় গেল ডান কান। যা'কে বলে ড্যবরা পাগড়ী। আমার ভুল হয়েছে বল্‌লেও কবি 'ওই ঠিক আছে'

* তখনকার সাপ্তাহিক পত্র--অরুণ
সম্পাদক--চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ--এখানে আসিবার পূর্ব্বে হিতবাদী সম্পাদনা করিতেন।

বলে কি সন্তুষ্টিই না প্রকাশ করলেন। পাগড়ী মাথায়--পায়জামা আচকানে তাঁকে এক অভিনবরূপে দেখা গেল। রাজপুত্তুর বলে আমাদের গর্ব্ব ও আভিজাত্যকে তাঁর সেই রূপ সবরকমে ধিক্‌কৃত করে দিলো। সেই সমুন্নত দেহ, কোঁকড়ানো চুলে শিরোভূষণ, তারই শোভা বাড়াচ্ছিল সেই আয়ত চশমা-পরা চোখ দু'টি। সমস্ত মিলে কবির অন্তর্নিহিত বীরতাকেই যেন সকলের সামনে মূর্ত্ত করে রেখেছিলো। অপলক চোখে দরবারীরা তাঁকেই দর্শন করে নিজেদের সার্থক করছিলো। দুঃখ এই -নিজের ফটো তোলার উৎসাহ -অথচ একদম ভুলেই গেলাম এই অভিনব রূপের ছবি রাখবার কথা। পরে কবির আরও ছবি তুলেছি--আর মনে মনে এই ছবির জন্যে আপসোস করেছি। এখন আরও বিশেষ করে মনে ওঠে যখন কবির হাজারো রকম ছবি দেখি- কিন্তু আমাদের এখানকার সেই মূর্ত্তির প্রতিরূপ কোথাও খুঁজে পাই না। তবে এ ও মনে হয় স্মৃতির এই ছবি বাস্তব আলোছায়ায় ধরা প্রতিকৃতির চাইতেও বুঝি সুন্দর।''

মহারাজকুমার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক প্রথার কথা আলোচনা করিলেন। কবির স্নেহের আকর্ষণে ব্রজেন্দ্রকিশোর যখনই অন্তরে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত কবিকে অকপটে জানাইতেন। এমন অনেক চলতি রীতিনীতি ছিল যাহা সকলের সমর্থনযোগ্য নাও হইতে পারে। নিজেদের বিবাহ ব্যাপারে এমনই এক সঙ্কটকর ব্যাপার জানাইলে কবি উত্তর দিলেন- সামাজিক অন্যায় বন্ধনের মধ্যেও মানুষ কেমন করিয়া নিজের ন্যায্য পথকে বাছিয়া লইবে তাহাই কী সহৃদয়তার সহিত বলিলেন। শিলাইদহ হইতে পত্রখানা লিখিয়াছেন

" বোলপুর ঘুরিয়া তোমার পত্র আমার হাতে আজ আসিয়া পৌঁছিল--পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।

তুমি যে বিষয়ে লিখিয়াছ যতীর মুখে তাহা আভাসে মাত্র শুনিয়াছিলাম এবং শুনিয়াও আমি তোমার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হই নাই। আজ তোমার পত্র পড়িয়া জানিলাম যে তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে যথার্থ কর্ত্তব্য পালন হইয়াছে এরূপ না হইলে অন্যায় অবিচার হইত এবং সমাজ তোমাকে নিন্দা না করিলেও তুমি ধর্ম্মে পতিত হইতে। সেই জন্যই তোমার চিঠিখানি পড়িয়া আমার হৃদয় বড়ই স্নিগ্ধ হইল- তুমি যখন ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া আছ ঈশ্বর তোমাকে কখনও দুর্ব্বল করিবেন না -তিনি তোমার মঙ্গল করিবেনই -তিনি সুখেও তোমার মঙ্গল করিবেন দুঃখেও তোমার মঙ্গল করিবেন। তোমার মঙ্গল তোমার জীবনে তোমার অন্তরে ঘটিবে। আমি আমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি -তুমি সংসারের সমস্ত ভালয় মন্দয় সমস্ত লাভে ক্ষতিতে মনুষ্যত্বের পরম সার্থকতা লাভ কর--তোমার অন্তর্যামীর প্রসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে তুমি ধন্য হও।"

চিঠির শেষের দিকে লিখিয়াছেন--

"আজ মহিমের পত্রে সংবাদ পাইলাম যে ঢোলপুরের সেই কন্যাটির সহিত শীঘ্রই তোমার বিবাহ হইবে। ঈশ্বর তোমাদের মিলনকে সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণময় করুন এই আমি একান্ত মনে প্রর্থনা করি।"

(১৩ই ফাল্গুন, ১৩১৪)

"ঢোলপুর থেকে বিয়ের পর" মহারাজকুমার বল্‌লেন "আমরা ক'দিন কলিকাতায় কাটাই। কবি ছিলেন জোড়াসাঁকো বাড়ীতে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম -আমন্ত্রণ করলুম আমাদের থিয়েটার রোডের বাড়ীতে। তিনি এলে আমার স্ত্রী বেরিয়ে এসে তাকে প্রণাম করলো। তিনি তো অবাক! তিনি খুব ভাল করেই জান্‌তেন আমাদের পরিবারের মেয়েদের বাইরে কারো সামনে তখন বের হওয়ার প্রথা ছিলো না। এমনকি রাস্তায় রেল ষ্টীমারে ঘেরাটোপে পালকী ব্যবহার অনিবার্য্য ছিল। ঠাকুর বাড়ীতেও এত কড়াকড়ি না থাক্‌লেও অচেনা পুরুষের সামনে মেয়েরা বের হতেন না। এহেন অবস্থায় সেই পশ্চিমদেশীয় এক মেয়ে সদা বাংলায় এসে কবির পদধূলি নেওয়ায় আভিজাত্যের অচলায়তনকে চূর্ণ করায়--তিনি নিতান্তই বিস্মিত হলেও অত্যন্ত প্রীতিলাভ করলেন। বল্‌লেন 'বৌমা তোমাকে আর কি বল্‌বো--আমার আর কি আছে' তাঁর ক'খানা গ্রন্থ আমার স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।- সেদিন আর কই" বলিয়া মহারাজকুমার নীরব হইলেন। সেই স্মৃতি তাঁহার প্রাণে অনেক কিছু আলোড়ন করিতেছিল বুঝিলাম।

বিবাহিত জীবনের স্বল্পকাল মধ্যে ব্রজেন্দ্রকিশোর পিতৃহারা হইলেন। জ্যেষ্ঠ বীরেন্দ্রকিশোর রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তাঁহার সহায়তায় নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করিলেন। পূর্ব্বেই আমরা ইহা আলোচনা করিয়াছি।

স্ত্রীশিক্ষায় ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে বীরচন্দ্রের দুই কন্যার কথাই সকলের আগে আসিয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে স্বীয় প্রতিভায় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন বিদুষী রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী। তাঁহার কাব্যালোচনার ফল তাঁহাকে তৎকালীন বাংলাদেশের মহিলা কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট আসন দান করিয়াছিল। তাঁহার তিনখানি কাব্যগ্রন্থ: 'শোকগাথা', 'কণিকা' ও 'প্রীতি'। তখনও বোধহয় 'প্রীতি' কাব্যখানি প্রকাশিত হয় নাই, অপর দুইখানি তিনি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলেন। কবি অত্যন্ত প্রীত হইয়া একখানি পত্রে রাজকুমারীকে জানাইলেন

"আপনার রচিত 'শোকগাথা' ও 'কণিকা' উপহার পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনার এই কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের একটি স্বাভাবিক সৌরভ অনুভব করি। ইহাদের সৌন্দর্য বড় সরল এবং সুকুমার অথচ কলানৈপুণ্যও আপনার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ এই নৈপুণ্য আপনার শোক কাব্যগ্রন্থটিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।" ....(১৭ই শ্রাবণ, ১৩১৮)

চিঠিখানিতে রাজকুমারীর পিতার কবির প্রতি স্নেহ তাঁহার ভ্রাতা মহারাজ রাধাকিশোরের বন্ধুত্বের বিষয় স্মরণ করিয়া কবি বিশেষ ভাবে তৃপ্তিলাভ করেন তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অল্প কথায় অনঙ্গমোহিনীর কাব্য সম্পর্কে কি সুন্দর বিশ্লেষণ!

কবির শরীর ও মন ক্লান্ত। নিজের পরিবেষ্টন হইতে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য বিলাত হইয়া ক্রমে আমেরিকা ও জাপান ঘুরিয়া আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া (২৩শে আশ্বিন, ১৩১৮) পত্রে জানাইলেন ব্রজেন্দ্রকিশোরকে।--"মনে করিয়াছিলাম তোমাকেও আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ডাকিব। সে আমার পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় হইত।

কিন্তু আমি জানি তোমার অসংখ্য বাধা"..............রাজ্য পরিচালনায় নূতন প্রবেশ করিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোরের কত রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়--পক্ষান্তরে জ্যেষ্ঠ মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরও তাঁহার উপর কত নির্ভরশীল--ইহা কবি সম্যক উপলব্ধি করিতেছিলেন। সপ্তাহখানেক পরেই পুনরায় কবি জানাইলেন যে 'সাহিত্য পরিষদ' হইতে কবি সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইতেছে--ইহার পূবের্ব তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িবেন না--কাজেই ফাল্গুনের আগে বিদেশযাত্রা সম্ভব হইবে না--"এই খবরটা তোমাকে জানাইবার কারণ এই যে মনে বড় আশা রহিল যে সে সময়ে হয়তো কোনো উপায়ে তোমাকে ভ্রমণের সঙ্গীরূপে পাওয়া যাইতে পারে।" (২রা কার্ত্তিক, ১৩১৮)

চেষ্টা করিয়াও এইবারের বিদেশযাত্রায় মহারাজকুমার কবির সঙ্গী হইতে পারিলেন না। মহিম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রিপুরার কৃতী যুবক শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মাকে কবি সঙ্গে নিলেন।--বিদেশ হইতে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়া যাহাতে ত্রিপুরার কাজে নিয়োজিত হইতে পারে তাহাই কবির ইচ্ছা। দেশে থাকিতে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর প্রদত্ত ছাত্রবৃত্তি যেমন সোমেন্দ্রচন্দ্র পাইতেছিলেন--তেমনি বিদেশযাত্রা ও সেখানে শিক্ষা গ্রহণের যাবতীয় ব্যয়ও মহারাজ বহন করিয়াছিলেন।

মার্সেল্‌সে পৌঁছিবার আগের দিন জাহাজে বসিয়া মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের কথা ভাবিয়া তাঁহাকে লিখিলেন--

> ...."আমার বার বার কেবল এই কথা মনে হয় যে তুমি যদি দুই এক বৎসরের মত একবার য়ুরোপে ভ্রমন করিয়া যাইতে পার তবে তোমার বিস্তর উপকার হয়। ইহাকে একেবারে অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করিয়ো না- যেমন করিয়া পার একবার এদিকটা ঘুরিয়া যাইতে হইবে।"........

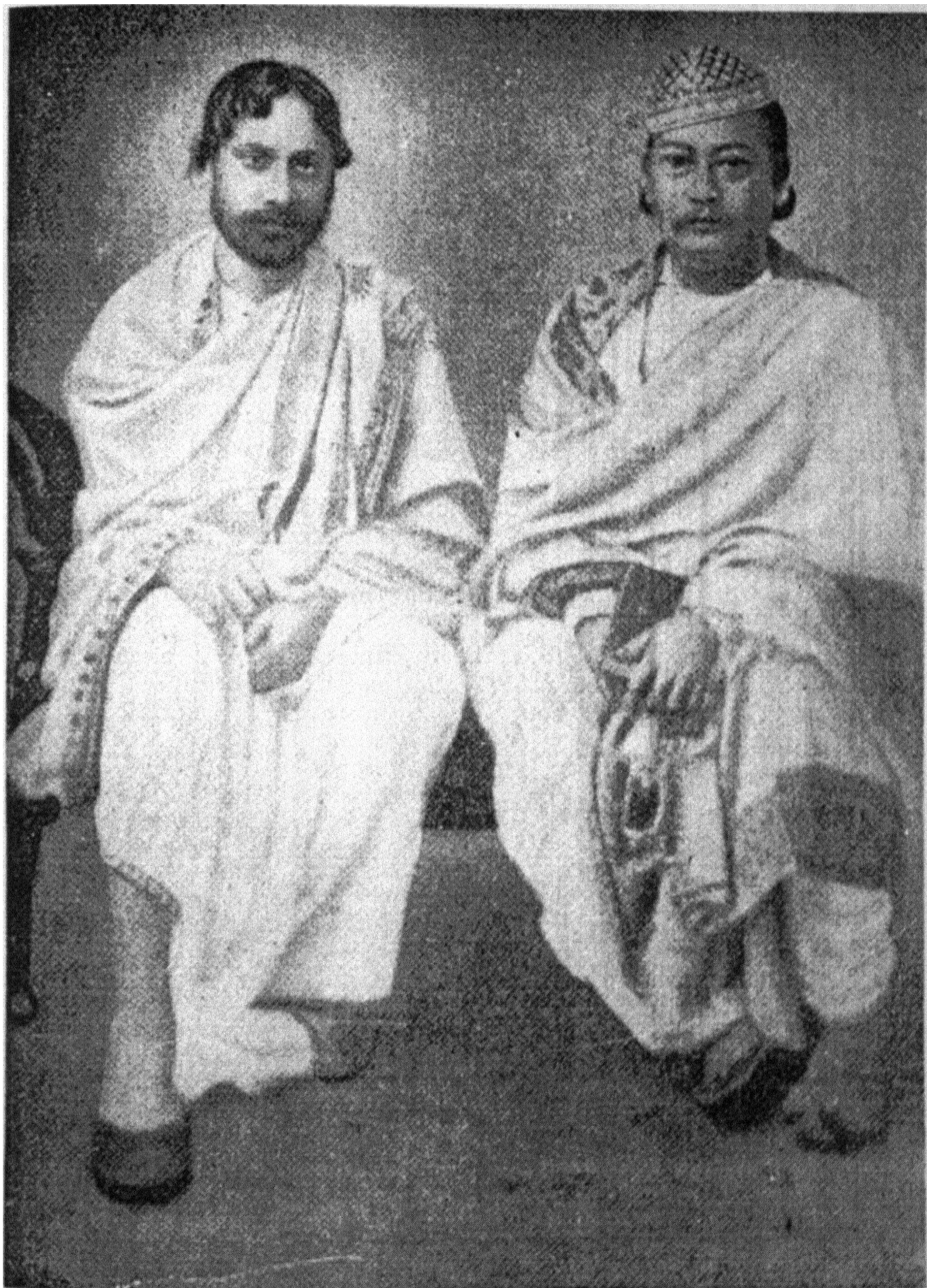
জাহাজে সোমেন্দ্রচন্দ্রের জ্বর হইয়াছিল তাহাও জানাইলেন এবং তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিলেন--

> "সোমেন্দ্র যাহাতে তোমাদের রাজ্যের কাজে লাগে এমন একটা শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে। তোমাদের রাজ্যে বিস্তর অরণ্য পড়িয়া রহিয়াছে। কাজে লাগাইতে পাড়িলে তাহা বিশেষ লাভবান সম্পত্তি হইয়া উঠিবে। এইজন্য সোমেন্দ্রকে Foresty শেখানো যাইতে পারে। শুনিয়াছি তোমাদের রাজ্যে ভাল Keoline মাটি বাহির হইয়াছে--সোমেন্দ্র যদি Ceramics শিখিয়া আসে তবে এই মাটি কাজে লাগিতে পারিবে। কিন্তু ইহার কলকারখানা বহুব্যয়সাধ্য। এ সম্বন্ধে যদি তুমি কিছু চিন্তা করিয়া থাক আমাকে জানাইবে।"..............
>
> (৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯)

বিলাতে পৌঁছিবার পর কবি ব্রজেন্দ্রকিশোরের পত্রে সোমেন্দ্রচন্দ্রের Ceramics পড়ানোর অভিমত লাভ করিয়া তাহাকে সেই শিক্ষায় প্রবৃত্ত করিয়া দিবেন বলিয়া উত্তরে জানাইলেন। সে সেপ্টম্বরের প্রথমেই আমেরিকা রওনা হইবে সে খবরও দিয়া

> "এখানকার লেখকমণ্ডলীর মধ্যে আমি সমাদর লাভ করিয়াছি..........। এ সময়ে তুমি এখানে উপস্থিত থাকিলে আমাদের এই সম্মানে আনন্দ লাভ করিতে পারিতে।"...........

(৬ আগষ্ট, ১৯১২)



১০। রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকিশোর



১১। যতীন্দ্রনাথ বসু, কুমার নবীন
কিশোর এবং মহারাজকুমার
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর

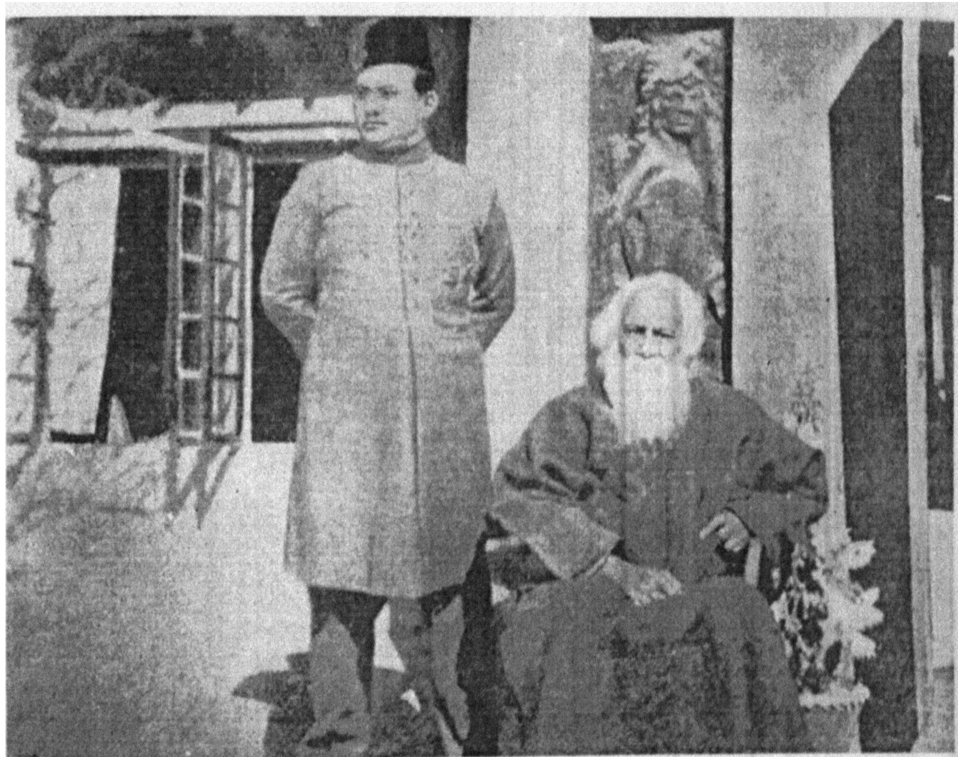
১২। শিলাইদহে — রথীন্দ্রনাথ, মহিম ঠাকুর, সুরেন্দ্র ঠাকুর (দণ্ডায়মান)
জগদীশচন্দ্র বসু, লোকেন্দ্র পালিত, রবীন্দ্রনাথ (উপবিষ্ট)।



১৩। কলিকাতা টাউন হলে মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর কর্ত্তৃক রবীন্দ্রমেলার উদ্বোধন (১৩৩৮)



১৪। 'কিশোর' সাহিত্য সমাজে (আগরতলা) কবি সম্বর্দ্ধন



১৫। শান্তিনিকেতনে কবিসহ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর

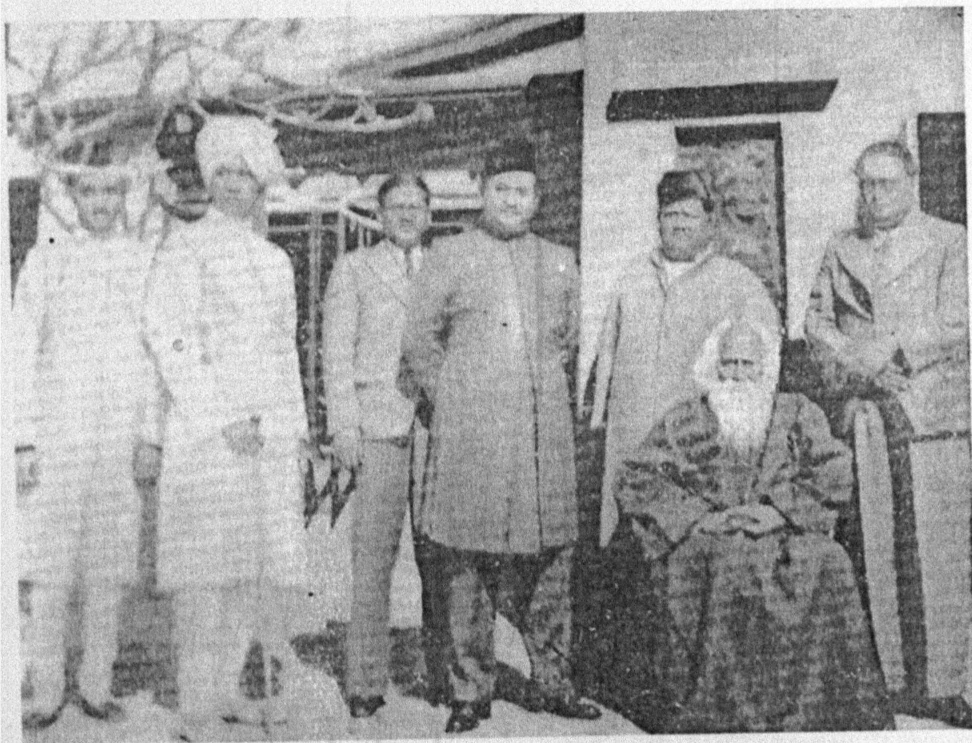


১৬। কুঞ্জবন প্রাসাদে সদলবলে শেষবার (১৩৩২)
দণ্ডায়মান — দিনেন্দ্রনাথ, হরিদাস ভট্টাচার্য্য, সোমেন্দ্র দেববর্ম্মা, রথীন্দ্রনাথ।
উপবিষ্ট — অধ্যাপক মরিস্‌, মহারাজকুমার শ্রী ব্রজেন্দ্র কিশোর (পুপেসহ),
রবীন্দ্রনাথ (কুমার নবীনা সহ) ও শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী
মহারাজকুমার রণবীরকিশোর ও শ্রী সত্যরঞ্জন বসু।



১৭। বন্ধু মহিমচন্দ্র ঠাকুরের পরিবার সহ (১৩৩২)
দণ্ডায়মান (বামদিকে হইতে) — যোগীন্দ্র, শ্রী ধীরেন্দ্র, উমেশ ঠাকুর, যাদব ঠাকুর, শ্রী নরেন্দ্র, হরিদাস ভট্টাচার্য্য।
চেয়ারে উপবিষ্ট — রথীন্দ্রনাথ, মরিসু, সপুপেহ কবি, মলয় ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ।
মাটিতে উপবিষ্ট — শ্রী শৈলেশ, শ্রী নরসিং ও শ্রী সুখময়।

১৮। শান্তিনিকেতনে সপারিষদ মহারাজ, বীরবিক্রম মাণিক্য
বাম হইতে দণ্ডায়মান — শ্রী দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, যোগেন্দ্র দেববর্ম্মা, ডাঃ অবনীশ্বর সেনগুপ্ত,
মহারাজ, রাণা বোধজং বাহাদুর, সোমেন্দ্র দেববর্ম্মা।
উপবিষ্ট — রবীন্দ্রনাথ



ইহাও জানাইতে ভুলিলেন না । কতদূর আপন হইলে নিজের মনের আনন্দের ভাগ দিয়া মানুষ কত তৃপ্তি পায়--এই তার নিদর্শন।

যে কোনো কাজেই হৌক না কেন, ব্রজেন্দ্রকিশোরকে কেবল উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিয়াই কবি ক্ষান্ত থাকিতেন না। নিজেও তাঁহার কাজের সহায়তায় নিজকে নিয়োজিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

১৩২০ সালের কথা। রাজ্যে একজন ভাল লোককে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করার বিষয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন। কনিষ্ঠ ব্রজেন্দ্রকিশোরকে কলিকাতা পাঠানো হইবে। তিনি কবিকে বিস্তারিত শান্তিনিকেতনে পত্রে লিখিয়া জানাইলেন। কবি চিঠি পাইয়াই কলিকাতা আসিয়া শুনিলেন মহারাজকুমার ইতিমধ্যেই রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন--কাজেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হইল না। তখন কবি ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লইয়া কে. জি. গুপ্তের কাছে যান । তিনি সবে বরোদা রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ফিরিয়াছেন । এইজনাই কবির বিশেষ আগ্রহ ত্রিপুরার কাজে তাঁহাকে পাইলে উত্তম। কবির সঙ্গে বহু আলোচনার পর গুপ্ত মহাশয় তাঁহার পক্ষে তখন এই দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া অনেক দুঃখ করিলেন।

মন্ত্রী নির্ব্বাচন পর্ব্ব সুফল দিল না। ব্রজেন্দ্রকিশোরকে কাছে পাইলেই কবি ত্রিপুরা রাজ্যের পুরানো কথা আলোচনা করিয়া খুবই আনন্দ লাভ করিতেন। সেবারও অনেক কথার মধ্যে বলিয়া ফেলিলেন-- ''তোমার বাবা আমাকে কবিত্ব থেকে রাজনীতিতে টেনে নিয়েছিলেন--তাই তোমাদের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করতে পারিনে''। পূর্ব্বে মহারাজ রাধাকিশোর ও কবি অধ্যায়ে ইহার পরিচয় পাইয়াছি। অন্তরঙ্গ আলোচনার মধ্যে অনেক কথাই ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্মরণে আসে। কথায় কথায় কবি তাঁহার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত বাঙালীর জাতীয় পোষাকের কথা কি রস দিয়াই না বলিতেন--আর সেই ''সরোজিনী'' জাহাজ (১) পরিচালনার কথা। কিন্তু এই রসাস্বাদনেও জ্যেষ্ঠের প্রতি কি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা--তাহাই ব্রজেন্দ্রকিশোরকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

কবি নোবেল পুরস্কার পাইলেন। দেশময় আলোড়ন। আগরতলায় অভিনন্দন সভা আহুত হয়। উদ্যোক্তা মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর । সভায় অনেকে অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু তখনকার পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপ্টেন উইলিয়মস যাহা বলিয়াছিলেন তাহা মহারাজকুমারের মনে আজও স্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি বলিলেন--'' কোনো বিখ্যাত শিল্পীর একখানি চিত্র । শিল্পী প্রতিভাপূর্ণ। নিখুঁত বর্ণসমাবেশ ও অপূর্ব্ব ভাবসমন্বয়ে চিত্রখানি জীবন্ত হয়ে দর্শকমাত্রকেই মোহিত করে--সৃষ্ট সৌন্দর্য্য নয়ন আকর্ষণী।

(১).............''স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, সে-খোল একদা ভরতি হইয়া উঠিল শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে- ঋণে এবং সর্ব্বনাশে।''

দ্রঃ --'জাহাজের খোল'--জীবনস্মৃতি

সার্থক শিল্পীর শিল্পসাধনা। কিন্তু এই শিল্পশ্রী কোথায় লুকাইয়া থাকে যখন আমরা তাকে আলোকচিত্রে ধরি? সেই রকম রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ইংরেজী তর্জ্জমাই পাশ্চাত্য গুণী সমাজকে মুগ্ধ করেছে--আলোকচিত্রের সমপর্য্যায়ের মত। কিন্তু কবির নিজ ভাষায় কাব্যের মাধুরী যদি সেই গুণী সমাজ গ্রহণ করার যোগ্যতা পেতেন, তবে প্রকৃত রসাস্বাদনে নিজেরা বিভোর হয়ে থাক্‌তেন।''..........সভার বিস্তারিত বিবরণ মহারাজকুমার লিখিয়া জানাইলে.........''আমার সম্মানে তোমরা যে আন্তরিক আনন্দ বোধ কর ইহাই আমার যথার্থ পুরস্কার''... বলিয়া কবি জানাইলেন। (১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০)

রাজ্যের মন্ত্রীপদে বাহির হইতে উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগ সম্ভবপর না হওয়ায় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর ভ্রাতা ব্রজেন্দ্রকিশোরকেই সেই পদে মনোনয়ন করিয়া গভর্ণমেন্টকে জানাইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা--কাজেই কর্ত্তব্যে বাধা পাইলে পারিবারিক শান্তিই বিঘ্নিত হইবে--ইহাই ছিল মহারাজকুমারে শঙ্কা। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে কবি যে সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন তাহা ত্রিপুরার মঙ্গল চিন্তায় নিরত রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভবপর হইয়াছিল! এই মনোনয়ন সম্বন্ধে 'ত্রিপুরার পক্ষে ইহা অপেক্ষা কল্যাণকর আর কিছুই হইতে পারে না' বলিয়া কবি বলিতেছেন। 'পদের দায়িত্বকে বিশ্লেষণ করিয়া স্থিরচিত্তে পদে পদে বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে।' আরও বলিলেন--

> ''...তোমাদের রাজ্যশাসনটিকে তোমরা ধর্ম্মাসনরূপে পালন করিও--কোথাও কোনো অন্যায় বা শৈথিল্য ঘটিতে দিয়ো না। কোন যথার্থ বড় কাজ কখনই কেবল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা হইতে পারে না, ধর্ম্মবুদ্ধির প্রয়োজন। তোমাদের ন্যায়বিচারের প্রতি সর্ব্বসাধারণের যেন অবিচলিত শ্রদ্ধা জন্মে। তাহারা একথা যেন নিশ্চিত বুঝিতে পারে তোমরা যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিবে সে নিয়মকে তুমি বা রাজা বা কেহই কোনো মতেই লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।''

আবার বলিতেছেন--মহারাজকুমারের হাতে রাজ্যব্যবস্থা শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিলে 'সমস্ত বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে।'.....'লক্ষ্মী তোমাদের ওখানে ধরাশয়নে সুপ্ত হইয়া রহিয়াছেন--তাঁহাকে জাগরিত কর'--। কবির মনের আবেগ লেখনীমুখে অবাধে চলিয়াছে। ব্রজেন্দ্রকিশোরের প্রতি কবির স্নেহের পরশ, শুভ আশীর্ব্বচন ও কর্ম্মে উদ্দীপ্ত প্ররোচনা সমগ্র পত্রটিকে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। ইহা বলিবার আরও বিশেষ কারণ--কবি ভালভাবেই জানিতেন মহারাজকুমারের অন্তরের বৃত্তিসমুচ্চয়ের শক্তি ও দৃঢ়তা।

যত কাজের মধ্যেই থাকুন না কেন, কবি বৎসরারম্ভে নিয়মিত মহারাজকুমারের কল্যাণ কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইতে ভুলিতেন না। বিদ্যালয়ের কথাও প্রায় প্রতি পত্রেই থাকিত। সেবারও (১৬ই বৈশাখ, ১৩২১) জানাইলেন--

> ....''আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি আজ হইতে আরম্ভ হইল। আগামী আষাঢ় হইতে বিদ্যালয়ের কাজে আণ্ড্রুজ ও পিয়ারসন সাহেব যোগ দিবেন--তাঁহাদের দ্বারা আমাদের প্রভূত উপকার আশা করি। এরূপ সহৃদয় ভারতহিতৈষী আমি ত দেখি নাই।''..........

আলমোড়ার নিকট পাহাড়ে ছুটি যাপন করার অভিপ্রায়ও পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল পত্রব্যবহারের দ্বারা নহে, দেখা হইলেই অন্য কথার মধ্যে বিদ্যালয়ের কথা ব্রজেন্দ্র-

কিশোরের সহিত আলোচনা করিয়া কবি আনন্দ লাভ করিতেন। কিন্তু মহারাজকুমার যে বৃহৎ কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহার জন্য কবির খুবই চিন্তা এবং "তাহা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিবার শক্তি ঈশ্বর তোমাকে দান করুন। তুমি বিজয়ী হও, তোমার তপস্যায় সিদ্ধি লাভ হউক।" (১৫ই আশ্বিন, ১৩২১) *- এই ভাবে পত্র লিখিয়া নিজের ব্যাকুলতা জ্ঞাপন করিতেন।

কিন্তু মন্ত্রীপদে দুই বৎসরকাল অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব্বেই 'স্বকীয়' (Household) ও 'রাষ্ট্রগত' (Administration) বিভাগে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। ব্রজেন্দ্রকিশোর মন্ত্রীপদ ত্যাগ করিয়া বসিলেন। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা হইতে বিরত থাকিতে অনুরুদ্ধ হইলে--তিনি তাহা মানিতে পারিলেন না। কাজেই দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য হইতে মহারাজকুমার নিজকে সরাইয়া লইলেন। লোকমুখে কথাটি রবীন্দ্রনাথের কানে পৌঁছিল। তিনি যে কেবলমাত্র মহারাজকুমারের জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন তাহা নহে। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্যও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া লিখিলেন--

........"সংবাদটি কি সত্য? তুমি কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ? ইহাতে নিশ্চয়ই তুমি মনের শান্তি পাইবে। কিন্তু আমি একান্ত আশা করি এই ব্যাপারে তোমার সাংসারিক ক্ষেত্রের ক্ষতি কিছুই ঘটিবে না। গভর্ণমেন্টের সহিত তোমার কিরূপ কথাবার্ত্তা এবং মহারাজার সহিত তোমার কিরূপ বন্দোবস্ত হইল তাহা জানিবার জন্য আমি উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম।"

এই পত্রে আরও লিখিলেন--

......"তোমাদের জেলায় এ বৎসর বন্যা প্রভৃতি কারণে দুর্বৎসরের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। ইতিমধ্যে তোমাদের রাজ্যের মধ্যে এই সকল অব্যবস্থার আশঙ্কা সম্ভাবনা ইহাতে মনে উৎকণ্ঠা অনুভব করিতেছি।"

(৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২২)

রাজকার্য্য হইতে সরিয়া আসায় ব্রজেন্দ্রকিশোরের সাংসারিক বিষয় চিন্তা করিয়া যে কবিই উৎকণ্ঠিত ছিলেন--তাহা নহে। বাংলা গভর্ণমেন্টএর উৎকণ্ঠা সমধিক তাঁহারাই ব্রজেন্দ্রকিশোরকে মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করিতে সম্মত করাইয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহযোগিতা করিয়া ত্রিপুরার সেবায় নিজকে নিয়োজিত করিতে অসমর্থ হওয়ায় ব্রজেন্দ্রকিশোর কিছুকাল বিশ্রাম গ্রহণের অভিলাষে সিমলার পথে কলিকাতা আসিলেন। বাংলার গভর্ণর কারমাইকেল তাঁহাকে সংবাদ দিয়া নেন। তিনি সেই সময়ে প্রস্তাব করেন, গভর্ণমেন্ট মহারাজকুমারকে কোনো বিশিষ্ট কাজে নিযুক্ত করিতেও ইচ্ছুক। তিনি গভর্ণরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে নিজের জ্যেষ্ঠের মন জোগাইয়া যাঁহার কর্ম্মপরিচালনা করা সম্ভপর হইল না-- তাঁহার পক্ষে অন্যের নির্দ্দেশ পালন করায় বহু বাধা বিপত্তি অবশ্যম্ভাবী এবং উহা তাঁহার মানসিক বৃত্তির পরিপন্থী। তিনি কবিকে সমস্ত বিষয় পত্রে জানাইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিতেছিলেন। কবি বহুবার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে তাঁহার সহিত বাস করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন-- কিন্তু ঘটিয়া উঠে নাই। এইবারও পারিবারিক ব্যবস্থা চিন্তা করিয়া কবির সহিত বাস করা সম্ভবপর না হইলেও পূর্ব্বেকার মত শান্তিনিকেতনে যাইয়া আশীর্ব্বাদ আহরণ

---

*দ্রষ্টব্য—পরিশিষ্ট

করিতে ভুলেন নাই--ব্রজেন্দ্রকিশোর বলেন, ইহা ছিল তাঁহার সঞ্জীবনী মহৌষধি। এই সময়কার ও পূর্ব্বেকার কয়েকখানি কবির পত্র খোঁজ করিয়া না পাওয়ায় মহারাজকুমার অত্যন্ত দুঃখিত। এই কালের পত্রে নব-পরিস্থিতিতে কবি ও মহারাজকুমারের মানসিক প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল, তিনি বলেন।

ইতিমধ্যে সোমেন্দ্রচন্দ্র আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়াছেন--হারভার্ড য়্যুনিভার্সিটির এম-এ ডিগ্রী লইয়া। ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ও কতিপয় বিভাগের ভার লইয়া উৎসাহ সহকারে কাজে ব্রতী। কিন্তু নানা বাধা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেছে। তিনি কবিকে সব কথা জানাইলে 'বাধার সঙ্গে লড়াই করাই ত গৌরবের কথা'--কবি উত্তর দিলেন এক পত্রে। ইহাতেই তিনি আবার জানান--

............"লালুকে (মহারাজকুমার) তাঁর কোণের ভিতর থেকে টেনে বের কর্। তিনি পরাভবের আশঙ্কা করে পলায়ন করলে চল্‌বে না। আগরতলার কলঙ্ক মোচন করবার দায়িত্ব ত তাঁরই--তাঁর সে শক্তিও আছে জোর করে তাঁকে তাঁর আপনার স্থানটি অধিকার করতে হবে-

বন্ধ দুয়ার দেখলি বলে
অমনি কি তুই আস্‌বি চলে ?
বারে বারে ঠেলবি দুয়ার
হয়ত দুয়ার টলবে না--
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না।"..........

কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহ ভঙ্গ না হয়, সেজন্য সোমেন্দ্রচন্দ্রকে লিখিলেন, 'ও যে তোরই দেশ--আর তোর জীবনের দায়িত্ব যে তোর আপনারই'--এই সঙ্গে আরো লিখিলেন--

"তোদের দেশ থেকে গোটা দশ বারো বাঁশের বাঁশি আমাকে পাঠিয়ে দিস্। কিন্তু তাতে ছিদ্র করে দিস্‌নে--ছিদ্র এখানেই করিয়ে নেব--তোদের Scale হয়ত বিশুদ্ধ না হ'তে পারে।"
(১১ই ভাদ্র, ১৩২৪)

এই বছর (১৩২৬) কার্ত্তিক মাসে মাহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সিলেট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আগরতলায় কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া যান। সহরের অনতিদূরে সুডৌল নাতিউচ্চ শৈলশিখরে অবস্থিত 'কুঞ্জবন বাংলা'য় (অধুনা মালঞ্চাবাস) কবির অবস্থান--আয়োজন করা হইয়াছিল। বীরেন্দ্রকিশোরের স্থপতিবিদ্যার পরিকল্পনায় জন্ম নিয়াছিল প্রকৃতির মধুময় নিবিড় বেষ্টনে--নিরাভরণ সরল শিশুটির মত--বাহুল্যবর্জ্জিত এই অবসর-বিনোদন গৃহটি। দিবাকরের শৈলমালার ভিতর হইতে আবির্ভাব ও অস্তাচলপর্ব্বতে অন্তর্ধান, প্রকৃতির এই লীলায় কবি কী মাধুর্য্য যে অনুভব করিয়াছিলেন তাহা তিনি সুযোগ পাইলেই উল্লেখ করিতেন। সবুজ আস্তরণে মণ্ডিত সুগোল শিখরটি নীরবে যেন আপনাকে মিলাইয়া দিয়াছে পাদদেশের পদ-যাত্রার নির্দ্দেশ রেখায়। সে প্রকৃতির পরিবেশ এখন আর নাই।

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর এইবার কবির সাহচর্য্য রক্ষা করিয়া নিজে ধন্য মানিয়াছিলেন। মহারাজের সঙ্গেই কবি উমাকান্ত একাডেমী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া পরিদর্শন--লিপি ইংরাজীতে দিয়াছিলেন (১০ নবেম্বর, ১৯১৯)। প্রধান শিক্ষক শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিকে

আবাহন জানাইলে--কবি ছেলেদের কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অল্পকথায় উপদেশ প্রদান করেন--বীরেন্দ্রকিশোর তখন উপস্থিত। তখনকার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই সেই স্মৃতি আজও বহন করিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকেন।

সেই সময়ে সম্ভবতঃ মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর শান্তিনিকেতনে হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিতে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া আরো পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে (১৩৩২)* ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রকিশোর সে সময়ে আগরতলায় অনুপস্থিত। কবি নিজেই তাঁহার বাড়ীর খবর করিবার জন্য সেখানে পদার্পণ করেন। সহসা বাড়ীতে কবির আবির্ভাবে সকলেই আনন্দিত। মহারাজকুমারের মাতা-মহারাণী বধূ ও নাতি নাতনীদের লইয়া কবির পদধূলি গ্রহণ করেন। মাতা-মহারাণী অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। স্বামীর বন্ধুকে তিনিও 'বন্ধু' বলিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় কবি অত্যন্ত প্রীত অন্তরে "নিশ্চয়ই বন্ধু বল্‌বেন" উত্তর করিলেন। এই অভাবনীয় প্রীতি সম্মিলনে মহারাজকুমারের ছোট এক কন্যার গান কবিকে অত্যন্ত আনন্দিত করিয়াছিল। সেই সময়কার রাজপারিবারিক আবেষ্টনের মধ্যে এই নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে কবি মুগ্ধ হন। মহারাজকুমারের সঙ্গে অতঃপর দেখা হইলে রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার কথা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই।

আসাম ও সিলেট ভ্রমণকালে অসমীয়া অপেক্ষা মণিপুরী মেয়েদের কাপড় বোনা ভাল দেখিয়া কবির অভিপ্রায় হইল বিদ্যালয়ে মণিপুরী নৃত্য ও শিল্প শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা। মহারাজের সহিতও এবিষয়ে অবশ্যই আলোচনা হইয়াছিল। "বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হইলে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে মণিপুরী নৃত্য প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইয়াছিল। ত্রিপুরা হইতে বুদ্ধিমন্ত সিং নামে এক বিখ্যাত নৃত্য-শিল্পীকে আনানো হয়; বালকরা তাঁহার খোলের বোলের সঙ্গে নৃত্যশিক্ষা শুরু করে (১৩২৬ অগ্র)। এই নৃত্য ব্যায়াম ও নৃত্যের সমবায় বলা যাইতে পারে--Rhythmic dance। কবির ইচ্ছা ছিল যে বাঙালীর ছেলের আড়ষ্ট দেহ নৃত্য ও ব্যায়ামের যুগ্ম সাধনায় সুন্দর ও সুদৃঢ় হইয়া উঠে। মণিপুরী বা ঐ শ্রেণীর কোনো তালবদ্ধ সংঘ-নৃত্য ছাত্রদের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা সেই জন্যই। কিন্তু কয়েক মাস পরেই নানা কারণে সংঘ-নৃত্যের' পরে যবনিকা পড়িয়া যায়।" (রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২)

মহারাজকুমারকে কবি নৃত্য প্রবর্ত্তনের কথা জ্ঞাপন করিয়া একজন অভিজ্ঞ শিল্পীর ব্যবস্থার জন্য বলিলেন। সমসাময়িক পত্রাদি না পাওয়ায় ব্রজেন্দ্রকিশোরের যাহা স্মরণে আছে তাহাই সঙ্কলন করা গেল। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের সহিত পরামর্শ করিয়া মণিপুরী রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহকে মনোনয়ন করা হইল। নাতিদীর্ঘ গৌরবর্ণ বুদ্ধিমন্ত একাধারে নৃত্য ও মৃদঙ্গ বাদনপটু, বিচক্ষণ কারুশিল্পী ও যন্ত্রবিৎ, অসি ও অশ্বচালনে সবিশেষ অভিজ্ঞ। কবি জানিতেন ত্রিপুরার রাজ-অন্তঃপুরে এবং অধিবাসীদের মধ্যে

*দ্রষ্টব্য--পরিশিষ্ট

বিশেষভাবে মণিপুরী সমাজে নৃত্যগীতের অভ্যাস একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বুদ্ধিমন্ত শান্তিনিকেতনে যোগদান করিলে তাঁহার কারুশিল্পের নিদর্শনগুলি কবিকে তাঁহার উদ্ভাবনী-শক্তিতে খুবই আকৃষ্ট করিয়াছিল।

এই সময়ে মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরকে লিখিত কবির দুইখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে। উভয় পত্রই মাঘ (১৩২৬) মাসে লেখা। প্রথম পত্রখানায় মহারাজের খুল্লতাত ভ্রাতা কুমার নবীনকিশোরের মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া "অবকাশমত কোনো এক সময়ে মহারাজ আশ্রম দর্শন করিতে আসিবেন মনে এই আশা রহিল" বলিয়া শেষ করেন।

অপর পত্রখানিতে বুদ্ধিমন্ত সিংহকে আশ্রমে প্রেরণের জন্য কবি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া-- "আমাদের মেয়েরাও নাচ ও মণিপুরী শিল্পকার্য্য শিখিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। মহারাজ যদি বুদ্ধিমন্ত সিংহের স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবার আদেশ দেন তবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে"......বলিয়া জানাইলেন। --(১৯শে মাঘ, ১৩২৬)

বুদ্ধিমন্ত সিংহের শিক্ষাদান কার্য্য বেশী দিন চলে নাই--রবীন্দ্রজীবনীকারের মন্তব্য পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখান হইতে ফিরিয়া কবি সম্পর্কে বুদ্ধিমন্ত এক নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া আসেন। মহারাজকুমারের কাছে তিনি ইহা বলিয়াছেন। প্রথম দিকে মেয়েরা বুদ্ধিমন্তের নির্দ্দেশমত তাঁহার সঙ্গে পদক্ষেপ ও অঙ্গসঞ্চালন করিতে স্বীকৃত হইতে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তখন বয়োবৃদ্ধ। তিনিই অগ্রণী হইয়া বুদ্ধিমন্তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অবলীলাক্রমে নৃত্য সুরু করেন--তখন মেয়েদের লজ্জা ভাঙে। ইহাই বাংলায় মেয়েদের নৃত্যশিক্ষায় প্রথম পদক্ষেপ--অভিনব বলিয়াই আজকাল মেয়েদের নিকট অনুভূত হইবে।

বিদেশ হইতে আসিয়া সোমেন্দ্রচন্দ্র দেশে কাজে ঢুকিয়া নানা বাধার সম্মুখীন হওয়ায় কবি শত কাজের মধ্যেও তাহার কথা ভাবিতেছেন। তিনি খুব খুশি হইলেন যখন শুনিলেন কাজকর্ম্ম ভালভাবেই চলিতেছে। একখানা পত্রে তাহাকে কবি জানাইতেছেন--"বিদেশে একরকম সম্মানের সঙ্গে কাটিয়ে এলুম--দেশে বোধহয় মান রক্ষা হবে না--নানা ভাবের বাঁকা কথা এখন থেকেই শোনা যাচ্ছে ।" .....(৯ই শ্রাবণ, ১৩২৭)

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের শিল্পসাধনার কথা কবি বিশেষভাবেই জানিতেন। চিত্র, শিল্প ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহেও তিনি বিশেষ আগ্রহশীল। অজন্তার ছবির বই মহারাজ সংগ্রহ করিবেন কবি জানিয়াছিলেন কিন্তু মহারাজের তরফ হইতে কোনো সঠিক খবর না পাইয়া সোমেন্দ্রচন্দ্রকে লিখিলেন........"Griffiths এর অজন্তার ফাল্‌তো কপির' পর যদি তাঁর বিশেষ আসক্তি থাকে তা হলে সে সম্বন্ধে তিনি নিরুত্তর থাক্‌লেই আমি তাঁর মনের ভাব বুঝে নিতে পারবো."......(১৩ আশ্বিন, ১৩২৮)

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর দেহত্যাগ করেন ১৩২৯ সনে। নাবালক রাজার পক্ষে রাজ্য পরিচালনার জন্য ত্রিপুরায় 'শাসন পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর পরিষদের সদস্য । সেবার (১৩৩২) কবি পূর্ব্ব বঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ঢাকা হইতে কুমিল্লায় আসিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোরকে বার বার দেখা করিবার জন্য কবি আহ্বান করিতেছেন। মহারাজকুমার কুমিল্লায় না যাইয়া রবীন্দ্রনাথকে আগরতলায় পদধূলি

দিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া জানাইতেছেন। মহারাজ নাবালক, তাঁহাকে তিনি জানেন না—সেই অবস্থায় কবি সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। আরো তাঁহার আগমনে কোনো প্রতিক্রিয়া দাঁড়ায় কিনা তাহাও কবির চিন্তনীয়। বিশেষতঃ—তাঁহার অভ্যস্ত—চিরাচরিত রাজ আহ্বানও নহে। মহারাজকুমার কবিকে কোনো চিন্তা না করিয়া আগরতলায় চলিয়া আসিবার জন্য অনুনয় করিয়া জানাইলে কবি আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। আগরতলায় আসিলেন ১০ই ফাল্গুন রাত্রিবেলা। তাঁহার অবস্থানের ব্যবস্থা হইল 'কুঞ্জবন প্রাসাদে'। যে কয়েকদিন এখানে ছিলেন—আলোচনা প্রসঙ্গে কবি ত্রিপুরার রাজাদের আভিজাত্যপূর্ণ সৌজন্য ও সহৃদয় ব্যবহারের কথাই বলিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিতেন। ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহাকে এতই মুগ্ধ করিত যে মহারাজকুমারকে বলিতেন—এই বনানীর অন্তরালে কোনো ঝরনার ধারে ছোট্ট কুটীর বেঁধে বাস করতে তাঁর খুবই সাধ হয়। "প্রকৃত বসন্ত উপভোগ করা যায় তোমাদের এখানেই" বলিয়া কবির মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিত।

কুঞ্জবন প্রাসাদের পূর্ব্ব অংশে অর্দ্ধ-বৃত্তাকার অলিন্দ। এখানেই ছিল কবির নিভৃত চিন্তার স্থান। প্রশস্ত অলিন্দে ছোট একখানা গালিচার উপর একখানা কেদারাই ছিল আসবাব। সংলগ্ন ঝাউ বৃক্ষে বাতাসের সন্ সন্ শব্দ, নানা রংয়ের নানাজাতীয় পাখীর কাকলি, ফুলের সুবাস, মূর্ত্ত বসন্তের আবির্ভাব কবিকে উদ্বেলিত করিত। পূর্ব্ব দিগন্ত পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথে বনানীর আলোড়নে শৈলশিখরে সবুজের ঢেউ—তাহারই অন্তরাল হইতে প্রভাতী অরুণাভা যখন উঁকি মারিত—কবি তখন করজোড়ে মৌন ধ্যানমগ্ন। যে আনন্দধারা তিনি আহরণ করিতেন—মনে হইত, সারা অবয়বে তাহা ঝরিয়া কবিকে পুলকচঞ্চল করিয়া তুলিত। মহারাজকুমার ও সঙ্গীরা এই দৃশ্য দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। এমন দিনও হইয়াছে যখন প্রাতঃরাশের সময়ও অতিবাহিত হইয়া যাইত।

১২ই ফাল্গুন প্রাতে স্থানীয় "কিশোর সাহিত্য সমাজ"—জনসভায় কবি সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেন উমাকান্ত একাডেমী হল ঘরে। এই বিদ্যালয়ে ইতিপূর্ব্বে আরো দুইবার কবি পদধূলি দিয়াছেন। (১) সভাপতি মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে বলেন—অকৃতী হইয়াও তিনি যে কবির স্নেহকোমল প্রাণের পরশ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন—তাহাই তাঁহার মনে বেশী আসিতেছে। তাই তাঁহার মনে হয়—"ভাগ্যবান যাঁহারা তাঁহারা সময়মত এমন এক একজনার স্নেহাশিস লাভ করিয়া ফেলেন—যাঁহার প্রেরণা—সকল প্রকার আবরণগুলিকে দূর করিয়া দিয়া, নির্ম্মল করিয়া দিয়া, প্রাণে ফাল্গুনের পাগলা-হাওয়ার আলোড়ন দিয়া, নূতন আশা-আকাঙ্খার পথ দেখাইয়া দিয়া

(১) রবীন্দ্র জীবনীতে (৩য় খণ্ড, পৃঃ১৭৮) আছে—"বর্ত্তমান (১৯২৬) মহারাজার পিতা বীরচন্দ্র মাণিক্য কবির বন্ধু ছিলেন; তাঁহার পিতা কবির কাব্য জীবনের প্রত্যুষে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, তাহার কথা কবি কোনোদিন ভুলেন নাই। ২৪শে ফেব্রুয়ারী স্থানীয় কিশোর সমাজ কর্ত্তৃক আহূত জনসভায় কবির সংবর্ধনা হইল; ত্রিপুরার তরুণ মহারাজ সভাপতি"—ইহা সঠিক তথ্য নয়। বীরচন্দ্র মাণিক্য ছিলেন তরুণ মহারাজের প্রপিতামহ। কবির বন্ধু ছিলেন তরুণ মহারাজের পিতামহ। এই সভায় মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর-তরুণ মহারাজ বীরবিক্রমের খুল্লতাত—সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

যায়। ঠিক যেমন শীতের জড়তার মধ্যে প্রথম ফাগুন— পরশে মঞ্জুরিত গাছগুলি নীল আকাশের পানে চেয়ে হাস্‌তে চায়।".....

"রবীন্দ্র-প্রশস্তি" করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। 'রবি'-র বিভিন্ন নামের দার্শনিক বিশ্লেষণে "তাঁহার আলোকে বিশ্বের অশেষ বৈচিত্র্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাই তিনি 'ভাস্কর' অর্থাৎ বিশ্ব-শিল্পী"—বলিয়া তিনি তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। আরো বলিলেন—জীবন প্রভাতে ভানুসিংহের পদাবলীতে "আগমনী গাইয়া, অপূর্ব্ব কাকলিতে সকলকে জাগাইয়াছ; জীবন-মধ্যাহ্নে কত সুধাবর্ষী সঙ্গীত আলাপে, কত অনুপম কাব্য-নাট্য-চিত্রের অঙ্কনে লোকের মন প্রাণ হরণ করিয়াছ। জীবনের সায়াহ্নে তোমার বীণার সুর উচ্চ গ্রামে চড়াইয়া, 'গীতাঞ্জলি'র মোহন তানে গভীর পরমার্থ-সঙ্গীত শুনাইয়া, 'শান্তিনিকেতনে'র 'বিশ্বভারতী'তে বিশ্বের মহা-সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছ।"...... সমাজের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্রে বলা হয়—

......."আমরা জানি, দেশদেশান্তরে ভারতের বাণী প্রচারকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্প্রতি তোমার শরীর অসুস্থ। এই অবস্থায়ও ত্রিপুরার প্রতি অশেষ স্নেহবশতঃ তুমি আজ আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে—ধন্য করিতে আগমন করিয়াছ ।..... তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাধনা বিশ্বভারতী সমগ্র মানব-সমাজের শাশ্বত সম্পত্তি, এই অতুল কীর্ত্তি তোমাকে জগতে অবিনশ্বর করুক।" উত্তরে কবি যে অপূর্ব্ব ভাষণ প্রদান করেন— তাহা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও কল্যাণ কামনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।*

এইদিনই (১২ই ফাল্গুন) সন্ধ্যায় মহারাজকুমারের বাড়ীতে কবি রাস-নৃত্য উপভোগ করেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়ীর মেয়েরা রবীন্দ্রনাথকে দেখাইবার জন্য কিছুদিন যাবৎ রাস-নৃত্য তালিম দিতেছিলেন। দেহ-শ্রী-সৌষ্ঠব-মণ্ডিতা বালিকাদের নৃত্য-সজ্জা — বিশেষভাবে পুষ্পাভরণ-সজ্জা অপূর্ব্ব । দীর্ঘতানলয় যোগে মৃদঙ্গ ও মন্দিরার তালে তালে তাঁহাদের পদ সঞ্চালন—লীলায়িত দেহ-লতিকায় নানা মুদ্রায় অঙ্গুলিবিন্যাস-মৃদু মধুর সুললিত কণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত-পুষ্পপত্র-শোভিত রাস-মণ্ডপে এক অপরূপ শোভার সমাবেশ। কবি মুগ্ধনেত্রে যেন বৃন্দাবনের অভিসারিণীদেরই প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। 'ইহা দেখায় আমার পূর্ব্ববঙ্গে আসা সার্থক হলো'—এই কথাই তখন কবির মুখে আসিয়াছিল। এই দৃশ্য কবির মনে এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে বহু পরেও দেখা হইলেই মহারাজকুমারকে এই সান্ধ্য অনুষ্ঠানের কথা বলিয়া যাইতেন। সঙ্গে সঙ্গে নাত্‌নীদের সম্বন্ধে রসিকতা করিতেও ভুল করিতেন না। শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণের পত্নী-মহারাজকুমারের কন্যা। তিনি কবিকে 'গুরুদেব' সম্বোধন করায় ব্রজেন্দ্রকিশোরকে বলেন — "দেখ লালু, তোমার মেয়ে আমাকে 'গুরুদেব' ডেকে অমন রসের সম্বন্ধটাই নষ্ট করে দিচ্ছে।"

এই রাস-নৃত্য আসরেই তরুণ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরের সহিত কবির পরিচয় হয়। স্বল্প অবসরে নানা কথার মধ্যে মহারাজকে ধ্বংসমুখে পতিত ত্রিপুরার প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ সংরক্ষণের জন্য কবি বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। স্নেহাস্পদকে আপন

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

করিয়া লইতে কবির আগ্রহ ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তরুণ মহারাজকে অভিভূত করিল। এই পরিচয়ে কবির বহু স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—কথা ও ভাবে তাহারই প্রকাশ।

বালিকাদের নৃত্যে কবি এতদূর আকৃষ্ট হইলেন যে শান্তিনিকেতনে পুনরায় মেয়েদের নৃত্যশিক্ষার প্রবর্ত্তনায় উৎসুক হইয়া উঠিলেন। মহারাজকুমারকে একজন নৃত্যশিক্ষক মনোনয়ন করিয়া পাঠাইবার জন্য তিনি বলিয়া গেলেন। মহারাজকুমারের বাড়ীর মেয়েদের নৃত্যশিক্ষা দিয়াছিলেন শিল্পী নবকুমার সিংহ। তাঁহাকেই ব্রজেন্দ্রকিশোর নির্ব্বাচন করিয়া শান্তিনিকেতনে পাঠাইলেন। সেখানে ইহাই নৃত্যশিক্ষার গোড়া-পত্তন বলিলেই হয়। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতধারায় মণিপুরী নৃত্যের ঠাট্ মিশিয়া অভিনবত্ব বর্দ্ধন করিল। অল্পদিন মধ্যেই নবকুমার তখনকার 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যের নব-রূপ দান করিয়া তাঁহার শিল্পসাধনাকে সার্থক করিয়াছিলেন।

অল্প কয়েকদিন মধ্যেই ইটালী পরিভ্রমণে কবি আমন্ত্রণ পান। এইবার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে তাঁহার সঙ্গী হইবার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করিলেন। শাসন পরিষদ হইতে কিছুদিনের জন্য অনুপস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোর বিদেশে যাওয়ার জন্য তৈরী হইলেন। নির্দ্ধারিত দিনে রওয়ানা হইলেন ইটালীয় জাহাজে। মুসোলিনীর আমল। কবির সঙ্গী ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, গৌরগোপাল ঘোষ (আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র) এবং ব্রজেন্দ্রকিশোর। কবির জন্য স্থান করা হইয়াছে জাহাজের ক্যাপটেনের ডেকে—সেখানেই কবি অবস্থান করিতেছেন— নীচে নামেনও না। আর সকলের জন্য যে ব্যবস্থা তাহা রাজোচিত। ক্যাপটেনের ডেকে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ অসীমের লীলা সমুদ্র-কল্লোল উপভোগ করেন-ধ্যানে মগ্ন থাকেন। আর ঘরে লেখায় নিয়োজিত থাকেন। কবির এই নির্জ্জন-বাসে সঙ্গীরা কেহই বাধা সৃষ্টি করিতে আসিতেন না। একদিন ব্রজেন্দ্রকিশোর খুব সন্তর্পনে পা-টিপিয়া কবির আসনের পিছনে যাইয়া উপস্থিত। ঘাড় না ফিরাইয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"রাজপুত্তুর এসেছো—নীচে এত আমোদ আহলাদ ফেলে? বেশ, বোসো—পুরোনো কথা বলি"—আরম্ভ করিলেন বীরচন্দ্র রাধাকিশোর মাণিক্যদের কত কথা, কত আনন্দই না তাঁহার মুখে তখন। মহরাজকুমার আরো বলিলেন--"কবির মনে কত স্মৃতি এসে পড়ছে—কথা যেন আর শেষ হয় না। বীরচন্দ্রের রাজোচিত বিনয় ও সৌজন্যের সেই বহুবার— বলা কার্সিয়াং-এর কথা আবারও বল্‌তে ভুল করলেন না। কী গভীর শ্রদ্ধা বীরচন্দ্রের ওপর—আমি অবাক হয়ে চেয়ে দেখি অপার সমুদ্র আর কবিকে।"

রোমে পৌছিয়া সকল রকম সুব্যবস্থার মধ্যেও যেন কেমন খাপছাড়া লাগিতেছিল— সকলের কাছেই। কবি কিন্তু সঙ্গী সকল যুবকদের ও প্রতিমা দেবীকেও বেশ সাবধান করিয়া দিলেন, কথাবার্ত্তা ও চলা-ফেরা সম্বন্ধে। সঙ্গীদের সরকারী ব্যবস্থার বাহিরে কোথাও যাওয়া আসা হইয়া উঠিত না বলিলেই হয়। ব্রজেন্দ্রকিশোর কিন্তু ইহার মধ্যেও একা একা বেড়াইয়া ফিরিতেন—কবির সাবধানী উপদেশও তাঁহাকে শুনিতে হইত— যাহাতে ব্রজেন্দ্রকিশোরের উপর তাঁহার আস্থাই প্রকাশ পাইত। সেদিন ভ্যাটিক্যান-এ কি যেন উৎসব ছিল। লোকে লোকারণ্য-ব্রজেন্দ্রকিশোরও ঘুরিতে ঘুরিতে সেখানে উপস্থিত। তিনি ভিতরে ঢুকিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। তখন সোনার কেদারায়

উপবিষ্ট পোপকে বহন করিয়া কার্ডিন্যালরা পরিক্রমায় বাহির হইবেন। মহারাজকুমার এই উৎসব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। ভাগ্য প্রসন্ন, উৎসবের ব্যবস্থাপকদের একজনের সহিত ব্রজেন্দ্রকিশোরের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইয়া গেল—তিনি যেই শুনিলেন যুবক "টেগোর"-এর সঙ্গী একজন, খুব সম্মাননার সঙ্গে তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। মহারাজকুমারও সেই বিরাট ও বর্ণাঢ্য পরিক্রমা উৎসব প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। আবাসে ফিরিলে, কবি ব্রজেন্দ্রকিশোরের নিকট বিস্তারিত শুনিয়া তাঁহার সুযোগ-সন্ধানী বুদ্ধির তারিফ করিয়া অপরাপরদের জ্ঞাপন করিলেন।

"সেদিন কবির বক্তৃতা সভা। কী ভীড় মেয়ে-পুরুষে,—না দেখ্‌লে কথায় বুঝানো যায় না"— বলিতেছেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবির অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য সকলে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। কবিও একদিক হইতে নাম সহি করিয়া দিতেছেন। দীর্ঘ বক্তৃতার পর ভীড়ের চাপে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। সভাগৃহ হইতে বাহির হইতেও পারিতেছেন না। কবির অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁহার কাছে গেলেন। হাত ধরিয়া সকলকে একরকম ঠেলিয়াই কবিকে লইয়া বাহির হইবার পথ ধরিলেন। অটোগ্রাফ সংগ্রহকারীদের কেবল 'নো' 'নো' করিয়াই নিরস্ত করিলেন—কবিও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, বলিলেন—"ক্ষত্রিয় না হ'লে কি আর বামুনকে রক্ষা করা চলে!"

কবি—সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থাপক ছিলেন-অধ্যাপক ফরমেকী। 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ও সম্বর্দ্ধনার অঙ্গীভূত ছিল। সেখানেও লোকের অসম্ভব ভীড়। অভিনয় অপেক্ষা কবি দর্শনার্থীর সংখ্যাই বেশী। কী উন্মাদনা! সন্ত্রাসের রাজত্বে 'টেগোর'-এর উপস্থিতি যেন সব বাঁধন ছিড়িয়া ফেলিল। কবির আবাস সব সময়েই লোকে গম্‌গম্‌ করিত। মাঝে মাঝে রোমের পুরানো অভিজাত -বংশীয়দের মধ্যেও কেহ কেহ কবির কাছে আসিয়া সশঙ্কিত চিত্তে কথা বলিতেন—মন খুলিয়া কিছু বলার উপায় ছিলো না। লোকসমাগম বেশী হইলে অনেক সময় কবি তাহাদিগকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিতেন—"দেখে এসো Oriental Prince" —ত'াতেও কি তাঁর নিষ্কৃতি ছিল।

"রোমে পৌঁছিবার পরদিন"—মহারাজকুমার বলিলেন—"সকালে আমি স্নান সেরে, বের হওয়ার মতলবে কবির ঘরে গিয়ে দেখি, তিনি একটু বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। দেখেই বললেন—তুমি তো বেশ স্নান সেরে এসেছো— আমার বাথরুমে কলের গোলযোগে স্নান তো দূরের কথা, মুখ ধোয়াও হলো না-রথী কখন উঠ্‌বেন, তারপর কল ঠিক হলে তো জলের ব্যবহার করতে পারবো!" আগের দিন—ব্যবস্থাপকদের মধ্যে যিনি ওখানে নিয়োজিত ছিলেন তিনি কবির জন্য যে বিশেষ ধরনের কল তাঁহার বাথরুমে লাগানো ছিল তাহা কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে রথীন্দ্রনাথকে দেখাইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজকুমার 'আমি একটু দেখি'—বলিয়া কবির বাথরুমে ঢুকিয়া জলের কলটি এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করিয়া জলের প্রবাহ ঠিক করিয়া দিলেন। "ভাগ্যিস্‌, তুমি ছিলে, নইলে আমাকে বসেই থাক্‌তে হোতো"—খুশিতে কবির মুখ উজ্জ্বল।

ব্রজেন্দ্রকিশোর কবিকে ছাড়িয়া প্যারিসে গেলেন। প্রতিমা দেবীও সঙ্গে যান— তিনি উঠিলেন ম্যাডাম কারপেল্লের সহরতলীর বাড়ীতে। প্রথম রাত্রিতে হোটেল নির্ব্বাচন ও স্থান সংগ্রহে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তারপরও ভাল স্থান না পাওয়ায় প্রতিমা দেবী তাঁহার পরিচিত এক মহিলার বাড়ীতে মহারাজকুমারের স্থান করিয়া দেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর বলিলেন—সেখানে স্নানের জলের জন্য পৃথকভাবে দেয় আছে। কারণ ভারতীয়দের মত রোজ সেদেশে বড় কেহ স্নান করেন না। প্যারিসে কয়েকদিন কাটাইয়া মহারাজকুমার কবির সঙ্গে পুনরায় লন্ডনে মিলিত হন। বাংলার গভর্ণর লিটন সাহেব তখন ছুটিতে দেশে গ্রামের বাড়ীতে অবসর যাপন করিতেছেন। কবির লন্ডনে উপস্থিতির খবর পাইয়া ইণ্ডিয়া হাউসে কর্ম্মরত নির্ম্মল সেন মারফতে কবি ও সঙ্গীদের চা-পানে আমন্ত্রণ করিলেন তাঁহার গ্রাম্য বাড়ীতে। সকলেই ট্যাক্সী যাত্রী—কবির সঙ্গে গাড়ীতে ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। লিটন সাহেবের বাড়ী কেহই চিনিতেন না—হঠাৎ দেখা গেল— লিটন— কন্যা এক বাড়ীর সম্মুখে দণ্ডায়মান। সকলেই নামিলেন। লিটনের সহিত কবির আলোচনা চলিল বাড়ীতে প্রবেশ করা অবধি। মহারাজকুমারের বাগান করার সখ আছে জানিয়া লিটন—গৃহিনী তাঁহাকে বাড়ীর বাগান দেখাইতেছিলেন। তা আপ্যায়নান্তে সকলকে তিনি বাড়ীতে রক্ষিত Visitors' Book-খানা দেখাইতেছিলেন—তাহার মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বাক্ষরও দেখা গেল। পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর লইয়া মেম সাহেব ব্রজেন্দ্রকিশোরকেও বাংলায় স্বাক্ষর করিতে বলায় তিনিও তাহাই করিলেন। কিন্তু লিটন সাহেব উহা সকলে বুঝিবে না বলিয়া ইংরাজীতে স্বাক্ষর লইয়া ত্রিপুরার নামও লিখাইয়া লইলেন। মুচ্‌কি হাসিতে কবিও সানন্দে ব্যাপারটি লক্ষ্য করিলেন।

এই সময়ে প্রায় রোজই ব্রজেন্দ্রকিশোর বাস-এর উপরে বসিয়া লন্ডন সহর ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বাসায় ফিরিলে কবি তাঁহার কাছে সব শুনিতেন। একদিন বেশ একটু বৃষ্টি চলিতেছিল। বাসের খোলা ছাদে তিনি একা বসিয়া—আর যাত্রীরা নীচের তলায় আশ্রয় নিয়াছেন। এই সময় একটি ইংরেজ যুবক তাঁহার সঙ্গী হইলেন। যুবকটি প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন —"ভারী মজার মানুষ তো আপনি—এই বৃষ্টিতে বসে ভিজ্‌ছেন" মহারাজকুমারও "আপনিও তো কম নন" — বলিয়া আলাপ জমাইয়া লইলেন। যুবকটি অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট। দুইজনের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম—গান্ধীজীর কথাও অনেক হইল খোলাখুলিভাবে। রোজকার মত বাসায় ফিরিয়া সব কথা বিবৃত করিলে কবি ছোট্ট মন্তব্য করিলেন—"করেছো কি! সর্ব্বনাশ, কোথায় কোন্ ফ্যাসাদ বাঁধবে কে জানে ? আমি তো মার্কা মারা, ভয় তো তোমাদের জন্যেই।"

এই সময়ে একদিন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র হিমাংশু রায় তাঁহার প্রযোজিত বুদ্ধের ফিল্‌ম দেখিবার জন্য সঙ্গীসহ কবিকে আমন্ত্রণ করিলেন তাঁহারা যে ফ্ল্যাটে থাকেন সেইখানে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সঙ্গীরা সকলেই বিদেশী পোষাকে ভূষিত। কিন্তু সেখানে সহরের বাঙালী শিক্ষার্থীরা—কবি প্রণামের সুযোগ পাইয়া জড় হইয়াছেন— ধুতি, পাঞ্জাবী, চাদর পরিধান করিয়া। এমন কি, এক ভদ্রলোকের মেম সহধর্ম্মিণীও

সাড়ী পরিয়া ঘুরিতেছিলেন। সকলেরই যেন দেশের পরিবেশ ও আবহাওয়ার মধ্যে আসিয়াছেন—এই অনুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা। ফিল্‌ম দেখানো ও আদর আপ্যায়ন অন্তে বিশ্রম্ভালাপের সময় মেমটি আসিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোরকে ধরিলেন, তিনি যেন কবিকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করেন। সোজাসুজি বলিলে কবির স্বীকার না করার ভয় মনে করিয়াই তিনি একটু চালাকী করিলেন। সেদিনকার মজলিসে যে পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে সকলকেই বাংলা দেশের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। আরো সে-সময়কার ঝির ঝির বৃষ্টিতে দেশের মেঘলা হাওয়ার আবেশই সকলকে পাইয়াছে— আনুষঙ্গিক গানের নেশা—কিন্তু কবির সম্মুখে কে গান গাহিবে—নানা কথার অবতারণা করিয়া শেষ পর্যন্ত কবিকেই গান করিবার জন্য মহারাজকুমার কাতর অনুনয় করিলেন। ‘‘রাজপুত্তুরের কথা—এই বুড়ো বয়েসে কি গান আসে?’’—খুব সস্নেহে আব্দারের ভাষায়ই কবি উত্তর করিলেন—কিন্তু আরম্ভ করিলেন বাংলা গান। ‘‘আমার আর কিছুই বল্‌তে হোলো না’’—ব্রজেন্দ্রকিশোর বলিলেন—‘‘কয়েকটি বাংলা গানের পর হিন্দী গান গেয়ে তবে কবি নিবৃত্ত হলেন। আগেও দেশে থাক্‌তে দেখেছি কবিকে গাওয়াতে হলে তাঁরই রচিত কোন গান ইচ্ছে করে বে-সুরো করে কেউ গাইলেই—‘আরে থামো থামো’ বলে নিজেই তখন আরম্ভ করে দিতেন—আপন মনে গানের পর গান। কবিকে গান গাওয়াবার ব্যাপারে পটু ছিলেন—সুগায়ক ও কবির নিরতিশয় স্নেহের পাত্র যতি বসু—তিনি এককালে আমাদের এখানে প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজে ছিলেন।’’

কয়েক মাস বিদেশে অতিবাহিত করিয়া ব্রজেন্দ্রকিশোর একাই দেশে ফিরিলেন। দেশে ফিরিবার জন্য মন ব্যাকুল—আরো দেশে কাজের কথাও তাঁহাকে অধিক ব্যাকুল করিতেছিল। কিছুদিন পর কবিও দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। পোর্ট সৈয়দ হইতে মহারাজকুমারকে ‘‘য়ুরোপের পালা সাঙ্গ হ’ল’’—বলে চিঠি লিখিলেন। কিন্তু ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই আশ্রমে পৌঁছাইতে পারিবেন কিনা সন্দিহান—কারণ তাঁহাদের জার্ম্মান জাহাজ কলম্বো যাইয়া থামিবে। ....‘‘যাক্, দেশে ফিরে গিয়ে আশা করি তোমার সঙ্গে দেখা হবে। স্বরাজ্য থেকে নেমে একবার শান্তিনিকেতনে দেখা দিয়ো।’’......‘‘সম্মান অভ্যর্থনা যথেষ্ট পাওয়া গেছে। কিন্তু তোমারি মত মনের অবস্থাটা ছিল-মনটা অহোরাত্র দেশের দিকে উড়ু উড়ু করেছে।’’......‘‘আমি মাঝে মাঝে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেম। তাতে একটা এই সুবিধা হয়েছে যে আমার রাশিয়ায় যাওয়াটা বন্ধ হল। সেখানকার শীত এবং ভ্রমণের দুঃখ আমার কিছুতেই সইত না।’’......(৩ ডিসেম্বর, ১৯২৬)

দেশে ফিরিয়া সঙ্গে সঙ্গেই কবির পদপ্রান্তে বসিবার সুযোগ ব্রজেন্দ্রকিশোর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কলিকাতায় কোনো কাজ উপলক্ষে গেলেই শান্তিনিকেতনে অথবা কলিকাতা বা কাছাকাছি কোথাও তিনি থাকিলে মহারাজকুমার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিতে ভুলিতেন না। ব্রজেন্দ্রকিশোর কলিকাতায় যাইয়া সেবার খোঁজ লইয়া জানিলেন কবি ব্যারাকপুরের কাছে (খড়দহ?) কাহার এক বিরাট পুরানো বাড়ী ভাড়া করিয়া গঙ্গার ধারে নির্জ্জন বাস করিতেছেন। খোঁজ করিতে করিতে ব্রজেন্দ্রকিশোর সেখানে দেখা করিতে গেলেন—সঙ্গে ছিলেন বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্র। তাঁহাদের প্রণাম ও সম্ভাষণ

পাওয়ার আগেই কবি—"লালুর কাছে আর লুকিয়ে থাকার জো নেই"—বলিয়া বড়ঠাকুরের দিকে অত্যন্ত প্রীত বয়ানে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বিরাট পুরানো বাড়ীর কথায় বলিলেন—"লোকে বলে ভূতে পাওয়া বাড়ী, কাজেই সস্তা ভাড়ায় পাওয়া গেল,—আর আমি নিজেই ভূত, তাই নিরিবিলি কাটানো যাচ্ছে দিনগুলো।" সঙ্গে সঙ্গে সেই স্মিতবয়ানের হাসি।

"শেষবারের মত সাক্ষাৎ হয় কবির সঙ্গে কালিম্পংএ" —বলিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। "অসুস্থ মহারাণীকে নিয়ে গিয়েছি দার্জ্জিলিংএ। কবিও অসুস্থ শরীর নিয়ে শুনেছি বিশ্রামের জন্য এসেছেন কালিম্পংএ। একদিন মহারাণীকে নিয়ে মোটরে বেড়াতে বেড়াতে গিয়েছি কবির বিশ্রাম-আলয়ে। গাড়ী থেকে নেমে আমি গিয়ে দেখি তিনি বসে আছেন একখানা আরাম-কেদারায়। শারীরিক অসুস্থতা পাণ্ডুর বয়ানে পরিস্ফুট। আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—সে কথা ভুলবার নয়। আমি প্রণাম করবারও অবসর পেলাম না। তারপর কত কথা—যেন শেষ হতেই চায় না—যা আগেও উপলব্ধি করেছি। সেখানে তাঁর সঙ্গে থাক্‌বার জন্যে কি পীড়াপীড়ি-আমার পেটের পীড়ায় দার্জ্জিলিংএর জল ভাল নয়, কিন্তু কালিম্পংএর পাথর-চোয়ান জল খুব উপকারী ইত্যাদি অনেক কিছু বলে আমাকে তাঁর সঙ্গে বাস করার জন্য একরকম জেদ ধরলেন। কিন্তু যখন শুন্‌লেন আমি একা এসেছি অসুস্থ মহারাণীকে নিয়ে—তাঁকে একা ফেলে আসা সম্ভবপর নয়—ভারী দুঃখিত হলেন। বল্‌লেন অভিমানভরে—'তোমার সব সময়েই বাধা,—আমাকেও নাম্‌তে হবে—কাজ, কাজের ডাক, বিদ্যালয়ের কাজ।' আমি বল্‌লুম, শরীর না সারতেই চলে যাবেন, কেমন কথা ? কবি নীরব। আমারও আর বেশীক্ষণ কাটানো সম্ভব হলো না, গাড়ীতে মহারাণীকে একা রেখে গেছি। প্রণাম করে ফেরার সময় কবির নির্ব্বাক স্নেহমণ্ডিত আকুল চাহনি আমাকে খুবই চঞ্চল করে দিয়েছিল। আমি অবনত মস্তকে বেরিয়ে এলাম তাঁর সান্নিধ্য থেকে। তখন কে জান্‌তো এই শেষ দেখা। জীবনে আর তাঁর পায়ের ধুলো নেওয়ার সুযোগ হবে না।"

মহারাজকুমারের স্মৃতিতে যাহা আসিতেছিল তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

"কবির অশীতিতম জন্মবার্ষিকী তখন সমাগত-প্রায়। অল্প-বয়েস হলেও মহারাজ বীরবিক্রম জয়ন্তী উৎসব পালনের ব্যবস্থাপক এক কমিটি নিযুক্ত করে আদেশ জারি করলেন। তারই পরিণতি রাজকীয় আদেশে জন্ম-জয়ন্তী পালনে। রাজকীয় বিশেষ দরবারে এরকম জয়ন্তী উৎসব আর কোথাও পালিত হয়নি। আমরা ত্রিপুরাবাসী সকলেই এজন্য গৌরবান্বিত। চিরাচরিত নিয়মে মহারাজের সহি ও পদ্মমোহরযুক্ত রোবকারী প্রচারিত হলো কবিকে 'ভারত ভাস্কর' আখ্যায় ভূষিত করে। নকীবেরা রাজ-আজ্ঞা ঘোষণা করলো। কবি তখন অত্যন্ত অসুস্থ— কিন্তু আমি জানতুম-খবর পেয়ে তিনি কত আনন্দিত হবেন। এই অসুস্থ শরীরেও কতটা শান্তি লাভ করবেন।* এইসব কথা আমি দরবারে বলেছিলাম। আরো বলেছিলাম—বিদেশে লোকেরা

* ব্রজেন্দ্রকিশোরের কাছে রথীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম—

"Father delighted with honour will write soon himself stop glad to welcome your emissary"

পরবর্তী প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য ।

রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে গ্রহণ করেছে। ইটালীতে প্রত্যক্ষ করেছি—বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যখন সসম্ভ্রমে পথপার্শ্ব থেকে নতজানু হয়ে, কবির পরিধেয় বস্ত্র অতি সন্তর্পণে গ্রহণ করে চুমো খেতো—আমার অন্তর গর্ব্বে ভরে উঠ্‌তো। শুনেছি এরকম সম্মান সে দেশের পোপ বা সম্রাটেরই প্রাপ্য।

"এরপর আর একবার সুইজারল্যাণ্ডে পারিবারিক অসুস্থতা নিয়ে আমাকে কিছু কাল কাটাতে হয়।

"সেখানে নানান্ দেশের সম্মিলন। আশ্চর্য্যের কথা যিনিই শুনেছেন-আমি ভারতবাসী—তিনিই এসেছেন আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করতে। অনেকেই তাঁদের নিজ নিজ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের* কাব্য পড়েছেন—তাঁদের শ্রদ্ধা সম্ভ্রম প্রত্যক্ষ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি— বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছি—আর তুলনা করেছি আমার অন্তরের সঙ্গে। এতবড় একটা বিরাট সত্তার কাছে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কান্বিত হওয়ার সৌভাগ্য করেও কতটুকু তাঁকে ধরতে পেরেছি— তাই ভাবি।"

ব্রজেন্দ্রকিশোর কথাগুলি খুব গর্ব্বমিশ্রিত অনুপ্রেরণা লইয়াই বলিতেছিলেন। কথা আর শেষ করিতে পারিতেছিলেন না।

"আলাপ করছি, আর কত ছোট ছোট কথা মনে উঠ্‌ছে, যা আগে আসেনি। মনে পড়ছে, সেবার আগরতলায় এসে তিনি আমার ব্যবহারের জুড়ি-বৈঠকখানায় আছেন। শিকার করার বাতিক আমার খুবই ছিলো। কে খবর দিয়েছে—সাম্‌নের দীঘিতে বালী হাঁস পড়েছে। বন্দুক নিয়ে হাঁস মেরে খুব আনন্দ করে কবিকে দেখাতে নিয়ে এসেছি—আমার স্থির লক্ষ্য-সন্ধানের ফল। পাখিটি দেখে কবির সমস্ত মুখাবয়বে কী বেদনাক্লিষ্ট ছবি ফুটে উঠ্‌লো। তিনি কোনো কথাই বল্‌লেন না। আজও আমার অন্তরে তাঁর সেই বেদনাক্লিষ্ট মুখচ্ছবি জেগে উঠে ঘা' দিচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছিলো সিদ্ধার্থের শর-বিদ্ধ পক্ষী দরশনের কথা।"

। চুপ করিয়া থাকিয়া মহারাজকুমার আবার বলিতে লাগিলেন—তাঁহার মনের আবেগ কমিতেছিল না।—

"মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বহুভাবে দেখেছি। অন্যায় অপরাধকে শোধন করবার ব্যবস্থাই ছিল আমাদের চিন্তার বাইরে। অপরাধীকে মধুর ব্যবহার করে তার কালিমা দূর করে দিতেন। অন্যায় যে তাঁর কাছে কত করেছি, কিন্তু কোনো দিনই কর্কশ ব্যবহার পাইনি। ক্রোধ প্রকাশ ছিলো তাঁর স্নেহমিশ্রিত—ঘৃণাবিজড়িত নয়। তাঁর হাতের পরশ যাঁরা পেয়েছেন—তাঁরাই জানেন অস্থির অন্তরে শান্তির প্রলেপ। আমার ভাষা নেই তাঁকে আপনাদের কাছে বুঝিয়ে বল্‌তে। আত্মীয়-স্বজন বিয়োগ ভুলে যাই। কিন্তু তাঁর তিরোধানকে ভুল্‌তে পারি না। শোক তাপ বহু পেয়েছি, কিন্তু ......

*এই প্রসঙ্গে শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্তর নিকট লিখিত কবির (১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০) চিঠি দ্রষ্টব্য। মহারাজ বীরবিক্রমের সঙ্গে পাশ্চাত্য ভ্রমণে দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন সঙ্গী। দেশে ফিরিয়া কবিকে বিদেশের ভক্তবন্ধুদের কথা তিনি জানাইয়াছিলেন। তাহারই উত্তর।

"......... আমার প্রবাস বাসকালীন ভক্ত বন্ধুদের কারো কারো সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়েছে শুনে খুসি হলুম। তাঁরা অনেকে ছড়িয়ে পড়েছেন, অনেকে পরলোকে। জানিনে আইন-ষ্টাইনের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে কিনা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ স্মরণীয়। ....."

আর বলিতে পারিলেন না ব্রজেন্দ্রকিশোর। নিজেকে স্থির করে নিয়ে আবার বলিলেন—

"অবাক হয়ে ভাববার বস্তু তিনিই। তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার দিয়ে গিয়েছেন আমাদের—তার ব্যবহার, তার উপভোগ করতে পারছিনে বলে আমার দুঃখ হয়। পালিত কেশ আমার, তবুও আমার মনে হচ্ছে, সেই ছোট্টটি আমি, তাঁর পায়ের কাছে বসে আছি—অবাক হয়ে; তিনি তাঁর স্নেহকোমল কথায়, গানে আমাকে আপ্লুত করে দিচ্ছেন। আমি আজও সেইভাবেই মাথা নত করে তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করছি।"

রবীন্দ্রতীর্থ পরিক্রমায় মহারাজ বীরবিক্রমের সঙ্গে

শ্রী দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত

বিশ্বজয়ী মহাকবির শততম-জন্মজয়ন্তীর পুণ্যক্ষণে প্রণাম নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুঞ্জয়ী কবির শুচিস্মিত ও স্নিগ্ধমধুর সৌম্যমূর্ত্তিটি যেন মনের বাতায়নে চুপিসারে এসে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে গেল। অনন্তজিজ্ঞাসার উত্তর চিরদিনের জন্য, অনাগতকালের জন্য কবি নিজেই দিয়ে গেছেন,

"তখন কে বলেগো নেই আমি গো নেই আমি,
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।"

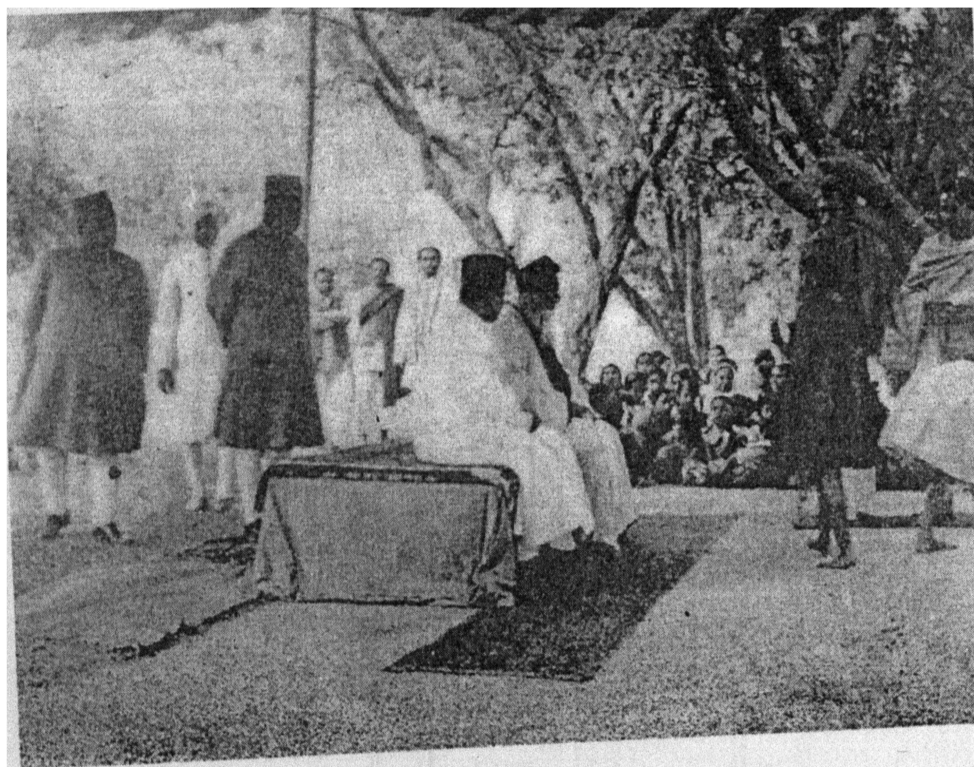
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পটভূমিকায় সুদূর অতীতের অনেক কথা ও অনেক কাহিনী এযাবৎ কিছু কিছু বলা হয়েছে। না-বলা কাহিনী রয়ে গেছে আরও অনেক বেশী। আজকের স্মৃতি-চারণে স্বীয়লব্ধ সুখস্মৃতির আলোচনাকেই পল্লবিত করব বলে সংকল্প নিয়েছি। রবীন্দ্র-জীবনপটে ত্রিপুরার স্বর্গত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের ভূমিকা ও তাঁর অবদান এ স্মৃতিকথার মূল বিষয়। এ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের যবনিকা উঠবে, রবীন্দ্রনাথের সপ্তম ও শেষের বারে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় শুভাগমন দিয়ে—মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর তখন সপ্তদশ বৎসরের যুবক। আমার কর্ম্মজীবনে প্রবেশাধিকার হ'ল কিঞ্চিদধিক বছক খানেক পরে। ঐ সময় কবি-সান্নিধ্য-লাভের যে সুযোগ ঘটেছিল তার পুণ্যস্মৃতি দিয়েই আজকের আলোচনার মুখবন্ধ রচিত হয়েছে।

ত্রিপুরায় কবির সর্ব্বশেষ পদার্পণ —

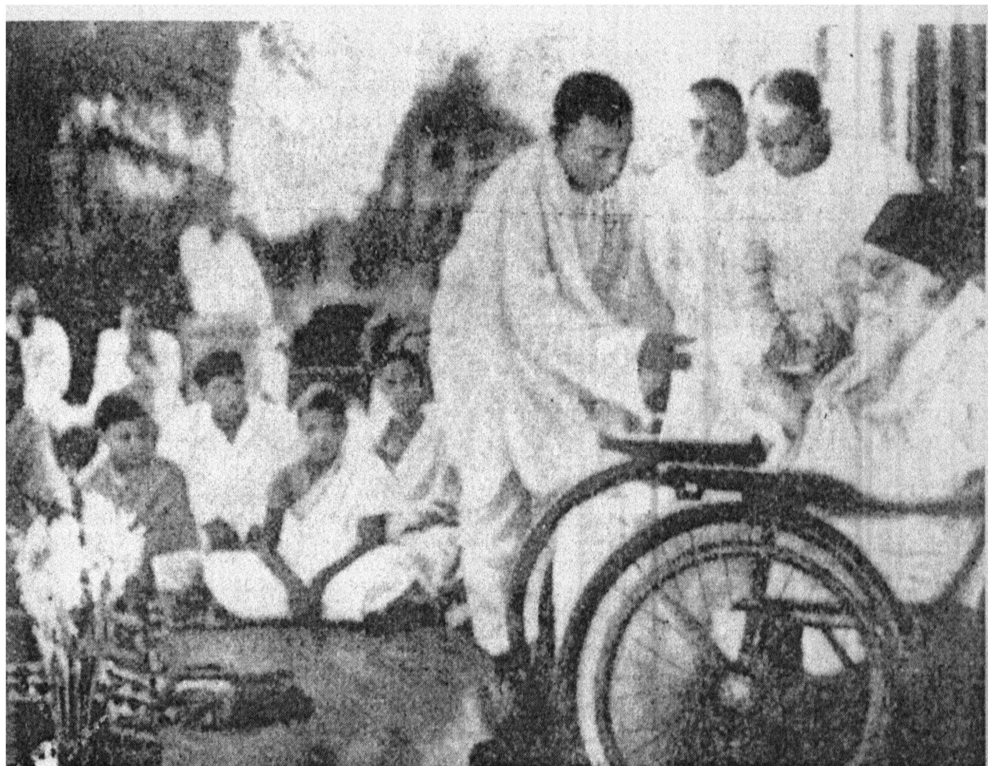
১৩৩২ বাংলার ফাল্গুন মাস অর্থাৎ ১৯২৬ সনের ফেব্রুয়ারী-ঠিক পয়ঁত্রিশ বছর পূর্ব্বের কথা। সম্ভবতঃ বছরখানেক আগে কবি দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে স্বদেশে ফিরে এসেছেন; আর সেবার অল্পদিন আগে লক্ষ্ণৌ থেকে ঘুরে এসেই পূর্ব্ববাংলায় সফরে বেরুবেন মনস্থ করেছেন। 'পুরবী' সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। ঐ বছর কুমিল্লায় এলেন ৭ই ফাল্গুন। অভয়-আশ্রমের বার্ষিক-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন। আগেই বলেছি, কর্ম্মজীবনে তখনো প্রবেশ করিনি, সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন অবসর। কবির কুমিল্লা-সফরের খবর একদা কানে পৌঁছতেই ছুটে গেলাম সেখানে। কুমিল্লায় কবি আতিথ্যগ্রহণ করেছেন সতীর্থ ও অন্তরঙ্গ এক বন্ধুগৃহে, সুতরাং এই সুযোগে কয়দিন কবি—সঙ্গলাভের সুবিধে হয়ে গেল। সভাসমিতিতে যোগদান যে বাদ পড়ল না তা' বলাই বাহুল্য। বাড়ীতে বসবার ঘরে কবির কথোপকথনের সময় সবার পেছনে বসে পেন্সিলে নোট করে যেতাম, আর বাড়ী ফিরেই ডায়ারীতে লিখে নিতাম। বন্ধুবরের কাছেই অবশেষে একদিন শোনা গেল, কবি কুমিল্লা থেকে যাচ্ছেন আগরতলায় সেদিনের সন্ধ্যার গাড়ীতেই। নিমেষেই স্থির হল, সহযাত্রী হয়ে যাব স্বস্থান আগরতলায়। কবি যথাসময়ে এলেন ষ্টেশনে। দুটি রিজার্ভ করা কামরার একটিতে উঠলেন কবিগুরু—সঙ্গে নিয়ে শ্রীযুক্তা প্রতিমা



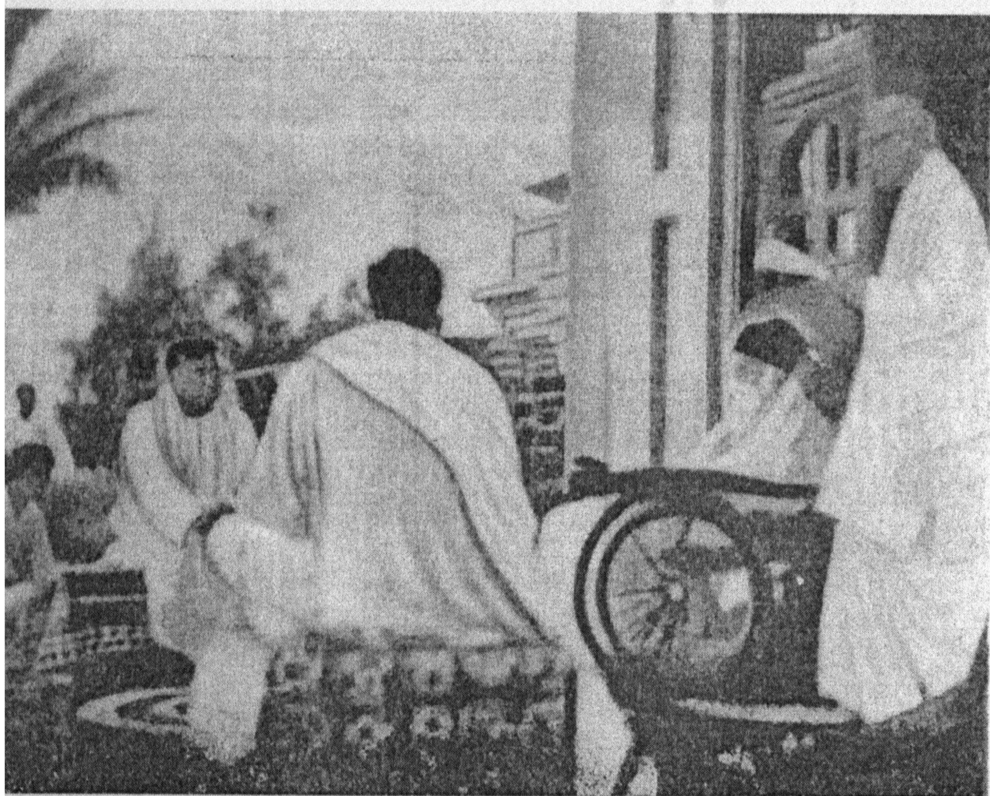
১৯। চিত্রাঙ্কনরত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য



২০। শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে মহারাজ বীরবিক্রমের সম্বর্দ্ধনা



২১। শান্তিনিকেতনে কবির "ভারত ভাস্কর" মানপত্র



২২। "ভারত ভাস্কর" মানপত্র গ্রহণান্তর কবির প্রত্যুত্তর পাঠরত রথীন্দ্রনাথ

দেবীকে আর ৪/৫ বছরের পৌত্রী নন্দিনীকে (পুপে)। অপর কামরায় উঠলেন শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ আর অধ্যাপক হিরজীভাই পেস্তনজী মরিস্। তৃতীয় শ্রেণীর একটা টিকেট কিনে আমি উঠে পড়লাম সংলগ্ন একটা ছোট কামরায়। সন্ধ্যানাগাদ কুমিল্লা ছেড়ে রাত ন'টায় আখাউড়া ষ্টেশনে পৌঁছা গেল। আখাউড়া ষ্টেশনে কবিগুরুকে অভ্যর্থনা করতে এলেন মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজকুমার রণবীরকিশোর এবং আরও অনেকে। ফাল্গুনের ১০ই (২২শে ফেব্রুয়ারী), সোমবার রাত ১০টায় কবি আগরতলায় এসে মহারাজকুমারের আতিথ্য গ্রহণ করে উঠলেন, সহরতলীতে অবস্থিত কুঞ্জবন—প্রাসাদে। আমি চলে এলাম চিরপরিচিত মাতুল-গৃহে।

সকালে উঠেই ভাবছি কবিদর্শন ও তাঁর সান্নিধ্যলাভের সূত্র আবিষ্কারের কথা। সহজেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র এবং কবির পরম স্নেহের পাত্র হরিদাস ভট্টাচার্য্য মশাই আমার প্রতিবেশী ও শুভানুধ্যায়ী। কবির আগরতলায় বাসকালীন তদীয় যত্নপরিচর্য্যার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত থাকায় রাজপ্রাসাদে গিয়ে কবিসন্দর্শনের সুব্যবস্থা হয়ে গেল। তিনিই সময় ও সুযোগ বলে দিলেন।

সেদিন ১১ই ফাল্গুন। অপরাহ্নে বেরিয়ে পড়া গেল কুঞ্জবনের আঁকাবাঁকা রাঙ্গামাটির পথে। সর্পিল পথ উঠে গেছে পাহাড়ের উপর প্রাসাদের দিকে। দুধারে সুশ্যামল আর সুন্দর-করে ছাঁটাই কামিনী-বীথিকা। প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বৃক্ষশাখায় লতানো ও পুষ্পিতা বিগোনিয়া-ভেনিষ্টা, বিচিত্র রংএর বুগেনভ্যালিয়া আর বাগানে রয়েছে মাধবী-মল্লিকা-নেয়ারী-গোপাল-বেলী ও ক্যানার কেয়ারীর বর্ণ-সমারোহ। ওপাশে দেবদারু-ইউক্যালিপটাস্ বনঝাউ-সিলভারওক্ আর অর্কেরিয়ার বৃক্ষশ্রেণী। ম্যাগনোলিয়া আর অশোকও রয়েছে। মনটা উৎফুল্ল হল। রাজপারিষদ পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মশাই একদিন বলেছিলেন, রাজপ্রাসাদের নাম 'উজ্জয়ন্ত' বলে সবাই জানে। তার সঙ্গে নামের মিল রেখে কুঞ্জবন-প্রাসাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'পুষ্পবন্ত প্রাসাদ'। কিন্তু তা' কোষ্ঠীর অচল নামই রয়ে গেল। চলতি পরিচয়ে আর চালু হল না। উত্তরদিকের পুরান কুঞ্জবনের উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় যে প্রাসাদ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা হয়েছিল, তার নাম কল্পিত হয়েছিল 'বৈজয়ন্ত'। নানা কারণে সে পরিকল্পনা বরবাদ হয়ে গেল।

সন্তর্পণে এখানে ওখানে খোঁজ করে হরিদাস বাবুকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, অনেক আগে এসেছি—অপেক্ষা করতে হবে। বাইরের বাগানে এসে বাতাবী, মাধবী, বসন্ত আর কাটালীচাঁপার ফুল সংগ্রহ করা গেল অনেকটা। সংগৃহীত ফুল ক্যানার পাতায় মুড়ে সযত্নে রেখে দিলাম, সুযোগ পেলে কবিচরণে পুষ্পার্ঘ্য দেবার মানসে। একটা বকুলতলায় গা এলিয়ে অপেক্ষা করছি, একটু বাদেই সংবাদ জানা গেল, কবি প্রাসাদের পুর্বদিকের গোলবারান্দায় বসেছেন। হরিদাস বাবুর সঙ্গেই কবিসদনে উপস্থিত হয়ে তাঁর রাজীবচরণে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলে উৎফুল্ল হয়ে ফুলগুলি হাতে নিলেন ও আমায় বসতে আদেশ করলেন। উপস্থিত রয়েছেন দিনেন্দ্রনাথ, মিঃ মরিস্, মহারাজকুমার

নরেন্দ্রকিশোর, রণবীরকিশোর, অধ্যাপক শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং আরও দু'চারজন। গল্প আগেই জমেছে। বলছিলেন,

"গোমতীর বুক থেকে সোপানশ্রেণী উঠে গেছে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে—অদূরে গোবিন্দ মাণিক্যের প্রাসাদ। (১) হাঁ, মহারাজ বীরচন্দ্র 'রাজর্ষি' রচনার যুগে আমায় অনেক সাহায্য করেছেন ইতিহাস, কিংবদন্তী, পাহাড়ী ছড়া, ত্রিপুরার রূপকথা আর নানা ছবি পাঠিয়ে। 'রাজর্ষি'তে আমি কিন্তু আমার কল্পনায়ই পরিবেশ এঁকেছি। তোমরা বলছ, প্রাচীন উদয়পুর আর গোবিন্দ মাণিক্যের বাড়ী আমায় দেখাবে—সে আমি আর দেখতে চাইনে। আমার কল্পনার রাজর্ষি চিরকাল আমার কল্পনায়ই অধিষ্ঠিত থাকুন। অনুরাগী উত্তরসাধকগণ তাঁদের মানসস্বর্গে ভুবনেশ্বরীর দেউল গড়বেন।"

ক্ষণিক অবকাশ নিয়ে ও পেয়ালায় চুমুক দিয়ে স্বভাব-সৌজন্যেই যেন আবার বললেন,

"বৃদ্ধ হয়েছি—দেহমন ক্লান্ত। আমার উদয়পুর দেখা আর পাহাড়ী নৌকায় গোমতীতে তিন দিন উজান বেয়ে যাবার অনুমতি এই দেহরক্ষীগণই আমায় দেবেন না।"

বলেই পরিহাস করে দিনেন্দ্রনাথের দিকে কটাক্ষে চাইলেন। এবার কবি মহারাজকুমার নরেন্দ্রকিশোরের দিকে চেয়ে আবার বললেন,

"ঐ যে দ্বিতীয় গানটা পড়ে শোনালেন, ওটা আমার ভাল লাগল। যে কোন রচনাই বলুন—তা' কবিতাই হউক আর গানই হউক—সাহিত্য হবে রসোত্তীর্ণ, তবেই হবে তা' পরম রমণীয়। আর তাই হবে সৎসাহিত্য। 'রবি' পত্রিকাটিকে রমণীয় করে তুলুন, হউক না তা' ত্রৈমাসিক পত্র। ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা রাজভাষার গৌরবে সম্পন্ন, সমৃদ্ধ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর।"

প্রসঙ্গান্তর হল। এবার চেয়ে আছেন অপরাহ্নের পূর্ব্বদিগন্তের দিকে—যেখানে বড়মুড়া পাহাড়ের সানুদেশে অরণ্যানীতে আসন্ন অন্ধকারের ঘননীল ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। পূর্ব্বদিগন্তের পর্ব্বতশ্রেণী কতদূরে আর যাতায়াতের পথ কেমন, এ সব সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে জেনে নিচ্ছেন কিন্তু অন্তরে যেন আর কিছু ভাবছেন। কারো মুখে কোনো প্রশ্ন নেই—সবাই শোনবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। দিনুবাবুর দিকে চেয়ে একবার ছোট করে বললেন,

"ঐ যে ও গানটা—
আজকি দেখি কালো চুলের আঁধার ঢালা
স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মাণিক জ্বালা।"

দিনুবাবু পাদপূরণ করলেন,

"আকাশ আজি গানের সুরে ভরে আছে
ঝিল্লীরবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে,
বন্দনা তোর পুষ্পবনের গন্ধধূপে
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বরূপ রূপে।"

সবাই চুপ করে বসে আছি। গোলবারান্দার বাইরে চিকন পাতার ঝাউএর ডালে ডালে দক্ষিণ সমীরণ সন্ সন্ শব্দের শিহরণ তুলেছে। অদূরে একটা ঝোপের আড়াল

(১) ভগ্ন মন্দির ও প্রাসাদের ফটোগ্রাফ দ্রষ্টব্য

হতে সত্যই ঝিল্লীর ভেসে আসছিল—ওটা এতক্ষণ যেন কানে বাজেনি। আর, পুষ্পবনের গন্ধধূপ তো সদ্য-নিবেদিত নৈবেদ্য থেকেই উঠছিল। সার্থক হলো আমার আজকের পূজা। তৃপ্তির আনন্দে মনটা ভরে গেল। দিনুবাবু কবিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, বাইরে সহর বেড়াতে যাবার কথা। গল্প থামিয়ে কবি বল্লেন,

"তাইতো, লালু এসেচে? চল, এবার উঠা যাক, বড্ড দেরী হয়ে গেল।"

সভা ভঙ্গ হল। বলে রাখা ভাল যে 'লালু' হচ্ছে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের ঘরোয়া চল্‌তি নাম।

কবির আগরতলায় আগমনের এবার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় "কিশোর-সাহিত্য-সমাজ" কর্ত্তৃক আয়োজিত সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ, তরুণ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয় এবং মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রমুখ অনুরাগিগণ ও শান্তিনিকেতনের বহু প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে পুনর্মিলন। সর্ব্বোপরি, পূর্ব্বকার দুইসপ্তাহকাল ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় বক্তৃতা আর ঠাসা প্রোগ্রামের ভারমুক্ত হয়ে ত্রিপুরায় এসে পূর্ব্বস্মৃতি-বিজড়িত পরিবেশে নিরালায় ক'দিন অবকাশ যাপনের সংকল্প। 'কিশোর-সাহিত্য-সমাজে'র মুখপত্র 'রবি' ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দের চতুর্থ সংখ্যায় (রবীন্দ্র-সম্মিলন সংখ্যা) এবং ১৩৪৮ সনের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসীতে' কবির আগরতলায় অবস্থান সম্পর্কে অনেক বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

কিশোর সাহিত্য সমাজ কর্ত্তৃক কবি সম্বর্দ্ধনা

১২ই ফাল্গুন পূর্ব্বাহ্নে আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমী নামক স্কুল গৃহে কিশোর সাহিত্য-সমাজ কর্ত্তৃক কবি-সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর। ত্রিপুরেশ্বরগণের সঙ্গে প্রথম পরিচয় থেকে উত্তরকালে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক অকথিত ও হৃদয়গ্রাহী তথ্য কবিগুরুর ভাষণে সেদিন উল্লেখ হয়। সাহিত্য- সমাজের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অভিনন্দনে (১) বলা হল,

> "অতীত গৌরবের যে রেশটুকু লইয়া এই সুপ্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্য ও রাজ-পরিবার তোমার লেখনী সম্পাতে কাব্যে অমর হইয়াছে, তাহারই রাজধানীতে তোমাকে পাইয়া আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই!
>
> "এই সেই মাণিক্যপ্রসূ বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর ও বীরেন্দ্রকিশোরের লীলাভূমি—যাহার প্রত্যেক পরমাণু তোমার প্রীতিপরশে ধন্য হইয়াছে—যেখানে বাংলা ভাষা রাজভাষায় সম্মানিত আসন লাভ করিয়াছে—যেখানে বঙ্গভাষা রাজ ইতিহাস 'রাজমালার' জীবন—যেখানে তুমিই সাহিত্য-সভার উদ্বোধন করিয়াছিলে ---আজ সেই স্থানে আমাদের নবগঠিত 'কিশোর'- সাহিত্য-সমাজ মাতৃভাষার সেবাব্রত-গ্রহণযোগ্য শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তোমার মত সিদ্ধ-সেবকের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার্থ নতমস্তকে দণ্ডায়মান। তোমার বাণী প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ করুক।"

* * * *

ত্রিপুরার শ্রদ্ধেয় ও প্রবীণ অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মশায় কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য (২) দিতে গিয়ে বলেন,

"প্রভাতে, ভানু পক্ষিগণের কলকাকলিতে বিশ্বকে মুখরিত করিয়া তোলেন, দিবসে জীবকুলের সংরাবে ধরাকে শব্দায়মান করিয়া রাখেন; এবং সায়াহ্নে বিশ্রামের কলরবের মধ্যে সকলের জন্য

---

(১) ও (২) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

শান্তির ছায়া পাতিয়া দেন। এইরূপে বিবিধ রব উত্থিত করেন বলিয়াই তিনি 'রবি' হইয়াছেন।

"তাঁহার আলোকে বিশ্বের অশেষ বৈচিত্র্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাই তিনি "ভাস্কর" অর্থাৎ বিশ্ব-শিল্পী।

"তিনি জীবজগতে চৈতন্যের সঞ্চারকারী, তাহা হইতে জীবলোক নূতন জীবন প্রাপ্ত হয়, তাই তিনি 'সবিতা'। চৈতন্যের পরম পরিণতি জ্ঞান; জ্ঞানেরও প্রবর্ত্তক তিনিই। তাহাতেই সাবিত্রীমন্ত্রে তাঁহার নিকট জ্ঞানের প্রেরণার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

"তুমি রবির এই সমস্ত নামেরই নূতন সার্থকতা সম্পাদিত করিয়াছ" ইত্যাদি।

পরিশেষে প্রতিভাষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমর বাণী (১) প্রদান উপলক্ষ্যে বল্‌লেন,

"এই ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে আমার যে প্রথম পরিচয়, তা খুব অল্পবয়সে। সদ্য England থেকে ফিরে এসেছি, তখন একখানি মাত্র কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। বাল্যের রচনা, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি অনেক ত্রুটি থাকায়, পুনঃ প্রকাশিত হয় নাই।***

একদিন, এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম। আপনারা হয়তো অনেকেই দূতমহাশয়ের নাম জানেন— তিনি রাধারমণ ঘোষ। মহারাজ তাঁকে সুদূর ত্রিপুরা হ'তে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি কবি-রূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন।***

"জীবনে যে যশ আজ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তা'র প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন, অভিনন্দনের দ্বারা। তিনি আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টিদ্বারা দেখতে পেয়েই তখনি আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না, তাঁকেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন। ***

শুভদৈববশতঃ অনেক সম্মান—এমনকি য়ুরোপীয় রাজহস্তেও—আমার ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু আমার এই ঘরের এবং স্বদেশের রাজার কাছ থেকে যে সম্মান লাভ করে এসেছি ব্যক্তিগত জীবনে আমার কাছে তা মূল্য অনেক বেশী। এই জন্যই এই ত্রিপুরার সঙ্গে আমার ক্ষণিক অতিথির সম্বন্ধ নয়। এ সম্বন্ধ এখানকার রাজপিতা ও পিতামহদের স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত।***

"এই রাজ-পরিবারে বহুকাল থেকে বাংলাভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন কর্ত্তব্য প্রজাকে পালন করা, তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা। বিদেশী আচারের মোহে বিক্ষিপ্ত হয়ে, কোনোদিনই দেশীয় রাজন্যবর্গ এই মহৎ দায়িত্ব থেকে যেন বিচ্যুত না হন। এই পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগসূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।

"রাধাকিশোর ও বীরচন্দ্রের লেখার মত চিঠি আমি খুব অল্পই দেখেছি। সেগুলি যেমন সংযত, তেমনি সুসংস্কৃত—তেম্‌নি সরস। মাতৃভাষাকে এমন সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা, এ যে তাঁদরে রাজোচিত সৌজন্যেরই অঙ্গ।

* * *

"ব্রজেন্দ্রকিশোর তখন বালক, যখন তিনি আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি তাঁর ব্যবহারে ও আচরণে আমার নিকটতম আত্মীয়ের স্থান গ্রহণ করেছেন। বালককাল থেকেই তিনি আমার

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সঙ্গে পত্রব্যবহার করতেন। ইহা যে ব্যর্থ হয় নাই, ইহাই আমার পরম আনন্দ। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের আর কোন হিত যদি না করে থাকি, কেবলমাত্র যদি ব্রজেন্দ্রকিশোরের চরিত্রকে কর্ত্তব্যের দীক্ষায় দৃঢ় করতে পেরে থাকি, তবে তাঁর দ্বারা ত্রিপুরার স্থায়ী কল্যাণ সাধন করেছি বলে গৌরব করতে পারবো।***

"আজ বসন্তে, ত্রিপুরার বনশ্রী যখন দক্ষিণ বাতাসে দিকে দিকে পুষ্পোৎসবের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, তখন আমি এঁরই কাছ থেকে এঁর পিতৃসখা রূপে সেই মাল্য গ্রহণ করতে এসেচি, যা এঁর পিতা পিতামহ তাঁদের প্রীতিভাজন এই অতিথির জন্য সজ্জিত করে রেখে দিতেন।***

"এই উপলক্ষ্যে ত্রিপুরার রাজগণের প্রতি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ইচ্ছা করি। আজ বিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করেছি। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোকের মধ্যে একমাত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে আমি নিয়মিত আনুকূল্য পেয়েছি। তিনি স্বয়ং আমাদের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করে, আমাদের আনন্দিত ও সম্মানিত করেছেন। সে সময় আমার এই প্রতিষ্ঠান দৈন্য-পীড়িত ও অধিকাংশের অপরিজ্ঞাত ছিল। অথচ তখনই রাধাকিশোর কেবল যে বার্ষিক অর্থদানের দ্বারা এই শুভকর্ম্মের সাহায্য করেছিলেন তা নয়, ত্রিপুরার অনেক বালককে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র বীরেন্দ্র মাণিক্যও যে কেবলমাত্র এই দানকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন তা নয় সেখানকার হাসপাতাল নির্ম্মাণ করতে পাঁচ হাজার টাকা দান করেছিলেন এবং আরো পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করেছিলেন।***

"অবশেষে কিশোর-সাহিত্য-সমাজ ও ত্রিপুরার জনসাধারণকে অদ্যকার দিনে এই শেষ কথা জানিয়ে যাই যে আমি যশোভাগ্যবান কবির মতো এখানে মান নিতে আসিনি; আমি স্বর্গগত মহারাজদের বন্ধুরূপে যেমন আমার তরুণ বয়সে এখানে প্রীতি ও শ্রদ্ধালাভ করেছি, আজ আমার শেষ বয়সেও সেই আত্মীয়তার শেষ রসটুকু ভোগ করে বলে যেতে এসেছি—

সর্ব্বস্তরতু দুর্গানি সর্ব্বো ভদ্রানি পশ্যতু।"

সম্বর্দ্ধনা সভা শেষ হল—কবি কুঞ্জবনে ফিরে গেলেন।

কবির উপরোক্ত ভাষণে মহারাজ বীরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কার্সিয়াং-এ অবস্থানের প্রসঙ্গে তিনি বলছেন,

"তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে যখন আমি তাঁর আতিথ্যভোগ করেছিলেম......."

সে সময়েই বৈষ্ণব পদাবলী সঙ্কলন ও প্রকাশ করবার উপলক্ষে মহারাজ লক্ষমুদ্রা ব্যয়ের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্ত্তী কালে শান্তিনিকেতনে কবির ১৩৪৫ সনের ২২শে পৌষের এবং ১৩৪৮ সনের ৩০শে বৈশাখের ভাষণাদিতেও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। রবীন্দ্রজীবনী (১মখণ্ড) থেকে আমরা জানতে পারি যে ১৩০১ সনের "গ্রীষ্মকালে কয়দিনের জন্য কবি গেলেন কার্সিয়াং-এ; ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য রবীন্দ্রনাথকে তথায় কয়েকদিন কাটাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন।" বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলীর সামগ্রিক প্রকাশ সম্বন্ধে সে সময়ে কবির সঙ্গে মহারাজের এক উদার পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়। এই সময়ে মহারাজ বীরচন্দ্রের সহিত সাহিত্য-কাব্য-সঙ্গীত-চিত্রবিদ্যা ও ফটোগ্রাফী ইত্যাদির অফুরন্ত চর্চ্চা সম্বন্ধে কর্ণেল মহিমচন্দ্র তদীয় "দেশীয় রাজ্য" গ্রন্থে এক বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। কার্সিয়াং-এ কবির এই অবস্থিতির ঠিক আড়াই বছর পর অর্থাৎ ১৩০৩ সনের অগ্রহায়ণ মাসে মহারাজ বীরচন্দ্র কলকাতায়

লোকান্তরিত হলেন। মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্ব্বেই বিশেষ অসুস্থ হয়ে মহারাজকে কার্সিয়াং থেকে চলে আসতে হয়। কবি বারংবার বলেছেন, বীরচন্দ্রের মৃত্যুর "অনতিকাল পূর্ব্বে" তিনি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। —সে সময়েই বৈষ্ণব সাহিত্যাদি প্রকাশের পরিকল্পনা হয় কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিকল্পনা আর কার্য্যে পরিণত হয়নি। সুতরাং, ১৩০১ সনের গ্রীষ্মকালের পর মহারাজের মৃত্যুর পূর্ব্ব সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কার্সিয়াং গমন করতঃ পুনরায় মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন কিনা এবং ঐ সময়েই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বৈষ্ণব সাহিত্য সঙ্কলন ও রবীন্দ্রকাব্যের অলঙ্কৃত সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছিল কিনা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের অবকাশ থাকায় এবিষয়ে রবীন্দ্র- জীবনীকারের অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। তিনিও কবির দ্বিতীয়বার কার্সিয়াং গমন করতঃ মহারাজের আতিথ্যগ্রহণ সম্বন্ধে একমত হয়েছেন। এদিকেও অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৩ সনের মাঝামাঝি কোনও এক সময় পুনরায় কার্সিয়াং-এ মহারাজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তথায় কয়দিন অতিবাহিত করেন। তার অনতিকাল পরেই অগ্রহায়ণ মাসের ২৭শে তারিখ মহারাজ বীরচন্দ্র কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে আর একটা কথা বলা যেতে পারে যে ত্রিপুরার মহারাণী-রাজমাতার অনুমত্যনুসারে আগরতলা রাজপ্রাসাদ থেকে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের সমকালীন-তোলা সহস্র সহস্র ফটো-প্রিন্টের সঞ্চয়সম্ভার খুঁজে সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে দুটি ব্রোমাইড-এন্‌লার্জ্জমেন্ট ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে, কবির সে দুটি দুষ্প্রাপ্য ছবি মহারাজ বীরচন্দ্রের স্বহস্তগৃহীত বলে জানা যায় এবং তা' তোলা হয়েছিল কার্সিয়াং-এ ১৩০১ সনে— কবির বয়ঃক্রম তখন ৩৩ বৎসর। আর একটা ছবি পূর্ব্বাশাপত্রের রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যায় আগে প্রকাশিত হয়েছিল। এ আলোচনার বিস্তার অপ্রাসঙ্গিক।

১২ই ফাল্গুন অপরাহ্নে আবার ছুটে গেলাম কুঞ্জবনের দিকে। হরিদাস বাবুর সস্নেহ ব্যবস্থায় অচিরেই কবিসকাশে পৌঁছা গেল। ত্রিপুরার শাসন-পরিষদের সরকারী সভাপতি রায়বাহাদুর জ্যোতিশ্চন্দ্র সেন, পরিষদের মুখ্যসচিব দেওয়ান বিজয়কুমার সেন, শিক্ষাসচিব সোমেন্দ্র দেববর্ম্মা (রেণুসাহেব) আর রাজ-পরিবারের অথবা ঠাকুর পরিবারের একটি মহিলা বসে আছেন যাঁকে চিন্‌তে পারিনি। সসম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে বসে পড়লাম। এদিন কবি বলে চলেছেন আরও কুড়িবছর আগে (১৩১২ বাংলায়) তাঁর আগরতলা আসার গল্প আর উমাকান্ত একাডেমী বিদ্যালয়ে 'ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনী'তে তদীয় "দেশীয় রাজ্য" প্রবন্ধপাঠের (১) কথা। গল্পের বাচনভঙ্গী হাল্কা। তখনকার দিনে আগরতলা সহরের চেহারা ও পুরাতন প্রসঙ্গ আলোচনায় সোমেন্‌দা এক সময়ে জানালেন যে জগন্নাথ বাড়ীর সামনে রাজপথের পাশে যে দুটি উঁচু মহীরুহ রয়েছে, তাতে রাজ্যের শকুনের বাসা ছিল আর পথচারীর অসুবিধাও ছিল। আমরা কিন্তু তার থেকে অধুনা ঐ রাজপথের নামকরণ করেছি— শকুন্তলা রোড ! কবি শুনে পরিহাস করে বল্‌লেন,

"খুব সুন্দর আর যথার্থ নামকরণ হয়েছে রে ! দুষ্মন্তের রাজ-অন্তঃপুরে দুঃখিনী শকুন্তলা এবার চিরবন্দিনী হলেন—কণ্বমুনির আর চিন্তা রইল না।"

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

লঘু পরিহাসটি অত্যন্ত উপভোগ্য হল। আবার বলে চলেছেন, বর্ত্তমান মালঞ্চাবাস পাহাড়ের শিখরদেশে অবস্থিত শ্লেটপাথরের টালিতে-ছাওয়া পাকা বাংলোয় আগের বারের অবস্থানের স্মৃতি, তার আরও আগে যে আগরতলায় ৫/৬ বার এসেছিলেন, সে সময়ের উপভোগ্য হাল্কা গল্পের মাধ্যমে তদানীন্তন রাজপারিষদগণের চরিত্র বিশ্লেষণ। হঠাৎ যেন একটু সংযত হয়ে বললেন,

> "বালক মহারাজের সঙ্গে শিক্ষকতাকার্য্যে দেশীয় শিক্ষকগণ যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন, ত্রিপুরা সম্বন্ধে মহারাজের ঔৎসুক্য জাগাতে তাঁদের বলে দেবেন। রাজ্যের ও প্রজার কল্যাণব্রতে ওঁর মনকে পরিচালিত করবার মধ্যেই নিহিত রয়েছে রাজ্যের ও দেশের সামগ্রিক মঙ্গল। মহিম ঠাকুরকে দেখেছি বীরচন্দ্রের শিষ্যরূপে, আর রাধাকিশোরের তিনি ছিলেন সখা।"

কবির অনুমতি নিয়ে এসময়ে উঠে গেলেন রায়বাহাদুর আর দেওয়ান বিজয়বাবু — সরকারী কাজের তাগিদে। চল্‌তি প্রসঙ্গ আর বেশীদুর বাড়ল না। রাজপুরুষদের অন্তর্ধানে এবার যেন হাল্কা মনের আমেজ মাখিয়ে বল্‌লেন,

> "লালুদের ওখানে আজ যাচ্ছি মণিপুরী নৃত্য দেখতে। হয়তো এক্ষুণি আস্‌ছেন ওঁরা। তোমরা তৈরী হয়ে নাও — আমি প্রস্তুতই আছি। দক্ষিণ সমীরণে আজ মাধবীর মধুময় মন্ত্র দিকে দিকে বার্ত্তা পাঠিয়েছে। বসন্তের আগমনে আশার অরূপবাণীকে রূপ দিতে হবে — তবেই না প্রাণগঙ্গাকে আবাহনের সার্থকতা!"

একটু থেমে বলছেন,

> "প্রকৃত বসন্তকাল তোদের দেশেই দেখে উপভোগ করলুম।"

আবার বললেন,

> "বসন্ত এসেচে। বনে-উপবনে অজস্র বাসনার বিকাশোৎসবের মঙ্গল ভৈরবী বেজে উঠেছে। আমরা কি একান্তই মানুষ-প্রকৃতির সমগোত্রীয় নই? প্রকৃতির সঙ্গে কোনো সংযোগই থাকবে না? বনদেবী যখন আমার আঙিনা ছায়ায় ঢেকে দেবেন, গন্ধে ভরে দেবেন, তাঁর এলোচুল যখন ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠবে, আমরা তখন আপিসে যাবো চাপকান পরে? মানবমনে বিশ্বের বৈচিত্র্যের ছায়াপাত হয় বলেই মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে তার প্রভেদ। রম্য প্রকৃতির রাজমহলের প্রতিদুয়ারই খোলা রয়েছে তোমাদের জন্য।"

এবার আরও যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন,

> "প্রকৃতিকে ভালবাসো, বিশ্বাস করো, আর তাঁর কাছে চিঠি পাঠাও। প্রিয়জনের চিঠি পাবার প্রত্যাশা নিয়ে ডাকহরকরার অপেক্ষায় বসে থাকবে — তবে তো সার্থক হবে বনদেবীর আবাহন।"

একটু চুপ করে প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। আবার একটু হাল্কা গল্প হয়েই সভাভঙ্গ হল।

খানিকক্ষণ বাদেই সবাই বেরিয়ে গেলেন শহরের দিকে। রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে একটা নিরালা কুঞ্জের আড়ালে বসে পড়লাম। কবির আজকের কথাগুলি হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে ও মনের চিন্তায় তার অনুশীলন চলেছে। নোট বইটা বারে বারে খুলি আর মনঃসংযোগ করে হারিয়ে-যাওয়া শব্দ বা বাক্যনিচয়ের সংযোজন বা সংশোধন করে নেই। পশ্চিম আকাশে সূর্য্যদেব তখন অস্তমিত, আর পূর্ব্ব গগনে দ্বাদশী অথবা ত্রয়োদশীয় চাঁদ — সাম্‌নেই তো হোলীর পূর্ণিমা। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবার

আগেই বনপথ পেরিয়ে যেতে হবে, সুতরাং উঠে পড়লাম। ত্রস্তপদে শহরে এসে লালুকর্ত্তার বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াতেই শুনছি, মণিপুরী কীর্ত্তনীয়ার কণ্ঠ হতে ভেসে আসছে গানের একটি চরণ, " — আবীর ছড়াইয়া আছে পলাশের ফুলে — সখি লো!"

আগরতলায় কবি-রচিত সংগীত

রবীন্দ্রনাথের আগরতলায় রচিত সঙ্গীত অনুসন্ধানের প্রসঙ্গে এখানে একটু আলোচনা করে রাখা প্রয়োজন। 'রবীন্দ্রজীবনী'কার তদীয় গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ) কবির আগরতলায় রচিত গান সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে কবি "দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা" ও "ফাগুনের নবীন আনন্দে" গান দুটি আগরতলায় রচনা করেন। "এসো আমার ঘরে", "বনে যদি ফুটল কুসুম", "আপন হারা মাতোয়ারা", "ওগো জলের রাণী" এ কয়টি গানও কবির এবারকার ভ্রমণকালেই রচিত বলে জীবনীকার অনুমান করেন। আগরতলায় কবিকথার যে সামান্য অনুলিখন পঁয়ত্রিশ বছর আগে ডায়ারীতে তুলে রেখেছিলাম, অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি নিয়ে এবার তার উপর আলোকপাত করা গেল। দেখে স্বভাবতঃই আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে জীবনীকারের অনুমানের যথার্থ্য ডায়ারীতেও পেয়ে যাচ্ছি। "এসো আমার ঘরে" গানটিও যে আগরতলায় রচিত তৎসম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। কবিকথার অংশ বিশেষের যে অনুলিখন ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেও এ গানগুলির ভাঙ্গাচরণ ঐ কথার মধ্যেই অবিকল পেয়ে যাই। অন্ততঃ প্রথমোক্ত তিনটি গান যে ১২ই ফাল্গুনের খুব কাছাকাছি এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে রচিত, তার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ দেখতে পাচ্ছি যে ১৩৩২ সনে প্রকাশিত 'চয়নিকা' কাব্যসংকলনের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠায় "দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা" আর "ফাগুনের নবীন আনন্দে" গান দুটির তারিখ দেওয়া হয়েছে ১৫ই ফাল্গুন। চয়নিকায় দেওয়া তারিখ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ ছিল বলেই জীবনীকার পরবর্ত্তী সময়ে তার নিরসন করেছেন। কবি আগরতলা থেকে ১৪ই ফাল্গুন (২৬শে ফেব্রুয়ারী) শুক্লা চতুর্দ্দশীতে রওনা হয়ে চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ইতাদি স্থান ষ্টীমারযোগে ঘুরে কলকাতা ফিরলেন মার্চ্চের গোড়ার দিকে। সুতরাং, একমাত্র "ওগো জলের রাণী" সংগীতটি পদ্মাপাড়ির পরিবেশানুকূল হলেও বাকী সব কটা' গানই যে এবারে আগরতলায় রচিত তৎসম্বন্ধে কুঞ্জবনের অনুকূল পরিবেশই স্বাভাবিক নির্দ্দেশ দিচ্ছে।[১] 'রবি' পত্রিকায় তৎকালে প্রকাশিত হরিদাসবাবুর বিবরণীও সিদ্ধান্তগ্রহণে অনেকটা সহায়তা করে। প্রাসাদের পূর্ব্বদিকের গোলবারান্দা থেকে সুদূর শৈলশিরে প্রভাতে সূর্য্যোদয় শোভা নিরীক্ষণে কবির ধ্যানমৌন তন্ময় চিন্তায়, গভীর নিশুতিরাতে জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত বন-উপবনের ও পুষ্পিত লতাকুঞ্জের শান্ত পরিবেশে তাঁর নিরুপম সৌন্দর্য্যধ্যানে অথবা নবীন-বসন্তে কুঞ্জবনের রম্য-প্রকৃতির কোলে নিভৃত বিশ্রাম-নিলয়ে সংশয়াতীতভাবেই এই সংগীতগুলি এবার ত্রিপুরার আলো হাওয়ায় জন্ম নিয়েছিল। (২)

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য (আগরতলায় রচিত সঙ্গীত)
(২) পরিশিষ্ট — আগরতলায় রবীন্দ্রনাথ, হরিদাস ভট্টাচার্য্য।

কবির আগরতলায় রচিত গানের প্রসঙ্গে আর একটি কথার আলোচনা আনতে হচ্ছে। ত্রিপুরাবাসী — বিশেষতঃ, আগরতলার প্রাচীন নাগরিকগণের কেহ কেহ বলে থাকেন, "যামিনী না যেতে জাগালে না কেন" এই সুপরিচিত সংগীতটি রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় রচনা করেন। কিন্তু প্রকৃত তথ্য অন্য রূপ। কবি প্রথমবার আগরতলা আগমন করেন ১৩০৬ সনে; কিন্তু কল্পনা-কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৩০৭ সনে প্রথম প্রকাশিত) এবং রবীন্দ্র রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে দেখ্‌তে পাই যে গানটির রচনাকাল ১৩০৪ সনে এবং এটা লেখা হয়েছিল, কবির উত্তরবঙ্গ সফরকালে ব্রহ্মপুত্রের (যমুনা) বুকে বোটে অবস্থানকালে। সঙ্গত অনুমান এই হয় যে কবির আগরতলায় প্রথমবারে শুভ পদার্পণকালে অপ্রকাশিত এই অতি সুন্দর নতুন গানটি কবিকণ্ঠ থেকেই আগরতলাবাসী প্রথম শোনেন এবং তা' অল্পকাল মধ্যেই সঙ্গীতরসিকদের মধ্যে সমাদৃত হয়। গানটিকে স্বদেশজ করে নেওয়ার কল্পনাশ্রয়ী বাসনা থেকেই এক সময়ে ইহার উপর পূর্ব্বোক্ত দাবী উপজাত হয়েছিল।

১৩ই ফাল্গুন তারিখ। হরিদাসবাবু বললেন, কুঞ্জবনে এদিন যাবার চাইতে বরং প্রতাপগড়ে(বর্ত্তমান অরুন্ধতীনগর) এখন যেখানে চা বাগান খাস করে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন পুলিশ লাইন গড়ে উঠেছে, আর তারও আদিতে যেখানে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর ও হরিদাসবাবুর প্রচেষ্টায় 'প্রতাপগড় কৃষিক্ষেত্র' বলে যৌথ প্রতিষ্ঠানটি জন্ম নিয়েছিল, সেখানে কবি যাবেন বিকেল বেলায় — সেখানে গেলেই কবি সন্দর্শন হবে। সহর থেকে দূরে বন জঙ্গলের মাঝে অবস্থিত প্রতাপগড় যাওয়া তখনকার দিনে মনে হত, কুঞ্জবন যাওয়ার চাইতেও কষ্টসাধ্য, আর দূরত্বও মনে হত অনেক বেশী। বন্য জন্তুর আনাগোনাও ঐ অঞ্চলে অনেক সময় শোনা যেত। যাই হউক, যথাসময়ে চলে গেলাম ওখানে। রাজপরিবারের অল্প কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গণ্যমান্য দু'একজন সহরবাসী আর বেসরকারী কতিপয় দর্শক ও পরিচারক সেখানে উপস্থিত। একটু বাদেই কবির পদার্পণ হল সদলবলে। এখানে তো আর নিমন্ত্রিত নই, গল্পের আসরও নেই, সুতরাং আহার্য্য ও চা-পরিবেশনের ব্যাপারে হরিদাসবাবুর নিযুক্ত পরিচারকদের সহকারীরূপে স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত হয়ে গেলাম। কোনও একটা অজুহাত নিয়ে কবির আশে পাশে আনাগোনার মধ্যেই আমার মন তার খোরাক সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হল। কবি কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করে অনেক উপদেশ দিলেন আর শান্তিনিকেতনে পরীক্ষিত দু'চারটে অভিনব চাষপদ্ধতির কথাও বললেন। ভোজ্যবস্তুর মধ্যে ত্রিপুরার সুস্বাদু পেঁপে খেয়ে খুব আনন্দিত হলেন। ঈশান কোণে কালো মেঘের একটু সঞ্চার কখন যে হয়েছে, সেদিকে কারো খেয়াল নেই। উত্তরের আকাশ কালো করে এল। কবির কী উল্লাস! হরিদাসবাবু লিখেছেন, এমন জায়গায় একটি কুটির বেঁধে বাস করার বাসনা নাকি কবি সেদিন প্রকাশ করেছিলেন।

সন্ধ্যায় রাজ-অন্তঃপুরিকাদের দ্বারা রাসনৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁর বাড়ীতে। ত্রিপুরার নবীন মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য স্থানান্তরে ছিলেন, কবি সন্দর্শনে আগরতলায় এসেছেন। এই সান্ধ্যানুষ্ঠানেই নবীন মহারাজের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হোল।

১৪ই ফাল্গুন (২৬শে ফেব্রুয়ারী) কবির মধ্যাহ্নে আগরতলা ত্যাগ করবার কথা কলকাতার পথে। পূর্ব্বাহ্নে কুঞ্জবনে গিয়ে প্রাসাদের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে সামনের বারান্দায় পৌছুতেই দেখা হল দিনুবাবুর সঙ্গে। পায়চারী করে আপন মনে গুন্ গুন্ করে কি একটা গান গাইছেন। এমন একটা সুযোগ পাবার প্রত্যাশাই ক'দিন ধরে মনে মনে ছিল — আজ দেবতার কৃপায় যোগাযোগ ঘটে গেল। নমস্কারের প্রত্যভিবাদন জানিয়েই পুনরায় সামান্য একটু উঁচু গলায় সুরের ইন্দ্রজাল বিস্তার করলেন দিনেন্দ্রনাথ,

"আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া।
বাতাসে আজ কোন্ পরশের লাগে হাওয়া।।
অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল বাণী
আজ উদাসীর বাঁশির সুরে কে দেয় আনি —
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া।।
কোন্ ফাগুনে যে-ফুল ফোটা হল সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা।
বকুলতলায় কাজ-ভোলা সেই কোন্ দুপুরে
যে-সব কথা ভাসিয়ে দিলেম গানের সুরে
ব্যথায় ভরে ফিরে আসে সে গান-গাওয়া।।"

কী সুকণ্ঠ! এক নিমেষে শ্রোতার মনোবীণায় ঝংকার জাগিয়ে তোলে। গানের প্রতিটি কথা — প্রতিটি কলি সুস্পষ্ট ও সুগম্ভীর তার ব্যঞ্জনা। মধুক্ষরা নিভাঁঝ গলায় আশ-মীড়-মূর্চ্ছনার কতই-না সুন্দর কাজ আর দরদের সঙ্গে মণিকাঞ্চন সংযোগ! কবির 'গানের ভাণ্ডারী'র কণ্ঠে যে-গান একদিন শুনেছি — এমনটি আর শুনব কি?

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এলেন — সঙ্গে কন্যা নন্দিনী আর আমাদের রাজ-অন্দরের ছোট্ট একটি রাজকুমারী। সম্প্রতিকালে শুনেছি — তিনি ছিলেন রাজকুমারী নবীনা — মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের কন্যা। শোনা গেল, আর সবাই ভেতরে রয়েছেন। ফটোগ্রাফের আয়োজনও চলেছে। নিতান্ত বাইরের লোক আমি। আমার এ সময়ে উপস্থিতিটা অশোভন ও অসঙ্গত হবে ভেবে দিনুবাবুকে বলে একটু পাশ কাটিয়ে সরে পড়লাম।

কবির এবারকার আগরতলায় অবস্থানকালে তোলা কয়েকটি ফটোগ্রাফ 'রবি' ত্রৈমাসিক পত্রের রবীন্দ্র সম্মেলন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যায় যে কুঞ্জবন-প্রাসাদের বড় বৈঠকখানা ঘরে কবির একটি একক ছবি গ্রহণ করেন মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর। এই প্রাসাদেই পূর্ব্বদিকের বড় হল ঘরে কবির গ্রুপছবিটি এবং আরও একটি একক ছবি গৃহীত হয় — সেগুলি, আর উমাকান্ত একাডেমী স্কুলগৃহের সম্মুখে কিশোর-সাহিত্য-সমাজের সম্বর্দ্ধনার গ্রুপছবিটি তোলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বন্ধুবর শ্রীনরেন্দ্র দেববর্ম্মা।

ঘন্টাখানেক বাদে হরিদাসবাবুর কাছেই খবর পাওয়া গেল, কবি বাইরে এসেছেন। ড্রইং রুমের দরজায় এসেই দেখলাম, কবি ঘুরে ঘুরে দেখছেন দেয়ালের ছবি আর এটা সেটা প্রশ্ন চলছে। আমায় দেখেই স্মিতহাস্যে বললেন,

"আমরা তো আজই চলে যাচ্ছি, তা' তুমি আগেই খবর পেয়ে গেছ দেখ্‌ছি। তুমি তো ত্রিপুরারই ছেলে — আবার দেখা হবে।"

যাত্রার প্রস্তুতির নানা তাগিদ আর নানা প্রসঙ্গ এসে গেল। এবারকার মতো কবিসঙ্গ এখানেই শেষ হল মনে ভেবে কবিগুরুকে প্রণাম আর অনুগামীদের যথাযোগ্য অভিবাদন জানিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। তখন যেন ততটা ভাবিনি, আজ ভাব্‌ছি — শূন্য হাতে কি ফিরেছিলাম, না তীর্থযাত্রার সার্থক 'সুফল' আমার পথের ঝোলায় চিরদিনের জন্য সঞ্চিত হল!

আগরতলায় এই শেষ বারের পদার্পণের একটি অমূল্য স্মরণচিহ্ন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের প্রাচীনতম ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু মশাই কুঞ্জবনে গুরুদেবের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা জ্ঞাপন করলে যাত্রার প্রাক্‌কালে কবি তখনই একটি সংস্কৃত শ্লোকবাক্য এবং তার বঙ্গানুবাদ তাঁকে লিখে দিয়ে আশীর্ব্বাদ জানালেন,

"নীতিজ্ঞ করুন নিন্দা অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী গৃহে আসুন বা ছাড়ুন ভবন,
আজ মৃত্যু হোক্‌ কিম্বা হোক্‌ যুগান্তরে
ন্যায্য পথ হতে ধীর এক পা না সরে।"

কবির সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসব

প্রায় ছ'বছর পরের কথা। ইতিপূর্ব্বেই ক'বছর আগে রাজদরবারে কর্ম্মব্যপদেশে নিয়োজিত হয়েছি। সেবার ১৩৩৮ বাংলার পৌষমাসে ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে কলকাতায় অবস্থান করছি। এ সফরের প্রধানতম আকর্ষণ, কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে দেশবাসী-আয়োজিত জয়ন্তী-উৎসবে যোগদান। সপ্তাহকালব্যাপী জয়ন্তী-উৎসবের ব্যবস্থাপনার উৎসমুখে অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যরসিক শ্রীযুক্ত অমল হোম। উৎসবের নানাবিধ অঙ্গের মধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছিল 'রবীন্দ্রজয়ন্তী শিল্পপ্রদর্শনী মেলা' দিয়ে — যার মূল ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রখ্যাত কর্ম্মী ও দেশপ্রেমিক জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। এই শিল্পপ্রদর্শনী ও মেলার কর্ম্মপরিষদে ছিলেন, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, পার্সি ব্রাউন, আচার্য্য নন্দলাল বসু, প্রফুল্লকুমার ঠাকুর, ডাঃ ষ্টেলা ক্রামরিচ প্রভৃতি প্রখ্যাত সুধী ও রসবেত্ত্ববর্গ। ত্রিপুরার সহজাত শিল্পানুরাগের সুখ্যাতি চিরদিনের; বিশেষতঃ, ত্রিপুরার রাজপরিবারের সঙ্গে কবির পুরুষ পরম্পরায় অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিশেষ কারণে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর আহূত হলেন শিল্পপ্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধনে পৌরোহিত্য করার জন্য। কবির সঙ্গে পুনর্মিলনের সম্ভাবনায় এই আমন্ত্রণ সসম্মানে গৃহীত হল।

৯ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩১) শুক্রবার কলকাতার টাউনহল প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-শিল্প-প্রদর্শনী ও মেলার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজ সপারিষদ টাউনহলের

উদ্বোধন সভায় উপস্থিত হলে জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষ থেকে অন্যতম প্রতিনিধি ও কলকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন মেয়র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ত্রিপুরাধিপতিকে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করলে মহারাজ কবি ও উপস্থিত বিদগ্ধ-জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন (জয়ন্তী-উৎসব সংস্থার প্রচারিত পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত);

"আপনারা আমাকে এই মহাযজ্ঞের হোতৃপদে বরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। জগৎপূজ্য বিশ্বকবির সংবর্দ্ধনার কোনো অঙ্গের নেতৃত্ব করিতে আমার ন্যায় ব্যক্তির সঙ্কোচ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তথাপি কবির সহিত ত্রিপুরা-রাজপরিবারের যে চিরপ্রীতির সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে তাহাই আজ আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। পূর্ণগৌরবমণ্ডিত রবির ভাস্বর দীপ্তির ঐশ্বর্য্যের প্রতি আজ আমার লক্ষ্য নাই। আমি আপনাদিগের আহ্বানে আমার পিতামহ প্রপিতামহের স্নেহপরায়ণ বন্ধু — আমাদিগের বিশ্বজয়ী অন্তরঙ্গের জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করিতে পারিয়া আপনাকে সৌভাগ্যান্বিত মনে করিতেছি। দরিদ্র সুদামা ব্রাহ্মণের সাহসে আজ আমি বলীয়ান্।"

"বিধাতার বিধানে ত্রিপুরা-রাজপরিবার চিরকালই কলাসৌন্দর্য্যসেবী। তাই শুভক্ষণে উদীয়মান রবির তরুণ সৌন্দর্য্যের ছটায় আমার প্রপিতামহ পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বীরচন্দ্র মাণিক্য আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তদবধি কবিবরের সহিত আমাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ। পিতৃদেব বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যও সে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।"

"শিল্পপ্রিয় ত্রিপুরা-রাজবংশের উপর কবির প্রভাব সামান্য নহে। পক্ষান্তরে গিরিনির্ঝরিণীশোভিতা, বনপুষ্পভূষিতা, শ্যামলা পার্ব্বতী ত্রিপুরার স্বভাব সৌন্দর্য্য, গোবিন্দমাণিক্য প্রমুখ আমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ, ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চ্চা, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্র ও বয়নশিল্প মহাকবিকেও আকৃষ্ট করিয়াছে; ইহাতে ত্রিপুরাবাসী মাত্রেই গৌরবান্বিত।"

"আপনারা ক্ষমা করিবেন; আমি স্বার্থপরের ন্যায় মহাকবির সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধেরই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার কবি — ভারতের কবি — বিশ্বকবি' — আমি তাঁহাকে ত্রিপুরার কবি বলিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিতেছি।"

"তথাপি একথা কোনমতেই ভুলিলে চলিবে না যে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মক্ষেত্র কেবলমাত্র সাহিত্যজগতেই আবদ্ধ নহে। বিশ্বমানবের আশা আকাঙ্খা তাঁহার বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উদাত্তসুরে বাজিয়া উঠিতেছে; কিন্তু সেখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তাহাদের চরিতার্থতার জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম; সামান্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনও তাঁহার নিকট উপেক্ষার বস্তু নহে; শান্তিতে শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া যাহাতে উহা অখণ্ড বিশ্বজীবনের মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট না হয়, — উপদেশের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা, নিজের জীবনব্যাপী কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সর্ব্বদাই তিনি এই আদর্শকে আপামর সাধারণ সকলের সমক্ষেই তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই জন্যই শিল্পকলাকে কোনদিনই তিনি কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞের উপভোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই; নিজের দেশের শিল্পকলাকে সমগ্রভাবে, যথার্থভাবে দেখিবার শিক্ষা' আমরা তাঁহারই নিকট পাইয়াছি; তাঁহারই নিকট দীক্ষা পাইয়া 'শিল্প-সৌন্দর্য্যের দিব্য নিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদিগের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে।' এবিষয়েও ত্রিপুরাবাসীর সৌভাগ্যের সীমা নাই। কেননা দেশীয় শিল্পকলা সম্বন্ধীয় তাঁহার সর্ব্বপ্রধান প্রবন্ধ 'দেশীয় রাজ্য' প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে আগরতলায় ত্রিপুরা সাহিত্যসম্মিলনীতে পঠিত হয়। আজ, একদিকে যেমন গীতাঞ্জলির করুণ সুরের ঝঙ্কার আমাদিগের বৈষ্ণব পরিবারের প্রাণে অহরহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধের মহতী উপদেশবাণী রাজ্য পরিচালনাকে 'সৌন্দর্য্যে এবং কল্যাণের কান্তিতে উজ্জ্বল' করিয়া তুলিবার বিষয়ে দিব্য-ইঙ্গিতের নির্দ্দেশে আমাদিগকে ধন্য করিতেছে।"

"আমি আর অধিকক্ষণ আপনাদের সময় লইতে চাই না। আসুন, আজ মহাকবির সপ্ততিতম জন্মোৎসবে আমরা সমবেতভাবে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করি যে, তিনি তাঁহার বরপুত্রকে সুদীর্ঘজীবন প্রদান করিয়া তাঁহার মুখে স্বীয় অভয়বাণী বিশ্বময় প্রচার করিতে থাকুন। কবিবরের আশীর্ব্বাদ আকাঙ্খা করিয়া আমি এক্ষণে এই শিল্পপ্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।"

মহারাজের অভিপ্রায় অনুসারে আগের দিন আমাকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কবিসকাশে যেতে হয়। জয়ন্তী-উৎসবের কর্ম্মকর্ত্তাগণের মধ্যে কয়জন তখন কবির সঙ্গে তাঁর ঘরে রয়েছেন, আর বসবার ঘরে ৩/৪ জন দর্শনার্থী অপেক্ষমান দেখা গেল —তন্মধ্যে, দু'জন বিদেশিনী। অল্পক্ষণ বাদেই আমায় স্মরণ করলেন। কবিসকাশে উপস্থিত হয়ে প্রণাম জানাতেই মহারাজের ও রাজপরিবারের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। তারপর মহারাজের উদ্বোধনী ভাষণটি পড়ে প্রসন্ন হয়ে বললেন,

"বেশ হয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে। উত্তরপুরুষের মনে বেঁচে থাকবার কামনা মানবমনেরই স্বভাবধর্ম্ম। মহারাজকে বলবে, ওঁর লেখা দেখে অতীতের অনেক সুখস্মৃতি আজ আমার মনে পড়ছে। ত্রিপুরার সুখ-সৌভাগ্য ও মঙ্গলকামনা আমি নিরন্তর করি।"

অপেক্ষমান দর্শকদের কথা স্মরণ করে ও কাজের তাড়ায় কবিকে পুনরায় প্রণাম জানিয়ে প্রসন্নমনে বিদায় গ্রহণ করলাম।

মহারাজের উপরোক্ত অভিভাষণের উত্তরে কবি ত্রিপুরার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা গভীর প্রীতি ও মমতার সঙ্গে স্মরণ করেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তা' প্রকাশিত হয়েছিল। স্বগৃহে অন্তরঙ্গ ও সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের মধ্যেই কবির পরবর্তী প্রকাশ্য ভাষণের মর্ম্মকথা যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। যথাসময়ে সভাস্থলে ভাষণাদির পর ত্রিপুরেশ্বর কবিগুরুকে সঙ্গে নিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করে টাউনহলের প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে এসে মেলার দ্বারোন্মোচন করেন ও প্রদর্শনী প্রদক্ষিণ করেন। কবির অঙ্কিত চিত্র-সংগ্রহ, প্রকাশিত রচনাবলী ও মূল পাণ্ডুলিপি, কবিজীবনের নানা পর্য্যায়ে নানাদেশে গৃহীত রাশি রাশি আলেখ্য ও আলোকচিত্র, দেশ বিদেশ হতে প্রাপ্ত সম্মান ও উপহারসমূহ প্রদর্শনীর মূল বিষয়ীভূত থাকলেও, স্বদেশজাত অন্যবিধ বহুশিল্পসামগ্রী ঐ মেলায় প্রদর্শিত হয়। 'রাজর্ষি'র যুগে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক মহারাজ বীরচন্দ্রকে লিখিত প্রথম পত্রটি [১] এবং রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখিত কয়েকটি মূলপত্র, আর ত্রিপুরার রকমারি চারু ও কারুশিল্প-সামগ্রী এই প্রদর্শনীতে কবির ও দর্শকগণের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। অল্পকাল পূর্ব্বে গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার গ্লানিতে কবিকে এবার বেশ ক্লান্ত দেখলাম। কবির সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসবের অন্যবিধ অনুষ্ঠানাদির মধ্যে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র-সাহিত্যসভা, জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'নটীর-পূজা' অভিনয়, টাউনহলের সামনে কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে পৌর-অভিনন্দন ছাড়াও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন, হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন এবং জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষ হতে কবিকে অভিনন্দিত করা হয় ও তাঁকে জয়ন্তী-স্মারক গ্রন্থ — The Golden Book of Tagore — আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত হয়। এসকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বে ছিলেন যথাক্রমে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

রায়, শ্রীযুক্তা প্রতিভা দেবী, পণ্ডিত অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, কবি কামিনী রায়, প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ স্ব স্ব ক্ষেত্রে দিক্‌পাল সুধীবৃন্দ। জয়ন্তী-উৎসবের আনন্দগঙ্গায় আকণ্ঠনিমজ্জিত হয়ে অবগাহন করা গেল।

এই উৎসবে পুনর্মিলনের মাধ্যমে কবিবরের সঙ্গে মহারাজ বীরবিক্রমের সম্পর্কের বন্ধন যেন ঘনিষ্ঠতর হয়ে এল। তরুণ ত্রিপুরেশ্বরকে একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে বিশ্বভারতী পরিদর্শনের আমন্ত্রণ কবি জানালেন। উভয় পক্ষেরই নানাবিধ কর্ম্মব্যস্ততার কারণে সুদীর্ঘ সাতবৎসর সে সুযোগ হয়ে উঠেনি যদিও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা প্রসঙ্গে মহারাজের মুখে অনেকবার তথায় যাবার আকাঙ্খার কথা আমরা শুনেছি। অবশেষে যোগাযোগ ঘটল। ত্রিপুরার কৃতি সন্তান ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রদ্ধেয় সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা, এম,এ (হারভার্ড) এ বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন, আর তাঁর মাধ্যমেই যোগাযোগ এবার রূপ-পরিগ্রহ করল। কবির সাদর আমন্ত্রণ আবার এল রাজসকাশে এবং মহারাজ তা' সানন্দে গ্রহণ করলেন।

শান্তিনিকেতনে মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর

১৩৪৫ বাংলার ২২শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৯) হাওড়া থেকে কিউল প্যাসেঞ্জারে মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর সপারিষদ বোলপুরে রওনা হয়ে শান্তিনিকেতনে পৌঁছুলেন বেলা দ্বিপ্রহরে। মহারাজের অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন রাজা রানা বোধজঙ্গ (মহারাজের মুখ্যসচিব), কুমার রমেন্দ্রকিশোর, লেঃ যোগেন্দ্র দেববর্ম্মা, ডাঃ অবনীশ্বর সেনগুপ্ত আর লেখক। সোমেনদা (ত্রিপুরার শিক্ষাসচিব ও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র) ব্যবস্থাদি উপলক্ষ্যে আগেই সেখানে চলে যান। সেখানে গিয়ে পেলাম, শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, ডাঃ শচীন মুখার্জ্জি ও শৈলেশ দেববর্ম্মা প্রভৃতি আগরতলার অনেককে। "উত্তরায়ণে" কবি মহারাজকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন এবং ওখানেই মহারাজের থাকবার ব্যবস্থাদি হয়। কবি তখন স্বয়ং বাস করছেন মাটির ঘর 'শ্যামলী'তে। আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হল যতদূর মনে হয় 'পুনশ্চে' অথবা শ্যামলীর সংলগ্ন অন্য এক বাড়ীতে। প্রাথমিক কুশল প্রশ্ন সম্ভাষণাদি শেষ হতেই শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর নিকট থেকে মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থাদি প্রস্তুত বলে সংবাদ এল। যে যার ঘরে গিয়ে বেশ পরিবর্ত্তনের পর উত্তরায়ণের হলঘরে সকলে পুনরায় সমবেত হলেন। মহারাজসহ সকলে আহারে উপবেশন করলে একটা বেতের হেলান-দেওয়া আসনে কবি উপবিষ্ট হয়ে খোসগল্প শুরু করলেন। সোমেনদা' আর কুমার রমেন্দ্রকিশোরকে (মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র) নিয়ে পরিহাস আর মাঝে মাঝে হাসির ঢেউ-এ ভেঙে পড়েন। আমার ডায়ারীতে দু'চারটে প্রসঙ্গেরই খালি উল্লেখ আছে দেখতে পাই। তার মধ্যে দেখছি, ত্রিপুরার বড় মহারাজকুমারী জয়তীদেবীর প্রসঙ্গ — যিনি বিয়ের পর এখন চরখারীর মহারাণী-অধিরাণী।

"ওহে মহারাজ", সম্বোধন করে মহারাজকে কবি বল্লেন যে তিনি শুনতে পেয়েছেন, মহারাজকুমারীকে নাকি "ডোরীন্" নামে ডাকা হয়; আর প্রশ্ন করলেন, ভারতীয় সুন্দর নামের দুর্ভিক্ষ ঘটেছে কিনা! মহারাজ সলজ্জভাবে জানালেন যে কথাটা পুরোপুরি

ঠিক নয়, তবে আংশিক সত্যতাও অনস্বীকার্য্য। বুঝিয়ে বললেন যে রাজকুমারীর ইংরেজ-নার্স মহিলাটি আদর করে ঐ নামে ডাকেন বলে কেউ কেউ ও নাম ব্যবহার করে থাকেন বটে, তবে তা' চল্‌তিনামও নয় এবং পোষাকী নামও নয়। শুনে কবি আশ্বস্ত হলেন।

উজ্জ্বল শ্বেত পাথরের অতি সুন্দর থালাবাটিতে আহার্য্যদ্রব্যাদি পরিবেশিত হয়েছিল। সোমেন্‌দা' আর আমি প্রধান অতিথির আসন থেকে দূরবর্তী প্রান্তদেশে বসেছি। আমাদের থালার সংলগ্ন অসংখ্য বাটিগুলির মধ্যে দুটি কালো-পাথরবাটি কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। পরিহাস করে বললেন, ঐ কালোমানিকরা কি সমধর্ম্মী-বর্ণ খুঁজবার দুর্ব্বলতা এখনো এড়াতে পারেনি। প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তেই আমরা দুজনে স্ব স্ব বর্ণ সম্বন্ধে সপ্রতিভ হয়ে উঠলাম। ব্যবস্থাপনায় যাঁরা ছিলেন তাঁরাও সচকিত হতেই ঘরময় দুর্দ্দমনীয় একটা হাসিতে সবাই ফেটে পড়লেন। লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্যে রাজকীয় ভোজনপর্ব্ব সমাধা হল। মহারাজ বললেন, ত্রিপুরায় 'কালোমানিকের' দেশজ নাম 'আন্ধার-মানিক' অথবা 'আঁধার-মানিক'। শুনে কবি আবার হাস্‌লেন। এবার মহারাজের প্রতি সকলের সুস্পষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করে জবাব দিলেন —

> ''তা', ত্রিপুরার মানিকটির দেখছি রকম সকম আলাদা — এ মানিকের আবার হাত পা,-ও আছে আর কথা কয়!''

ঘরময় উচ্চহাস্য উঠল।

ঐদিন অপরাহ্নে আম্রকুঞ্জে ত্রিপুরেশ্বরের আনুষ্ঠানিক সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হয়েছে। পত্রপুষ্পে, আলিম্পনে আর ধূপদীপে কট্‌কী চন্দ্রাতপের নীচে অনুষ্ঠান-প্রাঙ্গণ সুচারুভাবে অলঙ্কৃত করা হয়েছে। বিশ্বভারতীর পরিচালকবৃন্দ অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত আশ্রমবাসী নরনারীবৃন্দসহ কবি সভাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন। মহারাজ তথায় উপনীত হলে নির্দ্ধারিত আসনে মহারাজকে পার্শ্বে নিয়ে কবি উপবিষ্ট হতেই পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মশাই স্বস্তিবচন ও আশ্রমবাসীদের পক্ষে প্রদত্ত অভিনন্দন পাঠ করেন। বিশিষ্ট অতিথির কল্যাণ কামনা করে সম্বর্দ্ধনার কাজ শুরু হলে তাঁকে মাল্যচন্দনে ও ধূপদীপে অভ্যর্থনা করা হয়। অতঃপর কবি ত্রিপুরেশ্বরকে শান্তিনিকেতনে শুভাগমনের জন্য আনন্দ ও সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনপূর্বক নিম্নোক্ত ভাষণটি পাঠ করেন — সে মূল অভিনন্দন পত্রটি এখনো সযত্নে তুলে রেখেছি। অভিনন্দনের উদ্ধৃতি খানিকটা দিচ্ছি।

> ''আজকের এই অস্তোন্মুখ সূর্য্যের মতোই আমার হৃদয় আমার জীবনের পশ্চিমদিগন্ত থেকে তোমার প্রতি তার আশীর্ব্বাদ বিকীর্ণ করছে।
>
> তোমার সঙ্গে আজ আমার এই মিলন আর একদিনকার শুভসম্মিলনের আলোকেই উদ্দীপ্ত হয়ে দেখা দিলে। সেকথা আজ তোমাকে জানিয়ে দেবার উপলক্ষ ঘটল ব'লে আমি আনন্দিত। তখন তোমার জন্ম হয়নি, আমি তখন বালক। একদা তোমার স্বর্গগত প্রপিতামহ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কেবল আমাকে এই কথা জানাবার জন্যে যে তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিতে চান। দেশের কাছ থেকে এই আমি প্রথম সমাদর পেয়েছিলুম। ***

"তাঁর মৃত্যু হোলো, মনে ভাবলুম এই রাজবংশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধসূত্র এইখানেই অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তা যে হোলো না সেও আমার পক্ষে বিস্ময়কর। তাঁর অভাবে ত্রিপুরায় আমার যে সৌহৃদ্যের আসন শূন্য হোলো মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য অবিলম্বে আমাকে সেখানে আহ্বান করে নিলেন। তাঁর কাছ থেকে যে অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সমাদর পেয়েছিলুম তা দুর্লভ। আজ একথা গর্ব্ব করে তোমাকে বলবার অধিকার আমার হয়েছে যে, ভারতবর্ষের যে কবি পৃথিবীতে সমাদৃত, তাঁকে তাঁর অনতিব্যক্ত খ্যাতির মুহূর্তে বন্ধুভাবে স্বীকার করে নেওয়াতে ত্রিপুরা রাজবংশ গৌরবলাভ করেছেন। তেমন গৌরব বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের কোনো রাজকুল আজ পর্য্যন্ত পান নি।

যে সংস্কৃতি, যে চিত্তোৎকর্ষ দেশের সকলের চেয়ে বড়ো মানসিক সম্পদ, একদা রাজারা তাকে রাজৈশ্বর্য্যের প্রধান অঙ্গ ব'লে গণ্য করতেন, তোমার পিতামহেরা সেকথা মনে মনে জানতেন। এই সংস্কৃতির সূত্রেই তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল এবং সে সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য ছিল। আজ তোমার আগমনে সেদিনকার সুখস্মৃতির দক্ষিণ সমীরণ তুমি বহন করে এনেছ। আজ তুমি বর্ত্তমান দিনকে সেই অতীতের অর্ঘ্য এনে দিয়েছ, এই উপলক্ষে তুমি আমার স্নিগ্ধহৃদয়ের সেই দান গ্রহণ করো যা তোমার পিতামহদের অর্পণ করেছিলুম, আর গ্রহণ করো আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ।"

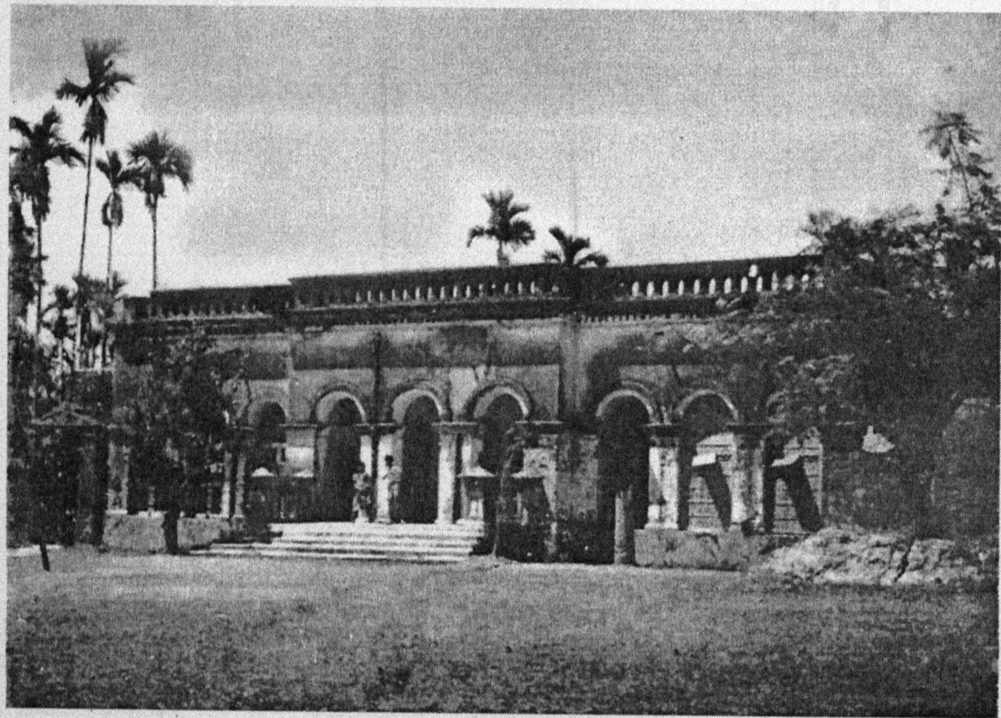
তপোবনের শান্তসমাহিত পরিবেশে আড়ম্বরের বাহুল্য বর্জ্জিত মনোজ্ঞ এই সম্বর্দ্ধনা-অনুষ্ঠানটির প্রাণবস্তুই ছিল, রাজার প্রতি কবির পরমাত্মীয়তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ এবং তাৎপর্য্যও ছিল সুগভীর।

শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে মহারাজকে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ এবং শ্রীনিকেতনে ঘুরিয়ে দেখানো হয় এবং এক অপরাহ্নে উত্তরায়ণে মহারাজ বিশ্বভারতীর অধ্যাপকবর্গের সহিত মিলিত হন। বিশ্বভারতীর পাঠভবন, বিদ্যাভবন, শ্রীভবন, গ্রন্থশালার চৈনিক গ্রন্থ সংগ্রহ এবং কবিকে প্রদত্ত দেশবিদেশের সম্মান ও শ্রদ্ধার রাশি রাশি নিদর্শন দেখে তিনি আনন্দলাভ করেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কলাভবনে আয়োজিত একটি চিত্রপ্রদর্শনী মহারাজকে ঘুরিয়ে দেখালেন। সিংহসদনে অতিথির সম্মানে নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' অভিনীত হল। সুখস্মৃতির একটি স্মরণীয় সন্ধ্যার কথা আমার ডায়ারিতে নোট করা রয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখের লাইনের তিনটি আসনের মাঝখানে কবিগুরু বসলেন। ডানদিকে ত্রিপুরাধিপতি আর বাঁ-দিকে মিঃ লিওনার্ড এল্‌ম্‌হার্ষ্ট। পরবর্ত্তী পেছনের সারিতেই রাজপারিষদবর্গ ও অপরাপর বিশিষ্ট অতিথিবর্গ — তার পেছনে উপস্থিত অন্যান্য দর্শকবৃন্দে প্রেক্ষাগৃহটি পরিপূর্ণ। আমার ভাগ্যের অবধি নেই, স্থান পেয়েছি দ্বিতীয় সারিতে ঠিক মহারাজ আর কবির পেছনে — যাতে করে ছোট করে কথা বললেও কবিকণ্ঠ বেশ শোনা যায়। সেই অপূর্ব্ব অভিনয়ের স্মৃতি ভাষায় অবর্ণনীয়। তার সঙ্গেই মনে পড়ে, নৃত্যনাট্যের মাঝে মাঝে কবি একবার সংগীতের কথার ব্যঞ্জনায় লাস্য ও মুদ্রাদিতে যে ভাববস্তু নিহিত রয়েছে, যে ইঙ্গিত সূক্ষ্মভাবে কেবল অনুভূতিরই বিষয়, তা' কখনও মহারাজকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আবার কখনও বা মিঃ এল্‌ম্‌হার্ষ্টকে। আমার দৃষ্টি তো অভিনয়ের আঙ্গিকেই সারাক্ষণ নিবদ্ধ, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির অথবা তার মায়ের গানের কথাই গ্রহণ করব, না ওদিকে সুর-সংগীতের সুইচ্‌ বন্ধ করে কবি যে সম্মানিত অতিথিগণকে পাশে বসিয়ে

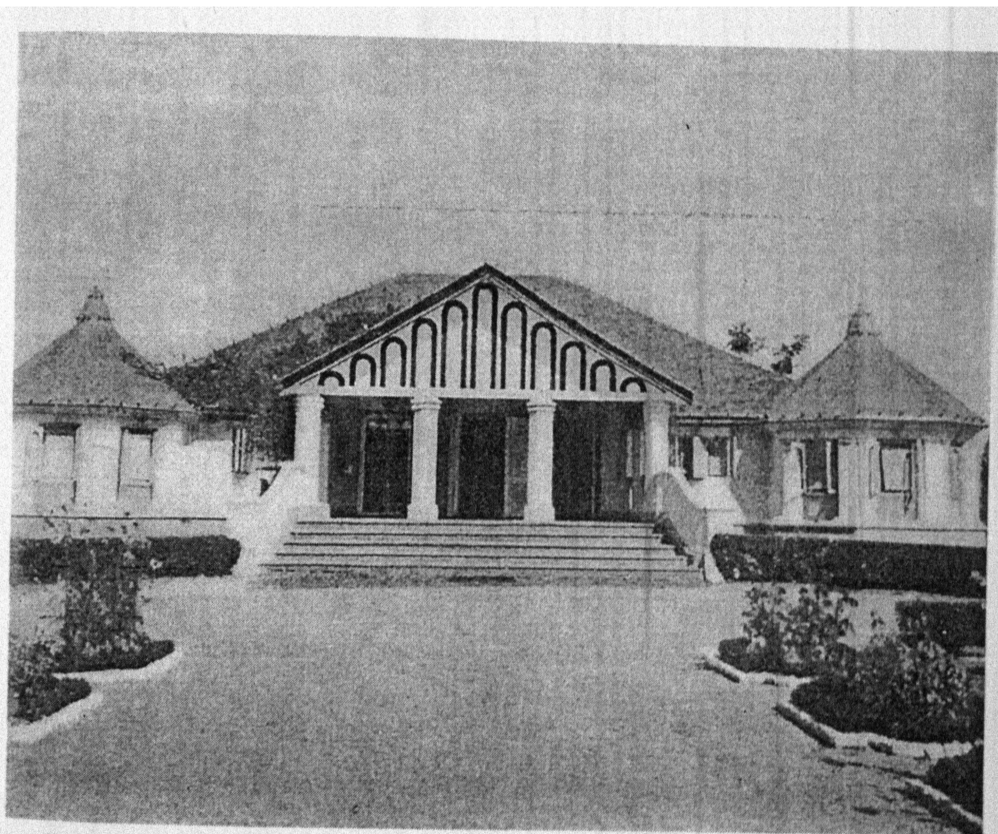
২৩। 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জ্জনে' বর্ণিত ভুবনেশ্বরীর মন্দির, উদয়পুর (কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষিত)



২৪। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের ভগ্ন রাজপ্রসাদ উদয়পুর (১৯০২)

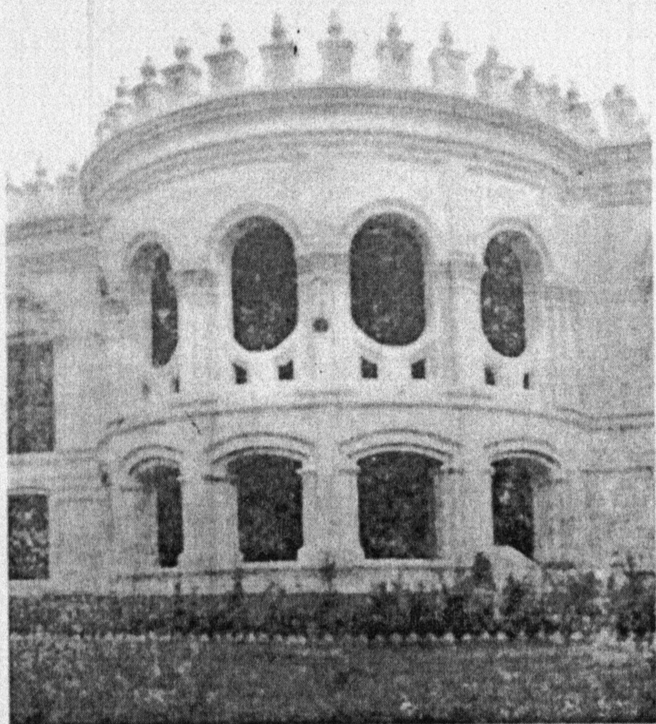


২৫। কর্ণেল মহিম ঠাকুরের বর্ত্তমান বাসভবন

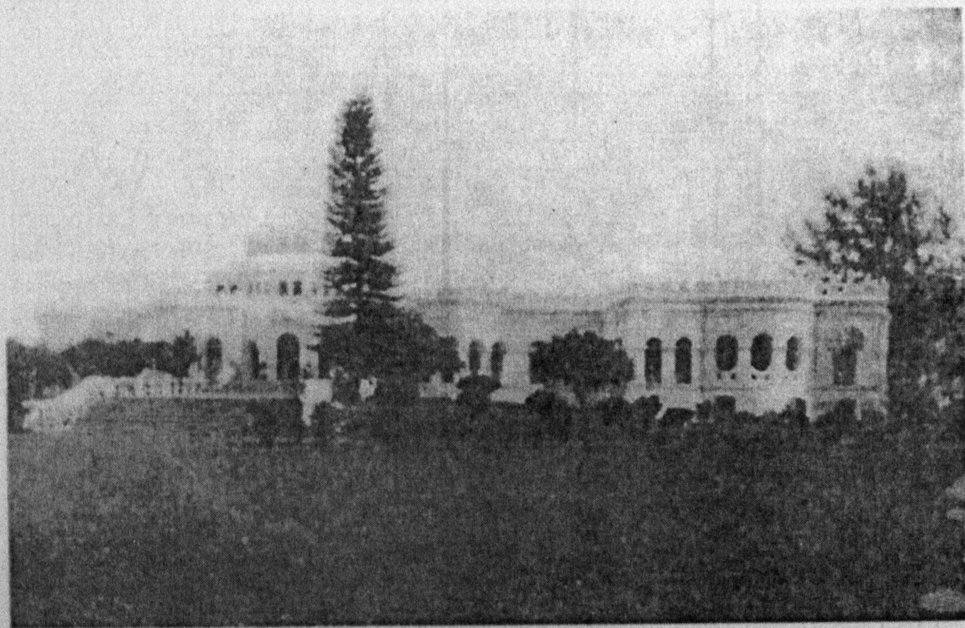


২৬। পুরাতন কুঞ্জবন বাংলা (মালঞ্চাবাসের পুর্ব্বতন বাড়ী), আগরতলা

২৭। কবির প্রিয় গোল বারান্দা,
কুঞ্জবন প্রাসাদ



২৮। কুঞ্জবন প্রাসাদ (১৩৩২)
আগরতলা



অভিনয়ের মর্ম্মকথাটুকু এখন তখন স্বয়ং বুঝিয়ে দিচ্ছেন, সেদিকেই কানের দুয়ার খুলবো। আজ দীর্ঘকাল পরে একথাই মনে হচ্ছে যে সেদিন অভিনয়ের সারা সন্ধ্যাটাই যেন মনে হয়েছিল, প্রাচীন শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডদের সুরম্য উদ্যানেই বুঝি বা বসে আছি, আর শিষ্য আনন্দের শ্রীমুখে ভগবান বুদ্ধের অমৃতবাণী শুনছি! ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় জগৎ যেন একসঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

অভিনয় শেষে উত্তরায়ণে ফিরে এসে কবি মহারাজের সঙ্গে বিশ্বভারতীর সংগীতভবনের সম্প্রসারণ-পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। অপরাহ্নেই সংগীত-ভবন নতুন করে নির্ম্মাণ উপলক্ষে একটি বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুতের জন্য ত্রিপুরাধিপতি এ কার্য্যে কুড়িহাজার টাকা অর্থ সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি কবির নিকট ব্যক্ত করেছিলেন এবং টাকাটা দু'তিন কিস্তিতে দেওয়া হবে কথা হল। রাজ্যের চল্‌তি বাজেটে (চাকলার) মোট অঙ্কের অনুপাতে আংশিক বরাদ্দের কথা রবীন্দ্রনাথকে জ্ঞাপন করা হলে কিছুকাল পরে মংপু থেকে কবির ব্যক্তিগত সচিব শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী লেখককে জানালেন,

> "৫০০০, (পাঁচ হাজার টাকা) out of Twenty Thousand এ বছর বরাদ্দ হয়েছে জেনে সে খবর কবিকে দিয়েছি। তিনি এখানেই (মংপুতে) আছেন। * * * আশা করি আগামী বছর বাকী টাকা এক সঙ্গে পাওয়া যাবে।"

প্রতিশ্রুত ব্যবস্থামত টাকাটা কিস্তি করে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হয়েছিল। কবির সঙ্গে সন্ধ্যার আলোচনায় অতীত সময়ে ত্রিপুরার বার্ষিক অর্থ-সাহায্যের কথাও উঠল। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এককালীন যে পাঁচসহস্র টাকা দান করেছিলেন, আগরতলার পূর্ব্বতন সরকারী কলেজের নানাবিধ মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যে তিনি বোলপুর বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আর ঐ সময় থেকে ত্রিপুরার সরকারী ব্যবস্থায় শান্তিনিকেতনে পড়বার জন্য প্রতিবৎসর বহু ছাত্র পাঠানোতে পরোক্ষভাবে যে সাহায্য কবি ত্রিপুরা দরবার থেকে অব্যাহতভাবে পেয়ে আসছিলেন তৎসম্বন্ধে আমরা কবির ভাষণাদি ও নানাজনের কাছে লিখিত সমসাময়িক পুরাতন পত্রাদিতে বারম্বার পাই। কিন্তু ১৯০১ সনে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শান্তিনিকেতনের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা' উত্তরকালে বিশ্বভারতী নামক মহাদ্রুমে রূপায়িত হয়েছে, তা' যে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরে ত্রিপুরা দরবার থেকে বার্ষিক বরাদ্দমত নিয়মিত অর্থসাহায্য অব্যাহতভাবে পেয়ে এসেছে, সে খবর হয়তো অনেকেরই জানা নেই। মাঝখানে নানা প্রয়োজনে এই অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ সাময়িকভাবে সঙ্কুচিত করা হয়েছিল। মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর পিতামহের মঞ্জুরী বরাদ্দ সম্পূর্ণ খুলে দিলেন। এ উপলক্ষে বিশ্বভারতীর তদানীন্তন কর্ম্মসচিব রথীন্দ্রনাথের ১৯৪১ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ৪৪/৭৬১ সেহাভুক্ত চিঠিতে আমায় জানিয়েছিলেন,

> "Allow me to thank you for your letter No. D.O. 3569/E dated the 3rd Poush 1350 T.E. conveying the order of His Highness The Maharaja Manikya Bahadur for the restoration of the annual grant to the Visva Bharati to its original sanction of Rs. 1000/- as well as

the futher direction of His Highness for the payment of the arrear dues that have accumulated due to the annual grant having been paid at the reduced rate during the last few years. I am pleased that His Highness has given his usual sympathetic consideration to the cause of the Visva Bharati and I request you to kindly convey my grateful thanks to him."

তুলনামূলকভাবে মানসপটে স্বভাবতঃই জেগে উঠে শান্তিনিকেতনের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত দুটি লজ্জাজনক ঘটনা। ইংরেজ আমলে শান্তিনিকেতনে সেবার এলেন বাংলাদেশের জাঁদরেল গভর্ণর স্যর জন এণ্ডারসন। আশ্রম ও বিদ্যালয় থেকে ছেলেমেয়েদের খালি করে লাটসাহেব বিশ্বভারতী পরিদর্শন করলেন! তার আরও আগে, গভর্ণর জ্যাকসন বিশ্বভারতীতে শুভাগমন করেন। বাংলার লাটের পদধূলির ফললাভ স্বরূপ কিঞ্চিৎ সরকারী অর্থসাহায্য মঞ্জুর হল। আজ বিশ্বভারতী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অতীতের সেই দুর্দ্দিনে মহাকবি ও মহাগুরুদেবকে কৃপণের সে অকিঞ্চিৎকর দানও হাত পেতে নিতে হয়েছিল! ত্রিপুরা তো তখন ছিল মধ্যযুগীয় আদর্শে শাসিত অতিক্ষুদ্র একটি দেশীয় রাজ্য ! ১৩১২ সনে রবীন্দ্রনাথই "দেশীয় রাজ্য" প্রবন্ধ পাঠের সময়, ইংরেজ-শাসিত ভারতের রাষ্ট্রনীতির পটভূমিকায় এই আগরতলায়ই বলেছিলেন,

"দেশীয় রাজ্যের ভুলক্রটি-মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে তাহাতে যেটুকু লাভ আছে তাহা বস্তুতঃই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ।"

আগেই বলেছি, শান্তিনিকেতনে আমরা ২/৩ জন থাকতাম, মাটির-ঘর শ্যামলীর ধারেই। রাত্রি প্রভাতে জান্‌লায় চোখ মেলে দেখেছি, শ্যামলীর সামনের দোরগোড়ায় বসে কবি আপনমনে লিখে যাচ্ছেন — অলিন্দের উপর এখানে সেখানে কয়টা শালিখ-চড়ুই-এর কলরব চল্‌ছে — ওদের প্রাতরাশের কিছু ভোজ্যবস্তু সম্ভবতঃ মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদিকে চেয়ে চেয়ে নিঃশব্দে প্রায় ঘন্টাখানেক সময় কেটে গেল। সোমেন্‌দা' (ত্রিপুরার শিক্ষাসচিব ৺সোমেন্দ্র দেববর্ম্মা) এসে জানালেন, একটু বাদেই ধীরেনকৃষ্ণ শ্যামলীতে কবির সঙ্গে মহারাজকে নিয়ে উত্তরায়ণের ছবি তোলবার আয়োজন করেছেন। দু'বাড়ীতেই আর উত্তরায়ণের সুন্দর বাগানে ছবি তোলা হল। ত্রিপুরার প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মার আঁকা কবিসহ মহারাজের সুন্দর বড় আলেখ্যটি উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের লাইব্রেরী ঘরে এখনও সাজানো রয়েছে। আর, ঐ প্রকোষ্ঠেরই ম্যান্টেলপিস্‌-এর উপর মহারাজের শান্তিনিকেতনের সফরের আর একটি মূল্যবান স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে, তা' হল, গুরুদেবের স্বাক্ষরসহ এবং চামড়ার অতি সুন্দর করে বাঁধাই কবির একটি মনোরম ছবি যা' কবি মহারাজ বীরবিক্রমকে স্মরণচিহ্নস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। মহারাজের মুখেই আমরা শুনেছি, এ ছবিটির ফ্রেম বাঁধাই-এ নাকি শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর সুচারু পরিকল্পনা রয়েছে।

কবির ও শান্তিনিকেতনের প্রতি মহারাজের অনুরাগের সম্বন্ধে উত্তরকালের একটি ছোট ঘটনার সুখস্মৃতি এখানে মনে পড়ল। সেবার (১৯৪৪) মহারাজ কলকাতায় বিশেষ

অনুরুদ্ধ হয়ে গেলেন, আগরতলার কৃতী সন্তান ও সরকারী আর্ট কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কলেজ ভবনস্থ কোয়ার্টারে। রমেনবাবুর উদ্দেশ্য ছিল মহারাজকে তাঁর ষ্টুডিয়ো দেখানো। অনেক ছবি, উড্‌কাট, আর নানারকম শিল্পসৃষ্টি মহারাজকে ঘুরিয়ে দেখালেন। অবশেষে ছবি নেওয়ার আয়োজন হল। রমেনবাবুর নির্ব্বাচিত স্থানটি মহারাজের মনঃপুত হল না। তখন কোথাকার অর্ডার পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মস্ত বড় একটা তৈলচিত্র রমেনবাবু শেষ করে ও সদ্য ফ্রেম করিয়ে ঘরের এক পাশে দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রেখেছিলেন। মহারাজের অভিপ্রায় অনুসারে ঐ ছবিটিকেই মোড় ঘুরিয়ে ব্যাকগ্রাউণ্ড করে ফটোগ্রাফ তোলা হল। মহারাজ রমেনবাবুকে বললেন, "বিশ্বভারতী কলাভবনের গঙ্গাধারাটি রবীন্দ্র-স্মৃতি বহন করিয়া কলিকাতার আর্ট স্কুলের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে। গঙ্গাতীরেই আজকের ছবিটি তোলা গেল!" ছবিখানা এখনো আমার কাছে রয়েছে। স্বর্গত বন্ধুবর রমেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহধন্য ও অনুরক্ত শিষ্য। শান্তিনিকেতনে তিনি সুদীর্ঘকাল কবির সান্নিধ্যে থেকে কবিমানসের শিল্পপ্রতিভা ভক্তের ন্যায় অনুসরণ করে গেছেন। বিদেশের শিল্পকলা সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি বহু বৎসর বিদেশে অতিবাহিত করলেও রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আচার্য্য নন্দলাল বসুর ভারতীয় আদর্শ আজীবনকাল নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করে চিত্রজগতে তাঁর একটি বিশিষ্ট ও স্থায়ী আসন রেখে গেছেন।

শান্তিনিকেতনের কথায় আবার ফিরে যাই। পরদিবস অর্থাৎ ২৩শে পৌষ সকালের দিকে বিশ্বভারতীর আরও কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখে মহারাজ ঐদিন অপরাহ্ণের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে এলেন। কবি স্বয়ং এবং আর সবাই মহারাজকে আরও ২/১ দিন ওখানে থেকে যাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু ৪/৫ দিনের মধ্যেই মহারাজের সঙ্গে আমাদের ব্রহ্মদেশ-যাত্রার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে তা' আর সম্ভব হল না। সোমেনদা দুদিন বাদে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরলেন। মহারাজ তাঁকে নিয়ে রেঙ্গুন যেতে চাইলেন কিন্তু লখ্‌নৌ থেকে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসার পূর্ব্ব ব্যবস্থার তাগিদে বিদায় নিয়ে তিনি রওনা হয়ে গেলেন লখ্‌নৌ। কে জানতো, সেদিনের অপয়া দেরাদুন-একস্‌প্রেস্ গাড়ীতে তাঁর অগস্ত্য যাত্রাই হল! বিহারের অরণ্য প্রদেশে সে গাড়ী দুর্ঘটনায় বিধ্বংস হল আর শ্রদ্ধেয় সুহৃদ ও ত্রিপুরার শিক্ষাসচিব সোমেনদা সে দুর্ঘটনায় চিরতরে হারিয়ে গেলেন! আমরা তখন বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিচ্ছি — বেতারবার্ত্তায় মহারাজ সে দুঃখের সংবাদ জানলেন। কবিরও ত্রিপুরার সূত্রে পরম স্নেহভাজন একটি বন্ধুপুত্রের বিয়োগ ঘটল — যাঁর মাধ্যমেই গোড়ার দিকে মহারাজের শান্তিনিকেতন সফরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সোমেনদার বিষয় আমাদের ভাবীকালের ত্রিপুরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে অন্ততঃ এই ভেবে যে, প্রগতির আদর্শবাদী মহারাজের উৎসাহে এখন থেকে প্রায় ত্রিশবছর আগে সোমেনদার ব্যবস্থাপনায় রাজধানী আগরতলায় বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়েছিল।

ত্রিপুরাধিপতির উপরোক্ত শান্তিনিকেতন পরিভ্রমণ সম্বন্ধে 'রবীন্দ্রজীবনী'র চতুর্থখণ্ডে (১৫৩ পৃষ্ঠা) কয়েক লাইন লিপিবদ্ধ আছে। এ সম্পর্কে দুটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হচ্ছে। প্রথমতঃ, জীবনীকার লিখেছেন যে ৯ই জানুয়ারী তারিখে মহারাজ সেখানে

গিয়েছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের ঐ বৎসরের প্রকাশিত এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশন রিপোর্ট আলোচনায় দেখতে পাচ্ছি যে মহারাজ শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন ৭ই জানুয়ারী এবং ফিরে এসেছিলেন তার পর দিন। দ্বিতীয়তঃ, এই জীবনীগ্রন্থে লিখিত হয়েছে যে "এই বংশের আর কোনো মহারাজা আশ্রমে আসেন নাই।" আমরা জানি, বিষয়টি অন্যরূপ। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ত্রিপুরার সমকালীন দরবারের স্বনামখ্যাত রাজপুরুষ কর্ণেল মহিম ঠাকুর প্রণীত "দেশীয় রাজ্য" গ্রন্থের (২২৩ পৃষ্ঠা) 'ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে মহারাজ রাধাকিশোর উপলক্ষে লিখিত হয়েছে যে তিনি "রবিবাবুর কাব্য-প্রতিভায় যেমন আকৃষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁহার কর্ম্মভূমি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি ছিল। স্বয়ং মহারাজ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইয়া বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রাদি দান করিয়া আসেন।" ইহা আনুমানিক ১৩১৩ বাংলা সনের কথা। কিশোর-সাহিত্য-সমাজের অভিনন্দনের উত্তরে মহারাজ রাধাকিশোর প্রসঙ্গে কবি স্বয়ং তার ভাষণে বলেছেন, "তিনি স্বয়ং আমাদের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করে, আমাদের আনন্দিত ও সম্মানিত করেছেন।"

বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসবার বছরই অর্থাৎ ১৩৪৬ বাংলায় আমার জীবনের অন্যতম সুযোগ ঘটল মহারাজের সঙ্গে পৃথিবী পর্য্যটনের। ইয়োরোপে, আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগর জাহাজে পাড়ি দেবার সময় ভিন্নদেশীয় সহযাত্রী বন্ধুগণের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গ জমে উঠতেই দেখেছি, 'টেগোরে'র প্রসঙ্গটি নির্ঘাত এসে গেছে। তার কত স্মৃতিই-না আজ মনে পড়ছে। ক্যার্লিফর্নিয়ায় লস্-এঞ্জেলস্-এর আম্বেসেডার হোটেলে টেলিগ্রাফ-কাউন্টারের ওধার থেকে, ভারতের জন্য প্রেরিত তারবার্ত্তাটি হাতে নিয়েই অপারেটার-কর্ম্মীটি একগাল হাসি মুখে নিয়ে বলেছিলেন, "তুমি টেগোরের দেশের লোক? সুপ্রভাত!" সান্‌ফ্রানসিস্‌কো থেকে সিড্‌নীর যাত্রী মিসেস্ ষ্ট্যানিফোর্থ রিকেট্‌সন্ "ম্যারিপোজা" জাহাজে একদিন হাতে নিয়ে এলেন "Sadhana" আর "The King of the Dark Chamber" গ্রন্থ দুটি। তিনি রবীন্দ্রানুরাগিনী বিদুষী মহিলা — বোষ্টনে আন্তর্জাতিক দার্শনিকদের এক মহাসম্মেলনে অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে আমেরিকা থেকে স্বদেশে ফিরছিলেন। কেবিনে আর বোট ডেকে বসে ৩/৪ দিন রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ও কবির ভাবধারার কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করলেন। আরও মনে পড়ে, অতলান্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দেবার সময় "অ্যারেঙোরা ষ্টার" জাহাজে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল, হিটলারের জার্ম্মেনী থেকে সদ্য-পালিয়ে-আসা বাস্তুত্যাগী এরম্যান (Dr. R. Ehrmann) পরিবারের সঙ্গে। এই জার্ম্মেন-ইহুদী ডাক্তার আমায় সবিশেষ অনুরোধ করলেন, আমি যেন দেশে ফিরে গিয়ে মহাকবির কাছে তাঁর সশ্রদ্ধ স্মরণ পৌঁছে দেই। কারণস্বরূপ বললেন, বার্লিনে এক সময়ে কবির সঙ্গে তিনি নাকি ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে এসেছিলেন। দুঃখ করে বললেন, কবির স্বাক্ষরবাহী স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ কাব্যগ্রন্থটি তিনি জার্ম্মেনীতে ফেলে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে, "কুইন মেরী" জাহাজে করে আর একবার অতলান্তিক পাড়িরসময় একটি কাম্বোডিয় ভদ্রলোক লাউঞ্জে এসে আমায় নিয়ে বসে পড়তেন — নামটি তাঁর এতকাল পর বিস্মৃত হয়েছি।

চয়নিকা থেকে তাঁকে রবীন্দ্রকাব্য পড়ে শোনাতে হত। সারার্থ জেনেই তিনি মুগ্ধ-বিস্ময়ে চুপ করে থাকতেন। এক-আধটা বাংলা শব্দের উচ্চারণে তিনি উচ্চকিত হয়ে উঠতেন — তাঁর কম্বোজী মাতৃভাষায়ও হয়তো তার ব্যবহার দেখে।

সুদীর্ঘ সাতমাসকাল পৃথিবী পর্য্যটনের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে কবিকে সে সব সুখস্মৃতি জানাই। কবি কিছুকাল আগেও বেশ অসুস্থ ছিলেন, তাঁর স্বহস্তলিখিত উত্তরখানি এখানে উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনে। ১৯৪০ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে লিখছেন,

> "আমার প্রবাসকালীন ভক্তবন্ধুদের কারো কারো সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়েছে শুনে খুশি হলুম। তাঁরা অনেকে ছড়িয়ে পড়েছেন, অনেকে তাঁরা পরলোকে। জানিনে আইনষ্টাইনের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে কিনা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ স্মরণীয়। আমি দূর বিদেশীয়দের কাছ থেকে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পেয়েছি সে তোমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।"

সঙ্গে সঙ্গেই শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর চিঠি এল। ১৪ ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে লিখেছেন,

> "২৫শে মাঘ আগরতলা হোতে পূজনীয় গুরুদেবকে লিখিত আপনার বিলেতে ভ্রমণ সম্পর্কীয় চিঠি গুরুদেব আমাকে পড়তে দিয়েছেন। বিলেতে না গেলে, কোনো ভারতবাসী বুঝতে পারবেন না যে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় এবং রবীন্দ্রনাথের জন্য য়ুরোপে ভারতবাসীর সম্মান কতটা।"

১৩৪৮-এর ত্রিপুরা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে সারা পৃথিবী তখন টলমল। ক্ষুদ্র ত্রিপুরারাজ্যেও তার প্রত্যক্ষ সংঘাত লেগেছে। একদিকে ত্রিপুরার সুদক্ষ সেনাবাহিনী ও ত্রিপুরার সন্তানগণ ব্রহ্মের অরণ্য-প্রদেশে জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সামরিক তৎপরতায় নিযুক্ত, অন্যদিকে ত্রিপুরার সর্ব্বজনপূজ্যা রাজমাতা মহারাণী অরুন্ধতী মহাদেবী স্বল্পকাল পূর্ব্বে লোকান্তরিতা হয়েছেন। সর্ব্বোপরি ১৯৪১ সনের সেই কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যার ফলে ঢাকা জেলার রায়পুরা ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে বৃটিশ-ভারতীয় সহস্র সহস্র সংখ্যালঘুসম্প্রদায়ের বাস্তুত্যাগী ত্রিপুরার দেশীয় নৃপতির ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণের জন্য আখাউড়া রেলষ্টেশনে এসে জমায়েত হল। পিতৃপুরুষের ভিটায় শান্তিতে বাস করবার অধিকার তাদের নেই সাম্প্রদায়িক নিপীড়নে। বাংলার তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তৎকালে রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলে রাহুগ্রস্ত। বহিরঞ্চলের রেলষ্টেশনে অসংখ্য শরণার্থীর এই আকস্মিক জমায়েতের গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে কুমিল্লার জেলাকর্ত্তৃপক্ষও নিয়েছেন নীরব দর্শকের ভূমিকা। ষ্টেশন কর্ত্তৃপক্ষ গুরুতর বিপর্য্যয়ের সম্মুখে উপায়বিহীন হয়ে ত্রিপুরেশ্বরের শরণাপন্ন হলেন। এদিকে, রাজধানীতে এক সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে তখন স্বর্গীয়া মহারাণী-রাজমাতার শ্রাদ্ধবাসরে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় মহারাজও সপারিষদ উপস্থিত রয়েছেন। পারলৌকিক কৃত্যাদির তাৎপর্য্য এবং অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত নিবিষ্ট — ঠিক এই সময়ে আখাউড়া ষ্টেশনমাষ্টার টেইলার সাহেব স্বয়ং এসে রাজদরবারে জরুরী এত্তেলা দিয়ে ততোধিক জরুরী পরিস্থিতির সংবাদ নিবেদন করলেন। রাজমন্ত্রী ও সচিববর্গের সহিত পরামর্শ করে

নিমেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। রাজধানীর আফিস-আদালত-বিদ্যালয়াদি সরকারী ভবনগুলির দুয়ার খুলে দিয়ে শরণার্থীদের জন্য যানবাহনাদির বন্দোবস্ত করে বৃটিশ-ভারতীয় দুর্গত নাগরিকদের স্বরাজ্যে নিয়ে আসবার আদেশ মহারাজ বীরবিক্রম প্রদান করলেন। ত্রিপুরার সে একদিন গেছে, উত্তরকালে ইতিহাসে যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তৎকালে ভারতের বিশিষ্ট সংবাদ- সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড প্রেসের সর্ব্বজন-পরিচিত পরিচালক ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্তের একটি চিঠিতে (১৭ এপ্রিল, ১৯৪১) সেদিনের চিত্রটি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি লেখককে লিখেছিলেন,

> "All roads lead to Tripura now and all eyes are directed towards its wonderful Ruler with reverence and love. Tripura has doen a miracle and has extorted the admiration of the whole country. May the flag of Tripura fly aloft for all time to come .... I am afraid you are all extremely busy with His Highness who is personally succouring the "Daridranarayan". I do not therefore propose to prolong my letter but shall be delighted to have a line in reply".

আগরতলায় রবীন্দ্রজয়ন্তী দরবারে কবিকে "ভারত ভাস্কর" উপাধি প্রদান

এরকম ঘটনাবহুল পরিবেশ এবং বিপর্য্যস্ত পরিস্থিতির পটভূমিকায়ও ১৩৪৮ বাংলার ২৫শে বৈশাখ ত্রিপুরার ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। কবির বার্দ্ধক্য ও তৎকালীন অসুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজ কিছুকাল থেকেই আসন্ন রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকীতে সেবার বিশেষ কিছু আয়োজনের কথা ভাবছিলেন। রাজমন্ত্রী, সচিববর্গ আর মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গেও পরামর্শ হচ্ছিল এবং এজন্য একটা কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিও গঠিত হল। অবশেষে স্থির হল, প্রপিতামহ মহারাজ বীরচন্দ্র কবিজীবনের পূর্ব্বাহ্নে কিশোর কবিকে যে রাজকীয় স্বীকৃতি দিয়ে অভিনন্দিত করেছিলেন, কবির জীবনসায়াহ্নে উত্তরকালে ত্রিপুরা থেকে মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর তদুপরি তাঁর রাজকীয় "পদ্মমোহরে" মুদ্রিত স্বাক্ষর রেখে যাবেন। শুভ ২৫শে বৈশাখের পূর্ব্বাহ্নে রাজধানী আগরতলায় উজ্জয়ন্ত-রাজপ্রাসাদের খাস দরবার হলে "রবীন্দ্রজয়ন্তী বিশেষ দরবার" অনুষ্ঠিত হল। মহারাজ সপারিষদ চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মিছিল করে দরবারে এসে আসন পরিগ্রহ করলে পণ্ডিতগণ বেদমন্ত্র ও স্বস্তিবচন পাঠ করলেন। তারপর মহারাজের অনুমতি গ্রহণে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর যে অভিভাষণ পাঠ করলেন তার নিম্নোক্ত অংশসমূহ আজকের দিনে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হবে। মহারাজকুমার বললেন,

"ত্রিপুরারাজ্য কেন, ভারতে অন্য কোথাও সম্ভবতঃ রাজকীয় বিশেষ দরবারে এই প্রকার জয়ন্তী-উৎসব সম্পাদিত হয় নাই। এই বিশিষ্টতা অর্জ্জন করা ত্রিপুরারাজ্যের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয় বলিয়া আমি মনে করি।"

"আমার জীবনে এমন অনেকদিন গিয়াছে, যে সময়ে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র বাণীই আমাকে সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ দেখাইয়া জীবন দিয়াছে। তাঁহার উপদেশপূর্ণ পত্রগুলি আমার অমূল্য সম্পদ।"

পরিশেষে এই বলে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁর ভাষণ শেষ করলেন,

"আজ সেই রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মদিনে আমাদের দেশের রাজা — রাজকীয়ভাবে জয়ন্তী-উৎসব দরবারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; — আমি জানি রোগশয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথ যখন এই সংবাদ পাইবেন তখন তিনি কতদূর শান্তিলাভ করিবেন। মহারাজের এই শুভ-অনুষ্ঠান আমাদের রাজ্যের মঙ্গল বহন করুক এই কামনা করিতেছি।"

অতঃপর রাজানুমতিগ্রহণে মুখ্যসচিব রাজ্যেশ্বরের 'রোবকারী' অর্থাৎ ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন যদ্দারা 'ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভস্বরূপ' কবিবর রবীন্দ্রনাথকে 'ভারত-ভাস্কর' উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হল। নকীবগণের ঘোষণায় কবিবরের নামসংযুক্ত সে সম্মান বিঘোষিত এবং ত্রিপুরার প্রশাসনিক সরকারী গেজেটে তা' প্রকাশিত হল। ত্রিপুরার রাজ-লাঞ্ছন-শোভিত, রাজপদ্মমোহর এবং রাজ্যেশ্বরের বাংলায় স্বাক্ষরসংযুক্ত, দরবারের ২৫২ ক্রমিক নম্বরবাহী সেই স্মরণীয় রোবকারীটির অংশবিশেষ নিম্নে বিবৃত হল। ঘোষণার প্রতিলিপিটি রয়েছে রাজপ্রাসাদ-দপ্তরে এবং এটি ১৩৪৮ সালের জ্যৈষ্ঠসংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত ও রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ডের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে ঃ—

দরবার বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন
হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যর বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর,
কে,সি, এস্, আই। এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্য।
নরপতেরাদেশোহয়ং কারকবর্গেযু প্রচরতু পরমস্য বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী।

ইতি — ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ; তারিখ ২৫শে বৈশাখ।

যেহেতু বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী-উৎসব হওয়া এপক্ষের অভিপ্রেত;—

* * *

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী-উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃকার্য্যে বৃত হইবার গৌরব লাভ এপক্ষের হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভস্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভাযুগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুরারাজের কর্ত্তব্য —

"জ্যোৎস্নাভিরাহত মহদ্ধদয়ান্ধকারম্" —
অতএব
এই উৎসবজয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত
কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে
"ভারত-ভাস্কর"
আখ্যায় ভূষিত করা যায়; —
এবং
শ্রীভগবান্ তদীয় আশীর্ব্বাদে কবিবরকে সুস্থদেহে
শতবর্ষভোগ করিবার সুযোগদান করুন।

শান্তিনিকেতনে কবির হস্তে "ভারত ভাস্কর" অভিজ্ঞাপত্র অর্পণ

আগরতলায় দরবার অনুষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কবির শ্রীহস্তে সম্মান-সূচক অভিজ্ঞাপত্র সমর্পণ করবার উদ্দেশ্যে দরবারের পক্ষে প্রতিনিধিস্বরূপ, কবির বিশেষ স্নেহের পাত্র এবং ত্রিপুরার অন্যতম সুসন্তান ও শিক্ষাবিদ্ শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,

এম্-এ মশাই রাজ- 'খরিতা', শুভ্ররেশমবস্ত্র-উত্তরীয়, স্বর্ণমুদ্রা ও নানাবিধ রাজ- 'খান্দানী' 'পোষাক' সহ শান্তিনিকেতনে কবিসকাশে প্রেরিত হলেন। এতদুপলক্ষে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে রথীন্দ্রনাথ লিখিত ৩০শে বৈশাখের একটি চিঠিতে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তিনি লিখেছেন,

"স্থির হয়েছে আজ সন্ধ্যার দিকে মহারাজার রোবকারী বাবা মহাশয়কে দেওয়া হবে। এই সম্পর্কে নন্দলালবাবুর পরামর্শ অনুসারে একটু অনুষ্ঠান করেই ব্যাপারটা সমাধা করা হবে। অনুষ্ঠানের বিবরণ ভূপেন্দ্রবাবুর কাছে নিশ্চয়ই সবিশেষ জান্‌তে পারবেন। বাবা মহাশয়কে এইভাবে সম্মান দেখান ত্রিপুরাধিপতির উপযুক্তই হয়েছে এবং আমাদের সকলেরই হৃদয়স্পর্শ করেছে।"

কবি তখন বিশেষ অসুস্থ। কিন্তু ত্রিপুরার প্রতি তাঁর সুগভীর মমতা ও আকর্ষণ এরকম অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁকে শান্তিনিকেতনে তাঁর শেষ আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম হতে বিরত করেনি। ৩০শে বৈশাখ অপরাহ্নে ইনভ্যালিড্-চেয়ারে বাহিত হয়ে কবি উত্তরায়ণের সভাস্থলে উপনীত হলেন ও ত্রিপুরেশ্বরের প্রদত্ত মানপত্র (সনদ) গ্রহণ করলেন।

কবির জীবনসন্ধ্যায় দেশের রাজার প্রদত্ত এই সম্মান কবি যে কী গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, এর মূল্য যে তাঁর কাছে নোবেল পুরস্কার ইত্যাদির মতো আন্তর্জাতিক সম্মানের চাইতে বিন্দুমাত্র ন্যূন ছিল না, তার পরিচয় পাই, রাজকীয় রোবকারীর প্রত্যুত্তরে রথীন্দ্রনাথ পঠিত কবির সুপ্রসিদ্ধ ভাষণে। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই ভাষণটি বাংলায় টাইপ করা ছিল, সর্ব্বনিম্নে শুভাকাঙ্খা-সম্বলিত কবির কম্পিত হস্তের স্বাক্ষর। ভাষণটির কিয়দংশ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ—

"ত্রিপুরার রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলাম আজ তা বিশেষ করে স্মরণ করবার ও তাকে স্মরণীয় করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এরকম অপ্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্ল্লভ। যেদিন মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য এই কথাটি আমাকে জানাবার জন্য তাঁর দূত আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন যে তিনি আমার তৎকালীন রচনার মধ্যেই একটি বৃহৎ ভবিষ্যতের সূচনা দেখেছেন একথাটি সম্পূর্ণ আশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

* * *

তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলংকৃত কবিতার সংস্করণ ছাপানো হবে। তখন তিনি ছিলেন কার্শিয়াং পাহাড়ে, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য। কলকাতায় ফিরে এসে অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

* * *

কবি বালকের প্রতি তাঁর পিতার স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধারা মহারাজ রাধাকিশোরের মধ্যেও সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেল।

* * *

যে অপরিণতবয়স্ক কবির খ্যাতির রথ সম্পূর্ণ সংশয়সঙ্কুল ছিল তার সঙ্গে কোনো রাজত্ব-গৌরবের অধিকারীর এমন অবারিত ও অহৈতুক সখ্যসম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। সেই রাজবংশের সেই সম্মান মূর্ত্ত পদবীদ্বারা আমার স্বল্পাবশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দীপ্যমান করেছে। আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে যখন বুঝলেম বর্ত্তমান মহারাজা অত্যাচারপীড়িত বহুসংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে অসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয়দান করেছেন, তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্ব্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে

পারলুম তাঁর বংশগত রাজউপাধি আজ বাংলাদেশের সর্ব্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হোল। এর সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মীর সকরুণ আশীর্ব্বাদ চিরকালের জন্য তাঁর রাজকুলকে শুভ-শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত করে রাখল। এ বংশের সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ যখন পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠল ঠিক সেই উজ্জ্বলমুহূর্তে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলেম তা সগৌরবে গ্রহণ করি এবং আশীর্ব্বাদ করি এই মহাপুণ্যের ফল মহারাজের জীবনযাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে যেন অগ্রসর করতে থাকে। আজ আমার দেহ দুর্ব্বল, আমার ক্ষীণ কণ্ঠ সমস্ত দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর জয়ধ্বনিতে কবিজীবনের অন্তিম শুভকামনা মিশ্রিত করে দিয়ে মহানৈঃশব্দের মধ্যে শান্তিলাভ করুক।"

ত্রিপুরারাজ্যের বাহিরের সহস্র সহস্র বাস্তুত্যাগী শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে মহারাজ আশ্রিত বাৎসল্যের যে উজ্জ্বল কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কবির হৃদয়কে তা কতখানি গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, এ ভাষণে তা'র সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা রয়েছে! বন্ধু মহারাজ রাধাকিশোরকে সম্বর্দ্ধনার জন্য রবীন্দ্রনাথ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৩০৭) তাঁর রচিত "রাজঅধিরাজ তব ভালে জয়মালা" সংগীতে হয়তো স্বল্পব্যক্ত কল্পনায় লিখেছিলেন,

"ক্ষীণজন ভয়তারণ অভয় তব বাণী,
দীনজন দুখহরণ — নিপুণ তব পাণি।"

(রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃঃ)

উত্তরকালে তদীয় পৌত্র মহারাজ বীরবিক্রমের মধ্যে সে কল্পনা অথবা আকাঙ্খাকে দুর্গত দেশবাসীর কল্যাণ ও সেবাব্রতে সার্থক এবং সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত দেখে কবিচিত্ত কী পরিমাণ পুলকিত হয়েছিল তা' সহজেই অনুমেয়।

'দীনজন দুখহরণ' - বিশেষিত ত্রিপুরেশ্বর বীরবিক্রমের আর একদিন এসেছিল আরও কিছুকাল পরে — বাংলাদেশের দুঃখদীর্ণ ও অশ্রুসিক্ত মন্বন্তরের (১৩৫০) যুগে। মহারাজ সেবারও রাজ্যান্তর হতে সমাগত হাজার হাজার ক্ষুধার্ত্ত নরনারীকে আশ্রয় দান করে এবং ক্ষুধায় অন্ন দিয়ে অক্ষয়পুণ্য অর্জ্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তা' জীবিতকালে দেখে যাননি, কিন্তু ত্রিকালদর্শী কবির শাশ্বত আশীর্ব্বাণী সে ঘোরতর দুর্দ্দিনেও সুস্পষ্টভাবে সত্য হয়েছিল।

উত্তরায়ণে অনুষ্ঠানের কথা বলছিলাম। অনুষ্ঠানশেষে একই অপরাহ্নে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে প্রেরিত রথীন্দ্রনাথের একটি টেলিগ্রামে রয়েছে —

"Father delighted with honour will write soon himself stop Glad to welcome your emissary."

দুঃখের বিষয়, কবির সে চিঠিটি অনুসন্ধানেও আমাদের হস্তগত হয়নি যা' থেকে হয়তো অনেক প্রসঙ্গের উপর আলোকপাত হোত। ভারত-ভাস্কর উপাধিসংক্রান্ত উৎসব ও অনুষ্ঠানাদির বিস্তারিত বিবরণ তৎকালীন 'বিশ্বভারতী নিউজ'-এ বেরিয়েছিল। প্রবাসীর সমকালীন সংখ্যায় সংবাদাদি ছাড়াও উত্তরায়ণে অনুষ্ঠানাদির ছবি ছাপা হয়েছিল।

এবছর আষাঢ় মাসটা পুরীতে কাটিয়ে মহারাজ বাঙ্গালোর যাবেন স্থির হয়েছে। পুরীতে অবস্থানকালে মহারাজ আমন্ত্রিত হলেন, পুরী রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনে পৌরোহিত্যের জন্য এবং তিনি তা' সানন্দে গ্রহণ করলেন। সমুদ্রবেলাভূমে ক্লার্ক হল

সভাগৃহে জয়ন্তী-উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য গৃহীত বিস্তারিত কর্ম্মসূচী অনুযায়ী ব্যবস্থাদি হয়েছে। ৪ঠা আষাঢ় (১৮ই জুন) উক্ত স্থানে পুরী বঙ্গ-সাহিত্য-পরিষদ ও পুরী সঙ্গীত-সম্মিলনী তীর্থোত্তম পুরোষোত্তমক্ষেত্রে শুভাগমন উপলক্ষে মহারাজকে সম্বর্দ্ধিত করেন। পুরীর পৌরজন এবং তৎকালে তথায় আমন্ত্রিত প্রখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মশাই মহারাজের বিদ্যানুরাগ, দানশীলতা, আশ্রিতবাৎসল্য আর সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রানুরাগের বিশেষ উল্লেখ করে জয়ন্তী-উৎসব উদ্বোধনের অনুরোধ জানালেন। দেশের জনমানসেও কবির প্রতি রাজার অনুরাগের বিষয় কী গভীর রেখাপাত করেছিল, সেদিনের ভাষণাদিতে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। সমুচিত প্রতিভাষণান্তে মহারাজ শুভ-অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন।

আরও প্রায় দুমাস পর, চেম্বার-অফ্-প্রিন্সেস্-এর ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে যোগদানের কাজ সমাধা করে মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর বোম্বাই থেকে বাঙ্গালোর ফিরে আসছেন। পথিমধ্যে রায়চুর পেরিয়ে গুন্টাকালের কাছাকাছি এসে ভোর সকালে একটা ছোট ষ্টেশনে কি কারণে গাড়ী থামল। কারণ সন্ধানে প্ল্যাটফর্মে নেমে অচেনা এক সহযাত্রীর হাতে সকালের সংবাদপত্রটার মোটা কালো হেড্‌লাইনটা দেখে আঁৎকে উঠলাম! কবি নেই — রবীন্দ্রনাথ তিরোহিত হয়েছেন কলকাতায় তার আগের দিন অর্থাৎ ২২শে শ্রাবণ বেলা দ্বিপ্রহরে! গুন্টাকাল জংশনে পৌঁছে সংবাদপত্রটি কিনে মহারাজের কামরার সামনে দাঁড়াতেই মহারাজ জান্‌লা নামিয়ে আমায় বল্লেন,

"আমি একটু আগে শুনিয়াছি। শুভলগ্নেই ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে রবির উদয় হইয়াছিল।"

অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করে বললেন, রথীন্দ্রনাথকে আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্য, আর ত্রিপুরার সব সরকারী আফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানাদি লোকান্তরিত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বন্ধ রাখবার বিষয়ে রাজমন্ত্রীকে তার বার্ত্তা পাঠাবার জন্য। রাজাদেশ তামিল করে গভীর ভারাক্রান্ত ও শূন্য মনে ফিরে এলাম নিজ কামরায়।

কর্ম্মজীবনে ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীরবিক্রমের সংস্পর্শে এসে কবি সান্নিধ্যের যে সুযোগ ও ঘটনাসমূহের সঙ্গে যেভাবে প্রত্যক্ষরূপে জড়িত ছিলাম, ছায়ামিছিলের মতো সেই সব স্মৃতি একের পর এক করে মনে ভিড় জমিয়েছে। মহারাজও গত হয়েছেন্ আজ চৌদ্দ বছর। ভারতের ভাগ্যাকাশে রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের স্বপ্ন ও সাধনার স্বাধীনতা-সূর্য্য ইতিমধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ স্বাধীন ভারতে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় কালজয়ী কবির লোকোত্তর প্রতিভার সশ্রদ্ধস্মরণে তাঁর জন্মশতবর্ষ-শুভ-উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে; তার ঢেউ লেগেছে সাত সাগরের পারে - দেশে দেশে - সারা বিশ্বে। বিশাল ভারতের এক উপান্তে অবস্থিত বনকুন্তলা ক্ষুদ্র ত্রিপুরা। আমাদের আজকের এই ক্ষুদ্র 'অঞ্চল'টির সঙ্গে মহাকবি রবীন্দ্রনাথের শুধুমাত্র মৈত্রীবন্ধনই ছিল না — এই অনতিখ্যাত রাজ্যখণ্ডটির সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় নাড়ীর যোগাযোগ — আত্মিক মিলন সংস্থাপিত হয়েছিল। তার তথ্যমূলক চিত্র ও সংসৃষ্ট উপাদানগুলি মননশীল উত্তরপুরুষের জন্য আমরা যথাসম্ভব আহরণ করেছি। আমাদের এবং উত্তরসাধকদের সাধনা সার্থক হবে তার সংরক্ষণে, নিদিধ্যাসনে ও পরিবর্দ্ধনে। তবেই সার্থকতর হবে আমাদের পূজা

আর ক্ষেমঙ্কর হবে তার রূপ। 'ভারত-ভাস্কর' রবীন্দ্রনাথ আমাদের জননী জন্মভূমি ত্রিপুরার আলো-আকাশ-বাতাসের পরিবেশে, আমাদের এই মাটির উপর দাঁড়িয়েই পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে আগরতলায় একদা ত্রিপুরার কল্যাণ কামনায় যে বাণী দিয়ে গেছেন, আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাঁর সেই অমর বাণীতে সেই শুভমন্ত্রে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ হউক;

> "মা যেন এখানেও কেবল কতকগুলো ছাপমারা লেপাফার মধ্যে আচ্ছন্ন না থাকেন — দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃবক্ষে আশ্রয়লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে।"

এই স্মৃতিচয়ন রচনায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু মহাশয়ের সযত্নরক্ষিত, ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখিত কয়েকটি চিঠিপত্র, কবির মূল ভাষণাদি এবং বহুমূল্যবান উপাদান দেখবার ও ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছি। এজন্য তাঁর কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। —লেখক।

তথ্যক্রমপঞ্জী

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত ত্রিপুরার সুদীর্ঘকালের ধারাবাহিক ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কের বিষয়ে এযাবৎ সময়ে সময়ে সাধারণভাবে আলোচনা হইয়াছে কিন্তু এইসকল আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই উভয় দিকের বিশেষ বিশেষ স্থান,কাল, পাত্র,ঘটনা-সমাবেশ ও তাহার দ্যোতনা-বৈশিষ্ট্যের বিষয়-বিশেষে সীমায়িত অথবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বহুবিধ বিস্ময়কর তথ্য এযাবৎ অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। এজন্যই এসকল উপাদানের আহরণ ও সুবিন্যাসের একান্ত প্রয়োজন।

কবি ও রাজার পরিবেশ, সংস্কৃতি, মনোগঠন, আদর্শ সকলই সাধারণ দৃষ্টিতে বিভিন্ন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই ত্রিপুরার প্রসঙ্গে একদা বলিয়াছেন,

> "যে সংস্কৃতি, যে চিত্তোৎকর্ষ দেশের সকলের চেয়ে বড়ো মানসিক সম্পদ, একদা রাজারা তাকে রাজৈশ্বর্য্যের প্রধান অঙ্গ বলে মনে করতেন।"

সম্ভবতঃ, এজন্যই জাহ্নবী-যমুনার উৎসমুখ বিভিন্ন হইলেও জীবনের অববাহিকায় পারস্পরিক গুণানুরাগ-নিসৃত সমগোত্রীয়ত্বের সন্ধিস্থলে কবি ও রাজার মধ্যে মহামিলনের পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত ত্রিপুরার সুদীর্ঘ ষষ্টিবৎসরের সর্ব্বার্থসাধক ও অব্যাহত যোগাযোগের সামগ্রিক রূপটি একনজরে অথবা ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মুগ্ধবিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এ যেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্য, পঞ্চাঙ্ক নাট্য অথবা একটি পূর্ণাঙ্গ 'রূপবাণী' যাহার পেছনে রহিয়াছে বিভিন্ন রসবিমিশ্র এবং প্রচুর উপাদান সম্বলিত ঐতিহাসিক সম্পদ ও সরস ঐতিহ্য। কবি প্রতিভার অন্যতম অবদান রবীন্দ্রনাথের পরম-বিস্ময়কর ও অপূর্ব্বরমণীয় পত্রসাহিত্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, একদিকে ত্রিপুরায় তাঁহার লিখিত এবং অন্যদিকে ত্রিপুরা হইতে তাঁহাকে লিখিত পত্রসম্পদের অতি সামান্যই এযাবৎ দৃষ্টিসীমার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উত্তরকালে আরও বিচিত্র উপচার ও অমূল্য উপাদান আবিষ্কৃত এবং সংগৃহীত হইবে, আমরা এই আশাই করিব। বিভিন্ন সূত্রে অসম্পূর্ণ যে সকল তথ্য এযাবৎ গোচরীভূত হইয়াছে, তাহারই একটি বর্ণাঢ্য কালক্রমিক তথ্যপঞ্জী শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত হইল। পুরোভাগে ইহার মাঙ্গলিক শুভশঙ্খধ্বনির আবাহন, আর অন্ত্য অধ্যায়ে পাই পঞ্চপ্রদীপের মঙ্গলারতি। কবির দক্ষিণ হস্তে ত্রিপুরার প্রথম-পরানো রাখীবন্ধনের কাল হইতেই এই শোভাযাত্রার শুভারম্ভ।

মহারাজ বীরচন্দ্র

১২৮৭ বঙ্গাব্দ — রবীন্দ্রনাথের "ভগ্নহৃদয়" কাব্য ১২৮৭ বঙ্গাব্দে ভারতী পত্রিকায় ক্রমপ্রকাশিত হইতেছে। কাব্যগ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল কবির বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসে। কবির বয়স তখন প্রায় ২০ বৎসর; সাহিত্য, সঙ্গীত ও নানাবিধ-কলারসিক মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য তখন ত্রিপুর সিংহাসনে অধিরূঢ়।

রবীন্দ্র জীবনী—শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখো - পাধ্যায় ১ম খণ্ড, ৯৬ পৃঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

১২৮৯ বঙ্গাব্দ — ত্রিপুরার প্রথমা মহিষী মহারাণী ভানুমতী দেবী স্বর্গীয়া হইলে মহারাজ বীরচন্দ্র অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। কবি বীরচন্দ্রের তৎকালীন মানসিক ভাবাবেগের সহিত কিশোর কবির "ভগ্নহৃদয়ে"র কবিতারভাব গভীরভাবে সায় দিয়াছিল। মহারাজ বীরচন্দ্রের প্রসঙ্গে কবি

Bengal Administration Report 1882-83, (Page-168)

"তিনি আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টিদ্বারা দেখতে পেয়েই তখনি আমাকে কবিসম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা' সহজে চোখে পড়ে না তা'কেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।"

কবির ভাষণ, 'রবি' ত্রৈমাসিক পত্র, চৈত্র, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ (১৩৩২ বাং)

বারান্তরে কবি শান্তিনিকেতনে ঐ একই প্রসঙ্গে মহারাজ বীরবিক্রমের উদ্দেশ্যে বলিলেন,

"একদা তোমার স্বর্গগত প্রপিতামহ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কেবল আমাকে এই কথা জানাবার জন্য যে তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিতে চান। দেশের কাছ থেকে এই আমি প্রথম সমাদর পেয়েছিলুম।"

শান্তিনিকেতনে ভারত-ভাস্কর পদবী গ্রহণ উপলক্ষে কবির ভাষণ, ৩০ বৈশাখ, ১৩৪৮ বাং

প্রৌঢ় মহারাজ (বয়স ৪৩) তাঁর একান্ত সচিব রাধারমণ ঘোষ মহাশয়কে কিশোরকবি রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে প্রেরণ করিলেন। বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ প্রতিভা রাজ-স্বীকৃতিতে অভিনন্দিত, অভিষিক্ত ও সম্মানিত হইল। কবির পক্ষে ইহা হইল এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়।

কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তদীয় পুস্তকে কবি জীবনের এই বিশেষ ঘটনাটির কথা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। তদীয় বিবরণে একটিমাত্র অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় এই যে, "ভগ্নহৃদয়" কাব্যগ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে মহারাণী ভানুমতীর মৃত্যুর বৎসরাধিককাল পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে নহে।

দেশীয় রাজ্য—কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা, ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ। (পরিশিষ্ট)

বয়সের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও একের প্রতিভায় ও অপরের গুণগ্রাহিতায় কবি ও রাজার মধ্যে সম্পর্ক অচিরেই অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল। ত্রিপুরার সহযোগী-রাজমন্ত্রী তখন স্বনামখ্যাত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮০-৮১ ইং, তৃতীয়বার)।

রবীন্দ্র জীবনী (১ম খণ্ড)

১২৯২ বঙ্গাব্দ — ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা'-বর্ণিত মহারাজ অমরমাণিক্যের একটি আখ্যানের ছায়াবলম্বনে 'বালক' পত্রিকায় প্রথমে রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'মুকুট' নামে গল্প প্রকাশিত হইল। রাজমালা লেখক ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই যাতায়াতের সূত্রে ইহার উপাদান কবি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। পরবর্ত্তী সময়ে (ডিসেম্বর ১৯০৮) ইহার নাট্যরূপ দেওয়া হয়।

আষাঢ় হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত 'রাজমালা'র গোবিন্দমাণিক্যের আখ্যানের পটভূমিকায় কবির 'রাজর্ষি' উপন্যাস ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইল। কিন্তু 'বালক' পত্রিকায় ইহার ক্রমপ্রকাশ অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল।

'রবি' ত্রৈমাসিক পত্র, চৈত্র, ১৩৩৫ ত্রিং

১২৯৩ বঙ্গাব্দ — 'রাজর্ষি' রচনা উপলক্ষে উপাদান সংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ ও মহারাজ বীরচন্দ্রের মধ্যে প্রথম পত্রবিনিময় স্মরণীয়[১]। কবি ২৩শে বৈশাখ তারিখের পত্রে বীরচন্দ্রকে লিখিতেছেন,

> "আপনাদের রাজপরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় আছে এইরূপ শুনিতেপাই — সেইজন্য সাহসী হইয়া মহারাজকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের পূর্ব্বকার সম্বন্ধ মহারাজের স্মরণে আসে ইহা আমার অভিপ্রায়। ••• ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বনকরিয়া 'রাজর্ষি' নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। ••• মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন ••• উদয়পুরের এবং ঐতিহাসিক ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের ফটোগ্রাফ পাওয়া যদি সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপকার হয়।" ইত্যাদি

মহারাজ বীরচন্দ্র প্রত্যুত্তরে ১২৯৬ ত্রিপুরাব্দ (১২৯৩ বাং), ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের সুদীর্ঘ পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখিলেন,

> "লিখিয়াছেন, আমাদের পরিবারের সহিত আপনাদের পরিবারের যে সম্বন্ধ ছিল তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য। সে সুখের সম্বন্ধ আমি ভুলি নাই ••• ভরসা করি, মধ্যে মধ্যে আপনার অবসর মত এইরূপ অমায়িকভাবপূর্ণ পত্র পাইব। "মুকুট" ও "রাজর্ষি" নামক দুইটি প্রবন্ধই আমি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। ••• পার্ব্বতীয় প্রজাগণের মধ্যে এমন প্রথা আছে যে, তাহারা নিজ নিজ ভাষায় রচনা করিয়া মহারাজগণের জীবনচরিতের কোন বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে গান করিয়া থাকে। সেই গানগুলি হইতে অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। ••• আপনি যে ত্রিপুর ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্ন করিতেছেন, ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ••• উদয়পুরের যে কয়খানা ফটোগ্রাফ আছে তাহার বিবরণ লিখিয়া ইহার পর তাহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। রাজরত্নাকরে গোবিন্দমাণিক্যের ও তাহার ভ্রাতা ছত্রমাণিক্যের চরিত যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নকল করান হইয়াছে।
>
> ••• মুদ্রাঙ্কন শেষ হইলে আপনার নিকট পাঠান যাইবে।" ইত্যাদি

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পত্রে উভয়েই উভয়কে 'প্রণতঃ' লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল। রাজদরবার হইতে পুস্তক রচনার নানাবিধ উপকরণ গভীর আগ্রহের সহিত কবিসকাশে প্রেরিত হইল এবং ইহাতে কবি উৎসাহিত হইলেন। এই সনে "রাজর্ষি" উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টাংশে মহারাজ বীরচন্দ্র প্রেরিত উপকরণ হইতে "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যস্য চরিত্রম্" শীর্ষক সংস্কৃত রাজমালায় বর্ণিত অংশটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল(১)।

১২৯৭ বঙ্গাব্দ — 'রাজর্ষি'র প্রথমাংশ লইয়া কবির 'বিসর্জ্জন' নাটক প্রথম প্রকাশিত হইল। ইতিমধ্যেই কবির প্রতি মহারাজ অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন। অবকাশ যাপনের জন্য বীরচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেই কবিকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া সঙ্গীতচর্চ্চা ও কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। বৈষয়িক বিষয়েও উভয়ের আলোচনা পরামর্শ সুরু হইল।

দেশীয় রাজ্য— কর্ণেল মহিম ঠাকুর

১৩০১ বঙ্গাব্দ — রবীন্দ্রজীবনীকারের মতে এই সনের "গ্রীষ্মকালে কয়েকদিনের জন্য কবি গেলেন কার্সিয়াং-এ।" কবির ভাষণাদি হইতে এবং কর্ণেল মহিম ঠাকুরের বর্ণনামত অবগত হওয়া যায় যে মহারাজ বীরচন্দ্র কবিকে সঙ্গে লইয়া কার্সিয়াং গমন করেন এবং কবি তাঁহার সঙ্গে তথায় কয়দিন অবস্থান করেন। এই শৈলনিবাসে অবকাশ যাপনের সময় কবি ও রাজার মধ্যে নিয়মিতভাবে সাহিত্য—বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্য দর্শন, কাব্য ও সঙ্গীতচর্চ্চা এবং অবসর বিনোদনকালে চিত্রকলা, ফটোগ্রাফী ইত্যাদির অনুশীলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ই বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের সামগ্রিক সঙ্কলন ও প্রকাশ সম্বন্ধে কবির সহিত বীরচন্দ্রের এক আলোচনার সূত্রপাত হয়। রাজপারিষদ মহিমচন্দ্র কার্সিয়াং-এর সুখস্মৃতির বিস্তৃত বিবরণ তদীয় "দেশীয় রাজ্য" গ্রন্থের "ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ( )।

'রবীন্দ্র জীবনী (২য় সংস্করণ) ১ম খণ্ড (৩০৩ পৃঃ)

দেশীয় রাজ্য— কর্ণেল মহিম চন্দ্র দেববর্ম্মা

১৩০৩ বঙ্গাব্দ — রবীন্দ্রনাথ মহারাজ বীরচন্দ্রের সহিত তাঁহার কার্সিয়াং গমন উপলক্ষে ১৩৩২সনে তদীয় ভাষণে বলিয়াছিলেন,

"সেই সময় বৈষ্ণব পদাবলী যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ ও প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল। কিন্তু তার পরই তাঁর সহসা মৃত্যু হওয়াতে সে সঙ্কল্প সফল হতে পারেনি।"

আগরতলায় কিশোর সাহিত্য সমাজে ভাষণ— রবি, রবীন্দ্র সম্মেলন সংখ্যা

(১) ও (২) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৩৪৮ সনে কবি শান্তিনিকেতেনে তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে বীরচন্দ্রের সহিত কার্সিয়াং-এ অবস্থান-স্মৃতি সম্পর্কে পুনরায় তদীয় ভাষণে বলিলেন,

ভারত-ভাস্কর পদবী গ্রহণের পর শান্তিনিকেতনে কবির ভাষণ

"তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল, লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার কবিতার অলঙ্কৃত সংস্করণ ছাপানো হবে। তখন তিনি ছিলেন কার্সিয়াং পাহাড়ে, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য। কলকাতায় ফিরে এসে অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।"

কার্সিয়াং-এ কবির দ্বিতীয়বার মহারাজ বীরচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রজীবনীতে (দ্বিতীয় সংস্করণ) কোনও উল্লেখ নাই। বিশেষ অনুসন্ধানে এবং যাবতীয় অবস্থাদি পর্য্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে রবীন্দ্রনাথ এই সনের মাঝামাঝি সময়ে পুনরায় কার্সিয়াং গমন করতঃ মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রজীবনীকারের সহিত সম্প্রতি পত্রব্যবহারে এই অনুমান সমর্থিত হইয়াছে। অল্পকাল মধ্যেই বীরচন্দ্রের অকস্মাৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি তথায় বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। এমতাবস্থায়ও কবির সহিত রাজার সাহিত্য, কাব্য এবং সঙ্গীতচর্চ্চার বিরাম ছিল না এবং এই সময়ই মহারাজ লক্ষমুদ্রা ব্যয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের সামগ্রিক সঙ্কলনের ও কবির কাব্য-গ্রন্থাদির অলঙ্কৃত সংস্করণ প্রকাশের এক উদার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বিশেষ অসুস্থতানিবন্ধন মহারাজকে কলিকাতায় চিকিৎসার্থ লইয়া আসা হইল কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র ২৭শে অগ্রহায়ণ লোকান্তরিত হইলেন।

মহারাজ রাধাকিশোর

দেশীয় রাজ্য— মহিম ঠাকুর

১৩০৩ বঙ্গাব্দ — যুবরাজ রাধাকিশোর ত্রিপুরার রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন এবং বর্ষশেষে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইল। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় পিতার দরবারে কদাচিৎ সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিলেও কবির সহিত রাধাকিশোরের ব্যক্তিগত পরিচয় সামান্যই ছিল। রাজ্যভার ন্যস্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই পারিবারিক নানারূপ জটিলতা, গৃহবিবাদ, রাজ্যের দাবিদারিতে মামলামোকদ্দমা এবং উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর অভাবে বিব্রত মহারাজ কবির সহিত সখ্য ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে অগ্রণী হইলেন। কবিও ন্যায় এবং ধর্ম্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই, অধিকন্তু মহারাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

১৩০৪ বঙ্গাব্দ — সমসাময়িক পুরাতন পত্রাদি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ মহারাজের বৈষয়িক বিবিধ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হইয়াও সুপরামর্শদান এবং রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পরিচয় স্থাপনে যোগাযোগ করিয়া

রাজ্যের অশেষ কল্যাণকর কার্য্যে সহায়ক হইয়াছিলেন। অনেকস্থলে কবির মাধ্যমে বাংলার শীর্ষস্থানীয় সুধী ও নেতৃবর্গের সহিত ত্রিপুরেশ্বর অচিরেই পরিচিত হইলেন।

এ বছরের একটি চিঠিতে অবগত হওয়া যায় যে কবির সহিত রাজার ফটোগ্রাফ-বিনিময়ও হইয়া গিয়াছে। কবির এই ফটোগ্রাফ আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসে নাই।

১৩০৫ বঙ্গাব্দ — রাজশাহীর অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের বয়ন প্রতিষ্ঠান হইতে সংগৃহীত সাদা রেশমের থান কবি কর্ত্তৃক একদা "স্বদেশের উপহার" স্বরূপ রাজসকাশে প্রেরিত হইল। মৈত্রেয় মহাশয় তখন "ঐতিহাসিক চিত্র" কার্য্যালয় চালাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরের যোগাযোগ কবির মাধ্যমেই স্থাপিত হইল।

বঙ্গদেশের বিদগ্ধ সমাজের খ্যাতিমানদের প্রায় সকলের সঙ্গে এবং বাংলার সাহিত্যসেবীদের অনেকের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরিচয় এই সময়ে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগের মধ্যে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, আশুতোষ চৌধুরী, জগদীশচন্দ্র বসু, নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, রাসবিহারী ঘোষ, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, দ্বারবঙ্গের মহারাজা, কুচবিহারাধিপতি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, নির্ম্মলচন্দ্র সেন, তারকনাথ পালিত, লোকেন্দ্র পালিত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, আনন্দমোহন বসু, মহাত্মা শিশিরকুমার, মতিলাল ঘোষ, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সকল পরিচয় দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধুতায় পরিণত হয় এবং এঁদের অনেকের সঙ্গেই মহারাজের রীতিমত চিঠিপত্র বিনিময়ও হইত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বহু অনুসন্ধানেও এযাবৎ এসকল বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের চিঠিপত্র পাওয়া যায় নাই যাহা এককালে বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষিত হইত। সমসাময়িক রাজকর্ম্মচারী ও পারিষদবর্গের অল্পসংখ্যক চিঠিপত্র হইতেই এখনও বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

কার্ত্তিকমাসে কলিকাতা হইতে মহারাজের নিকট মহিম ঠাকুরের লিখিত একটি পত্রে দেখা যায় যে রাজ্যের দাবিদারি লইয়া বড়ঠাকুর সমরেন্দ্রচন্দ্রের বিবাদ উপলক্ষে[১] রাজার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধ কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কবির সঙ্গে পরামর্শ প্রসঙ্গে দরবার হইতে প্রেরিত তদ্বিরকারক রাজপুরুষ মহিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন,

---

(১) সংসৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ও মহারাজ রাধাকিশোর সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মহারাজ রাধা-
কিশোরকে লিখিত,
মহিম ঠাকুরের
১৭ কার্ত্তিক
১৩০৫ বাং এর পত্র

"সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজার প্রতি অবজ্ঞার পাপ কোনমতেই প্রশ্রয় পাওয়া উচিত নহে। পৃথিবীতে জন্মিয়া সকলেই রাজা হয় না কিন্তু রাজভক্ত হইবার অধিকার সকলেরই আছে।"

মহিম ঠাকুরকে
লিখিত কবির পত্র,
পূর্ব্বাশা—
রবীন্দ্রস্মৃতি
সংখ্যা, ১৩৪৮

মহারাজ রাধাকিশোর স্বয়ং ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। মহিমঠাকুরের প্রণীত "দেশীয় রাজা" গ্রন্থপাঠে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা পাঠে কবি হেমচন্দ্রের দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইয়া মহারাজ রাধাকিশোর স্বেচ্ছায় রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে অন্ধকবির জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশ উপলক্ষে পিতা মহারাজ বীরচন্দ্রের উদার সাহায্যপুষ্ট সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেনের আজীবনকাল মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থাও ত্রিপুরা হইতে আদিষ্ট হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য পত্রেই তাহার বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে। দীনেশচন্দ্র তাঁহার শেষজীবনে প্রকাশিত "বৃহৎ বঙ্গ" গ্রন্থ মহারাজ বীরবিক্রমকিশোরকে উৎসর্গ করিবার কালে সকৃতজ্ঞভাবে ও উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়াছেন,

বঙ্গভাষা ও
সাহিত্য—

রায় বাহাদুর
দীনেশচন্দ্র সেন
(১ম ও ২য়
সংস্করণের ভূমিকা)
এবং ঐ গ্রন্থকারের প্রণীত
বৃহৎ বঙ্গ পুস্তকের
উৎসর্গ পত্র

"আমার প্রথম গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এবং (সম্ভবতঃ) এই শেষ গ্রন্থ 'বৃহৎ বঙ্গ' ত্রিপুরেশ্বরদ্বয়ের সঙ্গে সংযোজিত করিতে পারিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। আমার সাহিত্যিক জীবনের উদয়-অস্ত ত্রিপুর সিংহাসনের উৎসাহ ও আনুকূল্যের রশ্মিপাতে বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।"

Progressive
Tripura-A.C.
Bhattacharyya

এস্থলেই উল্লেখ করা যায় যে পরবর্ত্তী সময়ে (১৩১৪ সালে) রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে অনুপ্রাণিত হইয়াই মহারাজ রাধাকিশোর জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ-কর্ত্তৃক যাদবপুরে স্থাপিত বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট পরিদর্শন করিয়া ঐ বিদ্যায়তনে এককালীন অর্থসাহায্য এবং রাজ্য হইতে বার্ষিক অর্থবরাদ্দের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রাধাকিশোরের
অপ্রকাশিত পত্র,
২ আশ্বিন,
১৩০৯ ত্রিং
(১৩০৬) পরিশিষ্ট

১৩০৬ বঙ্গাব্দ — এই বৎসরের মাঝামাঝি (আশ্বিন) কবির দার্জ্জিলিং গমনের সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া মহারাজ কবিকে তাঁহার সঙ্গে তথায় অবস্থানের আমন্ত্রণ করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিতও যে রাধাকিশোরের পত্রব্যবহার চলিত তাহা এই পত্রেই অবগত হওয়া যায়। মহারাজের এবারের প্রবাসযাত্রায় গোয়ালন্দের পথে বিষম ঝড়ের কারণে পথের প্রোগ্রাম বিপর্য্যস্ত হয়। কবির নিকট রাধাকিশোরের পরবর্ত্তী বৎসরের ১৪ই বৈশাখের লিখিত পত্রেও পথের এই "বিতিকিচ্ছে বাধা"র কথার উল্লেখ পাই।

দেশীয় রাজ্য—
মহিম ঠাকুর

পৌষ মাসে মহারাজ কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণাদি বিষয়ে গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এবং কবির সঙ্গে তদীয় কাজ সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা হইয়া থাকিলেও রাজার সঙ্গে আচার্য্যদেবের এযাবৎ সাক্ষাৎ পরিচয়

হয় নাই। এবার সে সুযোগ সংঘটিত হইল। কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাগারে আচার্য্যদেবের আয়োজিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি দেখিবার জন্য একটি অনুষ্ঠানে বিনা নিমন্ত্রণেই একদা মহারাজ রাধাকিশোর তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেরই বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সেখানেই কবির মাধ্যমে মহারাজার সহিত বৈজ্ঞানিকের সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হইল। "দেশীয় রাজ্য" গ্রন্থে তৎকালীন Englishman (March 12, 1918) পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণসহ এই ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। শারদীয়া দেশ, ১৩৫৯—শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী সেন লিখিত প্রবন্ধ

মহারাজ রাধাকিশোরের কলিকাতায় অবস্থানকালেই (১৩০৬) জগদীশচন্দ্রের জন্য একটি নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপন উপলক্ষে প্রয়োজনীয় কুড়ি হাজার টাকার মধ্যে অর্দ্ধাংশ ত্রিপুরাদরবার হইতে সংগ্রহ করতঃ অবশিষ্টাংশ দেশবাসী হইতে চাঁদা তুলিয়া আদায় করিবার একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব লইয়া রবীন্দ্রনাথ রাজসকাশে উপস্থিত হইলে মহারাজ বলিলেন, চিঠিপত্র—৬ষ্ঠ খণ্ড (১২৬-২৭ পৃঃ)

> "এ বেশ আপনার সাজে না, আপনার বাঁশী বাজানই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দে ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব। প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমার রাজভোগ যোগায় — আমাদের অপেক্ষা জগতে কে আর বড় ভিক্ষুক আছে?"

নীরবদাতা রাধাকিশোর যে এতদুপলক্ষে অধিকাংশ পরিমাণ অর্থানুকূল্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন তৎসম্বন্ধে বিন্দু মাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। পরবর্ত্তী সময়ের লিখিত চিঠিপত্রেও ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আচার্য্যদেবের বিলাত যাত্রার পাথেয় ও অন্যবিধ ব্যয়নির্ব্বাহ উপলক্ষে মহারাজ পরবর্ত্তী সময়ে বারম্বার অর্থসাহায্য প্রেরণ করেন কবিরই মাধ্যমে — তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। অনেকানেক উদার দানের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না, কারণ মহানুভব মহারাজ রাধাকিশোর এই সকল নীরবদান তাঁহার ব্যক্তিগত 'নিজ তহবিল' হইতেই নির্ব্বাহ করিতেন — রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ব্যয়ের বাজেটে অথবা সরকারী রাজকোষের সঙ্গে এই সকল দানের কোন সম্পর্কই ছিল না।

বসন্তসমাগমে (১৩০৬), সম্ভবতঃ শ্রীপঞ্চমীর সময়, মহারাজের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় সর্ব্বপ্রথম আগমন করেন এবং রাজ-অতিথিরূপে কর্ণেল মহিম ঠাকুরের জন্য নব- রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড

---

(১) অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে একটি প্রশ্নের আলোচনা করিতে হইল। কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মার "দেশীয় রাজ্য" গ্রন্থভুক্ত "ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ" এবং "ত্রিপুরা-প্রসঙ্গ" প্রবন্ধ দুইটি রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা সম্পর্কে অনেকখানি আলোকপাত করে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধটি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হইল। মহিমচন্দ্রের এই আলোচনাগুলিই ত্রিপুরায় রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ অনুশীলনের অন্যতম উৎস বলিলেও অত্যুক্তি হয়

দেশীয় রাজ্য—
মহিম ঠাকুর

নির্ম্মিত গৃহে অবস্থান করেন।(১) উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের নির্ম্মাণ-কার্য্য তখনও চলিতেছে। কবির শুভাগমন উপলক্ষে সহরের উপকণ্ঠস্থ পুরান কুঞ্জবনের শৈলশিরে কবির সম্মানে বসন্তোৎসবের ও মণিপুরী নৃত্যগীতাদির মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আয়োজিত হইল।

যুবরাজ ও রাজকুমারগণের শিক্ষক-নির্ব্বাচনকার্য্য কবির সহিত আলোচনায় অগ্রসর হইতেছিল যাহার ফলে কবির এবং আচার্য্য বসুর মনোনয়নে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক নগেন্দ্র নাগ, মোক্ষদাকুমার বসু ইত্যাদি যুবরাজের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। মোক্ষদা বাবুর শিক্ষাদানের রীতি ছিল রবীন্দ্রনাথেরই অনুরূপ। বিবিধ সদ্‌গুণ দ্বারা তিনি শিক্ষার্থী রাজকুমারগণের যে অপরিসীম শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা ষাট বছর পরে আজও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। মোক্ষদা বাবু যে পদ্ধতিতে আর্নল্ডের Light of Asia প্রভৃতি গ্রন্থ পড়াইয়াছিলেন তাহা আলোচনা করিতে তিনি আজও অভিভূত হইয়া পড়েন।

মহিম ঠাকুরের মহারাজের নিকট লিখিত সমকালীন পত্র

ত্রিপুরায় অবস্থানকালে অন্যবিধ আলোচনার মধ্যে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, আচার্য্যদেবের গবেষণা উপলক্ষে সহায়তার উপায় নির্দ্ধারণ, সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ ইত্যাদির প্রসঙ্গও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সখা মহারাজের বৈষয়িক ও রাজ্যশাসন সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয়ের ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ তখন ক্রমেই জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। একদিকে বন্ধুপ্রীতি ও ত্রিপুরাকে আদর্শ দেশীয় রাজ্যরূপে পরিণত করিবার জন্য কবির আগ্রহ, এবং অপরদিকে চক্রান্তকারীদের জটাজালের বন্ধন হইতে বন্ধু মহারাজকে মুক্ত রাখিবার তীব্র কর্ত্তব্যবোধ কবিচিত্তকে ক্রমেই ব্যাকুল করিল। কতক রাজকর্ম্মচারী ও পারিষদগণের বিরুদ্ধাচরণ উপেক্ষা করিয়াও তিনি রাজ্যেশ্বরকে এবং রাজকুমারগণকে, বিশেষতঃ মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে, ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী জীবনগঠনের সদুপদেশদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রবন্ধগুলিতে মহিমচন্দ্র কবির বারম্বার আগরতলায় আগমন সংসৃষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী অতি অল্পই নিবদ্ধ করিয়াছেন। আগরতলার তুলনায় বাহিরের কথাই বেশী পাই। এমন কি, কবি যে রাজ-আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক মহিমচন্দ্রের গৃহেই প্রথমবার আগরতলায় অবস্থান করিয়া গেলেন, তদীয় গ্রন্থে ইহারও কোন উল্লেখ নাই। এই স্বল্পোল্লেখের কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে এই প্রবন্ধগুলি ৩০/৪০ বৎসর পূর্ব্বে আগরতলায় সাহিত্য সভার জন্য সাময়িক প্রয়োজনে রচিত হইয়াছিল। স্থানীয় ঘটনাদি স্বস্থানে সকলেরই স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মহিমচন্দ্র ত্রিপুরার বাহিরের ঘটনাবলীর উপরই সমধিক জোর দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শেষবার যখন আগরতলায় আগমন করেন, বন্ধু মহিমচন্দ্র তখন পরলোকে। তাঁহার মৃত্যুর পর পিতার লিখিত নানাবিধ প্রবন্ধ তৎপুত্রকর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া ''দেশীয় রাজ্য'' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

মহারাজের সম্মতি গ্রহণান্তে কবি তাঁহার 'কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ রাধাকিশোর দেব মাণিক্যের করকমলে 'সাদরে' উৎসর্গ করিলেন — ২০শে ফাল্গুন। মহারাজের চিঠিতে দেখিতে পাই, কবিকে লিখিতেছেন, রাধাকিশোরের পত্র, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩০৬

"কাহিনী গ্রন্থের সহিত আমার নাম সংশ্রব রাখিতে আপনি ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহাতে আমার অমত হইতে পারে কি? ছাপা হইবামাত্র ১০/১২ কপি পাঠাইয়া সুখী করিবেন। এখানকার বন্ধুবান্ধবদিগকে বিতরণ করিব।"

জগদীশচন্দ্রের নিজস্ব গবেষণাগার স্থাপনোপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্য প্রেরণের বিষয়ে ইঙ্গিত উপরোক্ত পত্রেই স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। একই পত্রে মহারাজ যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের শুভ-বিবাহ উপলক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী, জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন, যদিও ঐ সময় ইঁহাদের কেহই, এমন কি কবিও, উপস্থিত হইতে পারেন নাই। জগদীশচন্দ্রের প্রসঙ্গে মহারাজ বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেন,

"জগদীশবাবুর বিজ্ঞানশালা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আমার স্মরণ আছে। ভরসা করি, উক্ত শুভ ব্যাপারে আপনি ত নিশ্চয়ই আসিবেন, সেই সময় আপনার সহিত আলাপ করিয়া যাহা সাব্যস্ত হয় সেরূপ করিতে প্রস্তুত রহিলাম। জগদীশ্বর সমীপে যাচিঞা করি জগদীশবাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ভারতের মহিমা বৃদ্ধি করুন।"

স্বাক্ষর করিয়াছেন, "নিয়ত আপনার শ্রীরাধাকিশোর।"

"কাহিনী" কাব্যগ্রন্থের প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া মহারাজ কবিকে লিখিতেছেন, কবিকে লিখিত রাধাকিশোরের ২১শে চৈত্র ও পরবর্ত্তী ১৪ই বৈশাখের দুইটি পত্র

"কবিতার গাম্ভীর্য্যরক্ষা বিষয়ে আপনি সিদ্ধহস্ত। অথবা ইহা আপনার স্বাভাবিক শক্তির নৈপুণ্য।"

এ সময়ে কবির অনুরোধে কর্ণেল মহিম ঠাকুর কিছুদিনের জন্য শিলাইদহে গমন করিয়া তাঁহার সহিত অবস্থান করেন। জগদীশচন্দ্র, লোকেন্দ্র পালিত, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহারাও তখন শিলাইদহে অতিথি। মহিমচন্দ্রকে প্রেরণের অনুমতিপ্রদান প্রসঙ্গে কবির এবং তদুত্তরে রাধাকিশোরের কৌতুক-পরিহাসপূর্ণ চিঠিগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য। কর্ণেল মহিমচন্দ্রকে 'পাঁচ হাতিয়ার' (ক্যামেরা, বন্দুক ইত্যাদি) সহ শিলাইদহে গমনের অনুমতি প্রদত্ত হইল। সাহিত্যিক সেনানায়কটির সম্বন্ধে লঘু পরিহাস করিয়া মহারাজ লিখিলেন,

"মহিম শীঘ্রই আপনার হুকুম তামিল করিবে। * * সঙ্গে ক্যামারা, বন্দুক ইত্যাদি আরো কত কি কি আছে। ইংরেজ গোরা সিপাইদের ন্যায় মানুষ শিকার না করে এই ভয়। * * মহিম নাকি গান টান এমনি কিছু রচনা করে * * সেগুলি আপনি উশুল করিতে পারেন কি? * * এখানে যথারীতি ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এবার বোধ হয় বর্ষার ঘোটকে আগমন। ফল কি হয় বলিতে পারি না। ছোট ছোট আম্রগুলির দফা রফা হইয়াছে। চাটনী বা টক খাইবারও রহিল না।"

মহারাজ রাধা-কিশোরের ১৪ই বৈশাখ ও কবির ২১শে বৈশাখের পত্র (১৩০৭)— পরিশিষ্ট

শিলাইদহে রবীন্দ্র বাবু—সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩০৭ হইতে সাহিত্যের খবর বৈশাখ, ১৩০৮ রবীন্দ্র-সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত

My Rabindranath Calcutta Municipal Gazette- Tagore Birthday Special supplement 1941

রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা (Footnote)

১৩০৭ বঙ্গাব্দ — মহিমচন্দ্র শিলাইদহ হইতে বৎসরের গোড়ার দিকেই আগরতলা ফিরিলেন। সঙ্গে আসিলেন যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। ইনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু ও সাহিত্যের সঙ্গী কবি অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের জামাতা। কবি অক্ষয় চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "বাল্য-বয়সের সাহিত্য-শিক্ষাদাতা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নির্ব্বাচনে বসু মহাশয় বৈশাখ মাসের শেষভাগে যুবরাজের সহচর শিক্ষক ও সহযোগী একান্তসচিব নিযুক্ত হইলেন। তৎপত্নীও সুশিক্ষিতা এবং কৃষ্টিসম্পন্না বলিয়া যুবরাজ্ঞীর সহচরীরূপে নিয়োজিতা হইলেন। সুশিক্ষিত, সুলেখক, চিত্রকর, স্থাপত্যবিজ্ঞানী, সঙ্গীতজ্ঞ ও বহুগুণে বিভূষিত যতীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা-দরবারে বহুবৎসর প্রতিষ্ঠার সহিত কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন। তৎকালীন সমসাময়িক পত্রে যতীন্দ্রনাথের রচিত দুইটি প্রবন্ধ "শিলাইদহে রবীন্দ্রবাবু" এবং "My Rabindranath - An Introspection" সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। প্রথমোক্ত নিবন্ধটি বসু মহাশয় ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে রচনা করেন। ইহাতে শিলাইদহ কুঠিবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অতি সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে। রবীন্দ্র-জীবনীতে ইহার রচনাকাল জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে বলিয়া সূচিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যতীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গমন করেন বৈশাখ মাসে। নিবন্ধটিতেই সময়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-পরিচয়ের উপলক্ষে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে তাঁহার শ্বশ্রূমাতা বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা শরৎকুমারী চৌধুরাণীও ত্রিপুরায় বহুকাল অবস্থান করিয়া রাজ-অন্দরমহলে ও বাহিরের জনসমাজে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরা ছাড়িবার দীর্ঘকাল পরেও শরৎকুমারী মহারাজকে একপত্রে লিখিয়াছেন,

শরৎকুমারীর অপ্রকাশিত পত্র হইতে সংগৃহীত

> "ত্রিপুরার দিনের কথা যেন চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে ভাসিতেছে। মহারাজ, ত্রিপুরায় যেমন সুখে ছিলাম ছাড়িয়া আসিতেও তেমনি বেদনা পাইতে হইয়াছিল।"

শরৎকুমারীকেই রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "লাহোরিণী", "চৌধুরাণী" ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিতা করিতেন।

আগরতলায় সমকালীন অনেকের নিকট এখনও কণ্ঠসঙ্গীতে পারদর্শী যতী বাবুর গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' ইত্যাদি বহুশ্রুত গানের রেশ মনে লাগিয়া আছে। এককালে তাঁহার গাওয়া কয়েকটি পল্লীগীতি (রেকর্ড সংগীত) সারা বাংলায় বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল বলিয়া আমরা শুনিয়াছি।

রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, ৩৬৪ পৃঃ

রবীন্দ্রজীবনী অনুসারে কবি জ্যৈষ্ঠের গোড়ার দিকে দিন দশেকের জন্য ত্রিপুরার মহারাজের আমন্ত্রণে দার্জ্জিলিং গমন করেন ও তথায়

আনন্দমোহন বসুর কন্যার সঙ্গে অবস্থান করেন 'আনান্দেল হাউসে'। রাধাকিশোরের ১৪ই বৈশাখের পত্রেও (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এই দার্জ্জিলিং সফর এবং কবিকে তথায় আমন্ত্রণ সূচিত হইতেছে। দার্জ্জিলিংএ কবি ও রাজার মধ্যে এবারের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে প্রধান ছিল, জগদীশচন্দ্রের বিদেশগমন উপলক্ষে অর্থসংগ্রহ, যুবরাজ ও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় এবং রাজ্যের সুপরিচালনার ব্যবস্থা। ইংরেজ সরকারের অভিপ্রেত আজমীরের রাজকুমার কলেজে ত্রিপুরার রাজকুমারগণকে প্রেরণের বিপক্ষে কবি ও রাজা একমত হইলেন। এমতাবস্থায় সকল দিক রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণ সম্পর্কে কবি মহারাজকে স্বাধীন ও দৃঢ়যুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিলেন।

রাধাকিশোরের পত্র, ১৪ বৈশাখ ১৩১০ ত্রিং (১৩০৭)

ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখিত পত্র, প্রবাসী, ১৩৪৮

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এ বৎসর আষাঢ় মাসে বিদেশযাত্রা করেন। তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বেই পাথেয়াদি এবং বিলাতে গবেষণাদি কার্য্যে ও তথায় অবস্থিতির ব্যয় বাবদ মহারাজ রাধাকিশোর কবির হস্তে পনেরো হাজার টাকার চেক প্রদান করিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৬ পৃঃ

"বিষয়টা কী শুনে তিনি (মহারাজ) ঈষৎ হেসে বললেন, 'জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিনে; আমি যা দেব, সে আপনাকেই দেব, আপনি তা নিয়ে কী করবেন আমার জানবার দরকার নেই।' আমার হাতে দিলেন পনেরো হাজার টাকার চেক, সেই টাকা আমি আচার্য্যের পাথেয়ের অন্তর্গত করে দিয়েছি। সেদিন আমার অসামর্থ্যের সময় যে বন্ধুকৃত্য করতে পেরেছিলুম সে আর এক বন্ধুর প্রসাদে।"

আচার্য্য বসুর মৃত্যু উপলক্ষ্যে কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি

অগ্রহায়ণ মাস (১৩০৭)। জগদীশচন্দ্র বিলাতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্ববিধ সহায়তার জন্য মহারাজের ব্যাকুলতার বিষয় কবির সহিত আলোচনা হইল। কবি জগদীশচন্দ্রকে লিখিতেছেন,

"ত্রিপুরার মহারাজ এখন কলকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কি রকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বলব! বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে শ্রদ্ধা করেন এতেই তিনি বিশেষরূপে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেছেন। * * * তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কোনরূপে তোমাকে সহায়তা করবার জন্য তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন।"

চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড (৬নং পত্র)

পৌষমাসে কলিকাতায় পার্কষ্ট্রীটে অবস্থিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে 'ভারত-সঙ্গীত-সমাজ' কর্ত্তৃক মহারাজ রাধাকিশোরের সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। এই সম্বর্দ্ধনায় উদ্বোধনী সংগীত "রাজ-অধিরাজ তব ভালে জয়মালা, ত্রিপুর-পুরলক্ষ্মী বহে তব বরণডালা" রবীন্দ্রনাথ রচনা করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক ইহাতে খাম্বাজের সুর সংযোজিত হইল। সুকবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ভাষায় "মহারাজ

রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড

চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড (পরিশিষ্ট)

রবীন্দ্রনাথ ও যুগ সাহিত্য— যতীন্দ্রমোহন বাগচী

দেশীয় রাজ্য— মহিম ঠাকুর

রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা

সুযোগ্য ভাবে ও ভাষায় অভিনন্দনের যথোচিত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।" তৎপর ঐ সঙ্গীত-সমাজ কর্ত্তৃক অভিনীত "বিসর্জ্জন" নাট্যানুষ্ঠানে কবি স্বয়ং রঘুপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। এই ভূমিকায় কবির অনন্যসাধারণ অভিনয়ের বিস্তারিত বিবরণ যতীন্দ্রমোহনের গ্রন্থে জীবন্তরূপে বিবৃত হইয়াছে। 'ঘরোয়া'তে অবনীন্দ্রনাথ বর্ণিত 'বিসর্জ্জনে'র এই বিশেষ অভিনয়টি পরবর্ত্তী সময়ের বলিয়া অনুমিত হয়।

১৩০৮ বঙ্গাব্দ — পারিবারিক ও সাংসারিক নানা বিষয়ে ক্লিষ্ট কবি বৈশাখের শেষভাগে কিছুকালের জন্য দার্জ্জিলিং গমনকরতঃ মহারাজ রাধাকিশোরের আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। মহারাজ ১৪ই বৈশাখের পত্রে কবিকে লিখিতেছেন।

> "২৩শে তারিখ সোমবার এখান হইতে যাত্রা করিব। মঙ্গলবার বিকাল অনুমান ৪।। টার সময় কুষ্টিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিব। তথা হইতে একত্রে যাইতে পারি। দার্জ্জিলিংএ আমাদের জন্য যে বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে তাহাতে আমাদের সকলেরই সঙ্কুলান হইবে।"

রাধাকিশোরের পত্র, ১৪ বৈশাখ, ১৩১১ ত্রিপুরাব্দ (১৩০৮)— পরিশিষ্ট

একই পত্রে অন্যত্র লিখিতেছেন,

> "হিমালয়ের মহান সৌন্দর্য্যের সহিত আপনার কবিতা ও সংগীত সংযোগে আমার অবসরকালের বিশ্রাম কত যে মধুময় হইবে তাহাই ভাবিয়া উৎসাহিত আছি। আপনার কবিতার খাতা ও দুই একখানা বই সঙ্গে লইবেন। আমিও দু'চারখানা সঙ্গে আনিতেছি। যাহা হৌক এক্ষণে গৃহিণীঠাকুরাণী আপনার আরজ মঞ্জুর করিলেই হয়।"

বসন্তকুমার গুপ্তকে কবি লিখিত ১২ই ও ১৯শে বৈশাখের (১৩০৮) পত্র— পরিশিষ্ট

স্বর্গীয় বসন্তকুমার গুপ্তকে কবির ১৩০৮ সালের ১২ই এবং ১৯শে বৈশাখ তারিখে লিখিত দুইটি পত্রেও (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) মহারাজের সঙ্গেই এইবার কবির দার্জ্জিলিং গমনের উল্লেখ আছে। দার্জ্জিলিং অবস্থানকালেই কবিকন্যা মাধুরীলতার (বেলা) বিবাহ স্থিরীকৃত হওয়ায় কবিকে অত্যল্পকাল মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। এস্থলে উল্লেখ করা যায় যে ১৯শে বৈশাখ তারিখের আলোচ্য চিঠিখানা এযাবৎ ১৩০৭ সালের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে (রঃ জীঃ ১ম খণ্ড, ৩৬৪ পৃঃ) ইহা প্রকৃতপক্ষে ১৩০৮ সালের পত্র। বসন্তবাবু সম্বন্ধে এখানেই উল্লেখ করা যায় যে ইনি কবিরই মনোনয়নে বৎসরাধিককাল পর রাজকুমারীগণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া ত্রিপুরায় আগমন করেন ও রাজ্যের শিক্ষাবিভাগে সুদীর্ঘকাল সততারসহিত কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। বাল্যজীবনে গুপ্ত মহাশয় বলেন্দ্রনাথের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

এসময়ে বঙ্গদর্শন পত্রিকার পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধেও মহারাজের সহিত কবির আলোচনা হইল এবং এতদুপলক্ষে কবি রাজার অর্থ-সাহায্যের আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে উপরোক্ত চিঠিতেই মহারাজ কবিকে লিখিয়াছিলেন,

মহিমঠাকুরকে লিখিত পত্র, পূর্ব্বাশা, রবীন্দ্র স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৪৮

"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রকাশের সংবাদ অতি সুসংবাদ। * * * আপনি অগৌণে এবং অবিচারিত চিত্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করুন এবং আমাকে কি কি করিতে হইবে বলুন। আমি সর্ব্বতোভাবে ইহার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।"

দার্জ্জিলিং-এ অবস্থানকালে যুবরাজ ও মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রমুখ রাজকুমারগণের গৃহশিক্ষক বিলাত হইতে নির্ব্বাচন করা সম্বন্ধেও রাজার অভিপ্রায়ানুসারে রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে পত্র লিখিলেন। এদিকে কুচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গেও ইতিপূর্ব্বেই কবির মাধ্যমে ও ব্যবস্থায় রাধাকিশোরের সাক্ষাৎ পরিচয় এবং যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। এই সমবেত চেষ্টার ফলেই বিলাত হইতে শিক্ষাবিদ্ মিঃ টি, আর, উইলিয়াম্‌স্ যুবরাজের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড (১০নং পত্র)

বিলাতে জগদীশচন্দ্রের গৌরবময় সাফল্যের সংবাদে কবির আনন্দের সীমা নাই। এক পত্রে বসুজায়াকে লিখিতেছেন,

ঐ

"আপনি ধন্য। আমরাও দূরে থাকিয়া তাঁহার বন্ধুত্বে ধন্য। *** আমি সকলকে জয় সংবাদ জানাইয়া বেড়াইতেছি। ত্রিপুরার মহারাজকেও কাল টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছি।"

অবলা বসুকে লিখিত পত্র (১নং পত্র)

আষাঢ় মাসের গোড়ার দিকে কবিকন্যা মাধুরীলতার (বেলা) শুভ-বিবাহ উপলক্ষে মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া প্রতিনিধিরূপে কর্ণেল মহিম ঠাকুরকে শুভানুষ্ঠানে প্রেরণ করিলেন। বিবাহান্তে কন্যাকে মজঃফরপুর তাঁহার পতিগৃহে পৌঁছাইয়া দিবার প্রাক্‌কালে কবি জোড়াসাঁকো হইতে মহারাজকে মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত রাজধর্ম্ম প্রসঙ্গ আলোচনাপূর্ব্বক একটি সুদীর্ঘ পত্র লিখিলেন,

"আমাদের রাজার রাজত্ব কর্ত্তব্যের অধিকার, ঐশ্বর্য্যের অধিকার নহে — প্রাচীন বয়সে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনের প্রথার দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। * * * য়ুরোপে রাজত্বই রাজার সমস্ত। প্রাচীন ভারতে ভোগ এবং ক্ষমতার হিসাবে না দেখিয়া রাজত্বকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য হিসাবে দেখা হইত। নিজের ঐশ্বর্য্যকে নহে, পরন্তু সমাজবিহিত ধর্ম্মকে সকলপ্রকার আক্রমণ ও ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই রাজা দুর্ভর রাজদণ্ডভার গ্রহণ করিতেন। সম্প্রতি বিদেশী সম্রাট ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আছেন বলিয়াই স্বদেশী সমাজের আদর্শ উন্নত ও সবল করিয়া রাখা দেশীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে দ্বিগুণতর কর্ত্তব্য হইয়াছে।"

কবির সন তারিখ বিহীন পত্র— বিশ্বভারতী পত্রিকা আশ্বিন, ১৩৪৯

বেলার বিবাহানুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্বকারী রাজপ্রতিনিধি মহিম ঠাকুরের ত্রিপুরায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে, সম্ভবতঃ সামাজিকতার নিদর্শন-স্বরূপ, কিছু মিষ্টদ্রব্যাদি ও ফল প্রেরিত হইয়াছিল। সেজন্যই, অথবা রাষ্ট্রদর্শন-সম্পর্কিত নিরেট উপদেশের বটিকাটিকে মধুরতর রসের দ্বারা মণ্ডিত করিবার জন্য আলোচ্য চিঠিরই মধুর সমাপন দেখিতে পাই,

"শ খানেক আম ও মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছিলাম, মহারাজের ভোগে আসিয়াছে কি?"

কবিচরিত্রের চিরপরিচিত বৈশিষ্ট্যের কী অপরূপ অভিব্যঞ্জনার নিদর্শন!

মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কুমিল্লায় তাঁহার শিক্ষার সাময়িক একটা ব্যবস্থা হইল। এই গোজামিল ব্যবস্থা কাহারও মনঃপুত না হওয়ায় কবি তাঁহার ১৮ই শ্রাবণের পত্রে মহারাজকুমারকে লিখিতেছেন,

প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৮

"লক্ষ্মীবান পুরুষেরা নিজে সদাশয় হইলেও ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিদের দ্বারা এমন পরিবেষ্টিত যে ইচ্ছা করিলেও তাহাদের শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।"

রবীন্দ্রস্মৃতি—পূর্ব্বাশা

জগদীশচন্দ্রের জন্য আশু-সাহায্যের আবশ্যকতায় এবং বঙ্গদর্শন প্রকাশনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের মন অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন। ত্রিপুরায় কতিপয় রাজপুরুষ এবিষয়ে প্রতিকূল ভাব পোষণ করেন এবং মহারাজের ঔদার্য্যকেও আচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন — ইহা কবিচিত্তকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছিল। কর্ণেল মহিমচন্দ্রের নিকট আষাঢ়ের শেষ কিম্বা শ্রাবণের গোড়ার দিকে একটি বিস্তারিত পত্রে কবি তাঁহার মনোভাব অকপটে এবং দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিলেন। নানারকম প্রতিকূল অবস্থাদি উপেক্ষা করিয়াও রবীন্দ্রনাথ ২৪শে শ্রাবণ (১৩০৮) মহারাজকে এক সুদীর্ঘ (৬০০ শব্দ সম্বলিত) পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। কবি লিখিতেছেন,

চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৯ পৃঃ ও বিশ্বভারতী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩৪৯

"মহারাজের সহিত আমি এমন কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না যাহাতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির অপবাদ দিতে পারে। * * * কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন মহৎ কর্ম্মের মূল্য থাকে না — আমার যতদূর সাধ্য আছে বঙ্গদর্শন পরিচালনায় তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গৌরব লাভ করিব।"

বঙ্গদর্শনের আদর্শ সম্বন্ধে লিখিতেছেন,

"য়ুরোপীয় সভ্যতায় যাহাকে ন্যাশনাল মহত্ত্ব বলে তাহাই মহত্ত্বের আদর্শ নহে। আমাদের বিপুল সামাজিক আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও উচ্চ ছিল। এই আদর্শকে যদি জড়ত্ববশত আমরা নষ্ট হইতে দেই তবে য়ুরোপীয় মতে নেশন্‌ও হইব না অথচ আত্মপ্রকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল হইব।

জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে বলিতেছেন,

> "মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। জগদীশ বাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক — এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত। ...... আমি মহারাজের নির্জ্জন খাস দরবারের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশী — আমি মহারাজের প্রতি নিতান্তই উপদ্রব করিব, মন্ত্রীবর্গ দ্বারা আমি প্রতিহত হইব না।"

দেশের ও দশের বৃহত্তর সেবার ক্ষেত্রে এবং জীবনাদর্শ রূপায়ণের বন্ধুরপথে কবির কী কঠোর ও বিচিত্র সাধনা! এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সম্বলিত সুদীর্ঘ পত্রটি বন্ধু মহারাজের কাছে কবি লিখিলেন কোন্ দিন, কোন্ সময় ও কি অবস্থায়? চিঠির শেষের দুইটি লাইনেই সমকালীন বাস্তব পটভূমির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়া আরো বিস্ময় লাগে! বন্ধুকে লিখিতেছেন,

> "আজ আমার মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী রেণুকার বিবাহ। পাত্রটি মনের মত হওয়ায় দুই তিন দিনের মধ্যেই বিবাহ স্থির করিয়াছি। ঠিক দিনেই মহিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ...."

চিঠি শেষ করিয়াও সখা মহারাজের প্রতি অনুরাগের স্পর্শ সর্ব্বশেষে পুনরায় বুলাইয়া দিলেন, পুনশ্চ করিয়া —

> "ডাকযোগে একটি ইংরেজী কাগজ পাঠাইতেছি, তাহাতে প্যারিসের কয়েকজন সুবিখ্যাত শিল্পীর সোনার কাজের নকসা দেখিতে পাইবেন।"

মুখ্যতঃ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিদেশে অবস্থানের প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ কার্ত্তিকমাসে (১৩০৮) দ্বিতীয়বার আগরতলায় আগমন করিলেন। এইবারকবি জোড়াবাংলায় অথবা 'জুরি-বাংলা'য় বা তৎকালীন 'জুরি-বৈঠকখানা'য় কয়দিন অবস্থান করেন। এই জোড়া-বাংলায় সমুদয় চিহ্ন এখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। উজ্জয়ন্ত-রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণের সময়, দেশীয় শিল্পরীত্যনাযায়ী অতি সুন্দরভাবে পাশাপাশি দুইটি 'কাঁচা-বাংলো' নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাসাদের পশ্চিমদিকস্থ প্রাঙ্গণে, বর্ত্তমান জগন্নাথ মন্দিরের প্রায় ২৫০/৩০০ ফিট উত্তরদিকে পূর্ব্বাস্য এই দুইটি বাংলো বাড়ী অবস্থিত ছিল। যুবরাজ ও রাজকুমারগণের শিক্ষাগৃহরূপে এবং একাংশ বহিরাগত বিশিষ্ট অতিথিবর্গের অবস্থানের জন্যও ইহার ব্যবহার হইত এবং পরবর্ত্তী সময়ে প্রাসাদের রাজকীয় দপ্তর অর্থাৎ 'খাস সেরেস্তা' এখানে কিছুকালের জন্য স্থানান্তরিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বাংলায় একাধিকবার অবস্থান করেন।

আগরতলায় এই বারের আগমনের বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীতে উল্লেখ হয় নাই। আচার্য্যদেবের সাগরপারে আরব্ধ কার্য্য সমাপনের প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য সম্বন্ধে মহারাজের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত আলোচনা হইল। মহানুভব মহারাজ রাধাকিশোর তৎক্ষণাৎ দশ হাজার টাকা এবং অনতিকাল পরই আরও দশ হাজার টাকা আচার্য্যদেবকে সাহায্য প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া কবিকে আশ্বস্ত করিলেন। রবীন্দ্রনাথ আগরতলা হইতেই জগদীশচন্দ্রকে বিলাতে পত্রদ্বারা (কার্ত্তিক, ১৩০৮) এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন,

চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড, (১৮ নং পত্র)

"তিনি (মহারাজ) শীঘ্রই দু এক মেইলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশহাজার টাকা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। * * * স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই।"

বলা বাহুল্য, নীরবদাতা মহারাজ রাধাকিশোরের একমাত্র সর্ত্ত এস্থলেও ছিল যে দানের গোপনীয়তা বিশেষভাবে রক্ষিত হইবে। রাধাকিশোরের দেহান্তের পর আচার্য্য বসু এবং রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক এই সকল রাজোচিত ঔদার্য্য ও আনুকূল্যের কাহিনী সর্ব্বজনসমক্ষে বিপুল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত বিবৃত হয়।

কবির এবারের আগরতলায় অবস্থানকালীন একটি স্মৃতিকথা সম্প্রতি আহৃত হইয়াছে। সহরবাসী শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দেববর্ম্মা এবং প্রফুল্ল মজুমদার তৎকালে স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পাঠরত বালক। দুজনেই ভাল গাহিতে জানিতেন। 'জুড়িবাংলা'য় ঘরোয়াভাবে কবি-সম্বর্দ্ধনার আয়োজন হইল এবং এই অনুষ্ঠানে সংগীতের অংশগ্রহণের জন্য স্কুল হইতে ইঁহারা নির্ব্বাচিত হইলেন। পূর্ব্বেই যতীন্দ্রনাথ বসুর নিকট গান তৈরী করিয়া ঐ সান্ধ্যানুষ্ঠানে কবিরচিত "রাজ-অধিরাজ তব ভালে জয়মালা" এবং "অয়ি ভুবনমনমোহিনী" সঙ্গীত দুইটি ইঁহারা কবিকে শুনাইলেন। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর, তৎকালীন স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ স্বনামধন্য কুঞ্জলাল নাগ, একান্তসচিব যতীন্দ্রনাথ বসু, কর্ণেল মহিম ঠাকুর, স্কুলের প্রধান শিক্ষক শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বহু গণ্যমান্য নাগরিক ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বালকদের সঙ্গীতের পর স্থানীয় অভিজাতবংশীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেতার বাদন করিলেন। তৎপর সুদক্ষ বেহালাবাদক ও গায়ক রামকানাই শীল তৎপুত্র রাধাচরণ শীলসহ বেহালা সহযোগে মহারাজ বীরচন্দ্র রচিত ও তৎকর্ত্তৃক জয়জয়ন্তী ঝাঁপে সুর সংযোজিত বহু-জনসমাদৃত "জয় জগতবন্দিনী, হরিহৃদয়রঙ্গিণী, ব্রজরমণী মুকুটমণি রাধিকে শ্রীরাধিকে" মনোহরসাহী কীর্ত্তনটি গাহিলেন। কণ্ঠসংগীত এবং যন্ত্রসংগীত শ্রবণে কবি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দেববর্ম্মার স্মৃতি হইতে

এই জুড়িবাংলায় অবস্থানকালেই অর্‌গ্যানসহযোগে কবিকণ্ঠের "বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি" "নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরযামী" — নৈবেদ্যের অন্তর্গত এই সকল সুপ্রসিদ্ধ সংগীত বহুবার শ্রবণের কথা সহরবাসী বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে, কেহ কেহ এখনও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন।

মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্মৃতি অনুসারে তিনি এইবারই (১৩০৮) কবির সঙ্গে আগরতলা হইতে গমন করতঃ কলিকাতা হইতে শিলাইদহে গিয়া তথা হইতে কবির সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে গমন করিলেন। এ সময়েই তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া এবং কবিজায়ার নিকট অপত্যবৎ স্নেহযত্ন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

আগরতলায় অবস্থানকালে বোলপুরে সত্বরই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও কবির সহিত মহারাজের দীর্ঘ আলোচনা হয়। বিদ্যালয় স্থাপনে মহারাজের উৎসাহ এবং আনুকূল্যের আশ্বাসে শুধু কবিই নহেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও মহারাজকে আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছিলেন। ১লা অগ্রহায়ণ কবি মহিমচন্দ্রকে এক পত্রে লিখিতেছেন,

> "মহারাজ তাঁহার (মহর্ষির) এই কাজে আত্মীয়ভাবে যোগ দিয়াছেন বলিয়া তিনি অন্তরের সহিত তাঁহাকে (মহারাজকে) আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।"

এই অপ্রকাশিত পত্রটিতে এবং মহিম ঠাকুরকে লিখিত ১৮ই ভাদ্রের এক পত্রে হেসের নামোল্লেখ পাই। মহিম ঠাকুরকে কবি লিখিতেছেন,

পূর্ব্বাশা, রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা

> "হেস বেচারাকে মহারাজ বালিগঞ্জ বাড়িতে থাকিতে দিয়া বড় ভাল কাজ করিয়াছেন।"

রবীন্দ্রনাথ-রাধাকিশোর প্রসঙ্গে হেসের আলোচনার উপরএকটু আলোকপাত করিতে হয়। শশীকুমার হেস ছিলেন তৎকালে একজন সম্ভাব্যপূর্ণ সুখ্যাত চিত্রশিল্পী। বিদেশ হইতে স্বদেশে সদ্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপন সমাজেই নানা কারণে বিপন্ন ও আশ্রয়হীন হইলেন। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই ছিলেন স্বদেশের প্রতিভাবিকাশের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ও প্রতিশ্রুত পৃষ্ঠপোষক। হেসের ব্যক্তিগত বিপর্য্যয় তাঁহাকে ব্যাকুল করিল। তিনি ত্রিপুরাকে স্মরণ করিলেন। মহারাজের অনুমতিগ্রহণে হেস-দম্পতি বালিগঞ্জে অবস্থিত ত্রিপুরাভবনে আসিয়া কয়েকমাস অতিবাহিত করিলেন। শুধু আশ্রয়দানই নহে, মহারাজ হেসের অঙ্কিত একটি রমণীয় তৈলচিত্র "Boy with a pitcher" তিন সহস্র টাকার বিনিময়ে গ্রহণ করিয়া বিপন্ন দম্পতিকে আর্থিক দুর্গতি হইতেও সাময়িকভাবে মুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এই তৈলচিত্রটি কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী মেলায়

আচার্য্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রদত্ত একটি রসিদ হইতে আংশিক উপাদান গৃহীত

এবং লক্ষ্ণৌ একটি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। চিত্রটি এখনও উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে রক্ষিত আছে, কিন্তু ইহার অতীতের ইতিহাস ও সংযুক্ত মানবিক স্পর্শের সংবাদটি আজ কে রাখেন? রাজধনের উত্তরাধিকারী উত্তরপুরুষগণও সম্ভবতঃ ইহার ঐতিহ্য বিস্মৃত হইয়াছেন! [১]

রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড

স্মরণীয় ৭ই পৌষ (১৩০৮) তারিখে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয়ের শুভপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

১৩০৯ বঙ্গাব্দ — শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী রূপে ভর্ত্তি হইবার পক্ষে ইংরেজ সরকার এবং নানাদিক হইতে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়ায় মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর Indian Cadet Corps-এ মীরাটে যোগদান করেন। রাজকুমারকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য আগ্রহপরায়ণ হইয়া কবি ইতিপূর্ব্বেই মহারাজকে পত্র দিয়াছিলেন এবং সত্বর তাঁহাকে বোলপুর পাঠাইতেও বলিয়াছিলেন। মহর্ষিদেবও রাজকুমারের বোলপুর বিদ্যালয়ে যোগদানের সম্ভাবনায় উৎসাহিত ছিলেন, কিন্তু রাজকুমারগণের বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে তদানীন্তন বিদেশী সরকারের ছক্‌কাটা নীতির জটিল বন্ধনে সবই বান্‌চাল হইয়া গেল। সুতীব্র আশা ও আকাঙ্ক্ষায় ব্যাহত ব্রজেন্দ্রকিশোরকে কবি এই সময়ে ঘনঘন অতি উৎসাহপূর্ণ পত্রাদি লিখিতেছেন। ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শ, প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সংকল্পে দৃঢ়চিত্ততা, চারিত্রিক উৎকর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী ও গভীর সদুপদেশপূর্ণ এই সুদীর্ঘ পত্রাবলী রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যে অপূর্ব্ব অবদান। মহারাজকুমারকে ৭ই বৈশাখ (২) লিখিতেছেন,

মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখিত পত্রাবলী— প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৮

> "বৎস, তুমি ক্ষত্রিয় তাহা কদাপি বিস্মৃত হইও না। কোনো শিক্ষায় কোনো সঙ্গে তোমার তেজবীর্য্য ও শ্রদ্ধা যেন অভিভূত না হয়।"

(১) সুনিপুণ স্বভাবশিল্পী মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের অঙ্কিত দেয়ালজোড়া সুবৃহৎ এবং প্রখ্যাত তৈলচিত্র "সন্ন্যাসী (Hermit)", "ঝুলন", "বংশীশিক্ষা" প্রভৃতি এককালে যাহা দেশবিদেশের গুণিজনের মনোরঞ্জন এবং বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল এবং যাহা এককালে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের অলঙ্করণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইত, স্বদেশজাত এই সকল মহামূল্য শিল্পনিদর্শন আজ আর রাজপ্রাসাদে দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজকীয় হস্তের এই সার্থক শিল্পসৃষ্টি — অপূর্ব্ব এই চিত্রগুলি দেখিয়া অল্পকাল পূর্ব্বেও বহিরাগত জনৈক প্রখ্যাত শিল্পী মুগ্ধবিস্ময়ে হতবাক হইয়া কেবলমাত্র একটি কথাই উচ্চারণ করিয়াছিলেন — "ইস্‌মে জান্ ডাল্ দিয়া।"

এই গ্রন্থে প্রাসাদের ছবিঘরে চিত্রাঙ্কনরত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের যে ফটো চিত্রটি সংযুক্ত হইয়াছে তাহাতে উপরোক্ত চিত্র "সন্ন্যাসী"সহ রাজশিল্পীর আরও কয়টি চিত্রনিদর্শনের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে। বিখ্যাত "ঝুলন" চিত্রটি তখন সবেমাত্র ক্যানভাসে রূপায়িত হইতেছে।

(২) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পুনরায় বলিতেছেন,

"মহাভারতের ভীষ্ম, অর্জ্জুন ও কর্ণ ক্ষত্রিয়ের আদর্শ। সেই আদর্শই গ্রহণ করিয়ো। * * মহাভারত যে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।"

১৬ই শ্রাবণের পত্রে পুনরায় উপদেশ দিলেন,

মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখিত পত্রাবলী —প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪৮

"Cadet Corps"-এ প্রবেশ করিয়া তুমি ক্ষত্রিয় সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবে ইহা কল্পনা করিয়া আমার আনন্দ হয়। * * তুমি সংযত অপ্রমত্ত থাকিয়া সুদৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে * * চতুর্দ্দিকের ধূলিপঙ্কের মধ্যেও সরধুনি-ধারা স্নাত তরুণ দেবকুমারের মত তুমি অম্লান সুন্দর নির্ম্মলতা লইয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারিবে।"

কিছুকাল আগের একটি চিঠিতে (চৈত্র, ১৩০৮) দেখিতে পাই, কবি লিখিতেছেন,

"শান্তিতে সন্তোযে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা। * * বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও।

— "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ।"

কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর ব্রজেন্দ্রকিশোরের পত্র পাইয়া অগ্রহায়ণ মাসে কবি তাঁহাকে প্রবোধবাক্য প্রদান উপলক্ষে লিখিতেছেন,

প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪৮

"তুমি অল্পদিন এখানে থাকিয়াই তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছ। তাঁহার স্বভাব মাতৃভাবে পূর্ণ ছিল এবং তিনি তোমাকে আপন সন্তানের চক্ষেই দেখিতেন। * * ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন সেই শোককে তিনি নিষ্ফল হইতে দিবেন না — তিনি আমাকে এই শোকের দ্বার দিয়া মঙ্গলের পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।"

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই বৎসর শ্রাবণ মাসে মহারাজ রাধাকিশোর আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রয়োজনে পুনরায় ৫০০০ টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কবি এই অর্থের প্রাপ্তিস্বীকার উপলক্ষে ২৪শে শ্রাবণের পত্রে লিখিলেন,

শারদীয়া দেশ, ১৩৫৯, সংকলন শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী সেন

"মহারাজের ঔদার্য্য কালক্রমে সর্ব্বপ্রকার বাধামুক্ত হইয়া আমাদের স্বদেশকে সফলতার পথে প্রতিষ্ঠিত করিবে।"

১৩১০ বঙ্গাব্দ ---- সম্ভবতঃ এই বৎসর হইতেই ত্রিপুরার শিক্ষার্থী বালকগণ রাজসরকারী ব্যবস্থায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বোলপুর বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইতে লাগিল। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ, শিক্ষার্থীগণ এবং গুরুদেবসহ একটি তৎকালীন (১৯০৩-০৪) দুষ্প্রাপ্য গ্রুপ ফটোতে কবিপুত্র শমীন্দ্রনাথের সহিত উপবিষ্ট ত্রিপুরার একটি বালকের ছবি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা হইতে সর্ব্বপ্রথম প্রেরিত শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু এবং কিয়ৎকাল পরেই যথাক্রমে যোগেন্দ্র গাঙ্গুলী,

উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন্দ্র দেববর্ম্মা, কুমার প্রফুল্ল, কুমার প্রশান্ত ইত্যাদি বহু বিদ্যার্থী আগরতলা হইতে বোলপুর বিদ্যালয়ে প্রেরিত প্রাক্তন ছাত্রদলের মধ্যে পূর্ব্বতম। ত্রিপুরার ন্যায় দেশের উপান্ত অঞ্চলের এরূপ একটি ছোট সহর হইতে যত শিক্ষার্থী শান্তিনিকেতনে প্রেরিত হইয়াছিল, এরূপ দৃষ্টান্ত ঐ বিদ্যালয়ের ইতিহাসে বিরল। পরের বছরের গোড়ার দিকেই (৩০শে জ্যৈষ্ঠ) কবি মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিতেছেন,

বিশ্বভারতী পত্রিকা, চৈত্র, ১৩৪৯

"ত্রিপুরার মহারাজের খুড়ো নবদ্বীপচন্দ্র বাহাদুর তাঁর দুই ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠাবেন লিখেছেন — আরো দুচারটি ছেলে যাব যাব করচে — অতএব নূতন ঘরের দরকার।"

সদ্য-মাতৃহারা পীড়িতা কন্যার স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য কবি আলমোড়া গিয়াছেন। সেখানে গিয়াও ত্রিপুরাকে নিয়ত স্মরণ করিতেছেন। বন্ধুপ্রীতির নিদর্শনরূপ সংগৃহীত উৎকৃষ্ট চমরীপুচ্ছ যে আগেই আগরতলায় প্রেরিত হইয়াছে তাহা মহারাজের নিকট পৌঁছিল কিনা তৎসম্বন্ধে জানিতে লিখিয়াছেন মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে।

১৩১১ বঙ্গাব্দ — এই বৎসরই কোন এক সময় মহারাজ রাধাকিশোর শান্তিনিকেতন গমন করতঃ কবির আতিথ্য গ্রহণ করেন বলিয়া অনুমিত হয়। আগরতলায় নবস্থাপিত স্বল্পায়ু অবৈতনিক কলেজটি রাজ্যের বাহিরের চাপে — বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ম্মম নির্দ্দেশে মহারাজকে অল্পদিন আগে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের এই শুভ প্রচেষ্টায় বাধা পাইয়া রাজ্যেশ্বরের দুঃখের অবধি নাই। এই কলেজের মূল্যবান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মহারাজ শান্তিনিকেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের জন্য দান করিলেন। অধিকন্তু, ত্রিপুরার রাজসরকার হইতে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক অর্থসাহায্যও মঞ্জুর হইল যাহা কিঞ্চিন্ন্যূন অর্ধশতাব্দীকাল অব্যাহত ছিল। অতীতে এই প্রতিষ্ঠানের অনেক দুর্দ্দিনে ত্রিপুরার নিয়মিত অথবা নানাভাবে সাময়িক আর্থিক সাহায্যই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে কার্য্যকরী ভাবে অনেক সহায়তা করিয়াছিল। রবীন্দ্র-জীবনীকার তদীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন, "এই বংশের কোনো মহারাজা আশ্রমে আসেন নাই।" কিন্তু আগরতলায়-সাহিত্য-সমাজ প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মহারাজ রাধাকিশোরের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

ঘরোয়া— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র, জীবনী, ৪র্থ খণ্ড (১৫৩ পৃঃ)

"আমাদের দেশের লোকের মধ্যে একমাত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে আমি নিয়মিত অর্থানুকূল্য পেয়েছি। তিনি স্বয়ং আমাদের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করে আমাদের আনন্দিত ও সম্মানিত করেছেন।"

রবি, রবীন্দ্র সম্মেলন সংখ্যা

ভাদ্রমাসে (১৩১১) কবি তখন গিরিডিতে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে তথায় আহবান করিলেন। তিনি একান্তসচিব যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সঙ্গে তথায় গিয়া কবির সঙ্গে বাস করিয়া আসিলেন। কবি ২৬শে ভাদ্র তারিখে মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিতেছেন,

রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড

"আগামী সোমবারে যতী ত্রিপুরার মধ্যম রাজকুমারকে লইয়া এখানে আসিতেছেন তাঁহাদের জন্য একটি বাড়ী ঠিক করিয়াছি।"

বিশ্ব ভারতী পত্রিকা, চৈত্র, ১৩৪৯

মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের অটোগ্রাফ খাতায় রবীন্দ্রনাথ ৪ঠা আশ্বিন তারিখে এবারই আশীর্ব্বচন লিখিয়া দিলেন,

"হোক্ বা সুখ হোক্ বা দুখ
প্রিয় বা অপ্রিয়
অপরাজিত চিত্তে তুমি
বরণ করে নিয়ো!"

ব্রজেন্দ্রকিশোরের জীবনে এই আশীর্ব্বাদ বর্ণে বর্ণে সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছে।

দেশীয় রাজ্য— মহিম ঠাকুর

কবি আশ্বিন মাসে রথীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, অবলা বসু প্রভৃতি সমভিব্যাহারে বুদ্ধগয়া পরিদর্শন করেন। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরও কবির অনুগামী হইলেন।

Calcutta Municipal Gazette-Tagore Special Number 1941

১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত আগরতলায় পুরাতন রাজপ্রাসাদ পুনরায় নির্ম্মাণ এবং ত্রিপুরার অন্যবিধ সরকারী দেনা ইত্যাদি ঋণ পরিশোধের জন্য গভর্ণমেন্ট অথবা অন্য কোনও ব্যাঙ্ক হইতে এককালীন ঋণগ্রহণের যে প্রস্তাব ত্রিপুরায় তৎকালে চলিতেছিল, তৎসম্বন্ধে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট সুযোগ গ্রহণ করিয়া চাকলা রোসনাবাদ নামক বিস্তীর্ণ জমিদারীর কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণের জন্য নানাবিধ কৌশল সৃষ্টি করিতেছিল। স্বার্থান্বেষী রাজসরকারী কর্ম্মচারীগণের যোগসাজস উপলব্ধি করিয়া রবীন্দ্রনাথ মহারাজকে সতর্কবাণী পাঠাইলেন। এই সনের শেষভাগে লিখা একটি তারিখবিহীন পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য),

"ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল হইতে ঋণ পাওয় যাইবে না, অন্য কোনও প্রাইভেট ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে একথা সন্দেহজনক। প্রাইভেট ব্যাঙ্কের সহিত গোপন স্বার্থের সম্বন্ধ স্থাপন করা সহজ। এমনকি গভর্ণমেন্টের উচ্চ কর্ম্মচারীর পক্ষেও তাহা দুঃসাধ্য নহে। * * * যদি ঋণগ্রহণের জন্য মহারাজকে গভর্ণমেন্টের সর্ত্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেই হয় তবে জমিদারী শাসনের জন্য গভর্ণমেন্টের লোককে অগত্যা গ্রহণ করিয়া

মহারাজের নিজের নির্বাচিত একজন সুদক্ষ লোককে মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন — দুইয়েতে মিশাইবেন না।" (১)

শারদীয়া ত্রিপুরার কথা, ১৩৬১, চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড

১৩১২ বঙ্গাব্দ — উদ্ভিদ-বর্দ্ধনের পরিমাপক যন্ত্রের পরীক্ষাদি কার্য্যে সদ্য-অঙ্কুরিত মুলি বাঁশের চারার প্রয়োজন হইয়াছে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের। রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষেত্রেও ত্রিপুরাকে স্মরণ করিলেন। কবি বাঁশের চারা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন রাজদরবারে। এরূপ অকিঞ্চিৎকর বস্তু সরবরাহেও প্রেরকের কি নিষ্ঠা — যার পেছনে ছিল বন্ধুর নিকট হইতে অসঙ্কোচ দাবি।

অপ্রকাশিত পত্র (মহারাজকুমার আদিত্য কিশোর সংগৃহীত)

এই সনের গোড়ার দিকে কোনো এক সময়ের অপর একখানি তারিখবিহীন পত্রে (৬০০ শব্দ সম্বলিত) গভর্ণমেন্ট হইতে ঋণগ্রহণ সম্পর্কে কবি সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন ভাষায় ত্রিপুরেশ্বর রাধাকিশোরকে জানাইতেছেন,

"গোড়াতেই ইংরেজের নাম শুনিয়া ভয় হয়। এই জাতের হস্তে নিশ্চিত মনে আত্মসমর্পণ করা কোনোমতেই চলে না।"

পত্রের অন্যত্র মহারাজাকে একটি অমূল্য উপদেশ দিতেছেন,

"মহারাজের হৃদয় নিতান্ত কোমল, এই জন্যই নিজের ক্ষমাগুণ হইতে নিজের ঔদার্য্য হইতে নিজকে রক্ষা করিতে একজন সুদক্ষ মন্ত্রীর সুদৃঢ় সহায়তা মহারাজের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।"

* * * *

রবি পত্রিকা রবীন্দ্র সম্মেলন সংখ্যা

"পরের বন্ধনে একদিন ধরা দেওয়ার চেয়ে নিজের বন্ধনে নিজকে সুকঠিনভাবে বদ্ধ করা কর্ত্তব্য।"

বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়), ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। Visitor's Book Thakur Boarding, Agartala

আষাঢ় মাসে মহারাজের আহবানে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় আগরতলা আগমন করিলেন (তৃতীয়বার)। এবারও জোড়াবাংলায় অবস্থানের ব্যবস্থা হইল। ১৭ই আষাঢ় স্থানীয় উমাকান্ত একাডেমীর হলে মহারাজ রাধাকিশোরের উপস্থিতিতে কবি 'ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মেলনী'র সভায় সভাপতিত্ব করতঃ সুচিন্তিত ও সারগর্ভ "দেশীয় রাজ্য" প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। তৎকালে ভাবিবার মত বহু বিষয়বস্তু এবং আদর্শাদিতে সুসমৃদ্ধ সুদীর্ঘ এই প্রবন্ধ (২)। ১৮ই আষাঢ় কবি স্থানীয় ঠাকুর বোর্ডিং বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করেন। "দেশীয় রাজ্য" প্রবন্ধে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির উপযোগিতা তৎকালে কি ছিল এবং

---

(১) পরবর্ত্তী সময়ে ত্রিপুরার রাজসরকার ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল হইতেই সমান বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধের সর্ত্তে সুদে আসলে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং সর্ত্তমতই তাহা শোধ করা হয়। আমরা অতঃপর ইহাও দেখিতে পাইব যে কবি-মনোনীত একজন সুযোগ্য শাসনকর্ত্তা ত্রিপুরার রাজ-মন্ত্রীপদেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

(২) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দেশীয় রাজ্যসমূহের আদর্শ ও লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে কবি বলিয়াছিলেন,

"দেশীয় রাজ্যের ভুলক্রটি-মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে তাহাতে যেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতঃই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ।"

ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষের এবং বৈদেশিক প্রভাবিত রাষ্ট্রশাসনের আদর্শের পটভূমিকায় ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ত্রিপুরার প্রসঙ্গে বলিতেছেন,

"এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি সংস্কৃতবাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি - "কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকং" — বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেন্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্য্যই সার। এই বীর্য্য দেশ-কাল-পাত্রভেদে নানা প্রকারে প্রভাবিত হয় — কেহ শস্ত্রে বীর, কেহ বা শাস্ত্রে বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্ম্মে বীর, কেহ বা কর্ম্মে বীর।

আসল কথা, দেশের মাটিতে সার ফেলিতে হইবে। সেই সার আর কিছুই নহে — "কিল বিদুর্বীরতাং সারমেকং" — বীরতাকেই একমাত্র সার বলিয়া জানিবে।"

ভাষণের শেষে ত্রিপুরার কল্যাণ ও শ্রীকামনায় কবি ভাষণের উপসংহার করিলেন এই বলিয়া,

'মা যেন এখানেও কেবল কতগুলো ছাপমারা লেপাফার মধ্যে আচ্ছন্ন না থাকেন দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃবক্ষে আশ্রয় লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে।"

এই সময় নানা সমস্যাদি — বিশেষতঃ রাজ্যের অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থা ও তাহার প্রতিবিধানকল্পে উপায় উদ্ভাবনের বিষয়াদি মহারাজ কবির সঙ্গে আলোচনা করিবার সুযোগ গ্রহণ করেন। এই সময়ে উপযুক্ত একজন মন্ত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইল।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ বৈষয়িক বিষম ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করা সম্বন্ধে ২৮শে আষাঢ়ের (১৩১২) চিঠিতে নানাবিধ প্রসঙ্গ আলোচনান্তে লিখিতেছেন,

"ত্রিপুরার ইতিহাসে আমার পিতামহের যে যোগ ছিল সেই যোগ আমাকেও রক্ষা করিতে হইবে বিধাতার এই অভিপ্রায়বশতই অকস্মাৎ স্বর্গীয় মহারাজ বিনা পরিচয়েই আমাকে ত্রিপুরার সহিত আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।"

সম্ভবতঃ অনতিকাল পরে (সময় নির্দ্ধারণ সম্ভব হয় নাই) কোনো এক সময়ে "ভারত-রাজন্য-সভা" গঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একটি খসড়া পরিকল্পনা মহারাজ রাধাকিশোরের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিয়াছিলেন [১]। ভাবিতে বিস্ময় লাগে যে স্বাধীন ভারতে অধুনা

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

রবি, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিং

যে রাষ্ট্রীয় আঞ্চলিক পরিষদ (Zonal Council) গঠিত হইয়াছে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবির পরিকল্পনায় 'দেশীয় ভারতের' জন্য সেইরূপ অঞ্চল বিভাগ এবং সমধর্ম্মী কর্ম্মসূচী প্রণীত হইয়াছিল। এই পরিকল্পনার নীতি ও আদর্শ ছিল 'দেশীয় ভারতের' পক্ষে কল্যাণাশ্রয়ী। অতঃপর, অনেক বৎসর পরে 'নরেন্দ্রমণ্ডল' অথবা 'চেম্বার-অব-প্রিন্সেস্' নামক রাজন্য সভা গঠিত হয়। মনে হয়, এবার আগরতলায় অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের 'দেশীয় রাজ্য' প্রবন্ধ পাঠের পর ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের পটভূমিকায় সমগ্র ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির যৌথ উন্নয়ন সম্বন্ধে কবির চিন্তা অযৌক্তিক নহে—যাহার ফলেই সম্ভবতঃ সংযুক্তভাবে প্রচেষ্টার ভিত্তিতে 'ভারত-রাজন্য-সভা'র খসড়া পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল।

কয়েকদিন আগরতলায় অবকাশ যাপন করিয়া কবি কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। বিশ্বস্ত রাজসচিব যতীন্দ্রনাথ বসুও সঙ্গে রহিয়াছেন। গভর্ণমেন্ট হইতে ঋণগ্রহণ উপলক্ষে যে সকল প্রস্তাব আগরতলায় শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া রবীন্দ্রনাথ উতলা হইয়া উঠিয়াছেন। গোয়ালন্দ ষ্টীমারের সামনের ডেকে বসিয়া যতীন্দ্রনাথের সহিত কবি আলোচনায় মগ্ন। উঠিয়া তৎক্ষণাৎ মহারাজকে পত্র লিখিতে বসিলেন।

কবির সনতারিখ-বিহীন পত্র (অপ্রকাশিত), সম্ভবতঃ ১৩১২ সন, আষাঢ় মাসে লিখিত

"চাকলা রোশনাবাদ সমগ্রভাবে নূতন লোকের হস্তে ঋণশোধের জন্য আবদ্ধ রাখা অনাবশ্যক, তাহার একাংশ মাত্র রাখাই মহারাজের অভিপ্রেত ইহাই ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝাইয়া বলিবার কথা ছিল। কিন্তু * * * মহারাজের জমিদারীকে মহারাজের আয়ত্তভ্রষ্ট করার উদ্যোগ চলিতেছে। * * * বস্তুত বিশ্বাসযোগ্য সুযোগ্য লোককে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে মহারাজ কোনো কথা চালাইবেন কি করিয়া আমি তাহাই ভাবিতেছি। যাঁহারা ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা প্রতিকূলভাবে চলিতেছেন।"

কবির অপ্রকাশিত পত্র, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩১২ (মহারাজকুমার আদিত্যকিশোর সংগৃহীত)

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরও ত্রিপুরার সমস্যাদি ভাবিয়া কবির স্বস্তি নাই, বরং সমধিক চিন্তান্বিত। যিনি মহারাজের অন্যতম বিশ্বস্ত পারিষদ এবং কবিরও একান্ত অনুরক্ত বন্ধু, তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আগরতলায় স্বয়ং আসিয়া যাহা দেখিয়া ও শুনিয়া গিয়াছেন তদ্বিষয়ে কবি মহারাজকে নিঃসঙ্কোচে এক সুদীর্ঘ (১০০০ শব্দ সম্বলিত) পত্রযোগে [১] সতর্ক করিলেন। তৎসঙ্গে ইহাও মহারাজকে সবিশেষ অনুরোধ জানাইলেন যে,

"মহারাজ দয়া করিয়া আমার এই পত্রখানি ...... কে দেখাইবেন।"

রাজ্যের ও রাজ্যেশ্বরের মঙ্গলের মহান্ ব্রতকে কবি গ্রহণ করিয়াছেন বিধাতারই অদৃশ্যবিধানে। এ চিঠিতেও তাহাই বলিতেছেন,

"মহারাজের সহিত আমার যে একটি আন্তরিক সম্বন্ধ বিধিবশে স্থাপিত হইয়াছে তাহা উত্তরোত্তর প্রবলভাবে মনের মধ্যে অনুভব করি। এই সম্বন্ধের অনুসারী কর্ত্তব্য

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

নিশ্চয় আছে। সেই কর্ত্তব্য-পালন না করিলে অধর্ম্ম হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস যে কারণেই হউক এবার স্থির করিয়াছিলাম যে ত্রিপুরার হিতসাধনের জন্য সমস্ত সঙ্কোচ পরিহার করিয়া আমাকে নিযুক্ত হইতে হইবে।"

কিন্তু ত্রিপুরায় আসিয়া কবি কি দেখিলেন?

"আমি ইহা দেখিলাম যে সেখানে দলাদলি খুব প্রবল হইয়াছে — এরূপ অবস্থায় মহারাজের তরফে তাকানো কোনো দলের পক্ষে সম্ভব হয় না — অপর দলকে ব্যর্থ করা ও নিজের দলের জন্য বল সংগ্রহ করা ইহাই প্রত্যেক পক্ষের প্রধান চিন্তনীয় হয়। এমন স্থলে মহারাজের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী।"

এ কারণেই কবি দ্বিধাহীন চিত্তে রাজ্যেশ্বরকে পুনরায় উপদেশ দিলেন,

"স্থানীয় দলাদলির সহিত সম্পর্কশূন্য, নিঃস্বার্থ, সুশিক্ষিত, সুদক্ষ লোক মহারাজের সম্প্রতি একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।"

ইংরেজ একান্তসচিব সম্বন্ধে তদীয় কার্য্যকলাপে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে দেখিয়া তৎসম্বন্ধেও রাজ্যেশ্বরকে সতর্ক করিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, ত্রিপুরার এই বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীটি আজীবনকাল কবির সহিত বন্ধুত্বসূত্রে সমভাবেই আবদ্ধ ছিলেন। এযাবৎ অপ্রকাশিত এই পত্রটি রবীন্দ্রনাথ-রাধাকিশোরের অবিচ্ছেদ্য সম্পার্কের একটি মূল্যবান নিদর্শন।

এই বৎসর কবি আগরতলার অল্পকাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত কারিগরী বিদ্যালয়ের জন্য (উড্‌বার্ণ আর্টিজান স্কুল) শান্তিনিকেতনের একজন সুদক্ষ জাপানী মিস্ত্রীকে শিক্ষকস্বরূপ প্রেরণ করিলেন।

কার্ত্তিক মাসে (১৩১২) রবীন্দ্রনাথের মনোনীত কৃতবিদ্য অ্যাটর্নী ও কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের খ্যাতনামা ও অভিজ্ঞ উচ্চকর্ম্মচারী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরার রাজমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এই রমণীবাবুই ১২৯৪ সালের ২৬শে ফাল্গুন তারিখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদিত ও শান্তিনিকেতন সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ট্রাষ্টডীড্-এ বর্ণিত তিনজন ট্রাষ্টি অথবা অধিকারীর মধ্যে অন্যতম ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে ইনি কলিকাতায় তৎকালীন পৌরসভার সহকারী সভাপতিরূপে বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। নবনিযুক্ত রাজমন্ত্রীর কর্ম্মভার গ্রহণ উপলক্ষে, নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সহ কবি আগরতলায় আগমন করেন (চতুর্থবার)। স্থানীয় বিদ্যালয় গৃহে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিদায় এবং নবনিযুক্ত মন্ত্রীর অভ্যর্থনা সভায় এবং মন্ত্রী নিয়োগ দরবারে কবির উপস্থিতির কথা সমকালীন স্মৃতিতে এখনও অবগত হওয়া যায়।

ত্রিপুরার দরবার রোবকারী (ঘোষণা) পত্র

রবীন্দ্র জীবনী, ১মখণ্ড

শান্তিনিকেতন আশ্রম — অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

চৈত্রমাসে ইষ্টার-অবকাশের সময়ে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক-সম্মিলনের (যাহা অতঃপর পুলিশী জুলুমে এমার্সনী দক্ষযজ্ঞে পর্য্য-

বসিত হয়) অন্তর্ভুক্ত সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য তথায় যাইবার পথে রবীন্দ্রনাথ অল্প কয়দিনের জন্য পুনরায় আগরতলায় শুভাগমন করিলেন (পঞ্চমবার)। এবারে জোড়াবাংলায় অবস্থান করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। আগরতলা হইতে কবি ২৫শে চৈত্রের এক চিঠিতে লিখিতেছেন,

রবীন্দ্র জীবনী, ২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ

> "সম্প্রতি আগরতলায় আটকা পড়ে গেছি। * * শনি আমাকে ঘুরাইতেছে রবি তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিল না।"

সন, তারিখ ও স্বাক্ষর বিহীন কবির স্বহস্ত লিখিত নোট (অপ্রকাশিত)

কবির এবারকার আগরতলায় পদার্পণ কি কেবলই অবকাশ-যাপনের জন্য ছিল? ঘটনা অন্যরূপ এবং ইহার পেছনে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছিল, একটি পরম বিস্ময়কর অমূল্য দলিল (কবির স্বহস্তলিখিত) সম্প্রতি আবিষ্কৃত হওয়ায় অভাবনীয়ভাবে একটি বিস্মৃত অধ্যায়ের উপর তদ্দ্বারা আলোকপাত হইয়াছে। নবনিযুক্ত রাজমন্ত্রী রাজ্যের আয়ব্যয় সংক্রান্ত নববর্ষের বজেট প্রস্তাব রাজ্যেশ্বরের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। মহারাজ বজেটের বিষয় কবির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করিবেন বলিয়া তাঁহাকে জানাইলেন। বজেট প্রণয়নে কয়েকটি মূলনীতির সঙ্গে কবি একমত হইতে পারিতেছেন না। তাই বজেটের মূলনীতি নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ও সুদীর্ঘ নোটে (১) রবীন্দ্রনাথ স্বীয় যুক্তি ও অভিমত মহারাজকে নিবেদন করিলেন। রাজ্যের শাসনবিভাগ ও রাজসংসার বিভাগ সুনির্দ্দিষ্টভাবে পুনর্বিন্যাসের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মহারাজকে জানাইতেছেন,

> "রাজ্যের মধ্যে দুইটি স্বাভাবিক ভাগ আছে। একটি মহারাজের স্বকীয়, আর একটি রাষ্ট্রগত। উভয়কে জড়ীভূত করিয়া দেখিলে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে — এই উপলক্ষ্যে প্রভূত অনিষ্ট উৎপন্ন হয় — এবং এই দুই বিভাগের সন্ধিস্থলে নানা প্রকার দুষ্ট চক্রান্তের অবকাশ থাকিয়া যায়। * * * যাহা মহারাজের স্বকীয় তাহার উপর মন্ত্রী বা আর কাহারো হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দেওয়া চলে না। এইজন্য মহারাজের স্বীয় বিভাগকে মন্ত্রীর অধিকার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া মন্ত্রীর প্রতি রাষ্ট্রবিভাগের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করা আবশ্যক হইবে।"

নোটের অপরাংশে রাজ্যের শাশ্বত মঙ্গলের জন্য চিরন্তন ও চিরভাস্বর আদর্শটি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হইতেছে কবির নিজস্ব অভিব্যঞ্জনাবৈশিষ্ট্যে,

> "মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিজের নিয়মের দ্বারা নিজকে সংযত করাই রাজোচিত — তাহাই রাজধর্ম্ম।"

(১) বজেটের মূলনীতি সম্পর্কিত কবির রচিত নোটের ফটোচিত্র এবং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

শেষের দিকে নিষ্কাম নিস্পৃহ আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি সর্ব্বান্তঃকরণে বন্ধু মহারাজের মঙ্গল কামনা করিয়া সুদীর্ঘ নোটটি শেষ করিতেছেন এই বলিয়া,

"ঈশ্বরই মঙ্গল করিবার একমাত্র কর্ত্তা ইহাই একমাত্র নিশ্চয় জানিয়া অনাবশ্যক আগ্রহাতিশয্য হইতে চিত্তকে নির্ম্মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিব — আমার কোনো অধিকার নাই কোনো ক্ষমতা নাই, মহারাজ ধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন এবং ধর্ম্মই মহারাজকে রক্ষা করিবেন।"

কবি আগরতলা হইতে বরিশালে গমন করিলেন। নববর্ষদিবসে তথায় সম্মেলনের দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। এবার সম্ভবতঃ নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রনাথও কবির সঙ্গে আগরতলায় আগমন করিয়াছিলেন। কবির বরিশাল গমনের কয়েকদিন পরই (২৫ এপ্রিল, ১৯০৬) নাটোরের মহারাজ কর্ত্তৃক স্থানীয় ঠাকুর বোর্ডিং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নিদর্শন সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। Visitor's Book, Thakur Boarding

বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশে মহারাজের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা উপলক্ষে কতিপয় রাজকর্ম্মচারীর অনুদার আচরণে ক্ষুব্ধ কবির মানসিক গ্লানি নিরসনের জন্য ত্রিপুরাধিপতির প্রচেষ্টা চলিতেছে। এ সময়ের একটি চিঠিতে মহারাজ কবিকে লিখিতেছেন, মহারাজ রাধাকিশোরের লিখিত পত্রের প্রাপ্ত খসড়া

"বঙ্গদর্শনের দরুন যে সহায়তা আমি করিতেছি তাহা আপনার প্রতি ব্যক্তিগত বন্ধুতার দরুন নহে — বঙ্গভাষার প্রতি কি আমার কোনরূপ কর্ত্তব্য নাই, কি অধিকার নাই? বোলপুর বেদ বিদ্যালয় সম্বন্ধেও আমার একই কথা, কাজেই আপনি এসব বিষয়ে আমার সম্বন্ধ থাকার দরুন কোনরূপ দ্বিধা মনে রাখিবেন না।"

পুরাতন কাগজপত্রাদি সন্ধানে দেখা গিয়াছে যে রাধাকিশোর সরকারী অথবা ব্যক্তিগত অনেক চিঠির মুসাবিদা মৌখিক বলিয়া যাইতেন এবং কর্ম্মরত ষ্টাফ্ অফিসার দ্বারা তাহার অনুলিখন হইত। আলোচ্য খসড়াটিও ঐরূপ একটি অনুলিখিত পত্র — কিন্তু প্রামাণ্য। মহারাজের আলোচ্য এই পত্রটি এই বৎসরই কিছুকাল পূর্ব্বের লিখিত বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। রবীন্দ্র জীবনী আলোচনায় দৃষ্ট হয় যে রবীন্দ্রনাথ এইবার আগরতলা ও বরিশাল হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পকাল মধ্যেই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করতঃ শান্তিনিকেতনে কিছুকাল 'নিশ্চেষ্টতা'র মধ্যে ডুব দিলেন। অবশ্য 'খেয়া'র কবিতা তখন রচিত হইতেছে। রবীন্দ্র জীবনী ২য় খণ্ড ১৪০ পৃঃ

১৩১৩ বঙ্গাব্দ — রাজমন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যে স্বীয় স্থায়ী কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। শীতকালে কলিকাতায় অবস্থানকালে কবির সহিত মহারাজের রাজ্যশাসন — ব্যবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা হইল। রাজ্যে পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থাপক সভা, ষ্টেট কাউন্সিল ইত্যাদির কর্ম্মপরিচালনের এবং সদস্যদিগের প্রতি কবির আস্থা ছিল না। স্বার্থলোভিগণকে পরাভবের নিমিত্ত

একজন দৃঢ়চিত্ত ও সুদক্ষ মন্ত্রী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করিতেছিলেন। ১৪ই পৌষের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ মহারাজকে লিখিলেন,

সমকালীন
বৈশাখ, ১৩৬৪
বাং

"কৌন্সিল দ্বারা কোথাও কাজ চলে না। কৌন্সিলকে সহায়স্বরূপ করিয়া একজন কর্ত্তা কাজ করিয়া থাকেন।"

অন্যত্র বলিতেছেন,

"যে করিয়াই হউক, একজন সক্ষম ধর্ম্মভীরু মহারাজের একান্ত হিতৈষী ব্যক্তির আবশ্যক — তাহারই উপর ক্ষমতা দিয়া রাজ্য চালনা করিতে হইবে।"

চিঠির উপসংহারে লিখিতেছেন,

"ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি — মহারাজের সহিত তিনিই আমার সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন, এই সম্বন্ধের দ্বারা আমার সাধ্যমত মঙ্গলসাধন না হইলে আমার ক্ষমা নাই * * * মহারাজের স্নেহঋণে আমি বদ্ধ, তাহা আমি কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিব না।"

১৩১৪ বঙ্গাব্দ — বৈশাখ মাসে (৩রা বৈশাখ) যতীন্দ্রনাথ বসুর নিকট শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে কবি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে লিখিলেন যে তদীয় গদ্যসাহিত্য সংকলনের প্রথম গ্রন্থ 'বিচিত্র প্রবন্ধ' প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের চরম অর্থসংকট ! এমতাবস্থায় মহারাজ যদি 'কয়েক খণ্ড' পুস্তক ক্রয় করেন তবে বিদ্যালয় উপকৃত হইবে; কারণ এই সংস্করণের সমুদয় স্বত্ব কবি বিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। ত্রিপুরা রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক কয়েকশত গ্রন্থ ক্রয় করা হইল। বোলপুর বিদ্যালয়ের আর্থিক সংকটে ত্রিপুরাধিপতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সহায়তা নিরন্তর করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ বারম্বার কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বভারতী
পত্রিকা, আশ্বিন,
১৩৪৯

কর্ণেল মহিম ঠাকুরকে ৬ই চৈত্র (সন বিহীন) তারিখে লিখিত গুরুত্বপূর্ণ একটি চিঠি রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ এই বছরই লিখিয়াছিলেন (১)। ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণকামনায় কবি যে কী গভীরভাবে নিরন্তর নিয়োজিত ছিলেন, এই পত্রটিও তৎসম্বন্ধে একটি অন্যতম এবং উজ্জ্বল নিদর্শন। বন্ধু মহিমকে লিখিতেছেন,

"ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গলসাধনের জন্য আমি বারম্বার তোমার দিকে তাকাই। এই রাজ্যের সঙ্গে যেন আমার ধর্ম্মের সম্বন্ধ বাঁধিয়া গেছে — আমি যতই ইচ্ছা করি ইহার সম্বন্ধে আমি মনকে উদাসীন করিতে পারি না। * * * বিধাতা কেন আমাকে এখানে টানিয়াছেন জানি না --- মহারাজের সঙ্গে তিনি আমার একটি মঙ্গল সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন। * * * তোমার উপর যে মহৎ দায়িত্ব আছে তাহা ঠিকমত সাধন করিয়া যাইতে পারিলে তুমি জীবন সার্থক করিবে। সার্থকতার এত বড়

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্র ও অবসর সকলের জীবনে ঘটে না। * * * অতএব তোমাদের রাজ্যের মঙ্গলব্রত তোমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে — তাহা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য, কিন্তু যদি নিজের লাভ ক্ষতি ও আরামের দিকে লেশ মাত্র না তাকাইয়া প্রবৃত্ত হইতে পার তবে কিছুই অসাধ্য নহে।"

১৩১৫ বঙ্গাব্দ — রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর চিন্তায় ও কার্য্যে রবীন্দ্রনাথ নিরত রহিয়াছেন। নিঃস্বার্থ উপদেশাদি লাভ করিয়া গুণমুগ্ধ মহারাজও রাজ্যের উন্নতিজনক যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অকস্মাৎ কবির প্রিয়সুহৃদ্ মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ২৮ শে ফাল্গুন (মার্চ্চ ১৯০৯) মোটর দুর্ঘটনার ফলে ` কাশীধাম প্রাপ্ত হইলেন। যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ত্রিপুরা দরবার রোবকারী (ঘোষণা)

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর

প্রিয়সখা রাধাকিশোরের আকস্মিক এবং অকালমৃত্যুতে ত্রিপুরার দুর্দ্দিনে কবিচিত্ত বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নবীন মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের দুঃসময়ে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কবির পুত্রতুল্য মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে কয়েকদিনের মধ্যেই (১০ই চৈত্র) বোলপুর হইতে লিখিতেছেন, মহারাজকুমারকে লিখিত পত্র, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮

"তোমার এই পরম দুঃসময়ে তোমার ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবেন।

সুখংবা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসিত হৃদয়েনাপরাজিতা —

* * *

"এখন তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ যে ত্রিপুরার রাজ্যভার যাঁহার (বীরেন্দ্রকিশোর) প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে কায়মনোবাক্যে তাঁহার আনুকূল্যে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে — কারণ, তোমাদের রাজ্যের কল্যাণ তোমাদের সকলের কল্যাণ।

* * *

"দূরে থাকিয়াও আমি ত্রিপুরার মঙ্গলকামনায় বিরত থাকিব না। যখন দেখিব তোমরা দুই ভ্রাতায় দৃঢ়ভাবে মিলিত হইয়া তোমাদের সিংহাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং রাজলক্ষ্মীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছ — দেখিব তোমাদের রাজকোষ সচ্ছল, তোমাদের প্রজাগণ সুখী, সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং সিংহাসনের চারিদিকে কোনো কলুষ নাই — তখন আমার অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ হইবে।"

লক্ষ্য করিবার বিষয় চিঠির প্রারম্ভে উদ্ধৃত সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটি। ইহা কবির অত্যন্ত প্রিয় এবং অনেক দুঃখ-দুঃসময়ে তিনি ইহা হইতে শক্তিসঞ্চয় করিয়াছেন। কবিজায়া মৃণালিনী দেবীকে এবং কন্যা মীরাকে লিখিত পত্রাদিতেও এই একই শ্লোকের উদ্ধৃতি পাই। পুত্রসম ব্রজেন্দ্রকিশোরকেও পিতৃবিয়োগব্যথা প্রশমনে এবং কর্ত্তব্যের পথে বলসঞ্চয়ের জন্য এই একই মন্ত্র স্মরণ করিয়াছেন। চিঠিপত্র—১ম ও ৪র্থ খণ্ড

অপ্রকাশিত মূল পত্র

নবীন মহারাজের এবং রাজ্যের কল্যাণচিন্তায় নিয়োজিত রবীন্দ্রনাথ ২৭শে ভাদ্রের পত্রে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে পুনরায় লিখিলেন,

"আপাততঃ তোমাদের রাজকার্য্যে শৃঙ্খলাবিধান ও শান্তিস্থাপন হইয়াছে সংবাদ পাইলে আমি নিরুদ্বিগ্ন হইব। * * * গোড়াতেই বিঘ্নের সহিত তোমাকে যে সংগ্রাম করিতে হইতেছে ইহাতে মঙ্গলই আশা করি। পথ সহজ হইলে জড়তা আক্রমণ করে। * * * ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতিচূড়েই তোমার জীবনের সার্থকতা প্রতিষ্ঠালাভ করিবে।"

১৩১৮ বঙ্গাব্দ — ত্রিপুরার স্বনামধন্যা মহিলা স্বভাবকবি মহারাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী হইতে তৎরচিত "শোকগাথা" এবং "কণিকা" কাব্যগ্রন্থ দুইটি উপহার প্রাপ্ত হইয়া কবি বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন। রাজকন্যার সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ কলানৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লিখিলেন (১৭ই শ্রাবণ),

অপ্রকাশিত পত্র (উজীর বাড়ীতে সংরক্ষিত)

"আপনার এই কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের একটি স্বাভাবিক সৌরভ অনুভব করি। ইহাদের সৌন্দর্য্য বড় সরল এবং সুকুমার — অথচ কলানৈপুণ্যও আপনার পক্ষে স্বাভাবিক — এই নৈপুণ্য আপনার শেষ কাব্যগ্রন্থটিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।"

১৩১৯ বঙ্গাব্দ — রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে, ব্যবস্থাপনায় এবং ত্রিপুরা রাজদরবার কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থানুকুল্যে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কবির বন্ধু মহিম ঠাকুরের পুত্র, ত্রিপুরার অন্যতম কৃতী সন্তান সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা (রেণু সাহেব) কবির সঙ্গেই আমেরিকা গমন করিলেন। রেণু সাহেবের রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর সুশিক্ষালাভ সম্বন্ধে কবি নানারূপ বিকল্প প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইনি অবশেষে আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা সম্বন্ধে গবেষণামূলক জ্ঞান অর্জ্জন করতঃ এম্-এ পাশ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যাত্রার গোড়ার দিকে সমুদ্র ছিল অশান্ত। "সিটি-অব-গ্লাসগো" নামক জাহাজ হইতে কবি কন্যা মীরাদেবীর নিকট পরিহাস করিয়া লিখিতেছেন,

রবীন্দ্র জীবনী ২য় খণ্ড

"সোমেন্দ্রটা মাঝে মাঝে মাথা ঘুরচে বলে ক্যাবিনে চিৎ হয়ে পড়ে চব্বিশ ঘন্টা ঘুমিয়ে নিচ্চে * * * রাজকীয় চালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আহার চলচে — স্বয়ং ত্রিপুরার মহারাজকেও কোনোদিন এত আরাম করতে দেখিনি।"

চিঠিপত্র, ৪র্থ খণ্ড (৮নং পত্র)

এবার কবির লণ্ডনে অবস্থানকালে উইলিয়ম রথেন্‌ষ্টাইন, ষ্টপফোর্ড ব্রুক্‌স্, ওয়েল্‌স্, ইয়েট্‌স্, রাসেল প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদিগের সহিত সাক্ষাৎকার, আলোচনা ও ভাববিনিময় হয়। এবারকার বিদেশযাত্রাটিও তাই ঘটনা-সমাবেশের তাৎপর্য্যে স্মরণীয়। ত্রিপুরার শিক্ষাব্রতী সোমেন্দ্রচন্দ্র প্রখ্যাত মনীষিগণের সহিত কবিসান্নিধ্যে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। রথেনষ্টাইনের লণ্ডনস্থ

Calcutta Municipal Gazette, Tagore Supplement, 1941 (Page XVI)

বাসগৃহে গৃহস্বামীসহ রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের গ্রুপ ফটোগ্রাফে আমরা *সোমেন্দ্রচন্দ্রকেও দেখিতে পাই।

১৩২০ বঙ্গাব্দ — 'নোবেল'-পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে ত্রিপুরার জনগণ মিলিত হইয়া আগরতলায় অভিনন্দন সভার অনুষ্ঠান করিয়াছে সংবাদ অবগত হইয়া কবি ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখিলেন, প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪৮

"আমার সম্মানে তোমরা যে আনন্দ বোধ কর ইহাই আমার যথার্থ পুরস্কার।"

প্রবাসজীবন শেষ করিয়া শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ত্রিপুরার সেই ছেলেটি — বন্ধু মহিমের পুত্রকে কবির মনে পড়িল যাহাকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি আমেরিকায় রাখিয়া আসিয়াছেন। সোমেন্দ্রকে ২৬শে আশ্বিনের পত্রে লিখিলেন,

"তুই তোর শিক্ষা সমাধা করে আয়, বড় হয়ে আয়, পূর্ণ হয়ে আয়, বিশ্বপৃথিবীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে আয়।"

পরমস্নেহভাজন মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর ত্রিপুরার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আনন্দজ্ঞাপনপূর্ব্বক এবং উপদেশসহ রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে লিখিতেছেন (১১ই ফাল্গুন), ঐ

"তোমাদের রাজ্যশাসনটিকে তোমরা ধর্ম্মসাধনরূপে পালন করিও — কোথাও কোন শৈথিল্য ঘটিতে দিও না। কোনো যথার্থ বড় কাজ কেবল তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা হইতেই পারে না, ধর্ম্মবুদ্ধির প্রয়োজন। * * * যাঁহার হাতে ক্ষমতা আছে ক্ষমতাকে বিধানের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবার ভার তাঁহারই উপরে। * * * তোমাদের দেশের ভূগর্ভে অরণ্যে কান্তারে অনেক সমৃদ্ধি প্রচ্ছন্ন আছে — লক্ষ্মী তোমাদের ওখানে ধরাশয়নে সুপ্ত হইয়া রহিয়াছেন — তাঁহাকে জাগরিত কর — দেশের সর্ব্বত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বিস্তারিত কর — প্রজাদের প্রতি তোমাদের যে কর্ত্তব্য বহুকাল অনুষ্ঠিত রহিয়াছে তুমি তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে সাধন কর, তাহাতে তোমার জীবন সার্থক হইবে।"

১৩২৪ বঙ্গাব্দ — আমেরিকায় শিক্ষাসমাপনান্তে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা ইতিপূর্ব্বেই ত্রিপুরার শিক্ষাবিভাগে সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর ইতিমধ্যে মন্ত্রিত্বপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকার্য্য হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন — এই সংবাদ বেদনাদায়ক হইলেও কবিচিত্ত ত্রিপুরার হিতকামনায় পুনরায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ব্রজেন্দ্রকিশোরকে ত্রিপুরার শুভকর্ম্মে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ১১ই ভাদ্রের পত্রে সোমেন্দ্র দেববর্ম্মাকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন,

"লালুকে তাঁর কোণের ভিতর থেকে টেনে বের কর। * * জোর করে তাঁকে তাঁর আপনার স্থানটি অধিকার করতে হবে —

বন্ধ দুয়ার দেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে, হয়তো দুয়ার টলবে না —
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

শ্রীযুক্ত শৈলেশ দেববর্ম্মা হইতে সংগৃহীত

রাষ্ট্রনীতির গুরুগম্ভীর নিখাদ হইতে একই পত্রে সুর আবার পঞ্চমে বাজিল! প্রসঙ্গান্তরে কবি সোমেনের কাছে চাহিয়া পাঠাইলেন — ত্রিপুরার কয়টা সুপ্রসিদ্ধ বাঁশের বাঁশি! আবার সতর্ক করিয়া দিতেছেন, রন্ধ্রগুলি যেন করা না হয় — ওগুলি শান্তিনিকেতনেই করাইয়া লইবেন।

১৩২৬ বঙ্গাব্দ — শিলঙ-এ অবস্থানের পর সিলেট হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ত্রিপুরা দরবারের আমন্ত্রণে কার্ত্তিকমাসে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় আগরতলা আগমন করিলেন (ষষ্ঠ বার)। এবার সহরতলীতে কুঞ্জবনে শৈলচূড়ায় অবস্থিত বর্ত্তমান 'মালঞ্চাবাস' উদ্যানবাটিকার পূর্ব্ববর্ত্তী, নবনির্ম্মিত কুঞ্জবন বাংলায় অবকাশ যাপন করিয়া গেলেন। বর্ত্তমানকালে ইটালীয়ান-মোগল রীত্যনুযায়ী স্তরবিন্যস্ত উদ্যানভবন তখনও নির্ম্মিত হয় নাই। গোলাকৃতি শৈলশিখরদেশ এবং সানু-অঞ্চলটি তৃণ আচ্ছাদনে সুশ্যামল এবং ছায়াকীর্ণ। দূরদিগন্তের শ্যামতিমির বনচ্ছায়া পরম রমণীয়। এই কুঞ্জবন বাংলায় অবস্থানের স্মৃতি প্রসঙ্গে উত্তরকালে শান্তিনিকেতনে কবি বলিয়াছিলেন,

রাজমালা (বিদ্যালয় সংস্করণ)— ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"পৃথিবীতে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র অনেক দেখিয়াছি কিন্তু ঐ ত্রিপুরার কুঞ্জবনের শৈলশ্বেতভবন আমার স্মৃতি হইতে মলিন হইতে পারিতেছে না।"

এই প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা সংক্ষেপে সংযোজিত হইল। ত্রিপুরার সরকারী এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী। শান্তিনিকেতনের একটি প্রাক্তন ছাত্রসহ গিয়াছেন কবি-সন্দর্শনে অপরাহ্ন সময়। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তরাগে পশ্চিম গগন বিচিত্র শোভায় পরিশোভিত। বাংলার বারান্দায় উঠিবার পূর্ব্বেই দূর হইতে দুজনেরই নজরে পড়িল এক মহান্ দৃশ্য। কোন্ এক জ্যোতিষ্মান্ বিরাট পুরুষ যেন অদূরে ধ্যানমগ্ন-অচঞ্চল-ভঙ্গিমায় বারান্দায় দণ্ডায়মান! অস্তরাগের বিচিত্র বর্ণসমাবেশ তদীয় ঋষিকল্প সারা অবয়ব রক্তিম আভায় মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। সুনিপুণ ভাস্করের সার্থক-সৃষ্ট মর্ম্মরের প্রতিমূর্ত্তিটি যেন রূপপরিগ্রহ করিয়াছে! অস্তরাগটুকু মিলাইয়া গেলে তবেই উভয়ে বারান্দায় উঠিলেন। আশ্রমের প্রাক্তন বালক যোগেন্দ্রকে দেখিয়া উভয়কেই কবি নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বসাইলেন।

রবীন্দ্রনাথ উমাকান্ত একাডেমী স্কুল ভবনে এবার শুভ পদার্পণ করিলেন ১০ই নভেম্বর (১৯১৯)। পণ্ডিত কৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্কৃতে রচিত প্রশস্তি-পত্রদ্বারা কবি অভিনন্দিত হইলেন। স্কুলের হলের দক্ষিণদিকস্থ প্রশস্ত বারান্দায় ছাত্র ও শিক্ষকগণের সঙ্গে কবির এই মিলনের স্মৃতি এখনও সমকালীন অনেকের মনে অম্লান হইয়া আছে। স্কুলের প্রধান অধ্যক্ষ শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কবিকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন,

Visitor's Book, U.K. Academy, Agartala

"পশ্চিম গগনে রবির অস্তগমন দেখিতেই আমরা চিরকাল অভ্যস্ত কিন্তু আজ পশ্চিম গগনে রবির অভ্যুদয়ের বর্ণ সমারোহে সারা প্রতীচ্যের দিঙ্‌মণ্ডল — তথা সমগ্র বিশ্ব উদ্ভাসিত!"

অধ্যক্ষ মহাশয়ের এই ভাষণে কবির 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্তির খ্যাতিই সূচিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক ও ছাত্রগণকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন।

কবির আগরতলায় অবস্থানকালে আর একটি স্মৃতির কথা সত্যই অবিস্মরণীয়! অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত কালীকচ্ছনিবাসী অন্ধগায়ক দ্বিজদাস রায় তৎকালে তাঁহার গানের জন্য ও অমায়িকতায় সহরবাসীর নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তিনিও কবি-সন্দর্শনে কুঞ্জবন গমন করিয়া, দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতায় রবীন্দ্রনাথকে দেহতত্ত্ব-বিষয়ক কয়েকটি প্রাচীন মালসীগান শুনাইয়া আসিলেন। কবি মুগ্ধবিস্ময়ে অন্ধগায়কের সঙ্গীত শুনিলেন এবং কলিকাতা গিয়া তাঁহার চক্ষু-চিকিৎসা সম্বন্ধে ব্যবস্থাদি করিয়া দিলেন। কিন্তু অন্ধের চক্ষু ইতিপূর্ব্বেই চিকিৎসার অতীত হইয়া গিয়াছিল।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্মৃতি হইতে

এইবার কবির সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্র ও বিবিধকলায় পারদর্শী মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আলাপ আলোচনাও হইল। সম্ভবতঃ এই সময়ে অথবা অত্যল্পকাল পর শান্তিনিকেতনের হাসপাতাল নির্ম্মাণ কার্য্যে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর এককালীন পাঁচ হাজার টাকা দান করেন এবং আরও পাঁচ হাজার টাকা সাহয্যের প্রতিশ্রুতি কবিকে জ্ঞাপন করেন।

কবির ভাষণ রবি, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৩৫ ত্রিং রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের ব্যবস্থায় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই তথায় মণিপুরী নৃত্যাদি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য ত্রিপুরাবাসী মণিপুরী নৃত্য ও কারুশিল্পী বুদ্ধিমন্ত সিংহ রাজকুমার আগরতলা হইতে শান্তিনিকেতনে প্রেরিত হইলেন। শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় বুদ্ধিমন্ত সিংহকে মণিপুর হইতে আগত বলিয়া তদীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর মহাশয় তদীয় স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "আশ্রমের নৃত্যের ইতিহাসে গুরুদেবের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। * * * আশ্রমে নৃত্যশিক্ষা দানের জন্য আগরতলা-নিবাসী মণিপুরী নর্ত্তক মণিপুর রাজপরিবারের বুদ্ধিমন্ত সিংহকে শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলার পাশের খোলা প্রাঙ্গণে ছিল নৃত্যশিক্ষার আসর। গুরুদেব নিজে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিয়ে সকলের নৃত্যানুশীলন পর্য্যবেক্ষণ করতেন। গানও অনেকগুলি নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন নাচের সঙ্গে গাইবার জন্য। তার একটি গান ছিল 'আয় আয় রে পাগল ভুলবি রে চল

রবিতীর্থে — অসিতকুমার হালদার

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা— শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর পৃঃ (৭৯)

আপনাকে।" রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিমন্তের পরিচালনায় শান্তিনিকেতনে চারু ও কারুকলা শিক্ষার অগ্রগতিতে সন্তোষ লাভ করিলেন। তথায় ছাত্রীগণের মধ্যেও নৃত্যশিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য কবি এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মহারাজের নিকট ১৯শে মাঘ তারিখের লিখিত পত্রে লিখিতেছেন,

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরকে লিখিত অপ্রকাশিত পত্র

"বুদ্ধিমন্ত সিংহকে আশ্রমে পাঠাইয়াছেন সেজন্য আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। ছেলেরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার নিকট নাচ শিখিতেছে। আমাদের মেয়েরাও নাচ ও মণিপুরী শিল্পকার্য্য শিখিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। মহারাজ যদি বুদ্ধিমন্ত সিংহের স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবার আদেশ দেন তবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।"

আর একটি পত্রে কবি মহারাজকে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। বীরেন্দ্রকিশোর এবং কবির মধ্যে অনেকবার পত্রবিনিময় হইয়া থাকিলেও কেবলমাত্র উপরোক্ত দুইখানি পত্রই এযাবৎ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

(১) স্মরণ শিখা —ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রবি, চৈত্র, ১৩৩৫ ত্রিং

১৩২৭ বঙ্গাব্দ — স্কুলপাঠ্য রাজমালার লেখক ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের অতি নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ভাষার আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত একটি প্রবন্ধ কবির আমেরিকা সফরকালে কর্ণেল মহিম ঠাকুর তদীয় অভিমতের জন্য নিউইয়র্কে পাঠাইয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে নিউইয়র্ক হইতে ৭ই পৌষ (১৩২৭) তারিখে ভূপেন্দ্রচন্দ্রকে লিখিলেন,

"বাংলাভাষা ভারতের সকল প্রদেশের লোক আপনি শিখিতেছে — কেহ তাহাদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করে নাই। যতদিন বাংলাদেশে প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইতে থাকিতে ততদিন বাংলাভাষা আপনার আলোকে আপনি দশদিক উদ্ভাসিত করিবে।"

মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের মুখপত্র— প্রাচী, ৮ম বর্ষ, ১৯৫৬

বাংলাভাষা সম্বন্ধে অন্যান্য ইয়োরোপীয় জাতির তুলনায় ইংরেজদের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রসঙ্গে ভূপেনবাবুর নিকট কবি লিখিত আরও একটি পত্র (সন তারিখ বিহীন) স্থানীয় কলেজের বার্ষিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর

ত্রিপুরার দরবার রোবকারী (ঘোষণা)

১৩৩০ বঙ্গাব্দ — ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর পরলোক গত হইলে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক যুবরাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য রাজত্বলাভ করিলেন। রাজার অপ্রাপ্তবয়সহেতু রাজ্যশাসনভার একটি শাসন পরিষদের প্রতি ন্যস্ত হইল।

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৩৩২ বঙ্গাব্দ — ত্রিপুরার প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী (মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের জামাতা) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মাকে তাঁহার শুভপরিণয়ান্তে পরিহাস করিয়া কবি ১০ই বৈশাখ শান্তিনিকেতন হইতে লিখিলেন,

"এবার বসন্তোৎসবের অভিনয়ে তোর এসরাজের ছড়ির কথাটা বারে বারে মনে এসেছিল। তোরাই ত এতদিন এখানে ছিলি বসন্তরাজের দলবল, তোরা এখান থেকে দূরে চলে গেলে শালের মঞ্জরী বৃথাই ফুটবে। রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন হয়েছিল প্রাসাদ থেকে বনে, তোর নির্ব্বাসন হ'ল বন থেকে প্রাসাদে। কিন্তু তোর কতদিনের মেয়াদ?" শারদীয়া দেশ, ১৩৫৩

আগরতলা-নিবাসী মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত নবকুমার সিংহ শান্তিনিকেতনের জন্য নৃত্যশিক্ষক মনোনীত হইয়াছেন। কয়েকমাস পরই তিনি শান্তিনিকেতনে স্বীয় কার্য্যে যোগদান করিলেন। এ উপলক্ষে কবি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণকে লিখিতেছেন (১৬ই আশ্বিন),

"নাচের শিক্ষক পাওয়া যাবে শুনে খুব খুশী হলুম। মৃদঙ্গ করতাল কলকাতায় কি কিনতে পাওয়া যাবে? যদি তোমাদের ওখানে কেনবার সুযোগ থাকে, তাহ'লে দাম জানালে টাকা পাঠিয়ে দেব। এবার বাঁশের বাঁশি আনতে ভুলো না।" ঐ

আগেই দেখিয়াছি, সোমেন্দ্র দেববর্ম্মার কাছেও কবি ত্রিপুরার বাঁশের বাঁশি আনিতে অনুরোধ পাঠাইয়াছেন, এ চিঠিতেও বাঁশির কথা রহিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, ত্রিপুরা হইতে আরও অনেকবার শান্তিনিকেতনের জন্য তিনি ছেলেদের সঙ্গে বাঁশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'তিপ্রা বাঁশি' কবির খুবই প্রিয় বস্তু ছিল।

কাছাকাছি সময়েই ভগবৎ-আরাধনা সম্বন্ধে পুনরায় শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণকে লিখিতেছেন (তারিখবিহীন পত্র),

"পৌত্তলিক তাকেই বলি, যে মানুষ আসনকেই সত্য বলে জানে — সেই আসনে দেবতাকে দেখে না, যে মানুষ অপরূপকে বাদ দিয়ে রূপকে নিয়ে থাকে, যার কাছে মন্ত্র রয়েছে কিন্তু মন নেই, বাক্য রয়েছে অর্থ নেই। রূপের সঙ্গে ভাবের, অন্তরের সঙ্গে বাইরের মিল করে তবে পূজা।" ঐ

১৩৩২ বঙ্গাব্দ — পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা-ময়মনসিংহ-কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চল সফরের শেষে, মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ কয়দিন নিরালায় বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সদলবলে আগরতলায় শুভ পদার্পণ করিলেন ১০ই ফাল্গুন (৭ম ও শেষবার)। এবারে কবি অবস্থান করিলেন কুঞ্জবন-প্রাসাদে (যাহা বর্ত্তমানে চিফ কমিশনারের সরকারী বাসভবন)। এবারকার জনসম্বর্দ্ধনায় উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল, স্থানীয় 'কিশোর-সাহিত্য-সমাজ' কর্ত্তৃক উমাকান্ত একাডেমী হলে ১২ই ফাল্গুনের সম্বর্দ্ধনা। অভিনন্দনের উত্তরদান প্রসঙ্গে রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে [১] বলিলেন;

রবি—১৩৩৫
ত্রিপুরাব্দ—রবীন্দ্র
সম্মেলন সংখ্যা

"শুভদৈববশতঃ অনেক সম্মান — এমনকি য়ুরোপীয় রাজহস্তেও — আমার ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু আমার এই ঘরের এবং স্বদেশের রাজার কাছ থেকে যে সম্মান লাভ করে এসেছি — ব্যক্তিগত জীবনে আমার কাছে তার মূল্য অনেক বেশী। * * * এই রাজপরিবারে বহুকাল থেকে বাংলা ভাষার সম্মান চলে আসছে। * * * দেশের রাজার যেমন কর্ত্তব্য প্রজাকে পালন করা, তেম্‌নি ভাষাকে রক্ষা করা। * * * মাতৃভাষাকে এমন সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা এ যে তাঁদের রাজোচিত সৌজন্যেরই অঙ্গ। এই বৈদগ্ধ্যে, স্বদেশের সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্যের এই রসজ্ঞতায় তাঁদের আভিজাত্যের গৌরব ঘোষণা করে।"

ত্রিপুরার চিরপরিচিত মাটি ও জনগণের নিকট সর্ব্বশেষ বিদায়বাণীতে এই কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমৃতবাণী শেষ করিলেন,

"আমার এই শেষ কথা জানিয়ে যাই যে, আমি যশোভাগ্যবান কবির মতো এখানে মান নিতে আসিনি; আমি স্বর্গত মহারাজদের বন্ধুরূপে যেমন আমার তরুণ বয়সে এখানে প্রীতি ও শ্রদ্ধালাভ করেছি আজ আমার শেষ বয়সেও সেই আত্মীয়তার শেষ রেশটুকু ভোগ করে বলে যেতে এসেছি .....।"

আগরতলায় অবকাশযাপনের কর্ম্মসূচীর মধ্যে কবি সহরের সন্নিকটস্থ প্রতাপগড় কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন, মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের গৃহে একাধিকবার রাসনৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া তথায় কিশোর মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্যের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়, 'রাজমালা' ও 'গীতচন্দ্রোদয়' সম্পাদন সম্বন্ধে আলোচনা, ত্রিপুরার সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক মন্দিরপ্রাসাদাদি ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়াদি সংরক্ষণ, দীর্ঘদিনের পুরাতন বন্ধু কর্ণেল মহিমচন্দ্রের পরিবারবর্গের পুনর্মিলন ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

রবীন্দ্র জীবনী,
৩য় খণ্ড

'দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা', 'ফাগুনের নবীন আনন্দে', 'এসো আমার ঘরে', 'বনে যদি ফুটল কুসুম', 'আপন গন্ধে মাতোয়ারা' প্রভৃতি কয়েকটি সংগীত রবীন্দ্রনাথ এবার আগরতলায় রচনা করিলেন। (২)

১৪ই ফাল্গুন কবি সদলবলে কলিকাতার পথে আগরতলা পরিত্যাগ করেন।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ — রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আমন্ত্রণে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর এবারকার ইয়োরোপ সফরের সময় কবির অনুগামী হইলেন। এই গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী এক অধ্যায়ে এসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দ — মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন।

শান্তিনিকেতনে কলাভবনে শিক্ষার্থী শ্রীযুক্ত শৈলেশ দেববর্ম্মা আগরতলায় স্বগৃহে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। আরোগ্য-

(১) এবং (২) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।



২৯। এচিং — রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী



৩০। নটীর পূজা (উড্‌কাট) রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী



৩১। কবির নীড় (জলরঙে)। — রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কামনা জ্ঞাপনপ্রসঙ্গে বিদ্যার্থী মনে বিদ্যালয়ের মমতার স্পর্শটি জাগ্রত করিয়া ৪ঠা শ্রাবণের পত্রে কবি তাঁহাকে লিখিতেছেন,

"এখানে বেশ শ্রাবণের ধারা নেমেচে। আমাদের আশ্রমের ছেলেরা বেশ আনন্দে খোয়াইর মাঠে ভিজচে। এ খবরে তোমার মনটাও হয়তো একটু সাড়া দিয়ে উঠবে।" — শ্রীশৈলেশ দেববর্ম্মার সংগ্রহ হইতে (অপ্রকাশিত পত্র)

এখানেই উল্লেখ করা যায় যে পরের বছর ৬ই বৈশাখের চিঠিতে কবি শ্রীযুক্ত শৈলেশকে পুনরায় লিখিতেছেন,

"সোমেন্দ্র কেমন আছে? দেখা হলে তাকে বলবে, সে এদিকে আসবার সময় যেন আমার জন্য তোমাদের দেশের খাঁটি মধু নিয়ে আসে।"

ত্রিপুরার চিত্রশিল্পী ও বিশ্বভারতী কলাভবনের তৎকালীন অধ্যাপক ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা এই বৎসর রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর ভারত পরিভ্রমণে মালয়, জাভা ও বালীদ্বীপের পথে কবির অনুগামী হইলেন। — রবীন্দ্র জীবনী, ৩য়খণ্ড

১৩৩৬ বঙ্গাব্দ — লণ্ডনস্থ নবনির্ম্মিত 'ইণ্ডিয়া হাউস' এর আভ্যন্তরিক অলঙ্করণ পরিকল্পনা রূপায়ণে নিযুক্ত চিত্রশিল্পীগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণও অন্যতম। সরকারী বৃত্তি লইয়া দেশের প্রতিভা হেঁট হইবে আশঙ্কায় কবি প্রসন্ন হইতে পারিতেছেন না। বিদেশযাত্রার প্রাক্‌কালে শান্তিনিকেতন হইতে সস্নেহে তাঁহাকে লিখিতেছেন,

"ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তুমি বিলাত যাচ্ছ এ সংবাদে আমি কিছুমাত্র আনন্দবোধ করচিনে। যদি বিজ্ঞান শিখ্‌তে যেতে আপত্তি করতুম্ না। কিন্তু চিত্রকলা? * * * পিঠে ওদের দাগা নিয়ে তবে আমরা পণ্যের মতো হাটে বিকোতে যাব। * * * অজন্টার চিত্রীদের সম্বন্ধে এই গৌরব চিরদিন করব যে তাঁরা সম্পূর্ণ আমাদেরই — সাউথ কেন্সিংটনের লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত নয় তাঁরা। * * * আমাদের আপিসে পরোপজীবীদের দল আছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরের ছাত্রদের ভিড় — কিন্তু ভারতে ভারতীয় রাজ্যে কোথাও কি একটা জায়গা থাকবে না যেখানে বীণাপাণির বীণার অন্ততঃ একটি তারও এখানকারই খনির খাঁটি সোনায় তৈরি! সর্ব্বত্রই বিলিতী হাটের এইট্টিন ক্যারাট্ চালাতে হবে? * * * সাউথ কেন্সিংটনের দাগা দেশের আশীর্ব্বাদকে ব্যর্থ করবে এ মনে জেনে তোমার বিদেশযাত্রায় আমি প্রসন্নতা প্রকাশ করি কেমন করে?" — প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪৮

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর পাইয়া কবি আশ্বস্ত হইলেন। আগের চিঠিটার আঘাতের উপর স্বভাবকারুণ্যের সস্নেহ প্রলেপ বুলাইয়া দিলেন পরবর্ত্তী পত্রে (১১ই নভেম্বর, ১৯২৯),

"তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হলুম। বিলিতী মাষ্টারের হাতে তোমরা যে ছাত্র ব'নে যাবে না, এটা ভালো কথা। ওখানকার চিত্রকলা ভালো করে দেখবে, বিচার করবে, তার থেকে যেটুকু সম্পূর্ণভাবে আপনার করে নিতে পারো সে চেষ্টাও ছাড়া উচিত নয় — কেবল নিজের মুণ্ডটা নিজের কাঁধের উপরে যেন থাকে এই হলেই হোলো।" — ঐ

১৩৩৭ বঙ্গাব্দ — রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোপে অবস্থান করিতেছেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগন তখন ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন। গান্ধীজির লবণ আইন ভঙ্গ, তাঁহার এবং জহরলালের কারাবরণ, শোলাপুরে

দাঙ্গা ও 'মার্শাল ল', চট্টগ্রামে অস্ত্রাগারলুণ্ঠন, দেশব্যাপী সরকারী দমননীতির চণ্ডলীলা — দেশের এই সকল উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে কবিচিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত। অক্সফোর্ডে একদিকে কবির 'হিবার্ট লেকচার', অপরদিকে মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে প্রচারিত সাবধানবাণী — এই পটভূমিকায় শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ তখন লণ্ডনে কর্ম্মরত। কবি বার্লিন পৌঁছার প্রাক্কালে (১০ জুলাই, ১৯৩০) নৈবেদ্যকাব্য-গ্রন্থভুক্ত 'ত্রাণ' শীর্ষক —

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব্বতুচ্ছভয়,
লোকভয়, রাজ্যভয়, মৃত্যুভয় আর।" ইত্যাদি

বিখ্যাত সনেটটির একটি অলংকৃত লিপি শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণকে প্রেরণ করিলেন। কবির নৈবেদ্যযুগের সাধনা, আরাধনা আরও এক বৎসর পর 'প্রশ্ন' শীর্ষক কবিতায় মূর্ত্ত হইয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে শোণিতাপ্লুত জিজ্ঞাসায় আত্মপ্রকাশ করিল —

"তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
তুমি কি বেসেছ ভালো?"

১৩৩৮ বঙ্গাব্দ — পৌষ মাসে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। কলিকাতা টাউনহল প্রাঙ্গণে ৯ই পৌষ তারিখে উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান 'রবীন্দ্রশিল্পপ্রদর্শনী ও মেলা'র উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন করিলেন ত্রিপুরার নবীন মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য। উদ্বোধনী ভাষণে ত্রিপুরার সহিত কবির অন্তরঙ্গ ও সুদীর্ঘকালের নিবিড় সম্বন্ধ সম্পর্কে উল্লেখ করিতে গিয়া মহারাজ বলিলেন,

রবীন্দ্র জীবনী, ৩য় খণ্ড

"সামান্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনও তাঁহার (কবির) নিকট উপেক্ষার বস্তু নহে শান্তিতে শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া যাহাতে উহা অখণ্ড বিশ্বজীবনের মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট না হয়, — উপদেশের দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা, নিজের জীবনব্যাপী কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সর্ব্বদাই তিনি এই আদর্শকে আপামর সাধারণ সকলের সমক্ষেই তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই জন্যই শিল্পকলাকে কোনোদিনই তিনি কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞের উপভোগ বলিয়া মনে করেন নাই; নিজের দেশের 'শিল্পকলাকে সমগ্রভাবে, যথার্থভাবে দেখবার শিক্ষা' আমরা তাঁহারই নিকট পাইয়াছি।"

জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রচারিত মুদ্রিত ভাষণ হইতে সংগৃহীত

১৩৪০ বঙ্গাব্দ — ত্রিপুরার নৃত্যশিল্পী ও শিক্ষক শ্রীযুক্ত নবকুমার সিংহ শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষাদানে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বোম্বাই, আমেদাবাদ ইত্যাদি স্থানে শিক্ষাদানান্তে তিনি পুনরায় সাময়িকভাবে শান্তিনিকেতনে আগমন করায় রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠা কন্যাকে ১৮ই মার্চ্চ এক চিঠিতে লিখিতেছেন,

চিঠিপত্র, ৪র্থ খণ্ড (৬৮ নং পত্র)

"মণিপুরের নবকুমার এসেচে, ছুটিতে থাকবে। নাচ শেখবার দুর্লভ সুবিধা হয়েচে — এটাকে কিছুতেই উপেক্ষা করিস্‌নে।"

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে এবছর নিযুক্ত রহিয়াছেন (১৩৪০)। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কমলা লেকচার' প্রদানের পর শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন, শ্রীনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে। তথা হইতে শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণকে লিখিতেছেন,

> "হঠাৎ শেষ বয়সে প্রোফেসারীর দায় চেপেছে আমার স্কন্ধে, আমাকে ঘোরাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিকে — সে বিদ্যালয় সরস্বতীর শতদলপদ্ম নয় — বক্তৃতা দিতে হয়, বীণা গুঞ্জরণের সঙ্গে তার স্বর মেলে না। মানস সরোবরে যদি বা যাই, মধুসংগ্রহের জন্য নয়, কাদা ঘেঁটে মাছ ধরার জন্য, হাটের দাবী মেটাতে হবে।"

শারদীয়া দেশ, ১৩৫৩

১৩৪১ বঙ্গাব্দ — বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ সদলবলে সিংহল যাত্রা করেন। সিংহলের বহুস্থানে শান্তিনিকেতনের শিল্পিগণ কর্ত্তৃক কবির 'শাপমোচন' নাট্য অভিনীত হয়। এই গীতি ও নৃত্যনাট্যের রূপায়ণে ত্রিপুরার নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত নবকুমার সিংহের অবদান অনেকখানি ছিল। নটীর পূজার নৃত্যরূপায়ণে রবীন্দ্রনাথ নবকুমারের প্রতিভার পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। নবকুমারও শাপমোচন-শিল্পীগোষ্ঠীর সঙ্গে এবার সিংহলে কবির অনুগামী হইলেন। শান্তিনিকেতন হইতে সমগ্রদেশে মণিপুরী নৃত্যের সমাদর ও প্রসারের বিষয়ে শিল্পী নবকুমারের কৃতিত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় প্রকৃতই বলিয়াছেন,

> "শান্তিনিকেতনে আসার আগে তিনি (নবকুমার) ছিলেন প্রকৃত নর্ত্তক। যা শিখেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করতেন তিনি। নতুনভাবে নাচ রচনার কথা তিনি পূর্ব্বে কখনো ভাবেন নি। এখানে এসে প্রথম সেই পথে তাঁকে হাত দিতে হয় এবং সকলের পরামর্শক্রমে নতুন সম্ভাবনার পথ তিনি দেখাতে সক্ষম হন। শ্রীযুক্ত নবকুমার সিংহ এদিক থেকে এযুগের মণিপুরী নৃত্য আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এঁরই জন্য শিক্ষিত দেশবাসী মণিপুরী নাচের মাধুর্য্য উপলব্ধি করল নটীর পূজার সময়ে।"

শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নাচ— শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ, আনন্দ-বাজার পত্রিকা, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন,

> "মণিপুরী নৃত্য পদ্ধতিতে গুরুদেবের গানের সঙ্গে অভিনয় করার যোগ্যতা নবকুমারের মধ্যে যতটা প্রকাশ পেয়েছিল, পরবর্ত্তী শিক্ষকদের মধ্যে তা দেখিনি।"

এদিক হইতে নৃত্যশিল্পী ও আচার্য্য নবকুমার ত্রিপুরার বিশেষ গৌরবের স্থল, সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের যাদুস্পর্শেই নবকুমারের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে আগরতলা হইতে চন্দ্রজিৎ সিংহ প্রমুখ আরও ২/৩ জন নৃত্যশিক্ষক অল্পকালের জন্য শান্তিনিকেতনে গমন করিয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতনের শিল্পপ্রদর্শনী ও গীতোৎসব উপলক্ষে কার্ত্তিক মাসে রবীন্দ্রনাথ মান্দ্রাজ সহরে তখন অবস্থান করিতেছিলেন। সহরে শাপমোচন গীতিনাট্যের অভিনয় চলিতেছে। দীর্ঘকালের প্রিয়সুহৃদ ত্রিপুরার সুপণ্ডিত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লোকান্তরের সংবাদ

আসিল আগরতলা হইতে। পরমস্নেহভাজন ভূপেন্দ্রচন্দ্র, জিতেন্দ্রচন্দ্র ও শিল্পী রমেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুতে কবি শোককাতর পুত্রগণকে সান্ত্বনাজ্ঞাপক পত্রে লিখিতেছেন (৩১ অক্‌টোবর, ১৯৩৪),

অপ্রকাশিত পত্র

"যাঁরা আত্মার শান্তি পেয়েছেন মৃত্যুর শোচনীয়তা তাঁরা দূর করে দিয়ে যান — তাঁদের জীবনের সফলতা মৃত্যুতে পরিপূর্ণ হয়। এই কথা স্মরণ করেই তোমরা সান্ত্বনা লাভ করো।"

১৩৪৩ বঙ্গাব্দ — ত্রিপুরার রাজকুমার রমেন্দ্রকিশোরের সহিত (মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র) কুচবিহারের রাজকন্যা ইলাদেবীর শুভপরিণয় উপলক্ষে, শান্তিনিকেতনে চামড়ায় সুদৃশ্য বাঁধাই কয়েকখণ্ড স্বীয় কাব্যগ্রন্থে আশীর্ব্বাণী লিপিকরতঃ নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন রবীন্দ্রনাথ। রাণী ইলাদেবী আজ স্বর্গলোকে।

১৩৪৫ বঙ্গাব্দ — বিশ্বভারতী কলাভবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ত্রিপুরার ছেলেটি — শৈলেশ দেববর্ম্মাকে বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানাইতেছেন রবীন্দ্রনাথ (১০/১০/১৯৩৮)। চিঠির একদিকে আশীর্ব্বাদ লিখিয়া অন্যদিকে রঙীন্ একটি ছোট ছবি স্বয়ং আঁকিয়া পাঠাইলেন। বীরভূমের মুক্তপ্রান্তরে ঘনশ্যামল একটি আম্রকুঞ্জ — তার আড়ালে দূরে দেখা যায় নীলাভ জলরেখা। এ কি প্রাক্তন আশ্রমিকের জন্য গুরুদেবের চিরসঞ্চিত ও চিরন্তন শুভ কামনা?

Tripura Administration Report, 1937-40

কবির বিশেষ আমন্ত্রণে ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর শান্তিনিকেতনে গমন করতঃ তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন (২২শে-২৩শে পৌষ)। আম্রকুঞ্জে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসিগণ মহারাজকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। রাজাকে অভিনন্দিত করিয়া আশ্রমবাসিগণ স্বস্তিবচনে বলিলেন (১),

রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থ খণ্ড

মধুমতীরোষধীর্দ্যার আপো মধুমান্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্বরিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম।।

অনন্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিনন্দনে মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন (২),

প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৫

"আজ একথা গর্ব করে তোমাকে বলবার অধিকার আমার হয়েছে যে, ভারতবর্ষের যে কবি পৃথিবীতে সমাদৃত, তাঁকে তাঁর অনতিব্যক্ত খ্যাতির মুহূর্ত্তে বন্ধুভাবে স্বীকার করে নেওয়াতে ত্রিপুর রাজবংশ গৌরব লাভ করেছেন। তেমন গৌরব বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের কোনো রাজকুল আজ পর্য্যন্ত পাননি। * * * যে সংস্কৃতি, যে চিত্তোৎকর্ষ দেশের সকলের চেয়ে বড়ো মানসিক সম্পদ, একদা রাজারা তাকে রাজৈশ্বর্য্যের প্রধান অঙ্গ ব'লে গণ্য করতেন, তোমার পিতামহেরা সে কথা মনে মনে জানতেন।" * * *

মহারাজের সম্মানে শান্তিনিকেতনে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য অভিনীত হইল। তাঁহাকে আশ্রমের ও বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ দেখানো

(১) এবং (২) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

হইল। বিশ্বভারতীর পরিবর্দ্ধিত সংগীতভবনের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য ত্রিপুরেশ্বর বীরবিক্রমকিশোর কুড়ি হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দ — ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর নানাদেশ লেখকের পরিভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ও বন্ধুদের কারো কারো সঙ্গে দেখা ও পরিচয়ের সংবাদ কবিকে জানাইলে কবি একটি পত্রে লিখিতেছেন (১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০),

> "জানিনে আইনষ্টাইনের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে কিনা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ স্মরণীয়। আমি দূর বিদেশীয়দের কাছ থেকে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পেয়েছি সে তো তোমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।"

অপ্রকাশিত পত্র

১৩৪৭ বঙ্গাব্দ— কবির ক্যালিম্পং অবস্থানকালে ত্রিপুরার রাজমাতা মহারাণী প্রভাবতী মহাদেবীর সহিত অল্প সময়ের জন্য মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর তথায় গমন করিলেন। বহুদিন অদর্শনের পর পুত্রসম 'লালুকে' দেখিয়াই এবং প্রণাম নিবেদনের সময় পর্য্যন্ত না দিয়াই কবি মহারাজকুমারকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। ত্রিপুরার দীর্ঘদিনের সুখস্মৃতি কবিচিত্তকে পুনরায় ক্ষণকালের জন্য উতলা করিল।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দ — রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম বয়ঃক্রম পূর্ত্তি উপলক্ষে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। পুর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, রায়পুরা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে কিছুকাল পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাপীড়িত সহস্র সহস্র শরণার্থী অকস্মাৎ ত্রিপুরারাজ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলে মহারাজ অভূতপূর্ব্ব বদান্যতাদ্বারা দুর্গতদিগের দুঃখলাঘব কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। এসকল বিপর্য্যয়ের মধ্যেও কবির শুভজয়ন্তী উৎসব বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রতিপালিত হইল। উৎসবের মুখ্য অনুষ্ঠানরূপে ২৫শে বৈশাখ উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদে এক বিশেষ দরবার অনুষ্ঠানে ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর কবিকে "ভারত-ভাস্কর" উপাধিদ্বারা সম্মানিত করিলেন। উপাধি সনন্দের (রোবকারী) প্রচলিত হেতুবাদাদি বর্ণনান্তে কবির শতায়ু কামনায় ঘোষিত হইল,

ত্রিপুরা গেজেট, ১৩৪১ এবং দরবার রোবকারী (২৫২ নং)

> "অতএব এই উৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে "ভারত ভাস্কর" আখ্যায় ভূষিত করা যায়; এবং শ্রীভগবান তদীয় আশীর্ব্বাদে কবিবরকে সুস্থদেহে শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।"

রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থ খণ্ড

ত্রিপুরা হইতে প্রেরিত বিশেষ দূত ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক ৩০শে বৈশাখ শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাজকীয় মানপত্র (সনন্দ) কবিকে প্রদত্ত হয়। ত্রিপুরা হইতে আগত এই সম্মান গভীর

সমকালীন বিশ্বভারতী নিউজ

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরেশ্বরের উদ্দেশ্যে তাঁহার ভাষণে [১] ত্রিপুরার জন্য সর্ব্বশেষ বাণী রাখিয়া গেলেন,

কবির মূল ভাষণ

"সেই রাজবংশের সেই সম্মান মূর্ত্ত পদবী দ্বারা আমার স্বল্পাবশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দীপ্যমান করেছে। আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে যখন বুঝলেম বর্ত্তমান মহারাজ অত্যাচারপীড়িত বহুসংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে অসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয়দান করেছেন, তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম তাঁর বংশগত রাজ-উপাধি আজ বাংলাদেশের সর্ব্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হোল। * * * এ বংশের সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ যখন পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠল ঠিক সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত্তে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ পেলেম তা সগৌরবে গ্রহণ করি।"

আষাঢ় মাসে পুরীতে অবস্থানকালে মহারাজ পুরী বঙ্গসাহিত্য পরিষদ ও পুরী সঙ্গীত সম্মিলনী কর্ত্তৃক আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনে পৌরোহিত্য করিলেন (১৮ই জুন)।

স্মরণীয় ২২শে শ্রাবণ কলিকাতায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধান হইল। রাজন্যমণ্ডলের সভায় যোগদানের পর বোম্বাই হইতে বাঙ্গালোর যাইবার পথে ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর এই নিদারুণ সংবাদ অবগত হইলেন। ত্রিপুরার যাবতীয় সরকারী আফিস আদালত বিদ্যালয়াদি মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থ বন্ধ করিবার জন্য রাজাদেশের তারবার্ত্তা আগরতলায় প্রেরিত হইল। মহারাজের সেদিনের রুদ্ধকণ্ঠনিঃসৃত একটি মহাবাক্যই আজ হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়া স্মরণ করি,

"শুভলগ্নেই ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে রবির উদয় হইয়াছিল!"

— আজ মহারাজ বীরবিক্রমও স্বর্গগত।

---

(১) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

এই তথ্যপঞ্জী সঙ্কলন উপলক্ষে বহুবিধ বিষয়ে সবর্বাগ্রে অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু মহাশয়ের অকুণ্ঠ এবং অশেষ সহায়তা কৃতজ্ঞ অন্তরে ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করিতেছি। ত্রিপুরার শ্রীশ্রীমতী মহারাণী রাজমাতার সেক্রেটারী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জনেশকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এবং অত্রত্য বহু শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণের নিকট তাঁহাদিগের সহায়তার জন্য আমি সমভাবেই কৃতজ্ঞ।—লেখক।

শান্তিনিকেতন আশ্রমস্মৃতি

আশ্রম-বিদ্যালয় ও রবীন্দ্র-স্মৃতি-লিখন

শ্রী ধীরেন্‌কৃষ্ণ দেববর্ম্মা

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম আজ শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতের বাইরে বিদেশের সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল ও কলেজের অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র-অঙ্কন, কারুশিল্প শিক্ষারও সুব্যবস্থা আছে। শিক্ষার জন্য ভারতের নানা প্রদেশ হতে ছাত্রছাত্রীগণ এখানে আসে, আবার বহু বিদেশী ছাত্রছাত্রীও শিক্ষালাভ করে থাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কবিগুরু যখন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-ব্রহ্মবিদ্যালয় নামে এই বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের গোড়া পত্তন করেন তখন একমাত্র বাংলাদেশেই ইহার সামান্য খ্যাতি ছিল। তখনকার দিনে অনেকের ধারণা ছিল যে দুরন্ত ছেলেদের পড়াবার জন্য এই বিদ্যালয়ে পাঠালে তাদের চরিত্রের সংশোধন হয়, ভাল ছেলে হয়ে গড়ে উঠে। ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনের শিক্ষার আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখে তখনকার ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরিচালনার নিয়মাদি রচিত হয়েছিল। ছাত্রগণ প্রাচীনকালের গুরুশিষ্যের সম্বন্ধকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে আখ্যা দিয়েছিল। সেই অবধি তিনি আমাদের সকলের নিকট গুরুদেব বলে বরাবর শ্রদ্ধা ও ভক্তি পেয়ে এসেছেন। তখনকার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পরিবেশ ছিল ঠিক প্রাচীন তপোবনেরই মত। গাছপালার ঘন ছায়ায় আবৃত নিস্তব্ধ, সংযত বিদ্যালয়টি। গুরুদেব চেয়েছিলেন এই শিক্ষার স্থানটি হবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত, সহরের কোলাহল থেকে দূরে অবস্থিত, এই পরিবেশের মধ্যে যাতে সকলে শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করতে ও বুঝতে পারে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে ছাত্রগণ পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করে শুধু পাশ করাকে যেন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ না করে, তাদের শিক্ষা যেন সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতধরণের হয়। শারীরিক, মানসিক উন্নতি শিক্ষার দ্বারা হওয়া চাই। তখনকার দিনে স্কুল শিক্ষার সঙ্গে ভারতের কোন বিদ্যালয়ে সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র-অঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আরম্ভের সঙ্গে এই সব শিক্ষার প্রয়োজন বোধে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে উপযুক্ত শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব দেশে ছিল।

১৯১১ ইংরেজি সনের কথা মনে হচ্ছে। তখন আগরতলা সহর হতে মহিম কর্ণেলের বাড়ী ও দুই চারিটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীর ছেলেরা শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করত। পূজার ছুটির পরে তাদের সঙ্গে আমি ও আমার বড় ভাই শান্তিনিকেতনে ভর্ত্তি হতে এলাম। তখনকার শান্তিনিকেতনের আয়তন বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক ছোট ছিল। কিন্তু তবু কেন জানি স্থানটিকে খুব বড় বলে মনে হত এবং খুব ভাল লেগেছিল। গাছ-পালা ও পাখীর সমাবেশ আমার ছোট্ট মনকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বের দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আর লাল মাটির ঢেউ-খেলান খোআই। আলো বাতাসকে এমন নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবার যেন পূর্ব্বে কখনও সুযোগ হয়নি।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বয়সানুসারে তিনটি বিভাগে তাদের ভাগ করা হত। ছোট ছেলেদের শিশুবিভাগে, মাঝারিদের মধ্যবিভাগে এবং বড়দের আদ্যবিভাগে রাখা হত।

প্রত্যেক বিভাগে ছাত্রাবাস ভিন্ন ভিন্ন ছিল। বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট দৈনিক-পালনীয় নিয়মাবলী প্রত্যেক ছাত্রকেই পালন করতে হত। আমি শিশুবিভাগের একটি ঘরে থাকার স্থান পেলাম। একত্রে আমরা কুড়ি পঁচিশজন ছাত্র ছিলাম ঐ গৃহে এবং শিক্ষক মহাশয় দুইজন আমাদের সঙ্গে থাকতেন। ঝগড়া ও বন্ধুত্বের সংমিশ্রণে আমাদের ছাত্রজীবন বড় আনন্দে অতিবাহিত হত। গুরুদেবকে বিদ্যালয়ের সভা-সমিতিতে সভাপতিত্ব এবং উৎসবাদিতে পৌরোহিত্য করতে দেখতাম। দিনের প্রথম সাক্ষাতে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে মিলে গুরুদেবকে তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতাম। তবে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপের সুযোগ তখন হত না। আমরা ছিলাম নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র, তাই বলে বিজ্ঞান ক্লাশ আমাদের বাদ যেত না। একদিন বিজ্ঞান ক্লাশ ঘরে শিক্ষক সন্তোষ মজুমদার আমাদের ক্লাশ নিচ্ছিলেন। কথার প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বল্লেন, "পাশের ঘরে কাঁচের যে সব আলমারী রয়েছে সেগুলি ও বড় যে টেলীস্কোপ দেখছ এইগুলি সবই ত্রিপুরার মহারাজের দান।" তাঁর নিকটেই প্রথম জানতে পারলাম যে ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে গুরুদেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ত্রিপুরা-দেশের লোক বলে সেদিন আমার এ সংবাদে বড় আনন্দ বোধ হয়েছিল।

কয়েক বছর পরে শিশুবিভাগ ত্যাগ করে মধ্যবিভাগে উন্নীত হয়ে এলাম। শাল-বীথিকার পাশে নাট্যগৃহ, এইখানে তখন থাকতাম। সন্ধ্যা উপাসনার পর এবং রাত্রের খাওয়ার ঘন্টার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা খানিকটা সময় পেতাম নিজেদের আগামীকালের ক্লাশের পড়া তৈরী করবার। এই সময়টাতে সাধারণতঃ সকলেই বই পড়তাম, তবে কেউ কেউ একটু আধটু খেলাও করত। এমনি এক সন্ধ্যায় ছেলেরা না পড়ে কি কারণে গণ্ডগোল করছিল। আমাদেরই একজন হঠাৎ জানালা দিয়ে দেখতে পেল গুরুদেব জানালার বাইরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা এ কথা জানবামাত্র সকলেই চুপ করে নিজেদের আসনে বই নিয়ে বসে গেলাম। ভাবলাম গুরুদেব হয়ত এসে আমাদের বকুনি দেবেন। তিনি কিন্তু ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করে কাউকে বকলেন না। মুখে তাঁর প্রশান্ত হাসি, আমাদের সকলকে ডেকে বল্লেন একরকম খেলা আমাদের সঙ্গে খেলবেন। আমরা তাড়াতাড়ি ঘরের মেঝের উপর সতরঞ্চি ও আসন পেতে দিলাম তাঁর বসার জন্য। তিনি প্রথমে খেলাটা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন এই বলে যে আমাদের মধ্যে কেউ একজন বিদ্যালয়ের কোন এক ব্যক্তির নাম বা কোন বিশেষ জিনিষের নাম মনে মনে রাখবে, তাকে অন্য যে কেউ সর্ব্বাপেক্ষা কম প্রশ্ন করে সেই নামটি বের করতে পারবে সেই খেলায় জিতবে। গুরুদেব খুব কম প্রশ্নে আমাদের নিকট হতে লোকের নাম বা জিনিষের নাম বের করে দিচ্ছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে নানা রকম নূতন নূতন খেলা খেলতেন। অবশ্য এই খেলাগুলি সবই তাঁরই আবিষ্কার। খেলার মাঠের ধারে বেণুকুঞ্জ ঘরটিতে একবার শিক্ষকদের সঙ্গে গুরুদেবের কি একটা সভা হচ্ছিল। সভার শেষে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন, আমরা কয়েকটি ছেলে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন "বলত এটা কি?" এই বলে দু'হাত দিয়ে নিজের দু'কান চেপে আবার ছেড়ে দিলেন। আমরা অনেক কিছু বল্লাম, তিনি

শুনে বল্লেন, "একটিও হয়নি, এটা হচ্ছে চাপকান।" আমরা ভাবলাম তাইত কান দুইটি চেপে ধরলেন তাইতেই চাপকান হল।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্লাশে বই পড়াতে গুরুদেব ভালবাসতেন। আমরা তাঁর নিকট ইংরেজি ও বাংলা পড়েছি। খুব সম্ভব তখন আমরা পঞ্চম কিম্বা চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। রাস্কিনের লেখা আমাদের পক্ষে একটু কঠিন বুঝতে কিন্তু এই কঠিন বিষয়ও এই সব শ্রেণীতে পড়াতে তিনি দ্বিধা বোধ করতেন না। পূর্ব্বেই বলেছি, খুব নিম্ন শ্রেণীতেও এই বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ান হত। গুরুদেবের মত হচ্ছে কঠিন বিষয়কেও যদি সহজ করে বুঝাবার ক্ষমতা শিক্ষকের থাকে তবে তরুণ ছাত্রছাত্রীগণ অনায়াসে এই সব বিষয় বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পারবে। প্রথমে কোন ভাল ইংরেজী লেখা বাংলা অনুবাদ ক্লাশের ছাত্রদের দ্বারা করাতেন। দৈনিক যতটুকু অনুবাদ হত তাকে গুছিয়ে পরিষ্কার ও নির্ভুলভাবে লিখিয়ে আশ্রমের ছাপাখানায় ছাত্রগণ নিজেরা কাগজে ছাপাত। এইভাবে অনুবাদের সংখ্যা যখন বেশ কিছু হল তখন এইগুলিকে পুস্তকাকারে নিজেদেরই বাঁধাতে হত। এই বাংলা লেখাগুলিকে আবার ইংরেজিতে অনুবাদ করা হত। এমনিভাবে তাঁর অনুবাদ-চর্চ্চা পুস্তকখানি লিখিত হয়। বাংলা পড়েছিলাম একটু উঁচু শ্রেণীতে উঠে। গৌর প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব সীমান্তে একটি বড় বটগাছ ছিল। এর গোড়ায় একটি খড়ের চালাযুক্ত চারিপাশ খোলা গোল ঘর ছিল। গুরুদেব এইখানে মাটির বেদির উপর আসন পেতে বসতেন ও ছেলেদের ক্লাশে পড়াতেন। আমাদের বাংলা ক্লাশ যখন হ'ত তখন দেখতাম বিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকেরা এসে আমাদের পাশে বসতেন। ক্ষিতিমোহন বাবু প্রতিদিনই এই ক্লাশে যোগ দিতেন। গুরুদেবের নিকট তাঁর বিখ্যাত বলাকা কবিতা ও অন্যান্য কবিতা পড়েছিলাম। কবির নিজ মুখে তাঁর কবিতা ও লেখার ব্যাখ্যা শুনার যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা জীবনে হয়ত কখনও এই ক্লাশগুলির কথা ভুলবেন না। আমরা তন্ময় হয়ে তাঁর নিজ কবিতার ব্যাখ্যা শুনতাম।

বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায়ই ছবি আঁকা ও লেখার একটু চেষ্টা করতাম। শান্তিনিকেতনের এই বিদ্যালয়টি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামেও পরিচিত ছিল। আমরা সাধারণতঃ আশ্রমই বলতাম। একবার আশ্রম জননী নাম দিয়ে একটি লেখা লিখেছিলাম। যত প্রকার ভাব ও কবিত্ব সমাবেশের কোন ত্রুটি করিনি এ লেখাটায়। মনে মনে ভাবলাম লেখাটি খুব অপূর্ব্ব হয়েছে। একদিন প্রাতে সোজা গুরুদেবের নিকট গিয়ে উপস্থিত লেখাটি নিয়ে। তিনি তখন কি একটা লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। লেখাটি তাঁকে দেখাব বলে এনেছি বলাতেই তিনি নিজের লেখা বন্ধ করে আমার লেখাটি নিয়ে পড়ে দেখতে লাগলেন। লেখাটির বিশেষ কিছু সংশোধন করলেন না কেবল কোথায় 'ড়' হবে আর কোথায় 'র' হবে সেইটুকু সংশোধন করে আমাকে সেইটি ফেরত দিয়ে মন্তব্য করলেন, "লেখাটি হয়েছে বেশ, তবে তুই যে একটি বাঙ্গাল তার প্রমাণ তোর 'ড়' আর 'র' ব্যবহার থেকেই বুঝতে পারা যায়।" এখন মনে হয় কি দুঃসাহসিকের কাজই না তখন করেছিলাম।

মধ্যবিভাগের ছাত্র, নাট্যগৃহে বাস করি। মাটি দিয়ে গুরুদেবের এক পার্শ্বের একটি চেহারা গড়েছিলাম। এই সংবাদটি আমদের ঘরেরই একজন ছাত্রের নিকট হতে শিক্ষক সন্তোষ মজুমদার পেলেন। একদিন দ্বিপ্রহরের পর সন্তোষবাবু আমাকে বল্লেন

"চল মাটির কাজটি গুরুদেবকে দেখিয়ে আসি।" আমি একটু লাজুক ছিলাম, গুরুদেবের নিকট যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। সন্তোষবাবু আপত্তি শুনলেন না। মাটির কাজটি সহ আমাকে গুরুদেবের নিকট নিয়ে চল্লেন। গুরুদেব তখন দোতলা ছোট্টবাড়ী "দেহলীতে" বাস করতেন। তিনি মাটির কাজটি দেখে আমার খুব প্রশংসা করলেন এবং সন্তোষবাবুকে বল্লেন যাতে ভাল করে ড্রইং ও মডেলিং শিক্ষা করি। সেইদিনকার তাঁর প্রশংসা ও উৎসাহদান আমাকে শিল্পী হবার অনেক পাথেয় জুগিয়েছিল। এইভাবে ছোটকাল হতে বহুবার তাঁর নিকট হতে শিল্পবিষয়ে উৎসাহ ও প্রশংসা লাভের সৌভাগ্য হয়েছে।

ছোটকালে বাঁশী বাজাতাম। সভা-সমিতিতে কখনও বাজাইনি। খোলা মাঠে, খোআইয়ে ঘুরে ঘুরে বাজাতেই বেশী ভালবাসতাম। গুরুদেব জানতেন যে আমি ভাল বাঁশী বাজাই। মন্টেগু ভারতবর্ষে এলেন ১৯১৬ ইংরেজি সনে। তিনি ছিলেন ভারত সচিব। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা নির্দ্ধারণ করার উদ্দেশ্যে এখানে আসা। ভারতীয় মনীষী ও রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে মন্টেগু সাহেব আমাদের দেশের তখনকার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করেন। তিনি যখন কোলকাতায় এলেন তখন গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গুরুদেব শান্তিনিকেতন থেকে কোলকাতায় গেলেন দেখা করবার জন্য। সেখানে গিয়ে একটি টেলীগ্রাম পাঠালেন যাতে আমি অবিলম্বে আমার বাঁশী নিয়ে কোলকাতায় রওনা হই। গুরুদেবের কোলকাতার বাড়ী জোড়াসাঁকোতে সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে। এই উপলক্ষে ঐ বাড়ীর একটি অংশে সুন্দর একটি ছবি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল — বিচিত্রা নামে লাল বাড়ীটিতে। আমার জীবনে ছবি প্রদর্শনী এই প্রথম দেখা। কি আগ্রহ সহকারে ছবিগুলি দেখেছিলাম তখন, প্রত্যেকটি ছবি যেন এক একটি আনন্দের উৎস বলে মনে হয়েছিল। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রদর্শনীর ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখছেন, ছবির ভালমন্দের বিষয়ে মন্তব্য করছেন। এই বিখ্যাত শিল্পী ভ্রাতৃদ্বয়কে ঐ প্রথম দেখেছিলাম। মন্টেগু সাহেব জোড়াসাঁকো বাড়ীতে এলেন। গুরুদেবের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলে আমাকে তিনতলায় গুরুদেবের ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমি গুরুদেবের রচিত দু'তিনটি গান বাঁশীতে বাজিয়ে সাহেবকে শুনালাম। এই ধরনের বহু ছোটখাট ঘটনার বিষয় যখন ভাবি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে লেখাপড়া ভিন্ন আরো অন্য গুণ বা ক্ষমতা — যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি থাকলে সেইগুলি যাতে আরো স্ফুরিত হয়, প্রকাশ পায় তার সুযোগ গুরুদেব সর্ব্বদা ছাত্রদের দেবার ব্যবস্থা করতেন। সর্ব্বদা সেইসব ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন ও উৎসাহিত করতেন। শুধু ছাত্রদের নয়, শিক্ষক মহাশয়দেরও যার যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী যাতে আরো উন্নতি লাভ করতে পারেন সেই বিষয়ে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করতেন। গুরুদেবের উৎসাহে ও সংস্পর্শে এসে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত অভিধান লেখক হলেন। জগদানন্দ রায় হলেন বিজ্ঞান বিষয়ে লেখক। নন্দলাল বসু ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পী হলেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন রবীন্দ্রগানের ভাণ্ডারী ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ গায়ক। গুরুদেব যেন স্পর্শমণি ছিলেন, তাঁর সংস্পর্শে অনেকে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। মানুষকে তিনি

কখনও ছোট করে দেখেননি, তাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে ফুটিয়ে তোলবার তাঁর ক্ষমতা ছিল। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার দ্বারা মানুষের মনের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা ও উন্নতি কিন্তু আংশিক উন্নতি নয়। এই বিশ্বাসেই মানুষের সকল বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের আয়োজন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছিলেন। লেখাপড়া করে কয়েকটি বিষয়ে পাশ করাকে পূর্ণ শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য বলে তিনি গ্রহণ করেন নাই। শিক্ষার বিষয়ে তাঁর মতামত তাঁর বহু লেখায় প্রকাশ করে গেছেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে আমাদের সময়ে বাগান করার প্রচলন ছিল। প্রত্যেক ছাত্রাবাসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিদিন বিদ্যালয়ের সাধারণ "ক্যাপটেইন" নম্বর দিত। মাসান্তে নম্বর যোগ করে যে গৃহ বেশী নম্বর পেত সেই গৃহের ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হত। আমরা যখন নাট্যগৃহের বাসিন্দা তখন সেই গৃহের সংলগ্ন জমিতে তিন চার জন ছাত্র মিলে সুন্দর একটি বাগান করেছিলাম। শীতের মরশুমী ও অন্যান্য ফুল ফুটে খুবই সুন্দর হয়েছিল বাগানটি। গুরুদেব জাপান ভ্রমণ থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরেছেন। প্রতিদিন ভোর বেলাতে লম্বা জোব্বা গায়ে দিয়ে শালবীথিকায় ও ছাত্রাবাসের আশে পাশে ঘুরে বেড়াতেন। আমাদের বাগান দেখে তিনি খুব খুশী হলেন। তখন প্রতিমাসে একবার সন্ধ্যা উপাসনার পরে সাহিত্য সভা হত। গুরুদেব এমনি একটি সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বল্লেন যে নাট্যগৃহের সুন্দর বাগানটি দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছেন এবং যে সব ছাত্র এই বাগান করেছে তাদের জাপান থেকে সংগৃহীত একটি সুন্দর পুষ্পপাত্র তিনি পুরস্কার দিচ্ছেন। এই পুষ্পপাত্রটি আমাদের নিকট বহুদিন ছিল। তাঁর নিকট হতে উৎসাহ পেয়ে প্রতি বছরই আমরা সুন্দর বাগান করতাম।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মহাত্মা গান্ধী তাঁর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে ভারতবর্ষে এলেন। এই দেশে কোথায় এসে উঠবেন তার কোন কিছু ঠিক ছিল না। গুরুদেব মহাত্মা গান্ধীকে শান্তিনিকেতনে এসে থাকবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তখন ১৯১৪ ইংরেজী সন, মহাত্মা গান্ধী তাঁর ছাত্রগণ সহ আশ্রমে বসবাস করবার জন্য এলেন। তাঁর ছাত্রদের পরনে ছোট হাতাযুক্ত মোটা কাপড়ের জামা, ছোট ধুতি বা "হাফ্ পেন্ট", মাথায় ছোট করে কদম ছাঁটা চুল। সকলকে বেশ সংযত বলে মনে হল তাদের চালচলনে। মহাত্মা গান্ধীর আসার কিছুদিন পরেই একটি বুধবারে প্রাতে মন্দির উপাসনার পরে পিয়ার্সন সাহেব ও গুরুদেবের জামাতা নগেন গাঙ্গুলী বিদ্যালয়ের সাধারণ রান্নাঘরে আসলেন; আমরা কয়েকজন ছাত্রও তাঁদের পিছনে পিছনে ঐখানে এলাম। তাঁরা রান্নাঘরের পাচক ঠাকুরদের ও চাকরদের ডেকে বল্লেন তাদের কার্য্য হতে বিদায় দেওয়া হবে এবং ছাত্রগণই নিজেরা রান্না করবে। এদের মধ্যে অনেকেই বহুদিন ধরে এই রান্নাঘরে কাজ করে আসছে। কাজ হতে তাদের বিদায় দেওয়ার সংবাদে তারা খুবই মর্ম্মাহত হল। রান্নাঘরের কাজে শিক্ষক মহাশয়গণ ছাত্রদের কার উপর কী কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হল তার একটি ফর্দ্দ বের করলেন। রান্নাঘরের প্রয়োজনে প্রচুর জল কূয়া থেকে উঠাতে হয় এবং বেশ কিছুদূরে বহন করে নিতে হয়—এটা একটা শক্ত কাজ। আরেকটি শক্ত কাজ হচ্ছে রান্নার শেষে বিরাট হাঁড়িকুঁড়ি, ডেকচী, কড়াই-

গুলি মেজে ঘষে পরিষ্কার করা। স্বাস্থ্যবান ছেলেদের বেছে বেছে এই দুইটি কাজের ভার তাদের উপর দেওয়া হল। বাসন মাজার কাজে আমার নাম ছিল। আহারের অব্যবহিত পরেই ঐ বিরাট বাসনগুলি মাজার কাজে আমাদের বেশ পরিশ্রম করতে হত। এই কাজ যখন শেষ করতাম তখন দেখতাম আমাদের আবার বেশ খিদে পেয়ে গেছে। রান্নার ব্যাপার নিয়ে আমাদের সকল ছাত্রের মধ্যে বেশ একটি স্ফূর্ত্তির সাড়া পড়ে গিয়েছিল। ভোর থেকে সুরু করে রাত্রের আহারের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত একদল জলখাবার তৈয়ের করছে, কোনদল স্তূপীকৃত আলু তরকারী ইত্যাদি বঁটি দা দিয়ে কাটছে, হৈ চৈ করে কড়াই, খন্তা নেড়ে রান্না চলেছে — এ যেন উৎসবের বাড়ী। বৈশাখ মাসে আশ্রমের আমগাছগুলিতে কচি আমে ডাল নুইয়ে পড়েছে। গ্রীষ্মের দারুণ গরমে দুপুর বেলায় কচি আম পুড়িয়ে সরবত করা হত আর মনের আনন্দে তা পান করা হত। বিকেল বেলাকার জলখাবার হত চীনাবাদামভাজা, কলা আর খেজুর। কলাগুলি প্রায়ই পচাধরা থাকত। রোজ বিকেলে একই ধরনের জলখাবার খেয়ে খেয়ে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। এই বিষয়ে আমাদেরই একজন বেশ একটি ব্যঙ্গপূর্ণ গান রচনা করেছিল। তার প্রথম ছত্রটি হচ্ছে "পচাকলা তিনটে দুটো, মাংকী নাট্‌স্ মুঠো মুঠো।" বিকেল বেলাকার জল খাবারের সময়ে সকলেই প্রায় এই গানটি মহানন্দে গাইতাম। ছাত্রদের দ্বারা রান্না করাবার সংবাদ অভিভাবকেরা পেতে লাগলেন। তাঁদের অধিকাংশই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কোন ছাত্র বোধহয় তার মাকে লিখেছিল যে আজকাল আমরা শান্তিনিকেতনে রান্না শিক্ষা করছি ইত্যাদি। তার মা নাকি উত্তরে লিখেছিলেন যে "পড়া ছেড়ে যদি রান্নাই শিখতে হয় তবে বাড়ীতে চলে এস, আমার নিকট ভাল রান্না শিখতে পারবে।" আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বহু অভিভাবকের পত্র এল যে তাঁদের ছেলেদের বাধ্য হয়ে শান্তিনিকেতন হতে নাম কাটিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গুরুদেব খুবই চিন্তিত হলেন। ইতিমধ্যে গান্ধীজি বিশেষ কাজের জন্য অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। ধীরে ধীরে পুরানো ঠাকুর চাকরেরা আবার এসে রান্নাঘর দখল করল আর আমাদের রান্নার ব্যাপারও উঠে গেল। গান্ধীজির এই স্মৃতিকে রক্ষা করবার জন্য এখনও প্রতি বছর এপ্রিল মাসে গান্ধী পুণ্যাহদিন বিশ্বভারতীতে পালিত হয়।

শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক ও প্রধান উৎসব হচ্ছে ৭ই পৌষের উৎসব। গুরুদেবের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষার এই দিনটি। ৭ই পৌষ হতে আরম্ভ করে তিন দিন এই উৎসব পালন করা হয়। উৎসব প্রারম্ভের বেশ কিছু পূর্ব্বের থেকেই আরম্ভ হয়ে যায় আশ্রম পরিষ্কার করা, ছাত্রদের গৃহগুলির সংস্কার ও চূণকাম করা, সুষ্ঠুভাবে উৎসব যাতে পালন করা হয় তার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কাজ বন্টন ইত্যাদি। আশ্রমের এই সব কাজ তখন আনন্দের সঙ্গে ছাত্রগণই সম্পন্ন করত। এখনকার মত মজুর নিয়োগ করা হত না। সেই সময়ে ছাত্রদের মধ্যে আনন্দ ও উদ্দীপনার সাড়া পড়ে যেত। সাধারণত প্রতিবছরই মন্দির সাজাবার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হত। ৬ই পৌষের ভোরবেলায় আমরা তিন চারটি দলে বিভক্ত হয়ে বিছানার চাদর নিয়ে উৎসবের জন্য ফুল সংগ্রহে বের হতাম। শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্ত্তী সাঁওতাল গ্রামগুলিতে তখন প্রচুর গাঁদা ফুল ও অন্য দু'তিন রকমের ফুল পাওয়া

যেত। সাঁওতালদের নিকটে শান্তিনিকেতন তখন কাঁচ বাংলা নামে পরিচিত ছিল। উপাসনার মন্দিরটির গায়ে নানারঙের কাঁচ বসান আছে, এরই থেকে এদের নিকট কাঁচ বাংলা হল আশ্রমটি। কাঁচ বাংলার জন্য ফুল নিচ্ছি বল্লে সাঁওতালেরা ফুল দিতে কিছুমাত্র আপত্তি করে না। সংগৃহীত সমস্ত ফুল মন্দিরে এনে জড় করা হত। তারপর মন্দির সাজাবার কাজে যে সব ছাত্রদের নাম থাকতো তারা সকলে বিকেলের দিকে মন্দিরে এসে একত্রিত হয়ে ফুলের মালা, সুতলিতে আমপাতা বেঁধে মালার মত করা, মন্দিরের ফটকটিকে দেবদারু পাতা দিয়ে সাজানোর কাজে লেগে যেত। সব কাজ শেষ হত না তাই রাত্রের আহারের পর আমরা তিন চারিটি ছেলে কম্বল নিয়ে মন্দিরে এসে বাকী সাজানোর কাজ সমাপ্ত করতাম। রাত একটা বা দু'টো বেজে যেত কাজ শেষ করতে। বাকী রাতটা মন্দিরেই কম্বল-গায়ে শুয়ে কাটাতাম। ৭ই পৌষের ভোর চার ঘটিকায় বৈতালিক গান গেয়ে গেয়ে একদল ছাত্র আশ্রম প্রদক্ষিণ করত। বৈতালিক পরিচালনা করতেন দিনেন্দ্রনাথ। তাঁর দরাজ গলা সকল গলার ঊর্দ্ধে শুনা যেত। আমরা কয়েকজন অতি উৎসাহী ছাত্র বৈতালিকের পূর্ব্বেই শেষ রাত্রির অন্ধকারে কূয়া থেকে জল টেনে স্নান করে নিতাম। খোলা জায়গায় পৌষের শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া আমাদের স্নানের উৎসাহকে কিছুমাত্র দমিয়ে দিতে পারত না। শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই ভোরবেলায় স্নান সমাপন করে পরিষ্কার ও শুদ্ধ হয়ে গৈরিক রঙের লম্বা আলখেল্লা গায়ে দিয়ে উৎসবে যোগ দিতেন। উপাসনা মন্দিরের ফটকের উপরে বড় একটি ঘন্টা ঝুলান ছিল। গুরুদেব তারই সংলগ্ন একটি দড়ি ধরে মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উপাসনার ঘন্টা বাজাতেন। আলখেল্লা-পরিহিত আমরা ছাত্রের দল পংক্তিবদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতাম। এই দৃশ্য প্রাচীনকালের তপোবনের ব্রহ্মচারীদের কথা মনে করিয়ে দিত। মন্দিরের ফটক পেরিয়ে ছাত্রগণ একে একে গুরুদেবকে পাদস্পর্শ করে প্রণাম জানিয়ে শান্ত ও ঋজু হয়ে মন্দিরের ভিতরে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করত। গুরুদেব উপাসনার সময়ে যে আসনে বসতেন তার সম্মুখে তিনটি শ্বেত পাথরের ছোট ছোট টেবিল থাকতো। সেইগুলিকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে তারই সামনে ধূপধুনা জ্বালান হত। উপাসনার কাজ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে সমবেত কণ্ঠে ধর্ম্মসঙ্গীত গাওয়া হত। দিনেন্দ্রনাথ গান পরিচালনা করতেন আমি সঙ্গে এস্রাজ বাজাতাম। গুরুদেব উপাসনার ভাষণে ৭ই পৌষ উৎসবের মর্ম্মার্থ বুঝিয়ে দিতেন। তিনি ভাষণ দিতে দিতে তন্ময় হয়ে উচ্চ কণ্ঠে গান গেয়ে উঠতেন। এই মন্দিরের উপাসনা ৭ই পৌষ উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ও প্রাণ ছিল। এর জন্য কোলকাতা হ'তে রবীন্দ্রভক্ত একদল গুণী ও মনীষী ব্যক্তি আসতেন। এই সব ভাষণ শুনবার যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছে, আশা করি, তার স্মৃতি তাঁরা কখনও ভুলতে পারবেন না। উপাসনার শেষে নীরবভাবে আমরা ঐ স্থান ত্যাগ করে আসতাম। এরপর মেলা দেখার পালা সুরু হত। মেলার পরিধি তখন অনেক ছোট ছিল এবং মিষ্টির দোকানের সংখ্যাই বেশী থাকত। যাত্রাগান হত গ্রামের জনসাধারণের জন্য। ৭ই পৌষ মেলার সময়ে কয়েকটি ঘটনা আমাদের চোখে খুব পড়তো। শান্তিনিকেতনের প্রাচীন দু'তালা বাড়ীর উত্তরাংশের নীচের বারান্দায় গুরুদেবের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথ রাশভারী ব্যক্তি আসর জমিয়ে বসতেন,

সঙ্গে থাকত তাঁরই বন্ধুব্যক্তি রায়পুরের বিখ্যাত সিংহ পরিবারের এক ভদ্রলোক। আজ তাঁর চেহারার খুঁটিনাটি কিছুই মনে পড়ছে না, কিন্তু তাঁর বিরাট কাল গোঁফজোড়াটা এখনও চোখে ভাসছে। এঁরা দুইজনে আরো দু'চারটি সহায়ক নিয়ে উৎসব ব্যবস্থাপনার আসরটিকে গরম করে রাখতেন। মনে হত এঁরা যেন পূজাবাড়ীর কর্ত্তাব্যক্তি। এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য বাহির থেকে যে সব অতিথি ও অভ্যাগত আসতেন তাঁদের সুখ সুবিধা দেখাশুনা করার জন্য পর্য্যায়ক্রমে ছাত্রদের অতিথিসেবার কার্য্যভার অর্পণ করা হত। তখনকার দিনে আশ্রমের অতিথিসেবার বেশ সুনাম ছিল।

আশ্রম-বিদ্যালয়ের সাহিত্যসভা ও অভিনয়াদির প্রতি আমাদের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। যে গৃহে সভা হবে তাকে সাজাবার জন্য সেই সময়কার ফুল সংগ্রহ করে আনতাম। কখনও শতদল পদ্ম, কখনও শুভ্র কাশফুল দিয়ে সুন্দরভাবে সভাগৃহটিকে সাজান হত। ধূপধুনা ও ফুলের সুগন্ধ মিশে এক অপূর্ব্ব পরিবেশ সৃষ্টি হত। সভাতে ছাত্রদের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ, কবিতা পাঠ ও তাদেরই অঙ্কিত চিত্রাদি প্রদর্শন সভার প্রধান আকর্ষণ ছিল। গুরুদেব অনেক সময় এই সব সভায় সভাপতিত্ব করতেন। নাট্যগৃহে অভিনয়াদি হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গমঞ্চ এখনকার মত নীল লাল কাপড় দ্বারা সাজানো হত না, দেবদারু পাতা দিয়ে, ফুল দিয়ে, সাজানো হত। এই কাজে আমরা একদল ছাত্র ছিলাম উৎসাহী। এই নাট্যগৃহে শারদোৎসব, ফাল্গুনী, অচলায়তন, বিসর্জ্জন, মুকুট, ডাকঘর আরো অনেক গুরুদেবের লিখিত ভাল ভাল নাটকের অভিনয় হয়েছে। অধিকাংশ অভিনয়ে গুরুদেব প্রধান অভিনেতা রূপে অংশ গ্রহণ করতেন। অভিনয়ের পক্ষে নাট্যগৃহটি বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের তুলনায় খুবই ছোট ছিল। আশ্রমের শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য আশ্রমবাসীর সংখ্যা তখন এত অল্প ছিল যে সকলেরই বসার স্থান এই গৃহে হয়ে যেত।

প্রকৃতির কোলে গুরুদেব শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে ছাত্রগণ সহজে প্রকৃতির সকল প্রকাশকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। শরৎকালের বাতাসে শুভ্র কাশের আলোড়ন, নীল আকাশে উড়ন্ত শুভ্র বকের সারি, বসন্তে রঙিন শালপাতার হাতছানি, ডালে ডালে পাতায় পাতায় বসন্তের রাঙা রঙের স্পর্শ, বর্ষায় দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের শেষে কাজল মেঘের ঘনঘটার সমাবেশ ছাত্রদের কচি মনে যেন ছাপ দিতে পারে, রং ধরিয়ে দিতে পারে। পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষার চেয়ে প্রকৃতির এই প্রকাশের সঙ্গে নিবিড় মনের যোগে যে শিক্ষা ছাত্রগণ পাবে তা কোন অংশে অন্য শিক্ষার চেয়ে কম নয়। সৌন্দর্য্যের এই অভিব্যক্তিকেই ত গুরুদেব তাঁর গানে, কবিতায়, লেখায় আমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন। বর্ষায় যখন আকাশ ভেঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টির ধারা নেমে আসতো তখন ছেলেরা কেউ ঘরে বসে থাকতে পারত না। সব দল বেঁধে বৃষ্টির জলে ভিজতে বের হত। খোআইয়ের মাঝ দিয়ে বৃষ্টি জলের ধারা খরস্রোতারূপে কল কল করে বয়ে যেত। আমরা সেই গৈরিক রঙের কাদাজলে গা ভাসিয়ে দিতাম। বহুদূর পর্য্যন্ত জলে ভেসে ভেসে গোয়ালপাড়া যাবার রাস্তার পুলের নিকট গিয়ে জল ত্যাগ করে উঠে আসতাম। ভিজে কাপড়ে গান গাইতে গাইতে আশ্রমে ফিরে আসতাম। খুব বৃষ্টি হচ্ছে, এমনি সময়ে গুরুদেব একবার আদ্যবিভাগের গৃহে এলেন ভিজতে ভিজতে।

গায়ে তার গেঞ্জি হাতে একটি লম্বা লাঠি। ছোট ছেলেদের বাদ দিয়ে বড় ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ভিজতে ভিজতে কোপাই নদীতে গেলেন। কোপাই নদীর ধারের বনে যখন পলাশ গাছের রঙের আগুন ফুলগুলিতে ধরত তখন ছাত্রদের বনভোজনের আয়োজন হত ঐ নদীর পাড়ে। ছাত্রগণ বনে বনে ঘুরে পলাশের সৌন্দর্য্য উপভোগ করত। এইখানকার প্রকৃতির রুদ্রমূর্ত্তি ঝড়ও উপভোগ করার মত। সাধারণতঃ বৈশাখ মাসেই এখানে ঝড় হয়। সমস্ত আকাশ, খোলা প্রান্তর, বিদ্যালয়ের ঘর বাড়ীর উপর দিয়ে বালির প্রবল ঝড় বইতে থাকে, চোখে ভাল করে কিছু দেখা যায় না, সবই অন্ধকার ঝাপসা হয়ে আসে। আশ্রমের গাছপালাগুলি ঝড়ের উত্তাল বেগে আন্দোলিত হতে থাকে। সেই সময়ে খোআই অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ। প্রবল বাতাসের বেগে বিতাড়িত কাঁকর খণ্ডগুলি ক্রমাগত গায়ে আঘাত হানতে থাকে, চুল বালিতে আর বাতাসে উস্ক-খুস্ক হয়ে অপরূপ আকার ধারণ করে, গায়ের কাপড় ধরে রাখা এক সমস্যা, কিন্তু তবু এতে অদ্ভুত আনন্দ পাওয়া যায়। বালির কুয়াশায় যেন সমস্ত আবৃত করে দেয়। নিজের এক হাত দূরে কি আছে দেখা যায় না। তারপরই নেমে আসে শীতল করা বর্ষণধারা; মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রকৃতির এমন রূপপরিবর্ত্তন সত্যিই অবাক করে দেয়। প্রকৃতি যেন বিচিত্ররূপে ডালা সাজিয়ে আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়।

আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কথা যখন মনে আসে তখন দেখতে পাই সেই সব ছাত্র ছিল শান্ত সংযত, তাদের বেশভূষা ছিল রুচিমার্জ্জিত। অকারণে ও অযথা চীৎকার হৈ-চৈ করা, লঘু সঙ্গীত গাওয়া, বিলাসিতা তাদের ছিল না। কোন ক্ষুদ্র মতবাদের গোঁড়ামিতে নিজেদের বিচারবুদ্ধির ভারসাম্য হারাত না তারা। তারা ছিল শ্রদ্ধাশীল, উৎসাহী, শিক্ষার প্রতি অনুরাগী, সুরসিক, সৌন্দর্য্য উপভোগে পারদর্শী। তখনকার দিনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেই আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হত।

শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের পরিণতি হচ্ছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয় ৩রা জুলাই, ১৯১৯ ইংরেজি সনে। এর পূর্ব্বেই বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা গুরুদেবের মনে স্থান পেয়েছিল। আমেরিকার শিকাগো শহর হতে ১৯১৬ইং সনে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন তাতে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলবার জন্য। বিশ্বভারতীর কার্য্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবনের গোড়াপত্তন হল। বিদ্যাভবনে ভারতীয় ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বহু ভাষা শিক্ষার ও অনুশীলনের আয়োজন হল। কলাভবনে ভারতীয় চিত্র-অঙ্কন, মূর্ত্তিগঠন শিল্প, কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ও সঙ্গীতভবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত, মার্গসঙ্গীত, নৃত্য বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা হল। আশ্রম-বিদ্যালয়ে এতদিন ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করত; এখন বিশ্বভারতী হওয়ায় পূর্ণতর শিক্ষালাভ ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেল। গুরুদেবের প্রেরণায় শিক্ষার ও সৃষ্টি কার্য্যের যেন জোয়ার এল বিশ্বভারতীতে। বিদেশ হতে মহাপণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ হতে লাগল। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উইন্টারনীজ এলেন, টুচি আর সিলভেঁন লেভী এলেন, এঁদের ছাড়াও আরো দু'চারজন এই ধরনের পণ্ডিত এখানে এলেন। এঁদের ক্লাশের ছাত্র হলেন এই

খানকার অধ্যাপকেরা ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অনুশীলনের ছাত্রগণ। গুরুদেব এই সব ক্লাশে উপস্থিত থাকতেন। প্রথমের দিকে অতি উৎসাহের জন্য ছাত্রসংখ্যা এত বেশী হল যে সকলের স্থান হওয়াই অসুবিধা হল, তার পর ধীরে ধীরে অপগুিতের দল সরে পড়তে লাগলো। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল ছয় সাতজন যথার্থ বিদ্যার্থীই ক্লাশে রয়ে গেছে। সিলভেঁন লেভী গুরুদেবের নিকট বাংলা শিখতেন।

কলাভবন আরম্ভ হবার কিছু পূর্ব্বে ১৯১৬ ইং সনে সুরেন্দ্রনাথ কর ড্রইঙের শিক্ষক হয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। আমরা তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র, সুরেনবাবু আমাদের ড্রইং শেখাতেন। অসিতকুমার হালদার এলেন ১৯১৭ বা ১৯১৮ সনে এবং নন্দলাল বসু এলেন ১৯১৯ সনে। এই তিনজন শিক্ষককে নিয়ে কলাভবনের কার্য্যারম্ভ হল ১৯১৯ সনে। কলাভবনের গোড়ার দিকে দক্ষিণ ভারতীয় একটি ছাত্র নাম তার রামানুজ, শান্তিনিকেতনে এল চিত্র অঙ্কন শিখবে বলে। নন্দবাবু শান্তিনিকেতনের কার্য্যে তখনও ঠিকভাবে যোগ না দিলেও প্রতি সপ্তাহে একবার এখানে আসতেন। রামানুজকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। কলাভবন ঠিকমত আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে এই ছাত্রটিকে আর দেখতে পাইনি। কোলকাতার গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র অর্দ্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায, হীরাচাঁদ ডোগার ও কৃষ্ণকিঙ্কর এবং শান্তিনিকেতন থেকে আমি কলাভবনের প্রথম ছাত্ররূপে যোগ দিয়েছিলাম। এর কিছুদিন পরে বিনোদ মুখোপাধ্যায়, তারপরে সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, ভি. আর. চিত্রা, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, পি. হরিহরণ, বিনয়ক মাসোজী, শ্রীমতী হাতীসিং কলাভবনে যোগদান করেন। অসিতবাবুকে পূর্ব্বেও আশ্রম বিদ্যালয়ে এসে বাস করতে ও ছাত্রদের চিত্র বিদ্যা শিখাতে দেখেছি। বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় থাকার সময়ে তাঁর নিকট কয়েকবার ছবি আঁকতে গিয়েছিলাম। কলাভবনের প্রথম দিকে আরেকজন ছাত্র ছবি আঁকা শিখতে এসেছিল তার নাম ওয়ারীয়র। খুব সম্ভব দক্ষিণভারতীয় ছিল। মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে কিছুদিন পরেই কোথায় চলে গেল। অবিলম্বেই কলাভবনে চিত্রাঙ্কনের একটি অপূর্ব্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি হল। নন্দবাবু, অসিতবাবু, সুরেনবাবু একের পর এক ছবি এঁকে চল্লেন, ছাত্রগণও কম যায় না, তারাও গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল্ল। কোলকাতায় প্রতি ডিসেম্বর মাসে অরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে ছবির প্রদর্শনী হত। কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রদের ছবি নিয়ে কোলকাতায় শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে প্রদর্শনীর জন্য সোসাইটিতে দিয়ে আসতাম। ভোরবেলা যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর দিকে ছবিগুলি নিয়ে অগ্রসর হতাম তখন প্রথমেই নীচের তলাকার বারান্দায় অতি পুষ্ট একটি ভেড়া ও উদর সর্ব্বস্ব এক বলিষ্ঠ দারোয়ানের দর্শন মিলত। তারপর দোতালায় যাবার সুন্দর কাঠের সিঁড়ির গোড়ায় পৌছালে মোহিতকরা খাম্বিরা তামাকের ঘ্রাণ নাকে আসত। অবনীন্দ্রনাথের বাড়ীটি শিল্পবস্তুর দ্বারা সুন্দরভাবে সাজান ছিল। দোতালায় বড় হল ঘরটি সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্রের দ্বারা সুরুচিপূর্ণভাবে সাজান, দেয়ালে ছোট বড় বহু চিত্র টাঙ্গান থাকত। অধিকাংশ চিত্রগুলিই অবনীন্দ্রনাথের, গগনেন্দ্রনাথের ও নন্দলালের দ্বারা অঙ্কিত, তবে ভাল ভাল প্রাচীন রাজপুত ও মুঘল চিত্রও কিছু ছিল। দোতালার প্রশস্ত দক্ষিণ বারান্দায় পাশাপাশিভাবে ইজিচেয়ারে তিন ভাই গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ পাশে গুড়গুড়ি হুক্কা নিয়ে বসে থাকতেন। তাঁরা যেমন মহান শিল্পী তেমনি বড় মজলিসীও ছিলেন। কলাভবনের ছবিগুলি দেখার কি আগ্রহ তিন ভাইদের

মধ্যে দেখেছি। ছবির নাম ও মুল্য দুইই তাঁরাই নির্দ্ধারিত করতেন এবং ছবিগুলির দোষগুণ বলে দিতেন। ছবিগুলির প্রতি তাঁদের একটি দরদ ও মমতা দেখতে পেতাম। এইখান থেকে ছবিগুলিকে নিয়ে সোসাইটিতে পৌঁছিয়ে দিতাম।

কলাভবন এখন অনেক বড় হয়েছে, অনেক নিয়ম কানুনের দ্বারা বাঁধা হয়েছে, নির্দ্ধারিত শিক্ষার ধারা প্রবর্তন, সিলেবাস ও শিক্ষার সময় নিরূপণ করা হয়েছে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে ডিপ্লোমা প্রদানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। কলাভবনের প্রথম যুগে এ সব কিছুই ছিল না, শুধু ছিল অফুরন্ত প্রেরণা আর উদ্দীপনা। শিক্ষক, ছাত্র সকলেই ভাবত আমরা শিল্পী, এই মূলমন্ত্রই তাদের সকল শিক্ষায় প্রেরণা যোগাত। নন্দলাল শুধু মহান শিল্পী নন, তিনি একজন মহান শিক্ষকও বটে। যথার্থ শিক্ষক হওয়ার সকল গুণই তাঁর মধ্যে আছে। ছাত্রদের ড্রইং শুধু তিনি সংশোধন করতেন না, সেই ড্রইং বা ছবিটিকে উন্নত রূপ দান করতেন। তাঁর সংস্পর্শ ছাত্রদের শিল্পক্ষেত্রে মানসিক উন্নতি, প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ, উদার চরিত্র লাভের সহায়তা করত। নন্দলালের মধ্যে একত্রে ছাত্রেরা পেয়েছিল শিক্ষাগুরু, দরদী সঙ্গী ও বন্ধু, মমতাপূর্ণ আত্মীয়। তাঁর মত গুরু লাভ করা ছাত্রদের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। ছাত্রদের ছবি সংশোধন করে, নিজে ছবি এঁকে তবে শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, শিক্ষক তাঁর নিজের সৃষ্টির কাজ হতে যেন বিরত না হয়। প্রতিদিন শিল্পী তাঁর শিল্পসৃষ্টির দ্বারা যেমন আনন্দ লাভ করবেন তেমনি প্রতিদিনই নূতন নূতন করণ কৌশলের অভিজ্ঞতা আয়ত্তও করবেন। ছাত্রদের ভাল ভাল মূলচিত্র ও ছাপান ছবি দেখিয়ে নানা বিষয়ে বুঝিয়ে দিতেন। ছাত্রদের সঙ্গে নিজেও স্কেইচ্ করবার জন্য বাইরে বেরুতেন। কোপাই নদীর পাড়ে বনভোজন, ছুটির দিনে গরুর গাড়ী চড়ে দূর দূরান্তরে শিক্ষাভ্রমণে বের হওয়া — এই সব আয়োজনের মধ্যে একমাত্র ধ্যান ধারণা ছিল শিল্প। সকলেরই ভাব দেখে মনে হয় যেন শিল্পরসে তন্ময় হয়ে আছে। এতে যে কি আনন্দ এ তো ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য। গুরুদেবের সঙ্গীত, কাব্য, তাঁর ভাষণ, কলাভবনের প্রতি তাঁর দরদ আমাদের সকলের শিল্পীমনা হবার, ভাবুক হবার প্রেরণার উৎসস্থল ছিল। কলাভবনে রবীন্দ্রনাথের ও নন্দলালের মনিকাঞ্চন যোগাযোগ হয়েছিল। এই সৌভাগ্যলাভের সুযোগ অন্য কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের হতে পারে না। কলাভবনে চিত্র অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গীতেরও সংযোগ ছিল। ছবি আঁকার আসনেই আমার এস্রাজ থাকতো, ছবি আঁকছি তারই মাঝে মাঝে এস্রাজের বাজনাও চলত। সঙ্গীত ভবনের একটি ছাত্র বামন ক্ষিরোদকার তার বীণাযন্ত্রটি নিয়ে কলাভবনেই বসত। গান হত, বাজনা চলত, সমস্ত আবহাওয়া যেন সুরের মূর্চ্ছনায় ভরপুর হয়ে আছে। গুরুদেব কলাভবনে আসতেন যখনই শুনতেন যে কারোর ভাল একটি ছবি আঁকা হয়েছে। ছবি দেখে তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন। ছবির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমরা যেন বেঁচে গেলাম।

এই সময়ে গুরুদেবের লেখনী যেন বসন্তকালের মঞ্জরীর মত অফুরন্ত সঙ্গীত রচনায় চলেছে। নূতন গানের কথা ও সুর দেওয়া হয়ে গেলেই গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্র-নাথের খোঁজ হত। দিনুবাবুকে গানটি শিখিয়ে তবে গুরুদেব নিশ্চিন্ত হতেন। বিলম্ব হলে গানের দেওয়া সুর গুরুদেব ভুলে যাবেন বলে ভয় করতেন। দিনুবাবু একবার সুরটি

শিখে নিলে সেটি হারিয়ে যাবার আর উপায় ছিল না, অদ্ভুত তাঁর ক্ষমতা। রোজ সন্ধ্যাবেলার সময়টুকুর জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম কি গান নূতন হল তা শেখার জন্য। উত্তরায়ণের কোনার্ক বাড়ীতে ঐ সময়ে নূতন গানগুলি গুরুদেব নিজে শেখাতেন। যাঁরা গান শিখতেন তাঁদের মধ্যে দিনুবাবু, সঙ্গীত ভবনের শিক্ষক ভীমরাও শাস্ত্রী, তেজেশবাবু, বাছাই-করা সঙ্গীতের ছাত্ররা থাকতেন। আমি তখন এস্রাজ বাজাতাম। ক্ষিতিমোহনবাবু, নন্দবাবু ঐ সময়ে সেখানে রোজই থাকতেন। গান শেখান হয়ে গেলে ছাত্ররা রাত্রের আহারের জন্য চলে যেত। অন্যেরা সকলেই বসে থাকতেন। গুরুদেব তখন সঙ্গীত বা অন্য বিষয়ে আলোচনা করতেন। ক্ষিতিমোহনবাবু নানা রকম সরস সরস ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শোনাতেন। সেইবারে গুরুদেবের বহু ভাল গান রচিত হয়েছিল। একদিন কেমন জানি আকাশ মেঘলা করে আছে, শীতের আগমন প্রায় হয় হয়, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, মনটা আপনি বড় উদাস হয়ে যায়। সন্ধ্যায় গুরুদেবের নিকট গান শিখতে গিয়ে দেখি যে গানটি আজ শেখাবেন তার প্রথম পংক্তি হচ্ছে "আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার, দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার।" মনে হল, এত আমারই মনের কথা তিনি তাঁর গানে প্রকাশ করছেন। দিনের সমস্ত কাজের মধ্যে গানগুলি ছেলেদের কণ্ঠে গুঞ্জরিত হত। গানের ভিতর দিয়ে ভুবনকে দেখার আনন্দ ও সৌভাগ্য হয়েছিল।

অভিনয় ও ঋতু উৎসব প্রথমে শান্তিনিকেতনেই হ'ত তারপর কোলকাতায় হয়েছিল। ফাল্গুনীর অভিনয় কোলকাতায় খুব সাফল্য লাভ করল, দর্শকদের প্রশংসায় চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠেছিল। বেশ কিছুদিন পরে বিচিত্রা বাড়ীর পিছন প্রাঙ্গণে বিরাট একটি প্যাণ্ডেল তৈয়ারী হল, সেখানে প্রথম বর্ষামঙ্গল গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বহু লোকের সমাবেশ হয়েছিল। নির্ম্মল সিদ্ধান্তের স্ত্রী ছোট ঝুনু নামে পরিচিতা, তিনি একক কয়েকটি অপূর্ব্ব গান গেয়েছিলেন সেইদিন। সঙ্গে এস্রাজ আমি বাজিয়েছিলাম। নৃত্য ও সঙ্গীতে সকল দর্শকই বিমোহিত হয়েছিল। তারপর কয়েক বছর অন্তরই কোলকাতায় বর্ষামঙ্গল গীতোৎসব কোন না কোন রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হত। ম্যাডান থিয়েটারের মঞ্চে বসন্তোৎসব একবার হয়, তখন উৎসবের শেষ গানটি "সবার সাথে রং মিশাতে হবে, ওগো আমার প্রিয় তোমার রঙ্গিন উত্তরীয়", যখন গাওয়া হল তখন আমরা সকলেই রঙ্গিন চাদর উড়িয়ে গানের সঙ্গে নাচতে লাগলাম। গুরুদেব, দিনুবাবু, এল্‌মহার্ষ্ট সাহেব এই নাচে যোগ দিয়েছিলেন। এই মঞ্চে ভিন্ন সময়ে বিসর্জ্জন নাটক অভিনীত হয়। দিনুবাবু রঘুপতির এবং গুরুদেব জয়সিংহের পাঠ অভিনয় করেছিলেন। গুরুদেবের শুভ্র চুল ও দাড়ি কালো করে কি ভাবে তরুণ জয়সিংহ সাজান যায় এ নিয়ে একটি সমস্যা হল। কালো রঙে চুল, দাড়ি কালো করা চলে বটে, তবে অভিনয়ের শেষে এই রং জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে গিয়ে গুরুদেবের হয়ত ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনা আছে; তখন ছিল শীতকাল। তাঁকে সাজাতে গিয়ে নন্দবাবু, সুরেনবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন, সেই সময়ে কোথা থেকে অবনবাবু এসে উপস্থিত। তিনি সমস্যার কথা জানতে পেরে বল্লেন "এর জন্য এত ভাবনা, চিন্তা করার কোন কারণ নেই, শুধু বাজার থেকে কালো রঙের ক্রেপ কাপড় কিনে নিয়ে এস।" কালো কাপড় এলে তাই দিয়ে চুল দাড়িকে মুড়ে কাল করা হল, রাত্রে অভিনয়ের সময়ে গুরুদেবকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। অভিনয়ের একটি জায়গায়

রঘুপতি গোবিন্দ মাণিক্যের আদেশে মন্দিরে বলিবন্ধের সংবাদ শুনে খুব ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হয়ে যখন ভুবনেশ্বরীর মন্দির দ্বারে এসে পৌঁছাল তখন জয়সিংহ গুরুর জন্য পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে এল। গুরু কিন্তু শিষ্যের প্রতি বিরক্ত ও রূঢ় ব্যবহার করল। জয়সিংহ মর্ম্মাহত হয়ে গুরুর চরণে নত হয়ে পড়্লো। গুরুদেব জয়সিংহরূপে যখন রঘুপতির চরণে নত হলেন তখন রঘুপতিরূপে অভিনেতা দিনুবাবু হঠাৎ গুরুদেবকে ধরে উঠালেন এবং বল্লেন, "জয়সিংহ, এমনি ভাবে অবসাদে নত হয়ে পড়লে চলবে না, উঠ।" রঙ্গমঞ্চে পর্দ্দার আড়ালে যখন দু'জনেই এলেন তখন গুরুদেব দিনুবাবুকে বল্লেন, "দিনু, তুই আমাকে রক্ষা করেছিস, না ধরে উঠালে আমি উঠতেই পারছিলাম না।" অভিনয়ের এই জায়গায় জয়সিংহকে 'উঠ' বলে ধরে উঠাবার কোন কথা ছিল না। বলিবন্ধের সংবাদে রঘুপতি রেগে হাত নেড়ে বলছে, "ক্ষত্রিয়ের বাহুবল রাহুসম ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়," দিনুবাবুর বিশাল ও বলিষ্ঠ হাতের ঝাঁকুনিতে তাঁর গলার রুদ্রাক্ষের মালা গেল ছিঁড়ে। ছিন্ন রুদ্রাক্ষগুলি হাতে নিয়ে কি একটা উক্তি সহকারে দর্শকের দিকে ছুড়ে দিলেন। দর্শকদল অভিনয় দেখে খুব বাহবা ও হাততালি দিল। পর্দ্দার পিছনে যখন দিনুবাবু এলেন, গুরুদেবকে বল্লেন যে "রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে গেল তখন আর কি করি, দর্শকের দিকেই ছুড়ে দিলাম।" রঘুপতির পাঠে দিনুবাবুর মত ভাল অভিনয় করতে আমি আর কাউকে দেখিনি। অভিনয় বা ঋতু উৎসব রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হবার বেশ কিছুদিন পূর্ব্বে অংশগ্রহণকারী ছাত্র, অধ্যাপকের দল কোলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে উঠত। অভিনয় বা গানের মহড়া চলত অবনবাবুদের বাড়ীর দোতলার বড় হল ঘরটিতে প্রাতে বা সন্ধ্যায়। গুরুদেব নির্দ্দেশ দিতেন কি ভাবে অভিনয় করতে হবে, গান কি ভাবে হবে ইত্যাদি। অবনবাবু তাঁর এস্রাজ নিয়ে আমাদের সাথে গানে যোগ দিতেন। গগনবাবু, সমরবাবু আরো ঠাকুর বাড়ীর কেউ কেউ তখন উপস্থিত থাকতেন। মহড়ার পর বাকী সময়টাতে গল্পগুজবে আমাদের সময় বেশ আনন্দে অতিবাহিত হত। ভোরের দিকে মহড়ার পূর্ব্বে যে সময়টুকু পাওয়া যেত তখন নন্দলালবাবু ও আমি প্রায়ই অবনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর পাশে বসে ছবি-আঁকা দেখতাম। তিনি ছবি এঁকে যেতেন আবার মধ্যে মধ্যে একটু একটু গল্পও করতেন।

ভারতীয় সঙ্গীত বর্ত্তমান যুগে ধন্য হল রবীন্দ্র সঙ্গীতের অবদানে। কথা, সুর আর ভাব এ তিনের সম্পূর্ণ মিশ্রণ অন্য সঙ্গীতে সব সময় পাওয়া যায় না। নৃত্যের দিকেও তাঁর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম দিকে যখন অভিনয়ের বা ঋতু উৎসবের সঙ্গে নৃত্যের যোগাযোগ সুন্দররূপে দেবার চেষ্টায় ছিলেন তখন সঙ্গীতের তালে তালে হস্ত ও পদ সঞ্চালনের দ্বারা নৃত্যের চেষ্টা করেছিলেন। তবে তিনি অনুভব করেছিলেন যে নৃত্য নূতন ধরনের হলেও তার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অভিজ্ঞতা, প্রচলিত বিশেষ পদ্ধতির কিছু কাঠামো থাকা প্রয়োজন। সেই জন্য তিনি আমাকে মণিপুরী নৃত্যশিল্পীর খোঁজ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। আগরতলায় খোঁজ করে নৃত্যশিল্পী ঠাকুর নবকুমার সিংহের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি কিছুদিন পরে সঙ্গীত ভবনে মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষকরূপে বিশ্বভারতীর কার্য্যে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর পরিচালনায় গুরুদেবের সঙ্গীতের সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যের সংমিশ্রণে একটি নূতন নৃত্যপদ্ধতির প্রচলন হয়। পরবর্ত্তী কালে অবশ্য সঙ্গীত ভবনে কথাকলি, ভরত নাট্যম এবং সিংহলী নৃত্যের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

গুরুদেব একবার কোলকাতা হতে শান্তিনিকেতনে সংবাদ পাঠালেন যে কোলকাতায় "হিজ মাষ্টার্স্ ভয়েসের ষ্টুডিওতে" তিনি রেকর্ডে গান দেবেন, এই গানের সঙ্গে আমাকে এস্রাজ বাজাতে হবে। তাঁর গানের সঙ্গে এস্রাজ বাজাতে হবে — এতো খুবই গৌরবের বিষয় তবু কিন্তু একটু চিন্তিত হলাম, তার কারণ তিনি যখন নিজের গানই নিজে গান তখন অনেক সময় সুরের কোন কোন জায়গায় ইচ্ছা করেই সামান্য সুরের অদল বদল করে ফেলেন। শেখা-সুরে বাজাতে গিয়ে কোন অসুবিধা না করে ফেলি এই হল আমার ভাবনা। যাই হোক, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোলকাতার চিৎপুর রোডে "হিজ মাষ্টার্স্ ভয়েসের ষ্টুডিওতে" গিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে উপস্থিত হলাম। ঐখানকার কর্ম্মীরা তাঁকে খুবই খাতির ও সম্মান সহকারে অভ্যর্থনা করলো। প্রথমে ইংরেজি গীতাঞ্জলি বই হতে দুই একটি কবিতা আবৃত্তি রেকর্ড করা হল, তারপর "অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ", "শেষ পারানীর কড়ি কণ্ঠে নিলেম", এ ছাড়াও আরো দুই-তিনখানা গান রেকর্ডে দিলেন। গুরুদেবের গানের সঙ্গে আমি এস্রাজ ও সঙ্গীত ভবনের শিক্ষক ভীমরাও শাস্ত্রী বীণা বাজিয়ে ছিলেন। ষ্টুডিওর সাহেব কর্ম্মীরা গুরুদেবের ইংরেজি উচ্চারণের খুবই প্রশংসা করেছিলেন।

কলাভবনের প্রথম যুগে যখন শিক্ষক, ছাত্রদের মধ্যে শিল্পরচনার প্রেরণা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল তখন গুরুদেব ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে কলাভবনের ছাত্রগণ শুধু চিত্রবিদ্যা আয়ত্ত করার কার্য্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলে চলবে না, এর সাথে অর্থলাভের বিদ্যাও প্রত্যেক ছাত্রকে শিক্ষা করতে হবে। তাঁর ইচ্ছানুসারে কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হল কলাভবনে। তখনকার দিনে এই বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁত, গালার কাজ — এই ধরনের আরো কয়েকটি কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হল। এই কার্য্যে প্রধান উদ্যোক্তা হলেন গুরুদেবের পুত্রবধূ শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবী, সঙ্গে রইলেন ফরাসী চিত্রশিল্পী মাদাম কার্প্লেস। কলাভবনের ছাত্রসংখ্যা মোট হবে তখন আট নয় জন। কেউ তাঁত, কেউ অন্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করছে। আমি ও বিনোদ মুখোপাধ্যায় গালার কাজ শিখবো বলে মনস্থ করলাম। গালার শিক্ষক ছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে বার চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত ইলামবাজার নামক স্থানের লোক। ঐ স্থানের গালার কাজের জন্য ঐ অঞ্চলে বেশ খ্যাতি ছিল। শিক্ষকটি সরল গ্রাম্য লোক, তবে একটু রাগী স্বভাবের, ক্লাশে শেখাতে শেখাতে হঠাৎ রেগে হয়ত অতি নিকট সম্বন্ধ সম্বোধন করে হেঁকে উঠতেন। আমরা দেখলাম এতো বড় বিপদ, শিক্ষকের আর ছাত্রদের মধ্যে ব্যবহারে ত একেবারে ভদ্রতার বালাই নেই। একদিন নন্দলালবাবুর নিকটে গিয়ে এই সব বিষয় জানালাম। তিনি শুনে প্রথমে একটু চুপ করে রইলেন, শেষে বল্লেন, "দেখ, শিক্ষকের নিকট কোন বিদ্যালাভ করতে হলে সবই সইতে হয়। তোমাদের গালি দেয়, আবার তার সঙ্গে বিদ্যাও তো দিচ্ছে।" তারপর থেকে আমরা ভিন্ন পথ ধরেছিলাম। শিক্ষককে খুব তোয়াজ করতাম, তাতে ফলও ফলেছিল খুব ভাল। বুধবারে শান্তিনিকেতনের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। মঙ্গলবার বিকেলে কারুশিল্পের সব ছাত্রদের প্রতিমা দেবী তাঁর উত্তরায়ণ বাড়ীতে চা খাওয়াতেন। সাধারণত চা পানের অর্থে আমরা যা বুঝি তার চেয়ে ভোজন একটু গুরুতর হত। সপ্তাহের সকল দিনগুলির মধ্যে মঙ্গলবারের বিকেল বেলাটা আমাদের

নিকট খুবই লোভনীয় ছিল। গুরুদেব মাঝে মাঝে এসে আমাদের কাজকর্ম্ম দেখে যেতেন। অনেকদিন ধরে এই কারুশিক্ষার ক্লাশগুলি বেশ ভালই চলেছিল, তারপর কি কারণে জানি না ধীরে ধীরে উঠে গেল।

এর বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা, তখন আমি আগরতলায় আছি। হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম জোড়াসাঁকোর বাড়ী থেকে, শীঘ্র গোছগাছ করে কোলকাতায় রওনা হবার জন্য, কারণ গুরুদেব শীঘ্রই জাভা, বালিদ্বীপ ভ্রমণে যাবেন, তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। এই সংবাদে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। এর পূর্ব্বে বিদেশ যাওয়ার আমার কখনও সুযোগ হয়নি। দিন কয়েক পর কোলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম। পোষাক ইত্যাদি জামাকাপড় কিছু তাড়াতাড়ি করাতে হল। গুরুদেবের এই ভ্রমণে সঙ্গী হচ্ছেন সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ কর, আরণ্যকম্, ডাচ্ বাকে দম্পতি এবং আমি। ফরাসী জাহাজ আঁবোয়াজ ধরতে হবে মান্দ্রাজের বন্দর থেকে, তাই গুরুদেবের সঙ্গে আমরা ১২ই জুলাই, ১৯২৭ ইং সনে ট্রেন ধরে কোলকাতা ত্যাগ করি। মান্দ্রাজে একজন ধনী ব্যক্তি ও তথাকার হাইকোর্টের যশস্বী আইনজীবী, টি,ভি. রামস্বামীর ভবনে গিয়ে উঠলাম। সেইদিন সেই বাড়ীতে একটি বিয়ে ছিল। সানাই, ঢাক, ঢোলের বাজনা খুব চলেছিল। তারপর ১৪ই জুলাই আঁবোয়াজ জাহাজ ধরে জাভা বালিদ্বীপের উদ্দেশ্যে মান্দ্রাজ ত্যাগ করলাম। জাহাজের কেপ্টেনের পাশের সব চাইতে ভাল একটি "কেবিনে" গুরুদেবের থাকার ব্যবস্থা হল। যে কদিন এই জাহাজে ছিলাম খুব আনন্দে ও আরামের মধ্যে দিনগুলি কেটেছিল। গুরুদেবের লেখার কাজ রোজই চলত, মাঝে মাঝে আমাদের পড়ে শুনাতেন। জাহাজটি মান্দ্রাজ ত্যাগ করে কোথাও না থেমে সোজা সিঙাপুরে এসে ২০শে জুলাই পৌছাল। জাহাজ জেটিতে বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিল গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করার জন্য। বহু ইংরেজ, ভারতীয়, স্থানীয় চাইনীজ ও মুসলমান সেই সময় উপস্থিত ছিল। সিঙাপুর হতে আরম্ভ করে মালয় দেশের প্রধান প্রধান সহরগুলিতে দিন কয়েক করে অবস্থানের পর সদল বলে গুরুদেব কোয়ালালামপুরে এসে উপস্থিত হলেন। একেবারে সমুদ্রের ধারের একটি বাড়ীতে আমাদের সকলের থাকার ব্যবস্থা হল। এই ভ্রমণকালে আমরা বিলেতি পোষাক পরতাম। গলায় টাই বাঁধার অভ্যেস তখনও সহজ হয়নি। এই কাজে একটু উদ্বেগ বোধ করতাম। সুনীতিবাবু আর আমি পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে ভোরবেলায় স্নান করে তারপর গলায় টাই বেঁধে পোষাক পরে নেব আর রাত্রে শোয়ার পূর্ব্বে খোলা যাবে। ঠাণ্ডা জলে ভোরবেলায় স্নান করায় আমার বুকে ঠাণ্ডা লেগে গেল! বুকে ভয়ানক ব্যথা বোধ করতে লাগলাম। গুরুদেবের নিকট ঔষধ আছে জেনে তাঁকে আমার ব্যথার কথা জানালাম। তিনি সব শুনে গম্ভীর হয়ে বল্লেন যে "এ ব্যথা সারাবার ঔষধ আমার নিকট নেই। এ হচ্ছে বিরহের অন্তর বেদনা।" আমি কিছুদিন পূর্ব্বে নূতন বিয়ে করেছিলাম, আমার নববধূটি (১) তাঁর নাত্নী-সম্পর্কীয়া, তাই ঐ কৌতুক আমার সঙ্গে। অবিশ্যি পরে তাঁর ঔষধেই আরোগ্য লাভ করেছিলাম। কোয়ালালামপুর ত্যাগ করে আমরা পিনাং সহরে এসে উপস্থিত হলাম। সমুদ্রের খুব নিকটে স্থানীয় বিত্তশালী এক চাইনীজ ভদ্রলোকের মনোরম একটি বাড়ীতে সকলের

(১) কবির পুত্রস্থানীয় মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের কন্যা।

থাকার ব্যবস্থা হল। বাড়ীটির বারান্দায় এসে দাঁড়ালে সামনের উন্মুক্ত সীমাহীন সমুদ্রপাড়ের রাশি রাশি লম্বা নারিকেল বৃক্ষশ্রেণী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সত্যিই এক অপরূপ দৃশ্য। সমুদ্রের খুব নিকটে বাড়ীটি অবস্থিত হওয়ায় সমুদ্রজলের আঁশটে গন্ধ নাকে পাওয়া যেত। বিজয়াদশমীর দিনে আমরা পিনাংএ ছিলাম। গুরুদেব সমস্ত দিন ধরেই বিজয়ার বহু চিঠি লিখাতে ব্যস্ত ছিলেন। সন্ধ্যার দিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না, সমুদ্র পাড়ের বালির উপর নারিকেল গাছের কাল কাল ছায়া পড়ে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। সুনীতিবাবু ও আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলাম। ফিরে এসে সকলে মিলে রাত্রের আহার সমাপ্ত করে কিছুক্ষণ পরে সকলে বিছানায় গেলাম। চোখে একটু ঘুম এসেছে, তন্দ্রার মধ্যে যেন কিসের একটা গোঁঙান আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভাল করে যখন শব্দটি বুঝবার চেষ্টা করছি তখন মনে হল গুরুদেবের ঘরের থেকে আওয়াজটি হচ্ছে। সুনীতিবাবু ও সুরেনবাবুকে জাগিয়ে আমরা গুরুদেবের ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে দেখতে পেলাম গুরুদেব তাঁর বিছানার উপরে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়ে আছেন ও মুখ দিয়ে আওয়াজ করছেন, শুনে মনে হল যেন কষ্ট বোধ করছেন। তিনি বোধ হয় খাওয়া দাওয়ার পর আবার চিঠি লেখায় বসেছিলেন। পায়ের মোজা ও গায়ের জোব্বা জামাটা খুলে ভাল করে শুইয়ে দেওয়া হল। মাথায় বাতাস করা ও পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়ায় যেন একটু সুস্থ বোধ করলেন। জ্ঞান ফিরে এলে চোখ খুলে বল্লেন, "কেমন জানি বড় ক্লান্ত ও কষ্ট বোধ করছিলাম।" আমরা সকলে যে তাঁর সামান্য সেবা করছি তাতে যেন তিনি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করছিলেন, আমাদের বল্লেন, "এখন আমি বেশ ভাল, তোমরা সকলে ঘুমোতে যাও।" কিছুতেই সেবা নেবেন না। আমরা অগত্যা নিজ নিজ বিছানায় এলাম কিন্তু উদ্‌গ্রীব হয়ে কান পেতে রইলাম আর কোন কিছু হয় কিনা। আমরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম কারণ ধারে পাশে লোকের বসতি নেই, সহরও বহু দূরে, ডাক্তারের প্রয়োজন হলে পাওয়া খুবই অসুবিধা হত।

মালয়দেশে অবস্থানের সময়ে গুরুদেব বহু অভিনন্দন, অভ্যর্থনা ও সম্মান পেয়েছেন, তাঁকে অনেক সভায় বক্তৃতা দিতে হয়েছে। আমাদের চলাফেরায় লক্ষ্য করেছি ঐ দেশের রাস্তাগুলি খুবই ভাল। রাবারের বাগানও অনেক এবং এইগুলির অধিকাংশের মালিক হচ্ছেন ইংরেজ সাহেবেরা। বহুদূর পর্য্যন্ত এক স্থান হতে অন্য স্থানে আমাদের গাড়ী করে যেতে হত। রাস্তার দুই পাশে শুধু রাবারের গাছ, এই দৃশ্য দেখে দেখে গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে বলেছিলেন, "এই রাবারের স্মৃতিকে রাবার দিয়ে ঘষে মুছে ফেলতে হবে।" ১৬ই আগষ্ট মালয়দেশ ত্যাগ করে দুদিন পরে জাভাদেশে এসে পৌঁছলাম।

জাভাদেশটি তখন ওলন্দাজ গভর্ণমেন্টের অধীনে ছিল। স্থানীয় গভর্ণমেন্ট ও কয়েকজন জাভানীজ রাজা গুরুদেবকে খুবই সম্মান ও খাতির দেখিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলেন। দেশটি খুবই সুন্দর এবং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক বহু স্থাপত্যকীর্ত্তি ও সভ্যতার নিদর্শন তখনও ঐ দেশে রয়ে গেছে। বহু প্রাচীনকালে ভারতীয়েরা জাভায় রাজ্যবিস্তার করেছিল। এই দেশটির প্রধান সহর হচ্ছে বাটাভিয়া। এর মাঝখান দিয়ে বেশ একটি বড় জলের কেনেল চলে গেছে। দুই পাড় ইট পাথর দিয়ে বাঁধান। সকাল, সন্ধ্যায় মেয়েদের অবগাহন, কাপড় কাচা, গল্পে-গুজবে কেনেলের দু'পাড় মুখরিত হয়ে উঠে। জাভার যে দুই-একটি রাজবাড়ীতে গুরুদেবের সঙ্গে আতিথ্যগ্রহণের সুযোগ আমরা

পেয়েছিলাম সেই সব স্থানে বিখ্যাত জাভানীজ নৃত্য দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। রাজপরিবারের কন্যারাই অধিকাংশ নৃত্যে যোগ দিতেন। তাঁদের অঙ্গসৌষ্ঠব, হাত ও পায়ের অপূর্ব্ব ভঙ্গি, চলনছন্দ ও রূপসজ্জা নৃত্যগুলিকে এক অনির্ব্বচনীয় রসসৃষ্টিতে পরিণত করেছিল। গামেলাং বাজনার তালে তালে নৃত্যের সমস্ত গতি মনকে মুগ্ধ করে দেয়। জাভানীজ নৃত্য সত্যিই অপূর্ব্ব। ওআয়াং নামক ছায়া অভিনয় দেখার মত। এই ছায়া অভিনয়ের বিষয় হয়েছে প্রধানত মহাভারতের আখ্যানকে অবলম্বন করে। চামড়া কেটে চেপ্টাভাবে মূর্ত্তি তৈয়ের করে এক একটি কাঠির সঙ্গে সংলগ্ন করে দেওয়া হয়। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে থাকে অর্জ্জুন, ভীম, ঘটোৎকচ ইত্যাদি। শাদা পর্দ্দার কিছু দূরে একটি প্রদীপ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং মূর্ত্তিগুলিকে প্রদীপ ও পর্দ্দার মাঝামাঝিতে ধরে তার ছায়াটাকে পর্দ্দায় ফেলে। মূর্ত্তির হাত পা সঞ্চালিত করে গল্প বলে যায় আর তার সঙ্গে থাকে গামেলাং বাদ্য। দর্শকেরা চুপটি করে গল্পের আসরে যেন গল্প শুনতে থাকে। এই দেশের প্রধান দুইটি প্রাচীন মন্দির হচ্ছে প্রাম্বানাম ও বড়বুদুর। প্রথমটি হচ্ছে হিন্দুমন্দির যার পাথরের প্রাচীরগাত্রে সমস্ত রামায়ণের ঘটনা খোদিত আছে এবং দ্বিতীয় মন্দিরটি বৌদ্ধযুগের, তার পাথরের প্রাচীরগাত্রে বুদ্ধের জীবনী ও ঘটনা খোদাই করা হয়েছে। ভারতীয় স্থাপত্যের ও শিল্পের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এই দুইটি মন্দির। গুরুদেব জাভায় পদার্পণ পরে এই দেশের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন, সেইটি ইংরেজি ও ডাচ্ ভাষায় অনুবাদ করে সেইখানে ছাপান হয় ও গুণী ও প্রধান ব্যক্তিদের নিকট বিলি করা হয়। কবিতাটির নাম "শ্রীবিজয়লক্ষ্মী", গুরুদেবের 'জাভাযাত্রীর পত্র' নামক পুস্তকে ইহা ছাপান হয়। এই দেশের অন্যান্য কয়েকটি প্রধান সহর দেখেই গুরুদেব সদলবলে বালিদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

বালিদ্বীপে পৌছান ২৫শে আগষ্ট, ১৯২৭ইং সনে। এইটি একটি ছোট্ট দেশ। পুরাকালে জাভা ও বালির অধিবাসীরা ধর্ম্মে হিন্দু ছিল। তারপর আরবরা এই দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে আসে ও জাভার অধিবাসীদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করে। বালিদ্বীপের অধিবাসীরা কিন্তু হিন্দুই রয়ে গেল। এখনও সেই দেশে ব্রাহ্মণরা পূজা, পার্ব্বণে ও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে থাকে। সংস্কৃত মন্ত্র এদের দ্বারা উচ্চারিত হয় তবে তার বিকৃত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। সুনীতিবাবু অনেক মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ ওদের বলে দিয়েছিলেন। ঐ দেশের লোকেরা যখন শুনল যে মহাভারতের রামায়ণের দেশ ভারতবর্ষ থেকে আমরা এখানে এসেছি তখন ওরা খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এইখানকার লোকেদের সঙ্গে আলাপ হলে দুই-একজন নিজেদের বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল ও তালপাতায় লিখিত প্রাচীন মহাভারত পুঁথি আমাদের দেখিয়েছিল। হিন্দু হলেও তাদের আচার-ব্যবহার, সামাজিক জীবনের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দুদের অনেক জায়গায় অমিল দেখা যায়। গো-মাংস ভক্ষণ ঐ দ্বীপবাসীদের নিকট প্রচলিত। এই দেশের সঙ্গীত ও নৃত্যের খুব খ্যাতি আছে। আমরা যে সময়ে ঐ দেশে গিয়েছিলাম তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার কিছুমাত্র প্রভাব সেখানে দেখি নাই। অতি সরল জীবন তারা পালন করত। দেশে প্রচুর শস্য জন্মে। খাওয়া পরার বেশী ভাবনা নেই। সঙ্গীত আর নৃত্যেই যেন জীবন ভেসে চলেছে।

বালিদ্বীপে গুরুদেবের আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙলী নামক স্থানে রাজা বা 'পুংগবে'র এক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধোৎসব দেখার জন্য। সমস্ত দেশ জুড়ে শ্রাদ্ধোৎসব বেশ কিছুদিন ধরে চলেছিল। মৃতের জন্য শোক করা অপেক্ষা মনে হয় যেন দেশময় আনন্দোৎসব চলছে। বহু ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকানদের এই উৎসবস্থলে দেখেছিলাম। শুভদিনে শবটিকে নূতন থান কাপড়ে মুড়ে বিরাট এক তাজিয়ার মত বাঁশের উচ্চ মঞ্চে উঠিয়ে শত শত লোক তাকে কাঁধে বহন করে শ্মশানে নিয়ে যায়। সঙ্গে দেশের অন্যান্য শবাদিও একই স্থানে নিয়ে আসে। গামেলাং বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি, সঙ্গীত, নারীপুরুষের কলরবে সমস্ত সহর মুখরিত হয়ে উঠে। শবদাহের স্থানে একটি খোলা ঘরের মধ্যে কাল মখমলে আচ্ছাদিত কাঠের বিরাট বৃষ রাখা আছে, শবটি তারই মধ্যে রাখা হয়। কতগুলি অনুষ্ঠানের পর বৃষের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। শব বহনের তাজিয়াগুলিকেও আগুনে পোড়ান হয়। ঠিক সন্ধ্যায় এই ক্রিয়াগুলি করা হয়েছিল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়া না লাগায় এই দ্বীপবাসীদের জীবন সত্যিই বড় সুন্দর, সরল ও অকৃত্রিম ছিল। এই কারণে বহু চিত্রশিল্পী আকৃষ্ট হত এই দ্বীপবাসীদের প্রতি। দুয়েকজন ইয়ুরোপীয় শিল্পী ঐ দেশীয় নারীদের বিবাহ করে সেইখানেই বসবাস করতে আরম্ভ করে। স্থানীয় সমাজ-জীবনের অবস্থা জানবার জন্য খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম যে আমাদের আগমনের কিছু পূর্ব্বেও নাকি এই দ্বীপবাসীদের মধ্যে সতীদাহের প্রচলন ছিল। পরবর্ত্তী কালে ডাচ্ গভর্ণমেন্ট এই প্রথাকে রোধ করে দেন। জাভা ও বালিদ্বীপ ভ্রমণের সময়ে আমরা অনেক নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবার ও দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলাম।

জাভা ও বালিদ্বীপ ভ্রমণের দুই বছর পরে ভারত গভর্ণমেন্টের বৃত্তি লাভ করে আমরা চারজন ভারতীয় চিত্রশিল্পী ১৯২৯ইং সনে লণ্ডনে গিয়েছিলাম। সেই দেশে যাবার উদ্দেশ্য ছিল তথাকার ইণ্ডিয়া হাউস নামক ভারত গভর্ণমেন্টের অফিস বাড়ীর দেয়ালে চিত্র আঁকা। আমাদের লণ্ডনে থাকাকালীন গুরুদেব তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীসহ ১৯৩০ইং সনে লণ্ডনে সাউথ কেনসিংটনে অবস্থিত রেজিনা হোটেলে এসে উঠলেন। হোটেলের মালিক হচ্ছেন একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রতিদিন বিকেল বেলায় আমি ঐ হোটেলে যেতাম। তিনি ফরাসী দেশ হয়ে এখানে বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে তাঁর আঁকা বহু ছবি ছিল। প্যারিসে তাঁর ছবির একটি প্রদর্শনী হয় এবং শিল্প-সমালোচকেরা তাঁর ছবির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নূতন ধরনের এই ছবিগুলি বলে তাঁরা এতে খুব আকৃষ্ট হন। লণ্ডন সহরে রয়াল কলেজ অব আর্টের তখনকার প্রিন্সিপ্যাল উইলিয়ম রথেনষ্টাইন গুরুদেবের পুরাতন বন্ধু, তিনি গুরুদেবের ছবিগুলি দেখে ঐ দেশে একটি ছবির প্রদর্শনী করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। শেষ পর্য্যন্ত গুরুদেবের কয়েকজন পুরাতন ইংরেজ বন্ধুর প্রচেষ্টায় বার্মিংহামে তাঁর চিত্রের একটি প্রদর্শনী হয়। স্থানীয় মিউজিয়ামের জন্য প্রদর্শনী হতে কয়েকটি ছবি ক্রীত হয়। প্রদর্শনীতে দেবার উপযুক্ত ছবি বাছাই করার জন্য আমাকে গুরুদেব আদেশ দেন। রেজিনা হোটেলের একটি ঘরে বসে ছবিগুলি বাছাই করছিলাম, সেই সময়ে গুরুদেব ঐখানে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন তারপর হাসতে হাসতে আমাকে

বল্লেন, "তুই ভাবছিস, গুরুদেব কি সব ছবি এঁকেছেন, তোদের ছবির সঙ্গে একেবারেই মিল নেই। কিন্তু শুনে অবাক হবি আমার ছবিগুলি ইয়ুরোপীয় চিত্র-সমালোচকদের মনে খুব নাড়া দিয়েছে, তারা বেজায় প্রশংসা করছে।" তাঁর সেদিনকার উক্তি আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। আজ রবীন্দ্র-চিত্র জগৎ-শিল্পের মধ্যে উচ্চ স্থান লাভ করেছে। লণ্ডন হতে গুরুদেব জার্ম্মানী, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে গমন করেন এবং ইয়ুরোপের নানা স্থানে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়।

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, শিক্ষাবিদ, সঙ্গীতস্রষ্টা, সর্ব্বগুণে গুণান্বিত, এই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে সেই ১৯১১ইং সন হ'তে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নানাভাবে আলাপের ও তাঁকে দর্শনের সুযোগ আমি পেয়েছি। আমি লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরার রাজবংশের প্রতি তাঁর অন্তরে বিশেষ একটি দরদ ও ভালবাসা ছিল। তিনি ত্রিপুরাকে কখনও ভুলতে পারেন নাই। দেখা হলেই আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করতেন ত্রিপুরার নানা বিষয়ে সংবাদ পাবার জন্য; তারপর লালুকর্ত্তা (মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা) কেমন, তাঁর ছেলেপিলেরা কেমন আছে ইত্যাদি। অন্তরঙ্গ বন্ধু মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের সন্তান বলে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে নিজ পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। কোন এক সময়ে ত্রিপুরায় এসে আগরতলার কুঞ্জবনের একটি বাড়ীতে কিছুদিন তিনি বাস করেছিলেন। তখন মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের রাজত্বের সময়। কুঞ্জবনের সুন্দর দৃশ্য তাঁকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপের সময়ে তিনি অনেকবার ঐ সুখস্মৃতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। শান্তিনিকেতন ত্যাগ করার পরে ১৯৩৮ইং সনের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এলাম, ভেবেছিলাম বোম্বে যাবার পূর্ব্বে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে যাব। মাটির বাড়ী শ্যামলীতে প্রাতে এলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করব বলে, এসে দেখি তিনি নিবিষ্ট মনে টেবিলের উপর একটু ঝুঁকে কি একটা লেখায় ব্যস্ত। আমরা যখনই গিয়ে প্রণাম করি তখনই তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ করে থাকেন। কিন্তু আমার মনে হল, এই সময়ে তাঁর চিন্তার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা উচিত নয়। তাই আমি বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম এমন সময় গুরুদেবের প্রিয় পুরাতন ভৃত্য নীলমণি এসে বল্লে "বাবু ভেতরে যান না, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন।" আমি তাকে বুঝিয়ে বল্লাম যে একটু পরে দেখা করব। আমাদের চুপি চুপি কথাবার্ত্তা তাঁর কানে গিয়েছিল তিনি মাথা তুলে দেখলেন, আমাকে দেখেই ডেকে ভিতরে আসতে বল্লেন। প্রণাম করে পাশের মোড়াটার উপর বসলাম। তিনি আমার নিকট ত্রিপুরার সব সংবাদ জেনে নিলেন। তারপর যখন জানলেন যে আমি বোম্বে রওনা হচ্ছি তখন আমাকে বল্লেন, "তোদের মহারাজ আর কয়েকদিন পর শান্তিনিকেতনে আসবেন তখন তুই থাকবিনে? তুই হচ্ছিস শান্তিনিকেতন ও ত্রিপুরার মাঝে সেতু কারণ আমাদের প্রাক্তন ছাত্র আর ত্রিপুরা রাজ্যের লোক।" তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য করে দিন কয়েক পর আবার শান্তিনিকেতনে এলাম। ত্রিপুরার মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৯ইং সনে পার্ষদগণসহ শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছালেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র সোমেন্দ্র দেববর্ম্মাও ঐ দলে ছিলেন। আম্রকুঞ্জে মহারাজকে গুরুদেব সংবর্দ্ধনা

করেন আশ্রমের প্রচলিত অনুষ্ঠানের দ্বারা। এই সময়ে গুরুদেব একটি সুন্দর ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি মহারাজাকে বলেছিলেন যে "তোমার পূর্ব্বপুরুষদের সহিত আমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও আত্মীয়সুলভ সম্বন্ধ রয়েছে। সেই বংশেরই সেই সব পুরাতন স্মৃতিকে বহন করে আজ তুমি শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হয়েছ" ইত্যাদি। গুরুদেব মহারাজকে অভ্যর্থনা করেছিলেন মহারাজ বলে নয়, নিজের আত্মীয় রূপে। লক্ষ্য করেছিলাম কী আন্তরিকতার সহিত গুরুদেব মহারাজকে শান্তিনিকেতনে গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বভারতীর সর্ব্ববিভাগ ও কর্ম্মপদ্ধতি মহারাজাকে দেখান হয়, এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। তখনই তিনি সঙ্গীত-ভবনের সংলগ্ন রঙ্গমঞ্চের প্রস্তুতির যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দান করেন। তাঁরই আনুকূল্যে বর্ত্তমান সঙ্গীত-ভবনের রঙ্গমঞ্চটি প্রস্তুত হয়। তাঁর শান্তিনিকেতন আগমনের কয়েক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৪১ইং সনে রাজদরবার হতে প্রেরিত ব্যক্তিরা শান্তিনিকেতনে এসে গুরুদেবকে ১৩ই মে তারিখে ভারত-ভাস্কর উপাধি প্রদান করেন।

গুরুদেবের মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তাঁর সঙ্গে নানা কথার প্রসঙ্গে ত্রিপুরা রাজবংশের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, "দেখ্, তোদের মহারাজাদের হয়ত হাইদ্রাবাদের নিজামের মত অর্থ নেই কিন্তু তাঁদের নিকট হতে যে আন্তরিকতা ও রাজোচিত ব্যবহার পেয়েছি ভারতের কোন রাজাদের থেকে তা আমি পাইনি। আমাদের দেশের প্রাচীন কাব্য ও সাহিত্য পড়ে রাজাদের সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা আমাদের মনে আসে আমি শুধু একমাত্র ত্রিপুরা মহারাজাদের মধ্যেই সেই রাজোচিত গুণাবলীর পরিচয় পেয়েছি, সত্যিই এঁরা রাজারই উপযুক্ত ব্যক্তি।" এত বড় মহান ব্যক্তির এই উক্তিতে সত্যিই খুব আনন্দ অনুভব করেছিলাম সেদিন। ত্রিপুরার মহারাজেরা গুরুদেবের শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কার্য্যে সর্ব্বদা সহায়তা-পরায়ণ ছিলেন ও বহুপ্রকারে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। অন্তরে তাঁরা গুরুদেবকে বন্ধুরূপে বরণ করেছিলেন এবং শ্রদ্ধাও দেখিয়েছিলেন। গুরুদেব এই বন্ধুত্বের স্বীকৃতি বহুবার প্রকাশ করেছেন এবং ত্রিপুরার ইতিহাসকে অমরত্ব লাভের সুযোগ দিয়ে গেলেন তাঁর লিখিত রাজর্ষি উপন্যাসে ও বিসর্জ্জন ও মুকুট নাট্যকাব্যের মাধ্যমে। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বহু রাজ্য, রাজা ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে কিন্তু একবার মহাকবির কাব্যে যে স্থান পেল সে অমর হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের শতজন্মবার্ষিকী পূর্ণ হবে ১৯৬১ ইংরেজি সনের ২৫শে বৈশাখ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই উপলক্ষে উৎসব পালন করা হবে। ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট ও রাজ্যবাসীরা রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরার মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকার স্মৃতি মনে রেখে উপযুক্তভাবে উৎসব পালন করার ব্যবস্থা করছেন জেনে খুবই আনন্দিত হয়েছি। তবে গুরুদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি পৌঁছে দিতে পারব যদি আমরা তাঁর সাহিত্য, কাব্যকে আগ্রহসহকারে পড়ে দেখি, তাঁর সঙ্গীত শুনে আনন্দ পাবার চেষ্টা করি, তাঁর আদর্শকে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা করি। তবেই তাঁর শতবার্ষিকী জন্মোৎসব পালন সার্থক হবে।

'স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি'

ঠাকুর নবকুমার সিংহ

কবিগুরুর মহান আবির্ভাবের শতবার্ষিকী উৎসবে আপনাদের আহবান আমার জীবন-এ্যালবামের কয়েকটি ছবিকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিল। তখন ইচ্ছা হইল, সেই জীবনে আবার ফিরিয়া যাই, তাহাকে নতুন করিয়া উপভোগ করি। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বুঝিলাম, একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও তাহা আজ সম্ভব নয়। সমস্ত মনটা বিষাদে ভরিয়া গেল।

জীবনে স্মৃতির ভূমিকাকে যাহারা লঘু করিয়া দেখে, তাহাদের কথা বলিয়া লাভ নাই। আমাদের মতো যাহারা সত্তর-এর কোঠা পার হইয়া গিয়াছে অনেক দিন আগে, তাহাদের কাছে এই স্মৃতির যে একটা বিশেষ মূল্য আছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আজ পারের দিকে যাত্রা করিয়াছি। বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বলতা ও জড়ত্বে অনেক দিন আগে হইতেই জীবনটা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমিত হইয়া গিয়াছে। আবার, পরিবর্ত্তমান বিশ্বের দিকে তাকাইয়া ভবিষ্যতে নতুন কিছু লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাও আজ সাহসের সহিত করিতে পারিতেছি না। তখন স্বভাবতই পিছনের ঘাটে ফেলিয়া — আসা জীবনটার দিকে ফিরিয়া তাকাই। নিভৃত আত্মবিশ্লেষণের অবসরে নিজের অজান্তে কখন অতীত জীবনের অনেক ছবি চোখের সামনে পর পর ভাসিয়া উঠে। তখন বেশ লাগে, — কারণ, ইহারা যে আমার জীবনের 'একান্ত করে চাওয়া' ধন। ইহাদের বাদ দিলে যে জীবনের আর কিছুই থাকে না।

বাহির হইতে যখনই কোন কারণে স্মৃতির দুয়ারের কড়া নড়িয়া উঠে, তখনই মনটা এই রকম অতীতমুখী হইয়া পড়ে। আজিকার উৎসবে আপনাদের আহবান আমার জীবনে সেই ভূমিকা নিল। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশে বসিয়া গেলাম। দেখিলাম, দীর্ঘকাল কবিগুরুর মহান সান্নিধ্যে জীবনে এমন কিছু পাইয়াছিলাম, যাহা আজও আমাকে সর্ব্বপ্রকার তুচ্ছতা হইতে রক্ষা করিতেছে। আজ আমার দিনাবসানের আলোকে সবকিছু স্পষ্ট মনে পড়ে না। আবার এতদিন পর ঘটনা-পরম্পরায় সবকিছু স্মরণ রাখাও অসম্ভব। তদুপরি যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহার অবিকল নকল রাখিবার তুলিও সেদিন আমার হাতে ছিল না। স্বভাবতই আজ সেই সব বলিতে গেলে অনেক 'আগের জিনিষ পাছে ও পাছের জিনিষ আগে' আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। তবু যতদুর সম্ভব সবকিছুকে সামঞ্জস্যে আনিয়া স্মৃতি-কথায় ছবি আঁকিয়াছি, কোথাও ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করি নাই। তাই পাঠকদের কাছে অনুরোধ তাঁহারা যেন আমার এই স্মৃতি-কথাকে ইতিহাসের পর্য্যায়ে ফেলিয়া বিচার না করেন। যদি করেন, তবে আমাকে মস্ত ভুল বুঝা হইবে।

যতদুর মনে পড়ে, তখন উনিশ শ' পঁচিশ সালের শেষ ভাগ। তদানীন্তন ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মার কাছে কবির নিকট হইতে একটি চিঠি আসে। তাহাতে তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের জন্য একজন মণিপুরী নর্ত্তক চাহিয়া পাঠান। সেই সূত্রেই মাস কয়েক পর আমি ও আমার অনুজ ৺বৈকুণ্ঠনাথ

শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম। সে আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। বোলপুর ষ্টেশন হইতে আমাদের গন্তব্যস্থলের মাঝে কি দেখিয়াছিলাম, কি ঘটিয়াছিল, কে আমাদের পথ দেখাইয়া নিল — তাহার কিছুই আজ স্মরণে আসে না। শুধু এইটুকু মনে পড়ে, দিগন্তবিস্তৃত ধূ-ধূ-করা মাঠ পার হইয়া যখন শান্তিনিকেতনে পৌঁছিলাম তখন দেখিলাম, বেলাশেষের পড়ন্ত রোদ শান্তিনিকেতনের গোটা তিনেক দালান বাড়ি, টালি ও খড়ের ঘর এবং শাল-ছাতিমের চূড়ায় চূড়ায় বিচিত্র রঙের ছবি আঁকিতে বসিয়া গিয়াছে। উত্তরের গ্রাম-ছাড়ানো রাঙা মাটির পথকে তখন নববধূর সরু উজ্জ্বল সীমন্তের মতই মনে হইতেছিল। প্রথম দর্শনেই সেদিন শান্তিনিকেতন আমাকে অন্তর দিয়াছিল, আমিও তাহাকে ভাল বাসিয়াছিলাম।

কিছুকাল পর শান্তিনিকেতনে 'প্রাইভেট ভিজিটে' আসিলেন তৎকালীন বাংলার ছোটলাট লর্ড লীটন। কবি তাঁহার অতিথি-আপ্যায়নের যথারীতি ব্যবস্থা করিলেন। এই উপলক্ষে সংগীত-নৃত্যেরও আয়োজন হইয়াছিল। মনে পড়ে, আমি খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কয়েকজন মেয়েকে নিয়া মণিপুরী 'রাসলীলা নৃত্য' পরিবেশন করিয়াছিলাম। নৃত্যে সংযোজিত পদগুলির মধ্যে একটির শেষ পংক্তি ছিল — 'গোবিন্দ দাস তাই যায় বলিহারি'। কবির অনুমতি না লইয়াই আমি ভণিতায় 'গোবিন্দ দাসে'র স্থলে 'রবীন্দ্রনাথ' বসাইয়া দিয়াছিলাম। ছোটলাট আমাদের আতিথেয়তার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানের পর সব নীরব হইয়া গিয়াছিল। সবার মনেই আনন্দ। কিন্তু আমার মনে শুধু ভয়, কি জানি কবি কি বলেন। একটা বোবা অস্বস্তি নিরন্তর বোধ হইতে লাগিল। শেষে ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কবির কাছে গিয়া সবকিছু খুলিয়া বলিলাম। কিন্তু তিনি যখন হাস্যোজ্জ্বল মুখে 'বেশ ভালো হয়েছে' বলিয়া আমাকে উৎসাহিত করিলেন, তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ভার দূর হইয়া গেল। বহুকাল কবির সেই ক্ষমাসুন্দর হাসির কথা ভুলিতে পারি নাই।

আরও কিছুকাল পর, কবি তখন পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে সেই সফরের সবকিছু শুনিয়াছি। প্রসঙ্গত আমাদের আগরতলার আদর-আপ্যায়নের কথাও বলিয়াছিলেন। এখানকার মণিপুরী নৃত্য যে তাঁহার মনে বেশ আনন্দ দিয়াছিল ইহা তাঁহার কথা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আসিয়াই আমাকে বলিয়াছিলেন, "নবকুমার, তোমাদের আগরতলায় নৃত্য দেখে এলাম, বড়ো ভালো লাগলো। কিন্তু বড়ো বেশি Repetition হয়। তবু রাধার হাতের একটা বিশেষ ভঙ্গি বেশ লাগলো। কৈ তুমি তো আমার এখানে এমন কিছু দেখাও না, — দিতে কার্পণ্য করো নাকি?" আমি ভীষণ লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কি উত্তর করিয়াছিলাম তাহা আজ এতকাল পর ঠিক মনে নাই।

সেবার কবির ৬৫তম জন্মদিবস শান্তিনিকেতনে বেশ জাঁক করিয়া উদ্‌যাপিত হইল। কলিকাতা ও বাহির হইতে কবির অনুরাগী অনেকেই আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হইয়াছিল। মাস কয়েক পরে ইহা আবার কলিকাতার জোড়া—সাঁকোর বাড়ীতে অভিনীত হয়। নটীর ভূমিকায় নামিয়াছিলেন নন্দলাল বসুর বালিকা কন্যা গৌরী। নৃত্য-ভঙ্গিমায় বালিকা গৌরীর দক্ষতা তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিয়াছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই নাটকের অভিনয় উচ্চ প্রশংসিত হইল। শান্তিনিকেতন তথা সমগ্র বাংলা দেশের নৃত্যশিল্পের ক্ষেত্রে ইহা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। ইহার পূর্ব্বে আর কখনো ভদ্রবংশীয় মেয়েরা বোধ হয় সর্ব্বসমক্ষে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেন নাই। যথার্থভাবে বলিতে গেলে, এই ঘটনার পর হইতেই বোধ হয় বাংলার তথাকথিত ভদ্রসমাজে নৃত্যকলা সমাদর লাভ করে।

· শান্তিনিকেতনে প্রথম আসার পর দেখিয়াছিলাম, সেখানে কেবলমাত্র দক্ষিণী 'কথাকলি' নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এই কথা ঠিক যে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই কবি এখানে মণিপুরী নৃত্য প্রবর্ত্তনার কথা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেই বছর কয়েক আগে কবি আগরতলা হইতে মণিপুরী নর্ত্তক বুদ্ধিমন্ত সিংহকে এখানে আনয়ন করেন। কিন্তু বুদ্ধিমন্ত সিংহ বেশিকাল এখানে অবস্থান করেন নাই। তাহার পর হইতেই বেশ কিছুকাল শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য শিক্ষায় ছেদ পড়িয়া যায়।

মাঝে মাঝে কবি আমাকে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার দেখা নৃত্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা বলিতেন। কোথায় দক্ষিণী নৃত্য-ভঙ্গিমা, কোথায় সিলেটের লোকনৃত্য, আবার কোথায় যবদ্বীপের নৃত্যকলা দর্শন — কোনটাই বাদ পড়িত না। এই সব শুনিয়া মনে হইত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই পরিবর্ত্তিত হইতেছে — আর তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে মানুষের মন। সে আরও নতুন কিছু চায়, সে বৈচিত্র্যের পিয়াসী। ইহার পরেই আমি মণিপুর চলিয়া গেলাম নতুন কিছু নৃত্য-ঠাট শিখিবার উদ্দেশ্যে।

১৯২৭ সালের মে কি জুন মাস। গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য আমেদাবাদের ধনী ব্যবসায়ী অম্বালাল সারাভাই চলিয়াছেন শিলং এর দিকে। চন্দননগর সফরান্তে কবি ফিরিতেছেন শান্তিনিকেতনে। সময়মতো উভয়ের দেখা হইয়া গেল কলিকাতায়। সারাভাই আর কবিকে তখন শান্তিনিকেতনে ফিরিতে দিলেন না। সপরিবারে উভয়েই যাত্রা করিলেন শিলং পাহাড়ের দিকে। তখন আমি আগরতলায়। হাতে একদিন হঠাৎ একটি চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। খুলিয়া দেখি, উভয়ের আসরে আমার ডাক পড়িয়াছে। যাত্রার আর বিলম্ব করিলাম না। যথানির্দ্দিষ্ট দিনে শিলং পৌঁছিয়া দেখি কবি এক সুন্দর গৃহে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া উভয়েই বেশ খুশী। কয়েক মাস আগে কলিকাতায় 'নটীর পূজা' অভিনয়ের দেশজোড়া খ্যাতি সারাভাই মহাশয়ের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই শিলং পাহাড়ে আসিয়াই কবির কাছে প্রস্তাব দিলেন যেন কিছুকাল তাঁহার ছেলেমেয়ের নৃত্যশিক্ষার ভার আমি নেই। কবির আদেশ অমান্য করিতে পারি নাই — কুমারী মৃদুলা, লীনা প্রভৃতি জনকয়েক সারাভাইয়ের ছেলেমেয়ে আমার নিকট নৃত্যশিক্ষা করিতে লাগিল। মাস দেড়েকের শিলংবাসের জীবন মন্দ লাগে নাই। পাহাড়ের পর পাহাড় যেন গায়ে গায়ে লাগিয়া বহুদূরে মিশিয়া গিয়াছে। ইহাদের উপর পাইন বনের সারি — কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে মনটা অনায়াসেই এই জীবনের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির অতীত একটা অনির্ব্বচনীয় লোকের সন্ধান পাইত। কিছুই মনে থাকিত না — বহুক্ষণ পর পথিকের পদশব্দে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া বাসায় আসিতাম। এদিকে ঘনবর্ষা আসিবার বেশি বাকী ছিল না। তাই কবি ও সারাভাই উভয়েই সেবারের মতো

কলিকাতায় ফিরিবার জন্য পাততাড়ি গুটাইয়া লইলেন। আমিও বিদায় লইয়া আগরতলায় ফিরিয়া আসি।

ইহার পর আবার আমাকে অম্বালাল সারাভাই এর আমন্ত্রণে আমেদাবাদে যাইতে হইয়াছিল, সঙ্গে ছিল আমার জ্যেষ্ঠ ছেলে শ্রীমান নরেন্দ্রকুমার সিংহ। ঘটনাক্রমে সেখানে আমার প্রায় সাতটি বছর কাটিয়া গিয়াছে। ফিরিবার পথে কলিকাতায় আসিয়া শ্রীমান নরেন্দ্রকে দেশের দিকে পাঠাইয়া দিলাম। আমি চলিয়া গেলাম শান্তিনিকেতনে — কবির সহিত অনেকদিনের অসাক্ষাৎ, কি জানি কবি কেমন আছেন, কি ভাবে দিন কাটাইতেছেন। শান্তিনিকেতনে পৌছিলাম। কবি আমার আগমনের খবর পাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "নবকুমার যে, এসো, এসো — এ সময়ে তোমার উপস্থিতির প্রয়োজনই বেশি করে উপলব্ধি করছিলাম।" হঠাৎ আবার কি প্রয়োজন দেখা দিল তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। পরমুহূর্ত্তে যখন হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন, "রাক্ষসের দেশে যাবে?" — তখন বেশ কিছুটা ঘাবড়াইয়া গেলাম। "লঙ্কা যাচ্ছি, লঙ্কা — চলো আমার সঙ্গে" — কবি নিজেই শেষে সমস্ত ভয় দূর করিয়া দিলেন। খুলিয়া বলিলেন সবকিছু। কলম্বোর প্রসিদ্ধ ডাক্তার বালেন্দ্র টেলিগ্রাম করিয়া জানিতে চাহিয়াছেন, তিনি তাঁহার দলবল লইয়া সেখানে আসিতে পারিবেন কি না। এমন সময় আমাকে দেখিয়া কবি অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনিলকুমারকে নির্দ্দেশ দিলেন যেন শীঘ্র টেলিগ্রামের উত্তর দিয়া জানাইয়া দেওয়া হয় যে, আমরা অভিনয়ের দল লইয়া কলম্বোর দিকে আসিতেছি।

কবি এমনিতেই একটু বেশি ভ্রমণবিলাসী ছিলেন। ইহা ছাড়া এবারকার সফরের অন্য কয়েকটা উদ্দেশ্যও ছিল। ইহার আগে বেশ কয়েকবার কবিকে শান্তিনিকেতনের ব্যাপারে আর্থিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান সফরে মোটা একটা অর্থসংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল। সর্ব্বোপরি, দুই ভিন্নতর দেশের মধ্যে সংস্কৃতি বিনিময়ের মহৎ সম্ভাবনা। সুতরাং পুর্ণোদ্যমে যাত্রার প্রস্তুতি চলিল। 'শাপমোচন' বইটির নৃত্যনাট্যে রূপদানের দায়িত্ব পড়িল আমার উপর। সঙ্গীত সংস্থাপনার ভার নিলেন পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী। এই বিরাট কাজে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীমান নরেন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে ডাকিয়া পাঠাইলাম। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর অঙ্কিত চিত্রকলা সংগ্রহেরও বেশ তোড়জোড় চলিল।

অবশেষে ১৯৩৪ সালের ৫ই মে কলিকাতা বন্দর হইতে কবি তাঁহার অভিনয় দল সহ ডিজেল ইঞ্জিনে চালিত সম্পূর্ণ নতুন জাহাজ 'ইনচাংগা' করিয়া যাত্রা করিলেন কলম্বো অভিমুখে। দিন চারেক পর জাহাজ কলম্বোর মাটি স্পর্শ করিল। কবিকে সম্বর্দ্ধনা দিতে আসিলেন সহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। মেয়েদের থাকিবার ব্যবস্থা হইল স্থানীয় এক বালিকা বিদ্যালয়ে। আমরা রহিলাম ডেন্টিস্ট বালেন্দ্রের বাসায়। কবির জন্য আগে হইতেই নির্দ্দিষ্ট ছিল সমুদ্রতীরের এক সুন্দর বাড়ী। মাস দেড়েক কাল আমরা কলম্বোর বিভিন্ন জায়গায় বেড়াইলাম। প্রায় সব জায়গাতেই 'শাপমোচন' অভিনয় ও চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল।

কী ধর্ম, কী সংস্কৃতির সূত্রে সিংহলীদের সহিত ভারতবাসীর পরিচয় আজিকার নতুন ঘটনা নয়। বহু প্রাচীন কাল হইতেই তাহাদের সহিত আমাদের অন্তরের যোগাযোগ

রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু মাঝের কয়েক শতাব্দীর ইউরোপীয় প্রভুত্বে সিংহলীদের সহিত আমাদের সেই যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। দীর্ঘকাল পর আজ আমাদের ভ্রমণের দ্বারাই যেন সেই ছিন্নসূত্র পুনঃ সংযোজিত হইল। অবাক বিস্ময়ে সিংহলীরা ভারতীয় চিত্রকলা, সঙ্গীত ও অভিনয় দক্ষতা লক্ষ্য করিল। তাহারা মুগ্ধ হইয়া গেল।

১৫ই জুন। আমাদের জাহাজ যাত্রা করিল স্বদেশের অভিমুখে। অত্যধিক জনপ্রিয়তা বশতঃ যাত্রার পূর্ব্বের তিনদিন জনসাধারণ ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'শাপমোচনে'র বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ফিরিবার আগমুহূর্ত্তে বোম্বাই-এর ফেলোশিপ্‌স্ স্কুল হইতে কবিগুরুর কাছে আমাকে সেখানে পাঠাইবার জন্য এক আমন্ত্রণ আসিল। কবির আদেশে মাদ্রাজে পৌঁছিয়াই আমি শ্রীমান নরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বোম্বাই চলিয়া গেলাম। ফেলোশিপ্‌স্ স্কুলের কাজের শেষে আমাকে বেশ কতকদিন কে, এম, মুন্সীর অধীনে থাকিতে হইয়াছিল। কার্য্যশেষে আমি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া যাইতে আয়োজন করিয়াছিলাম। কিন্তু সেদিন বোম্বাই আমাকে কবির কাছে যাইতে না দিয়া আমার কি ক্ষতিটাই না করিয়াছিল, তাহা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি।

প্রায় চৌদ্দটি বছর সেখানে কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই দীর্ঘকাল প্রবাসের মুহূর্ত্তে কবির বন্ধুসুলভ মনোভাব, সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সর্ব্বোপরি সংগীত-নৃত্য ও মঞ্চশিল্প সম্পর্কে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্ব্বদা প্রেরণা দিয়াছে। একটি দিনও তাঁহার কথা ভুলিতে পারি নাই। দক্ষ নর্ত্তক বলিয়া সব সময় আমার একটা গর্ব্বের ভাব ছিল, এখনো আছে। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া আজ এই কথা নির্ব্বিচারে ঘোষণা করিয়া বলিতে পারি যে, কবিগুরুর মহান সান্নিধ্য সর্ব্বদা না পাইলে গানের ভাষা, সুর ও ভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া মঞ্চে সার্থক নৃত্যপরিবেশন-কৌশল আমার নিকট সম্পূর্ণ অজানা থাকিত। এই বিষয়ে কবিগুরুর কাছেই আমার প্রথম হাতেখড়ি।

১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট। একান্ত আকস্মিকভাবে খবর আসিল — কবি ইহলোকে নাই। খবর শুনিবার পর কিছুই ভাল লাগিল না, মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলাম। মনে হইল, জীবনের অর্থটি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছি। বছর কয়েক পর আগরতলার দিকে যাত্রা করিলাম। পথে কলিকাতা হইতে শৈলজাবাবুর নামে একটা চিঠি পাঠাইয়া দিলাম। জানাইলাম, আমার কর্ম্মজীবনের শুরু একদিন শান্তিনিকেতনে — জীবনের ছেদটাও সেখানে টানিতে চাই। শৈলজাবাবু আমার মনের অবস্থা বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন। যথাসময়ে আহবানলিপি পাইয়া আবার শান্তিনিকেতনে গেলাম। কিন্তু 'সেই শান্তিনিকেতন'কে পাইলাম না। সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। সেই খড়ের ঘর আর নাই — অনেক নতুন দালানবাড়ী উঠিয়াছে। বৎসরাধিককাল ছিলাম। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কিছুকাল পরেই আগরতলায় ফিরিতে বাধ্য হইয়াছি।

সেদিন ফিরিয়া আসিবার আগে পিছন পানে নতুন শান্তিনিকেতনের দিকে একবার শেষবারের মতো তাকাইয়া নিয়াছিলাম। তখন হঠাৎ কবির একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। কলম্বো হইতে ফিরিবার পথে বোম্বাই যাত্রার প্রাক্কালে কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, — "গুরুদেব, সেখানকার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি কোথায়

যাবো? জীবনের দীর্ঘ সময় প্রবাসে কাটিয়ে দিয়েছি, এখন দেশের বাড়ীকেও ভালো করে চাইতে পারবো না, অন্য কোন জায়গাতেও সত্যিকারের শান্তি পাবো না। এ অবস্থায় তখন আমি কি করবো?" কবি আমার কথার উত্তরে গভীর আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন, — "আমার শান্তিনিকেতনেই শান্তি আছে। তোমার যখনই কোন প্রকার অসুবিধা বোধ হবে, তখন এখানে চলে এসো। দেখবে, আমার শান্তিনিকেতন শান্তি দিতে জানে।" এই আশ্বাস লইয়াই শান্তিনিকেতনে আবার গিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখ রহিল, কবির জীবিতকালে তাঁহার আশ্রমে যাইতে পারিলাম না। এই কথাটা স্মরণে আসিলে আজও নিজের অজান্তে চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে, অলক্ষ্যে কয়েকফোঁটা অশ্রু নীচের দিকে নামিয়া আসে। সেই সব স্মৃতির ভারে আজও আমি এই প্রাত্যহিক জীবনের ধূলিজালের মধ্য দিয়া ক্লান্ত শরীরে বৈঠা বাহিয়া চলিয়াছি। কিন্তু বহুদিন আগেই কবি সেই তীরে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। আজ 'ভারমুক্ত সে এখানে নাই'।

[অনুলেখক—শ্রীপরিচয় দত্তগুপ্ত]

রবিতীর্থ - স্মৃতি

শ্রীশৈলেশচন্দ্র দেববর্ম্মা

আমার মাতুল ঁসোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের যথানির্দ্দিষ্ট শিক্ষা সমাধা করে যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁরই বিশেষ অনুরোধক্রমে দাদামহাশয় আমাদের শান্তিনিকেতন পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার মাতুলালয়ের প্রায় অনেকেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ছাত্র। আমার মাতুল সোমেন্দ্রচন্দ্রও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের শিক্ষা সমাধা করে গুরুদেবের সঙ্গেই অধ্যয়নার্থ আমেরিকার 'হারভার্ড' বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। গুরুদেবই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে ভর্ত্তি করিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। দাদামহাশয়ের আদেশ আর মাতুল সোমেন্দ্রচন্দ্রের আন্তরিক সমর্থনে আমার দুই মাতুল — নরসিং দেববর্ম্মা, সুখময় দেববর্ম্মা আর আমি এই তিনজনের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ পথযাত্রী হোতে হয়েছিল। তখন আমাদের পথ-চলার অভিভাবক ও পথ-প্রদর্শকরূপে দাদামহাশয় তাঁর আর্দ্দালী গৌরচন্দ্রকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। সে আমাদের তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রহায়ণ মাসের শীতের রাতে শান্তিনিকেতনের পথে রওনা হলো।

রেলগাড়ী ও ষ্টিমারে স্থলপথ ও জলপথ অতিক্রম করে তিনদিন পর শীতের সন্ধ্যায় বোলপুর ষ্টেশনে এসে পৌঁছলুম। বোলপুর ষ্টেশনে আসতেই গৌরচন্দ্র বলে উঠলো — "বাবু সাহেবরা এবার নেমে পড় আর কি? এখন শান্তিনিকেতন যেতে হবে।" আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম। গৌরচন্দ্রও তাড়াতাড়ি কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে দিয়েই আমাদের ষ্টেশনের বাহির পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্‌লো। আজকাল বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতন যেতে হ'লে মোটর গাড়ী ও সাইকেল রিক্সা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তারপর গোরুর গাড়ী তো আছেই। কিন্তু আমাদের যাবার বেলায় এক গোরুর গাড়ী ভিন্ন কোন গাড়ীই ছিল না। প্রায় অর্দ্ধঘন্টা পর আমরা ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতনের ধারে এসে পৌঁছলুম। গৌরচন্দ্র আমাদের নিচু-বাঙ্গলা দেখিয়ে দিল। তখন এই নিচু বাঙ্গলা তপোবনের মত আমার চোখে শোভা পাচ্ছিল। এখানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাস করতেন। দেখতে দেখতে গাড়ী নিচু-বাঙ্গলা ছেড়ে অতিথিশালার দ্বারে এসে পৌঁছলো। দাদামহাশয়ের চিঠি পেয়ে মাতুল নৃপেন্দ্রচন্দ্র আমাদের অপেক্ষায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের গাড়ী থেকে নামিয়ে নিলেন ও অতিথিশালায় নিয়ে গেলেন।

আমি শুনেছিলুম কখনো কখনো দাদামহাশয়ের কলিকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী যাবার পালা আসলেই তিনি গৌরচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কারণ তখন সে ছিল দাদামহাশয়ের আর্দ্দালী ও ক্যামেরা বাহক। দাদামহাশয় তাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের বহু জায়গায় গিয়ে অজস্র ফটো তুলেছিলেন। তাঁর একান্ত সখ ছিল ফটো তোলার, তাই ক্যামেরা বাহককে সর্ব্বদা সঙ্গে নিয়ে চলতে হোত। মনে পড়ে, গুরুদেব একবার দাদামহাশয়কে ঠাট্টা করে এক পত্রে লিখেছিলেন [১] — "তোমার হারা ক্যামেরা পাইয়াছ ত, হারানই উচিত ছিল। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ।"

---

(১) কর্ণেল মহিম ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ থেকে।

তাই গৌরচন্দ্র তখন ছিল দাদামহাশয়ের ক্যামেরা বাহক আর এখন হোল আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্র সান্নিধ্যের পথপ্রদর্শক ও অভিভাবক।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের শালবীথির পূর্ব্ব প্রান্তে বোলপুর ষ্টেশন যাবার রাঙামাটির পথপার্শ্বে ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ীতে বাস করতেন। এ বাড়ীটি এখন 'দেহলী' নামে পরিচিত। এ দোতলা বাড়ীটি টীনের ছাউনী দেওয়া ছিল। সেদিন শীতের সকাল বেলায় গুরুদেব সান্নিধ্যে উপস্থিত করাবার বাসনায় গৌরচন্দ্র তৈরী হলো এবং আমাদের জামা কাপড় নিয়ে প্রস্তুত হ'তে বললো। আমরা গুরুদেব রবীন্দ্র দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হলুম। যথাসময়ে মাতুল নৃপেন্দ্রচন্দ্রও প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গে চল্‌লেন। ধীরে ধীরে গুরুদেবের ছোট্ট দোতলা বাড়ীর সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হ'তেই গৌরচন্দ্রকে মাতুল নৃপেন্দ্রচন্দ্র বলেছিলেন, — "গৌরচন্দ্র, তুমি এদের নিয়ে এখানে একটু দাঁড়াও।" এ কথার সঙ্গে সঙ্গে গৌরচন্দ্র বেশ একটু বিরক্ত মনে মাতুল নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে বলেছিল — "ওহে বাবু সাহেব, তুমি কি রবিবাবুকে বেশী চেন?" বলেই আমাদের হাত ধরে হিড়্ হিড়্ করে টেনে নিয়ে চললো উপরতলায় সিঁড়ি-পথে। দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেই পরদাটা সরিয়ে আমাদের নিয়ে গুরুদেব সান্নিধ্যে উপস্থিত হ'ল। সেখানে গিয়েই সে করজোড়ে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হোল গুরুদেবের চরণপ্রান্তে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গুরুদেবকে প্রণাম করে একধারে দাঁড়িয়ে রইলুম। পেছন পেছন এসে মাতুল নৃপেন্দ্রচন্দ্র তাঁকে প্রণাম করলেন। বিশেষ করে গৌরচন্দ্রের এই কীর্ত্তি দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। গৌরচন্দ্র যখন আমাদের নিয়ে প্রবেশ করছিল, তখন গুরুদেব তাঁর দোতলা বাড়ীর পুবের বারান্দায় বসে কবিতা-রচনায় তন্ময় ছিলেন। আমাদের চলার শব্দ পেয়েই তিনি মাথা তুলে আমাদের প্রতি নিরীক্ষণ করতেই গৌরচন্দ্রকে দেখে বলে উঠ্‌লেন — "কীরে গৌরচন্দ্র, কবে এলি?"

"কর্ত্তাবাবু, কাল এসেছি। সাহেব এদের আপনার ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে পাঠালেন, তাই এদের নিয়ে আসতে হয়েছে। অনেক দিন থেকে আপনার শ্রীচরণ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, আজ এদের নিয়ে আসার আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হোল।"

ক্রমান্বয়ে গৌরচন্দ্র গুরুদেবের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে ডুবে অনর্গল আলোচনা জমিয়ে বসেছিল। কথায় কথায় এমন পুরনো রসের আলাপ জমিয়ে বসেছিল যে আর শেষ হবার মত নয়। উক্ত কথাপ্রসঙ্গের ভাবগতি দেখেই মাতুল নৃপেন্দ্রচন্দ্র চুপি চুপি আমাদের তিনজনকে বাহিরে যাবার জন্য ইসারা করলেন বিদায় নেবার ছলে আমরা গুরুদেবকে প্রণাম করতেই, তিনি আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেই বললেন, — "তোমরা এখানে এসেছো — বাড়ির মতই মনে করো। তারপর খেলাধূলো ত আছেই।"

গুরুদেবের আদেশ পেয়ে মাতুল নৃপেন্দ্রচন্দ্র আমাদের নিয়ে মোহিত কুটিরের পথে বেড়িয়ে পড়লেন। সেখানে শিক্ষক মহাশয় তেজেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমাদের মোহিত কুটিরে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে মর্ম্মে গুরুদেবের আদেশ জানালেন। এ খবরে তেজেশবাবু আমাদের তিনটি খাট দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করে প্রত্যেকে নিজ নিজ খাটে বিছানাপত্র পেতে নিলুম। ঢং ঢং করে দ্বিপ্রহরের খাবার ঘন্টা পড়ে গেল। আমরা নিজ নিজ

থালা বাটি হাতে নিয়ে লাইন বেঁধে রান্নাঘরে গেলুম। সেখানে মধ্যাহ্নের আহার সেরে ঘরে ফিরে এলুম এবং বিছানায় পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলুম। শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবছিলুম গুরুদেবের সান্নিধ্যের কথা। সে সময়কার গুরুদেব দর্শন আমার চোখে অপরূপ অনুভূত হয়েছিল। শীতের সকাল। চারিদিকে সোনালী রোদ ঝিক্ মিক্ করে গুরুদেবের গৌরবর্ণ মুখটিতে, শুভ্র চুলে ও দাড়িতে পড়ে মনোমুগ্ধকর রূপালী আভার সমাবেশে যে অপূর্ব্ব রঙিন ছন্দের সৃষ্টি করেছিল তা জীবনে ভুলবার নয়। আমি তাঁকে প্রথম দর্শনেই মহামুনি বাল্মীকিসদৃশই মনে করেছিলুম। কী সুন্দর গৌরবর্ণ মুখশ্রী, শুভ্র চুল ও দাড়ি, যেন কবি বাল্মীকি বসে; দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনকে ভক্তিরসে ডুবিয়ে দিয়েছিল। আমি ধীর স্থির হয়ে তাঁর মুখশ্রী দেখে যে কী তৃপ্তি অনুভব করেছিলুম তা বর্ণনাতীত। তিনি তখন সকালবেলাকার নবীন আলোকে তাঁর পূবের বারান্দায় বসে কাব্য রচনায় তন্ময় ছিলেন। সেদিন আমরাই তাঁর কাব্যরসে যৎকিঞ্চিৎ অসুবিধার সৃষ্টি করেছিলুম শুধু সাক্ষাতের মানসে! এ পরিচয়ের অপূর্ব্ব স্মৃতিটুকু এখনো আমার অন্তরে উজ্জ্বল স্মৃতিরূপে গাঁথা রয়েচে।

এদিকে বেলা একটায় গুরুদেবের এখান থেকে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে গৌরচন্দ্র আমাদের কাছে ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে মাতুল নৃপেন্দ্রচন্দ্রও আমাদের আশ্রমে ভর্ত্তির ব্যবস্থা শেষ করে, খবর দিতে এলেন। আমরা দুইজন — মাতুল নরসিং দেববর্ম্মা আর আমি — চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েছি খবর পেলুম। আমার আর এক মাতুল, সুখময় দেববর্ম্মা তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হোল। এ খবরে আমরা একটু আনন্দে মেতে উঠেছিলুম। কিন্তু এই ক্ষণিকের আনন্দরসের সাথে আর একটি দুঃখের ছায়া উঁকি মারছিল, — আগামী কাল সকালের গাড়ীতে গৌরচন্দ্র বাড়ী চলে যাবে; তাকে তো আর দেখতে পাব না — এইটুকু ভেবে।

গৌরচন্দ্র তার তল্পিতল্পা নিয়ে বাড়ী যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আমাদের কাছে এল। মাতুল নৃপেন্দ্রচন্দ্রও সেদিন ক্লাশে না গিয়ে আমাদের কাছে এলেন। গৌরচন্দ্র বলতে আরম্ভ করলো — "বাবুরা এখানে লেখাপড়া করে মানুষ হও। তোমরা এখান থেকে শিক্ষায় দীক্ষায় যখন বড় হয়ে বাড়ী যাবে, — তখন আমি তোমাদের নিয়ে খুব আনন্দ করবো। চিন্তা কী? রবিবাবু আছেন, তোমাদের দেখ্‌বেন। আমি এখন চলি, কেমন?" এইটুকু বলেই সে গরুর গাড়ী চেপে রওনা হয়ে গেল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্রদের বয়স অনুমানে প্রত্যেক ঘরে ভাগ করে থাক্‌বার ব্যবস্থা ছিল। (১) শিশুবিভাগ (ছোটদের), (২) মধ্যবিভাগ (মাঝারিদের), (৩) আদ্যবিভাগ (বড়দের) — এই তিনভাগে ভাগ করে বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, আমরা বয়সের অনুপাতে 'শিশুবিভাগেই' ভর্ত্তি হয়েছিলুম। আমরা চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েই ক্রমান্বয়ে ক্লাশে যোগদান করতঃ অধ্যয়নপর্ব্ব আরম্ভ করেছিলুম। তখন আমাদের ইংরেজী ক্লাশের শিক্ষক ছিলেন ৺কালীমোহন ঘোষ। তিনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির মাষ্টার মশাই ছিলেন। আমরা তাঁকে খুব ভয় করতুম। তিনি আমাদের গুরুদেবের লেখা "ইংরেজী শ্রুতিশিক্ষা" পড়াতেন। নগেন আইচ মহাশয় আমাদের অঙ্ক ক্লাশ নিতেন। তেজেশদা [1] আমাদের ভারতের ইতিহাস পড়াতেন। তিনি খুব শান্ত প্রকৃতির ও আমোদ-

(১) "তেজেশ দা" ৺তেজেন্দ্রচন্দ্র সেন মহাশয়।

প্রিয় ছিলেন। দিনদার [১] সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল। দিনদা প্রায়ই মধ্যাহ্নে "মোহিত কুটিরে" তাঁর এখানে আসতেন আমরা দেখতুম। মাঝে মাঝে এই দুইজনকে নানা বিষয় নিয়ে আমরা খুব বিরক্ত করতুম, তাঁদের কোন বিরক্তির ভাবই দেখিনি। দিনদা মোহিত-কুটিরে এসে গুরুদেবের গানগুলোর স্বরলিপি ঠিক করতেন। তেজেশদাকেও দেখতুম বেহালা নিয়ে একটু একটু করে সুর ভাঁজ্‌ছেন।

তারপর বিকেলবেলা বড়মা [২] বাঙ্গলা পড়াতেন। তিনি খুব শান্ত স্বভাবের ছিলেন। আমাদের নিজের ছেলের মত দেখতেন। আমি তাঁকে প্রায়ই খুব বিরক্ত করতুম। কোন দিন তিনি আমাকে বকেন নাই। তিনি নিচু বাঙ্গালায় থাক্‌তেন। শিশুবিভাগের ছেলেদের খুব ভালবাসতেন এবং খাওয়াতেন। মাঝে মাঝে আমি নিচু বাঙ্গলায় গিয়ে তাঁর কাছে খাবার আদায় করতুম। তিনি অম্লানবদনে আমাকে খাওয়াতেন, তা' আর ভুলতে পারছি না। বিকেলের বাঙ্গলা ক্লাশেও তিনি আমাদের খুব যত্ন করেই পড়াতেন।

তারপর বিকেল বেলার শেষ ঘন্টায় সুরেন কর মহাশয় আমাদের চিত্রবিদ্যা শিখাতেন। ছাতিমতলার দক্ষিণে যে ঘরটি ছিল সে বারান্দায় আমাদের চিত্রাঙ্কনের ক্লাশ হোত। তিনিও খুব শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তাঁর কাছে সময়ে অসময়ে ছবি এঁকে নিয়ে গিয়েছি — তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে দেখে সংশোধন করে দিতেন। তিনি একবার আমার কাজে খুশী হয়ে একটা ভাল সবুজ রঙের উইনসরের রাবার দিয়েছিলেন সেটা আমার এখনো মনে গাঁথা রয়েছে।

সন তারিখের কথা মনে নেই, কেবল বাল্যজীবনে অধ্যয়নকালের স্মৃতিটুকু একটু একটু করে মনে পড়চে। আশ্রমের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটি বটবৃক্ষের ছায়ায় আমাদের ক্লাশের জন্য মাটি দিয়ে বাঁধানো গোলাকার বেদী ছিল। বেদীটির উপর খড়ের ছাউনী সংসৃষ্ট ঘর ছিল। এই বেদীটির উপরই বড়মা বিকেলে আমাদের বাঙ্গলা ক্লাশ নিতেন। সেদিন অগ্রহায়ণ মাস। শীতের বিকেল বেলা, প্রায় আড়াইটায় সবেমাত্র আমাদের বাঙ্গলা ক্লাশ আরম্ভ হয়েছে, দেখতে পেলুম গুরুদেব ধীরে ধীরে আমাদের ক্লাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। ক্লাশে ঢুকতেই বড়মার সঙ্গে আমরা উঠে দাঁড়ালুম। তিনি আমাদের বসতে বলে বড়মার আসনটিতে গিয়ে উপবেশন করলেন। তারপর বড়মা আমাদের মধ্যে এসে বসলেন। তখন ক্লাশের পড়া আরম্ভ হয়েছিল গুরুদেবের লেখা বই 'কথা ও কাহিনী' থেকে একটি কবিতা — "মারাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ, করো করো, সবে সাজ।" (পণরক্ষা)

তারপর তিনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন — "তোমরা আবৃত্তি করতে জান? কী রকম আবৃত্তি করতে পার দেখি।" আমাদের মধ্যে একজন, নাম মনে নেই — সে উঠে দাঁড়ালো এবং খুব করুণ সুরে আবৃত্তি আরম্ভ করে দিল। তিনি তাকে বসিয়ে দিয়ে, "এখানে বীরের মত গর্জ্জিয়ে আবৃত্তি করতে হবে। তোমরা শোন, আমি কেমন করে আবৃত্তি করি," বলে --- গুরুগম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করেছিলেন, "মারাঠা দস্যু আসিছে

(১) "দিন দা" দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২) "বড়মা" শ্রীমতী হেমলতা দেবী, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রবধু।

রে ঐ, করো করো সবে সাজ।" আমরা তখন অবাক হয়ে তাঁর আবৃত্তি শ্রবণ করেছিলুম। সে গুরুগম্ভীর আবৃত্তির ধ্বনি বাল্যজীবনে তাঁর মুখে শুনে থাকলেও সে সুর এখনো আমার কর্ণে মুখরিত হয়ে আছে। নিরন্তর এভাবেই তিনি আমাদের বাঙ্গলা ক্লাশে এসে পড়াতেন। আমরা তাঁর পড়ার ভঙ্গিমা, কবিতার মূল ভাবার্থ, যা কিছু শুনতাম তা'তেই আমাদের শেখা হয়ে যেত। এমন কী, তাঁর বাঙ্গলা তর্জ্জমার লেখন পঠনে যা কিছু আয়ত্ত করেছিলুম তা' আজও ভুলবার মত নয়। পক্ষান্তরে, তাঁর লেখা কবিতার মূল মর্ম্মার্থগুলি এমন মধুর ভাষণের রসে পর্য্যবসিত হোত তা' আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকতো। তখন লেখাপড়ায় আমরা যা পেতাম সেঁটা তাঁর আন্তরিক স্নেহ ও আনন্দ রসের মধ্য দিয়েই আসতো — এটা অনুভব করতাম।

এখানে আর একটি মধুর স্মৃতি মনে পড়েছে — একবার মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমাকে ও সুশীলকে (১) আমাদের এক শিক্ষক মহাশয় ধীমুদা (২) একটি চিঠি হাতে দিয়ে গুরুদেবের নিকট উত্তরায়ণে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা দু'জনে পত্রবাহক হয়ে তখনই উত্তরায়ণের পথে রওনা হলুম। ধীরে ধীরে এসে উত্তরায়ণস্থিত সম্মুখের একটি কুয়োতলার ধারে আসতেই, দেখতে পেলুম গুরুদেব আহারে বসেছেন। মনে করেছিলুম, গুরুদেবের খাওয়া শেষ হলেই আমরা ঐদিকে যাব। এইটুকু ভেবেই কুয়োতলার দেয়ালের আড়ালে বসে পড়লুম। আড়ালে লুকিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব কখন যে আমাদের দেখে ফেলেছেন তা' আমাদের চিন্তার বহির্ভূত। পর মুহূর্ত্তেই দেখলুম বনমালী (৩) ছুটে এল। "বাবুরা এখানে বসে কী করছেন? আসুন, গুরুদেব ডাকচেন।" আমরা তখন একটু ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বনমালীকে অনুসরণ করলুম। আজকাল উত্তরায়ণের বড় পাকা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। তখনকার উত্তরায়ণে ছিল গোলাকৃতি খড়ের ছাউনী দেওয়া চতুর্দ্দিকে একটা বারান্দা-সংলগ্ন বাড়ি। আমরা তখন সেই গোলাকৃতি উত্তরায়ণের মাঝকামরা পর্য্যন্ত বনমালীর সাথে গিয়েছিলুম। তখন গুরুদেব খাচ্ছেন। তিনি মাথা তুলে আমাদের দেখতেই বলে উঠলেন — "কী হে শৈলেশ, কী মনে করে তোমরা কুয়োর আড়ালে লুকিয়েছিলে?" আমরা কোন জবাব না দিয়েই — প্রণাম করে, ধীমুদার চিঠিটা এগিয়ে দিলুম। খেতে খেতে তিনি বাম হাত দিয়েই চিঠিটা গ্রহণ করলেন এবং পড়ায় মন দিলেন।

তারপর আমাদের বললেন, "তোমরা খেয়েচ?"
"আমরা এইমাত্র খাওয়া শেষ করে এখানে এলুম।"
"আচ্ছা, আজ কী খেলে বলতো?"

আমি বললুম, "আলু ও বড়ার ঝোল, ডাল, ভাত আর আলুমিশ্রিত বেগুন তরকারী এবং দই!"

---

(১) 'সুশীল' ত্রিপুরার উজির ব্রজকৃষ্ণ ঠাকুরের পুত্র সুশীল দেববর্ম্মা।
(২) শিক্ষক মহাশয় ধীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
(৩) বনমালী গুরুদেবের ভৃত্য।

তারপর একটু হেসে বললেন, — ‘‘আচ্ছা, তোমরা দেখতো, এ টেবিলের উপর আমি যা’ খাচ্ছি এটা রান্নাঘরে খেতে পেয়েছ?”

সুশীল পূর্ব্ব থেকেই বেশ একটু হিসেবী ছিল, সে অমনি জবাব দিয়ে উঠলো — ‘‘আমাদের এরকম খানা খেতে গেলে অনেক টাকা লেগে যাবে।”

গুরুদেব হাসতে হাসতে সুশীলকে বললেন — ‘বাঃ, তুমি এই বয়সে দেখচি বেশ হিসেবী হয়েছ। যা’ হউক, খাওয়া পড়ায় বেশ হিসেব রাখতে পারবে। তোমার ভবিষ্যৎ ভালই হ’বে।’

তারপর বললেন, ‘‘এখানে তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করচি। তোমরা খেয়ে যাও, কেমন!”

কিছুক্ষণ পর দেখলুম, বনমালী আমাদের জন্য দুই প্লেট খাবার সাজিয়ে নিয়ে এল ফল, মিষ্টি আরো কত কিছু। সে টেবিলের উপর প্লেটটা রেখেই, বলে গেল, ‘‘বাবুরা খেতে আরম্ভ করুন।”

গুরুদেব ধীরে ধীরে খাচ্ছেন আর বলছেন, ‘‘চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। লজ্জা করচ কেন? খেয়ে যাও — দৌড়াদৌড়িতে স-ব হজম হয়ে যাবে হে? ভয় নেই।”

নিরুপায় অবস্থা বিশেষে এবার গুরুদেবের আদেশ পালন করতেই হোল।

আমাদের খাওয়া শেষ হইতেই গুরুদেব উঠে পাশের কামরায় চলে গেলেন। আমরা তখনকার উত্তরায়ণ ঘরের মধ্যে আর একটি অপরূপ শিল্পনিদর্শন ‘‘কুটিরকল্পশ্রী” দেখেছিলুম — সেটা হোল ঘরে চালা থেকে বহু রঙবেরঙের সিকে ঝুল্‌চে। কোন সিকেতে রঙিন বাইণ্ডিং বই, কোন সিকেতে কাগজ-পত্র, কোন সিকেতে বেতের রঙিন বাক্স — বেশ একটু একটু করে হাওয়ায় দুলছিল। এ দৃশ্যটি আমার চোখে খুবই ভাল লেগেছিল। তিনি ঐ একটা সিকের মধ্য থেকেই একটা চিঠির কাগজ নিয়ে ধীমুদাকে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন।

প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় উপাসনার পর — শান্তিনিকেতন পুরাতন কলাভবনের (বর্ত্তমানে কলেজের ছেলেদের হোষ্টেল হয়েছে) মাঝ কোঠায় তিনি আমাদের (শিশুবিভাগের ছাত্রদের) মহাভারতের গল্প বলতেন। তিনি যখন মহাভারতের গল্প একে একে বলে চলেছেন, তখন তার মধ্যে কোন যুদ্ধের অংশ আসলেই ভীম বা অর্জ্জুনের সদৃশ রূপ-ভূমিকায় এক অভিনয়ের আকার সৃষ্টিকরতঃ আনন্দ দান করতেন। তাঁর শ্রীমুখে এই রকম গল্প শ্রবণ করতে আমাদের খুবই ভাল লাগতো। খুব মনে পড়ে, যখন তিনি মহাভারত কথনের মধ্য থেকে ভীম ও দুর্য্যোধনের সেই গদাযুদ্ধ পর্ব্বে এসে পড়েছেন, — তখন তিনি এই গদাযুদ্ধ রসকে মল্লযুদ্ধের পরিবেশে এক অপূর্ব্ব ভূমিকার সৃষ্টি করে আমাদের মধ্যে একজনকে দু’বাহু বাড়ায়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আমরা এইভাবেই তাঁর বুধবারের গল্প-আসরে অতীব আনন্দ লাভ করতুম। তখন তিনি সর্ব্বদা আমাদের শিশুবিভাগস্থিত সবাইকে নিয়েই খুব সহজ সরল ভাবে দিন কাটাতেন। আমার মনে এখনো তাঁর বহু প্রকারের স্মৃতিগাঁথা অক্ষরে অক্ষরে লেখা রয়েছে।

তারপর মাঝে মাঝে আমরা তাঁকে আর একটি বিষয় নিয়ে তাঁর লেখন পঠনের অসুবিধায় ফেলতুম। আমার তখন ডাক টিকিটের একটা Album ছিল। তা'তে আমার সংগ্রহ-করা দেশবিদেশের বহু প্রকারের ডাক টিকিট জমানো থাক্‌তো। এই টিকিট সংগ্রহের বাতিক প্রথমে অজিনের [১] কাছ থেকে পাই। এই থেকেই আমি দেশী বিদেশী ডাক টিকিট সংগ্রহ করতে ভালবাসতুম। ফাল্গুন মাসের দ্বিপ্রহর, চারিদিকে রৌদ্রতাপে ঝাঁ ঝাঁ করচে। শালবীথির শালগাছগুলোর পত্রবিহীন অবস্থায় চারদিকে একদম ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছিল। গাছগুলোর নিচ দিয়ে যে রাস্তা গুরুদেবের বাড়ীর দিকে গিয়েছে তাতে স্খলিত শুকনো পাতাগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পড়ে জমা হয়ে রয়েছে। আমি তার উপর পা ফেলে ফেলে চলেছি; সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলোর মচ্ মচ্ শব্দ একটা ছন্দ সৃষ্টি করে আমার কর্ণরন্ধ্রে বেশ মধুর অনুভূতি দিচ্ছে। আমি তখন চলেছি ডাক টিকিট উদ্ধারকল্পে গুরুদেবের সেই দোতলা বাড়ীর পথে। ক্রমে গুরুদেবের বাড়ীর ধারে এসে পৌঁছতেই চারিদিকে চেয়ে দেখি সব মধ্যাহ্নের বিশ্রামশ্রীতে নীরব নিঝুম বোধ হচ্ছে। আমি সেখানে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে অতি সন্তর্পণে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে চললুম। দরজায় পৌঁছেই চুপটী করে পরদার ফাঁকে উঁকি দিলুম। কাছেই দেখতে পেলুম গুরুদেব টেবিলের উপর ঝুঁকে উত্তরমুখো হয়ে তাঁর কবিতা রচনায় তন্ময়। আমি এই ভাবে প্রায়ই গুরুদেবের পরিত্যক্ত কাগজের ঝুড়ি থেকে বহু দেশী বিদেশী ডাক টিকিট উদ্ধার করায় অভ্যস্ত ছিলুম। এমন কি বেশ সাহসও করতুম। কিন্তু এবার অতি সন্তর্পণে ঢুকেই তাঁর পরিত্যক্ত কাগজের ঝুড়িতে হাত দিতেই ধরা পড়ে গিয়েছিলুম। যখন তাঁর পরিত্যক্ত কাগজের ঝুড়িতে হাত দিয়েছি, — অমনি গুরুদেব কখন যে আমার মাথায় হাত দিয়ে ধরেছেন তা আমি খেয়ালই করতে পারিনি। মাথায় হাত দেবার সঙ্গেই তিনি বলে উঠলেন, "কে রে? সাবধান! টেবিল মাথায় লাগবে রে!" আমি ত এ যাত্রা ধরা পড়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। গুরুদেব আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "শৈলেশ, এ কী কর্ম্ম করলে? খুব অন্যায় হয়েচে না? আমি মাথা নত করে রইলুম। কারণ তখন আমার মনে খুবই ভয়ের সঞ্চার হচ্ছিল। তিনি গম্ভীর সুরে বলে উঠলেন, "দাঁড়াও, আমি তেজেশবাবুকে জানাচ্ছি! এবার একটা ব্যবস্থা না করলে চলচে না!" এইটুকু বলেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "সোজা ঘরে চলে যাবে।" আমি তো ছুটি পেয়ে এক দৌড়ে সোজা মোহিত কুটিরে চলে এসেছিলুম। ঘরে প্রবেশ করেই দেখি তেজেশদা' ও দিনদা' বসে গল্প করচেন। আমি কোন শব্দ না করে চুপি চুপি নিজের সিটে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বসলুম। সর্ব্বদা মন চঞ্চল হয়ে পড়েছিল, "এরপর আমার কী হবে? তেজেশদা'র কাছে এবার আমাকে বকুনী খেতে হ'বে।" সত্যই একদিন হঠাৎ তেজেশদা'র নিকট আমাদের ডাক পড়লো! এ খবর পেয়েই আমি তো ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছিলুম। তেজেশদা'র সম্মুখে সবাই উপস্থিত হয়েচি, কিন্তু আমি সেদিন সকলের পেছনে লুকিয়েছিলুম। ভয় হচ্ছিল — এবার তিনি কী বলবেন। তেজেশদা সবাইকে ডেকে বললেন, "শোন, তোমরা ডাক টিকিট সংগ্রহকল্পে কোনদিন অসময়ে গুরুদেবের ওখানে যাবে না। যদি কোনদিন সেখানে গিয়েছ জানতে পারি, খুব শাস্তি হবে। জেনে রেখো, প্রতি বুধবার

(১) অজিন কুঠার।

মন্দিরের পর তোমরা সেখানে যাবে। কেন জান? সেদিন তিনি তোমাদের ডাক টিকিট বিতরণ করবেন।" এ সংবাদ কানে আসতেই আমি এবং সকলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলুম। তখন গুরুদেব আমার অন্যায় তেজেশদা'কে বলেননি মনে করে, সে সময়ে নিজের মনকে একটু সান্ত্বনা দিতে পেরেছিলুম। এখানেই বুঝতে পারা গেল গুরুদেব ছোট ছেলেদের অন্যায় আচরণে কখনো বা কোন সময়ে আঘাত করেন না।

বুধবার মন্দিরের উপাসনার পর আমরা যাবো মনে করেই তিনি নিচের তলার বারান্দায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হতেই তিনি আমাদের লাইন বেঁধে দাঁড়াতে বললেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করেই লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

তিনি বনমালীকে ডাকলেন। বনমালী আসতেই তাকে বললেন, "আমার টেবিলের উপর যে লাল রঙের ডিবে আছে, সেটা নিয়ে এস তো!" বনমালী উপরে গিয়ে লাল ডিবেটি নিয়ে আসলো এবং গুরুদেবের হাতে তুলে দিল। এই ডিবেতেই তিনি খাম থেকে টিকিটগুলো কেটে আমাদের জন্য জমিয়ে রেখেছিলেন। তিনি এ ডিবেটি তাঁর জামার এক কোণে উপুর করে টিকিটগুলো ঢেলে নিলেন এবং আমাদের দিকে এগিয়ে এসে যার ভাগ্যে যেটুকু পড়ে সবাইকে একে একে বিতরণ করে দিতে লেগে গেলেন। টিকিট বিতরণ পর্ব্ব শেষ করেই গুরুদেব আমাদের সেখানে উপস্থিত থাকতে বলে বারান্দার আরাম কেদারায় গিয়ে বসলেন। তার কারণ, সেদিন তিনি আমাদের জলযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন — বনমালী মিষ্টি বিতরণ করলো, আমরা বেশ তৃপ্তির সহিত খেয়েছিলুম। আর গুরুদেব বসে বসে আমাদের খাওয়া দেখে দেখে হাসতেন। বাল্যজীবনের সীমায় তাঁর এইরূপ প্রগাঢ় স্নেহমমতার মধ্য দিয়ে সেখানে আমরা প্রতিপালিত হয়েছিলুম।

শরৎকাল আগত প্রায়। আশ্রমের সীমারেখার ধারে কাশ ফুলের অপরূপ শ্রী। প্রকৃতির আবহাওয়ার পরিবেশ শারদীয় শ্রীর আগমনবার্ত্তা পেয়ে কাশ ফুলগুলোও যেন আমাদের মত আনন্দে আত্মহারা। এদিকে পূজোর ছুটির চারদিন পূর্ব্বেই 'নাট্যঘরে' "শারদোৎসব" অভিনয়ের আয়োজন চলেছে। এ অভিনয়ের মঞ্চটি শরতের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য পরিকল্পনায় পূজনীয় নন্দবাবু সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এ অভিনয়ের দৃশ্য পরিকল্পনা ও অভিনয় যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরাই বলতে পারবেন তার পরিবেশসৃষ্টি কেমন হয়েছিল। শারদোৎসব অভিনয়ের এক ভূমিকায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নিজেই "সন্ন্যাসী"র বেশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর আমাদের মাষ্টার মহাশয় "জগদানন্দবাবু" লক্ষেশ্বর, "দিনদা" ঠাকুরদাদা, আর অজিন উপনন্দের ভূমিকায় নেমেছিলেন। এ অভিনয় মঞ্চে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশ সৃষ্টি এত সুগভীর ও শোভন হয়েছিল যে তা বর্ণনাতীত। উক্ত অভিনয় দর্শনের মানসে কলকাতা থেকে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। সেদিন এত লোকসমাগম হয়েছিল, — এমনকি নাট্যঘরে ঠাঁই পাওয়া গেল না। কলকাতার লোক-সমাগমের জন্য সেদিন গুরুদেব একটু বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। তখন তিনি মাষ্টার মহাশয়দের বলেছিলেন, "এ অভিনয় ছুটী উপলক্ষে ছেলেদের দেখাবার জন্য ব্যবস্থা করেছি, অথচ কোলকাতার লোক খবর পেল কী প্রকারে? আজ আমার

ছেলেরা তো দেখতেই পেল না।" সেদিন দর্শকের ভিড়ের চাপে অভিনয় দেখতেই পারি নি। তাই গুরুদেব জানিয়ে দিয়েছিলেন, আগামী কাল আমাদের অভিনয় দেখানো হবে। পরদিন বেশ সমারোহে শারদোৎসব অভিনয় হোল।

এদিকে, পূজোর ছুটীর ধূম শান্তিনিকেতনে লেগে গেল। সকালেই উঠেই জলযোগ শেষ করে আমরা গুরুদেবকে প্রণাম করতে গিয়েছিলুম। দোতলায় উঠেই গুরুদেবকে পূবের বারান্দায় কাব্যরচনায় ব্যস্ত দেখলুম। একে একে সবাই গিয়ে প্রণাম করে নেমে আসতে লাগলো। আমরা ত্রিপুরাবাসী চার পাঁচ জন ছাত্র যখন তাঁকে প্রণাম করতে গেলুম, — তখন তিনি আমাদের বলেছিলেন — "তোমরা আজ বাড়ি যাচ্ছ, কী আনন্দের বিষয়! বাড়ি গিয়ে পূজো তো দেখবে? লেখাপড়া করতে ভুলবে না তো? কেবল বেড়িয়ে বেড়ালে চল্‌বে না! তোমাদের দৈনন্দিন কাজটা যেন ঠিক থাকে, কেমন? তা'হলে এখন বাড়ী যাও, ঠিক সময়ে চলে এসো।" বলে আমাদের বিদায় দিলেন।

বাড়িতে এসে দাদামহাশয় ও দিদিমার কাছে গুরুদেব রবীন্দ্র সান্নিধ্যের গল্প বলতে বসে গেলুম। দাদামহাশয় মাঝে মাঝে গুরুদেবের কথাপ্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর জীবনস্মৃতি আমাদের শোনাতেন। তাঁর কাছে এই প্রকারের গুরুদেব সম্বন্ধীয় বহুতথ্যপূর্ণ কাহিনী নিয়ে খুবই আনন্দ পেতাম। দাদামহাশয় একবার গুরুদেবের ত্রিপুরা আগমন সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন তা আমার এখনো মনে আছে। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের বিশেষ আমন্ত্রণে ত্রিপুরার বসন্তোৎসব উপলক্ষে ১৩০৬ সনে তিনি আগরতলায় এসেছিলেন। তখন ভূমিকম্পের ভাঙ্গা ত্রিপুরা মহারাজার প্যালেশের যাবতীয় মালমশলার দান পেয়ে সবেমাত্র দাদামহাশয়ের নূতন বাড়ি প্রস্তুত হয়েছিল। মহারাজ সে বাড়িতেই তখন গুরুদেবের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। দাদামহাশয়ের মুখে জ্ঞাত হয়েছিলুম — গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কর্ণেল বাড়িতে আগমন উপলক্ষে আমার এক দিদিমা খুব মনোরম পুষ্পশিল্পের আয়োজন করেছিলেন। তিনি গুরুদেবের সমস্ত শয্যার উপর ও বালিশে অপর্য্যাপ্ত রঙবেরঙের পুষ্পাভরণের নক্সা পরিকল্পনায় সাজিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে, মাথার বালিশটিই অপরূপ রঙিন ফুলের শিল্পরসে শোভা বর্দ্ধন করেছিল। বালিশের উপর এই আলপনাসংসৃষ্ট শিল্পকীর্ত্তিতে বিশেষ করে বালিশের মধ্যস্থলে "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" নামাঙ্কিত করে অপরূপ পুষ্পশিল্পের সৃজন করেছিলেন। সেদিন গুরুদেব দাদামহাশয়ের সঙ্গে গাড়ী থেকে নেমেই সোজা নূতন বাড়ির পশ্চিম কামরায় প্রবেশ করতে যাবেন, ফাল্গুনের অযাচিত মিশ্রিত ফুলের গন্ধে বিভোর হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এবং দাদামহাশয়কে বলেছিলেন, "মহিম ঠাকুর, কী চমৎকার গন্ধ!" তারপর ঘরে প্রবেশ করতেই চারিদিকের আবহাওয়ার পরিবেশে সুবাসিত পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ হয়ে বিছানার পাশে যে চেয়ারটা ছিল সেখানে বসে পড়লেন। তাঁর আতিথ্যরসপূর্ণ কক্ষে শয্যার অপরূপ পুষ্পশিল্পের নিদর্শনটি নিরীক্ষণ করে তিনি খুব আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষতঃ, তাঁর বালিশের রূপসজ্জা দেখে আরো মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং শিল্পী দিদিমার সহিত পরিচয় করবার জন্য দাদামহাশয়ের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তখন দিদিমারা সকলেই উপস্থিত ছিলেন, দাদামহাশয় প্রত্যেককে সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। গুরুদেব পুষ্পশিল্পী দিদিমাকে দেখে তাঁর পুষ্পশিল্পের কারু-

কৌশলের খুব সুখ্যাতি বর্ণন করেছিলেন এবং আন্তরিক সাধুবাদ দিয়েছিলেন। তিনি সেদিন পুষ্পশিল্পীর অপূর্ব্ব শিল্পকৌশলের প্রতি মুগ্ধ হয়ে সে বিছানায় বসেন নাই, এমনকি শয়নও করেন নাই। কেবল বিছানার পাশে আরাম কেদারায় বসে বসে ফুলের গন্ধ ও পুষ্পশিল্পের অপরূপ মাধুর্য্য হৃদয়ে গ্রহণ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন। সেদিন গুরুদেবের জন্য দাদামহাশয়কে আর একটি শয্যার ব্যবস্থা তার পাশেই করে দিতে হয়েছিল। পুষ্পগন্ধে ও শিল্পরসে বিভোর হয়ে তাঁকে সেদিনটা এমনি অতিবাহিত করতে হয়েছিল। তিনি বিশেষ করে ত্রিপুরার পুষ্পশিল্পের প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি দাদামহাশয়ের কাছে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের শিখাবার জন্য একজন সুনিপুণ পুষ্পশিল্পী চেয়েছিলেন। দাদামহাশয় বিশেষ চেষ্টা করেও পুষ্পশিল্পী সংগ্রহ করে পাঠাতে পারেন নাই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

দাদামহাশয় গুরুদেব সম্বন্ধে আর একটি স্মৃতিকাহিনী বলেছিলেন। তিনি যখন এ বাড়ীতে এসে পশ্চিম কোঠায় আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন তখন প্রায়ই তিনি খুব ভোরে জেগে উঠেই দাদামহাশয়ের দক্ষিণের বারান্দায় আরাম কেদারায় গিয়ে বসতেন। তখন ফাল্গুন মাস, দক্ষিণের হাওয়াটি ভোরের পরশে খুবই আরামপ্রদ ছিল, তাই তিনি সেখানে বসে সময় কাটাতেন। দাদামহাশয় রাজপারিষদ ছিলেন, তাই কখনো কখনো রাজদরবার থেকে ফিরতে তাঁর দেরী হয়ে যেতো। তাই তাঁর ভোরবেলা জাগার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হোত। দাদামহাশয় এক রাত্রে রাজ-দরবার থেকে ফিরতে দেরী হওয়ায় বেশ নাসিকাগর্জ্জন করে ঘুমোচ্ছিলেন। গুরুদেব ভোরে উঠেই সেদিন দক্ষিণের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে দক্ষিণের বায়ু সেবন করছিলেন। এদিকে দিদিমা খুব ভোরে উঠেই যখন দক্ষিণের দরজা খুলেছেন অমনি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে সম্মুখে দেখে লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। এ দৃশ্য দেখেই তখন তিনি বন্ধুপত্নীকে উদ্দেশ্য করে সুললিত কণ্ঠে এই গানটি গেয়ে উঠেছিলেন — "যামিনী না যেতে জাগালে না কেন, বেলা হল মরি লাজে।" এইভাবে, সকাল বেলায় আরো একটা গান গেয়েছিলেন কর্ণেল বাড়ির পুকুরঘাটের মেয়েদের শ্রী নিয়ে — "কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে।" দিদিমারা আমাকে বলেছিলেন, তাঁর উল্লিখিত গান দু'টো এমন সুললিত কণ্ঠে তিনি গাইতেন তা' খুবই তারিফ করবার মত ছিল। সকাল বেলা দাদামহাশয় যখন জাগলেন তখন দক্ষিণের বারান্দায় বসে উল্লিখিত গানটির বিশেষ সমালোচনায় পরস্পর বেশ রহস্য জমিয়ে তুলেছিলেন। আমার কাছে দাদামহাশয়ের কথনমূলে এ স্মৃতি সত্য বলেই পরিগণিত। গুরুদেব সম্পর্কে দাদামহাশয়ের কাছে কত গল্প শুনেছিলুম ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে তার শেষ নেই। এই উল্লিখিত স্মৃতিকাহিনী আজো কর্ণেল বাড়ির সকলের নিকট সুপরিজ্ঞাত। আরো বিশেষ স্মৃতি মনে পড়ে। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বিলেত যাওয়া ও বিজ্ঞান গবেষণার পক্ষে গুরুদেব যে ত্রিপুরা রাজ-দরবারে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন এবং এ সম্পর্কে দাদামহাশয়কে চিঠি-পত্র লিখেছিলেন সে সব মূল কাহিনীও তিনি বলেছিলেন। এখনো সেই স্মৃতি-কাহিনী তাঁর লেখা "দেশীয় রাজ্য" পুস্তকে "ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে গাঁথা রয়েছে।

সমস্ত পুজোর ছুটীটা দাদামহাশয়ের কাছে গুরুদেবের কাহিনী শ্রবণ করতে করতে আমাদের ছুটী কেমন করে শেষ হয়ে গেল ঠাহরই পেলুম না। শান্তিনিকেতন যাবার পালাও ঘনিয়ে এল।

সেদিন কার্ত্তিক মাসের বিকেল বেলা শান্তিনিকেতনে সকলেই মাঠে খেলতে চলে গিয়েছিল। আমরা কয়েকজন যাইনি। তখন আমরা সমস্ত ঘর জুড়ে বেশ আনন্দে মেতে ছুটোছুটি খেলা খেলছিলুম। ঘরটি বলতে গেলে তখন বেশ উচ্চ কলরবে মুখরিত হয়ে জমাট বেঁধেছিল। ঘরের পুর্ব্বপ্রান্তে চন্দননগরের একটি ছেলে মোহিত কুটিরে থাকত। তার নাম মোহনলাল ঘোষ। সে তার গুটানো বিছানায় মাথা রেখে আর পা দু'টো জানালার উপরে ঠেস্ দিয়ে বেশ মধুর রাগিণীতে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছিল — "বলল, গোলাপ, মোরে বল্, তুই ফুটিবি সখী, কবে।" সে সময় প্রায়ই বিকেল বেলা গুরুদেব একা একা শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীর ধার দিয়ে শালবীথির পথে পায়চারি করতেন। সেদিন মোহনলালের গানটা তার কর্ণে গিয়ে পৌঁছেছিল। তিনি ধীরে ধীরে কখন যে মোহিত কুটিরের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তা আমরা জানতেই পেলুম না। তাঁকে দেখেই আমরা নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি প্রথম ঘরে ঢুকেই মুখের উপর তর্জ্জনী স্থাপন করে আমাদের চুপ থাকতে নির্দ্দেশ করেছিলেন। এদিকে মোহনলাল নিশ্চিন্তমনে একপ্রান্তে শুয়ে শুয়ে গানের রাগিণীতে তন্ময় হয়ে গেয়েই চলেছিল। গুরুদেব ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে তার মাথার কাছে গিয়ে বসলেন এবং খুব মন দিয়ে গান শুন্‌তে লাগলেন। হঠাৎ নিস্তব্ধতার দরুন অবাক হয়ে গুরুদেবকে সম্মুখে দেখে লজ্জায় বিছানায় মুখ ঢেকে ফেলেছিল।

তখন মোহনলালের মাথা তুলে গুরুদেব বললেন, "কী হে গান জান, অথচ লুকিয়ে লুকিয়ে গান গাইবে? এসব চলবে না। কাল থেকে তোমাকে আমার গানের ক্লাশে আসতে হবে।" সেই থেকে মোহনলাল গান শিখতে আরম্ভ করেছিল এবং খুব ভাল গাইতে শিখেছিল। এইভাবে গুরুদেব গানে, লেখায় ও আবৃত্তি ইত্যাদিতে আমাদের দান সময়ে অসময়ে এসে আদায় করেছিলেন। ছোটবেলায় আমিও এক-আধটু লেখার অভ্যাস করতুম। তবে খুব লুকিয়ে লুকিয়ে লেখা হোত। একবার ভুলক্রমে বাঙ্গলা ক্লাশের খাতায় চার লাইন কবিতা লিখেছিলুম — সেটা গুরুদেবের চোখে পড়ায় কবিতা লেখা সম্পর্কে ধরা পড়েছিলুম। এই চার লাইন কবিতা দেখে তিনি আমাকে লিখ্‌তে উৎসাহও দিয়েছিলেন, সে লেখা এখনো আমার কাছে রক্ষিত আছে।

তারপর শান্তিনিকেতনে চার বৎসর কাটাবার পর আমাকে সেখানে ম্যালেরিয়ায় ধরলো। অসুস্থ অবস্থায় কিছুদিন হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলুম। আমার কঠিন রোগের খবর পেয়ে আমার পিতৃদেব ও দাদামহাশয় আমাকে দেখ্‌তে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। আমি রোগশয্যায় মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলুম বিধায় দাদামহাশয় ও পিতৃদেবকে চিন্‌তেই পারিনি। পিতৃদেব শান্তিনিকেতনে কিছুদিন কাটাবার পর আমার অসুখের কোন পরিবর্ত্তন না দেখায় আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসলেন। বাড়িতে এসেই স্থানীয় ডাক্তার অমরনাথ মিত্রের সুচিকিৎসায় ও মাতৃদেবীর গভীর সেবাযত্নে ক্রমে ক্রমে সেরে

উঠেছিল্‌ম। বাড়িতে যৎকিঞ্চিৎ রোগমুক্তির পথে গুরুদেব আমাকে একটি পত্র দিয়েছিলেন তা' এখানে দেওয়া হল। তখন এ পত্রে তিনি বর্ষাকালে শান্তিনিকেতনে "আনন্দের শ্রী" আমাকে জানিয়ে আনন্দদান করেছিলেন।

Santiniketan,
Bengal, India

কল্যাণীয়েষু,

শৈলেশ, এইমাত্র তোমার চিঠি খানা পেয়ে খুশী হয়েছি। তোমাকে ম্যালেরিয়া ধরেছে জেনে চিন্তিত হলেম। দুই একদিন হোল সোমেন্দ্রের একটি চিঠি পেয়েছি — তাতে তোমার অসুখের খবরটুকুও ছিল। এখন কেমন আছ জানাবে। এ রোগের তাড়নায় এবার তোমার পড়াশুনায় বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নেই। সোমেন্দ্র হয় তো তোমার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করেচে। সেরে উঠ্‌তে পারলে এদিকে চলে আসার চেষ্টা করবে।

এখানে বেশ শ্রাবণের ধারা নেমেচে। আমাদের আশ্রমের ছেলেরা বেশ আনন্দে খোয়ায়ের মাঠে ভিজচে। এ খবরে তোমার মনটাও হয়তো একটু সাড়া দিয়ে উঠচে। আশ্রমের খবর সব ভাল। তুমি ও সোমেন্দ্র আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ঈশ্বর তোমাকে এ রোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করুন একান্ত মনে কামনা করি। ইতি ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩৪।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুব

আমি রোগ মুক্ত হলেম। এদিকে পিতৃদেবকে কঠিন ম্যালেরিয়া আক্রমণ করে কাতর করে তুললো। আমার অবস্থারও তখন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি। দাদামহাশয় পিতৃদেবকে নিজ বাড়িতে এনে খুব সেবাযত্নের ব্যবস্থা ও ডাক্তারি থেকে কবিরাজের চিকিৎসা করিয়েছিলেন। তবু পিতৃদেবকে রক্ষা করা গেল না। তিনি হঠাৎ আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে স্বর্গীয় হলেন। আমারও এবারের মত শান্তিনিকেতন যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

১৯৩১ ইং সনে ত্রিপুরা রাজদরবার থেকে 'ঠাকুর বৃত্তি' নিয়ে আমাকে পুনরায় চারুকলা বিদ্যা শিক্ষার মানসে শান্তিনিকেতন কলাভবনে ভর্ত্তি হ'তে হল। প্রথমেই আমাকে মহারাজের আদেশে লক্ষ্ণৌ সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে যেতে হয়েছিল। সেখানে শিক্ষার খরচ অত্যধিক বিধায় আমাকে ত্রিপুরা সরকারের আদেশে শান্তিনিকেতন আসতে হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা হয়ে আমি বোলপুরে পৌঁছলুম। একটা সাইকেল রিক্‌সা ঠিক করে সোজা শান্তিনিকেতনের পথ ধরে গুরুপল্লীতে পূজনীয় নন্দবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হলুম। নন্দবাবু তখনো কলাভবন থেকে ফিরে আসেন নি। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী আমার জলযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। জলযোগ সমাধা করে পূজনীয় নন্দবাবুর প্রতীক্ষায় বসে রইলুম। তিনি যখন বাড়িতে উপস্থিত হলেন তখন আমাকে দেখেই বললেন, "কখন এসেছো?" আমি বললুম, "ঘন্টাখানেক হবে।" বলে তাঁকে প্রণাম করলুম। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় বাল্যজীবন থেকেই ছিল। যখন গুরুদেব "কলাভবন" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন থেকেই তিনি মাঝে মাঝে অরিয়েন্টেল সোসাইটী থেকে শান্তিনিকেতন কলাভবনে এসে কাজ করতেন। এমন কি তখন থেকে আমার আঁকা ছবিও তাঁকে দেখাতুম, তিনি সেটা সংশোধন করে দিতেন ও উৎসাহ দিতেন। বাল্যজীবনের পাঠ্যাবস্থায় কলাভবনে গিয়ে আমি ও মনীষী দে পূজনীয় নন্দবাবুর কাছে

চিত্রবিদ্যা শিখতুম। সেই থেকেই আমার চিত্রাঙ্কনের স্পৃহা জেগেছিল। তাই পরবর্ত্তী আকর্ষণে তাঁর চরণপ্রান্তেই পুনরায় আমার চারুকলা শিখতে আসতে হয়েছিল।

পূজনীয় নন্দবাবু ঘরে এসেই বিকেল বেলায় জলযোগ সমাপনান্তে বললেন, "তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, এখন চল কলাভবন হোষ্টেলে।" তিনি ধীরে ধীরে চলেছেন — আমি তাঁর পেছনে পেছনে চললুম। কথায় কথায় পুরোন হাসপাতালে পৌঁছলুম। এটাই তখন আমাদের কলাভবন হোষ্টেল ছিল। সেখানে তিনি প্রথমেই আমার বাল্যবন্ধু পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমের কবি নিশিকান্ত রায়চৌধুরীকে দেখিয়ে দিলেন। তাঁকে দেখে আমার বাল্যজীবনের বহু স্মৃতি মনে পড়ে গেল। লিখতে গেলে তার শেষ নেই। শান্তিনিকেতনের বাল্যাবস্থায় বেশ মিলে মিশে আমাদের দিন কেটেছিল। এখন আবার সেই স্মৃতি নিয়েই আমাদের মধ্যে আর এক নবরূপে ছোঁয়া লেগে গেল। নিশিকান্ত বাল্যকাল থেকেই বেশ কবিতা লিখতে পারতো। কলাভবনে ভর্ত্তি হয়েও তাকে কাব্যরচনার মধ্যেই দেখেছি। গুরুদেব মাঝে মাঝে তার কবিতাগুলো সংশোধন করে দিতেন তা আমি জ্ঞাত ছিলুম। বিচিত্রায় যে গদ্য ছন্দে লিখিত কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তার শিরোনামা "টুকরী" লিখে দিয়েছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।

কলাভবনে ভর্ত্তি হয়েই আমি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে বিকেল বেলা গিয়েছিলুম। তিনি তখন উত্তরায়ণের পশ্চিমের বারান্দায় কী একটা বই পড়ছিলেন। আমি ধীরে ধীরে সেদিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর পদপ্রান্তে প্রণতি জানালাম। প্রথমে তিনি আমাকে দেখে চিনতেই পারেন নি। কারণ বাল্যজীবনের চেহারা এবং সে সময়ের চেহারায় একটু পরিবর্ত্তন ঘটায় আমাকে চিন্‌তে তাঁর একটু অসুবিধা হয়েছিল। আমি নাম জানিয়ে পরিচয় দিতেই আমাকে চিনে ফেল্‌লেন, আর বলে উঠ্‌লেন — "ও, তুমি আমাদের সেই শৈলেশ? তোমার খুব পরিবর্ত্তন দেখছি যে, — কবে এখানে এসেছো?"

আমি বল্‌লুম, "গুরুদেব, গতকাল এসেছি।"

তিনি বল্‌লেন, "তুমি যে কলাভবনে ভর্ত্তি হচ্ছ সে সম্বন্ধে কাল রেণু* আমাকে লিখেছিল। যাক্ কলাভবনে ভর্ত্তি হয়েছো তো?"

আমি বললুম, "কলাভবনে তো ভর্ত্তি হলুম, এখন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে ফ্রি-সিপ্ পাবার ইচ্ছায় আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করেন এবং বিশেষ করে মাষ্টার মশাইকে বলেন আমি সহজেই ফ্রি-সিপ্ পেতে পারি।"

তারপর তিনি আমাকে বললেন, "দেখ, আমি এ বিষয়ে কী বলতে পারি? কলাভবনের ব্যাপার সব নন্দবাবুর হাতে, সেই সব করতে পারে। তুমি গিয়ে তাঁকে ধরবে, সব হয়ে যাবে। আমার কিছু বলতে হবে না। তুমি একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। তারপর তোমাদের আগরতলার খবর কী? রেণুর কর্ম্মসংস্থান ও তার পারিপার্শ্বিক কি জান, বলতে পার?" আমি যা জানতুম বললুম।

কলাভবনে এসে ফ্রি-সিপের জন্য মাষ্টার মশাই নন্দবাবুকে ধরলুম। তিনি বললেন, "তোমার প্রথম বছরের কাজ ভাল হলে পর তোমাকে ফ্রি-সিপ্ দেওয়া যাবে।" আমি

* সোমেন্দ্র দেববর্ম্মা

মনোযোগের সহিত শিল্প-সাধনা আরম্ভ করে দিলুম। মাষ্টার মশাই প্রত্যহ আমার কাজ দেখতে আসতেন ও উপদেশ দিয়ে যেতেন। তিনি আমার প্রথম বছরের কাজ "বাঁশের সেতু" দেখে খুশী হয়েচিলেন ও ঝরনাটায় ফিনিসিং টাচ্ দিয়ে দিয়েছিলেন। এ ছবিটা এখনো আমার কাছেই আছে। কাজের মধ্য দিয়ে ক্রমে এক বছর কেটে গেল। আমাকেও ফ্রি-সিপ্ সম্পর্কে কোন খোঁজ নিতে হয় নাই। মাষ্টার মশাই নিজ থেকেই ফ্রি-সিপের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি আসবো, — এ উপলক্ষে গুরুদেবকে প্রণাম করবার জন্য বিকেল বেলা "কোনার্ক" বাড়ীতে গিয়েছিলুম তখন আমার সঙ্গে কলাভবনের একটি ছাত্র সুধাংশু পালিতও গিয়েছিল। আমরা দুইজন বাহিরের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করচি তখন গুরুদেব চিত্রাঙ্কনে তন্ময় হয়েছিলেন। তাই ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস হচ্ছিল না, ইতস্ততঃ করছিলুম। কিছুক্ষণ পর দেখলুম "হৈমন্তীদি" (১) বেড়িয়ে এলেন। তিনি আমাদের দেখে — "ঢুকে পড়ুন" বলে চলে গেলেন। তবুও আমরা ঢুক্‌বো কিনা ভেবে পাচ্ছিলুম না, এমন কি সাহসেও ভর করতে পারছিলুম না। প্রায় সন্ধ্যে হয়ে আসে এমন সময় গুরুদেব ভেতর থেকে ডাকলেন, "বনমালী বাতিটা জ্বালিয়ে দাও তো।" বনমালী বাতি জ্বালিয়ে দিল, এদিকে আমরা ঢুকবো কিনা এইটুকু ভেবেই ইতস্ততঃ করচি। কিছুক্ষণ পর আমি আর ধৈর্য রাখতে না পেরে একটু সাহসে ভর করেই পরদাটা সরিয়ে ঢুকে পড়লুম। ঢুকতেই তিনি আমাদের প্রতি নিরীক্ষণ করে বলে উঠ্‌লেন, "কি হে শৈলেশ, তোমাদের কী খবর? একটু এগিয়ে এস। আমার ছবিটা কেমন হয়েছে দেখ তো? তোমরা তো কলাভবনের ছাত্র — ছবিটার ভাব কী বল্‌তে পার?"

আমি গুরুদেবের চিত্রটি দেখে কি ভাব প্রকাশ করবো তা ভেবেই পেলুম না। চিত্রটির মধ্যে আমি বেশীর ভাগ হলুদ রঙের সমাবেশে একটি নারীর নৃত্যরত অবয়ব প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম — আর বাহিরের রঙগুলো নীল, লাল ও সবুজ রঙে মিশ্রিত বেশ একটা মধুর রঙরসের সুর নিয়ে ভরপুর। অনেকক্ষণ ছবিটার প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখে বলে ফেলেছিলুম, "গুরুদেব এটা একটা নাচের ছবি!" তিনি অমনি হেসে বলে উঠ্‌লেন, "ঠিকই বলেছো, আমি নাচের ছবিই আঁকছি। এর ভেতরে আরো রঙের রস দিতে হবে রে, আমার ছবি যে কথা বলছে না।"

গুরুদেবের চিত্রটির সমালোচনার মধ্য দিয়ে সুধাংশু গুরুদেবকে একটি অটোগ্রাফ খাতা এগিয়ে দিল।

গুরুদেব বললেন, "এটা কী?"

সুধাংশু বল্‌লো, "এটা আমার অটোগ্রাফ খাতা। অনুগ্রহ করে কিছু লিখে দিন।" তিনি খাতাখানি টেনে নিয়ে শুধু তা'তে লিখে দিয়েছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"। তারপর আমাকে বললেন — "তোমার অটোগ্রাফ খাতা কোথায়?"

(১) হৈমন্তী চক্রবর্ত্তী গুরুদেবের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী।

ওঁ

বিপুল সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন

কলিকাতার

জনতার মধ্যে আমি শরীরে মনে একেবারে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি এই কারণে মহারাজের নিকট অবসর প্রার্থনা করিয়া অদ্যই অপরাহ্ণের মেলে আমি বোলপুরে ফিরিবার স্থির করিয়াছি।

মহারাজের রাজ্যশাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার চিঠি গতকল্য মেলে পাঠাইয়াছি।

কৌন্সিলের দ্বারা [illegible]

৩৩। মহারাজ রাধাকিশোরকে লিখিত পত্র

কাজ চলিল না। কোনো শিক্ষককে সহায়সুবিধা করিয়া এতদিন কর্তার কাজ কাড়িয়া থাকেন। কিন্তু সে স্থলেও কোনো শিক্ষকের জনসম্মানকে নিঃস্বার্থ হিতৈষিতার সহিত অধিনায়কের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ কাজে অব্যবস্থা পরস্পরবিরোধিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা থাকে না। মহারাজের বর্তমান পারিষদবর্গ প্রভৃতি মহারাজের কি যথার্থ সুহৃদ আছে? ইঁহারা কি এত বড় দায়িত্বগ্রহণের যোগ্য? ইঁহাদের হাতে আত্মসমর্পণ

করিয়া কি মনুষ্যজাতের মঙ্গল
হইবে? মহাত্মা যিশুখৃষ্ট
দিয়া ইহাদের বলবৃদ্ধি করিয়া
দিয়াছেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে
সেই বল খর্ব্ব করিবেন, কিন্তু
সুসভ্যের নীতিচাতুর্য্য ক্ষুদ্রমনা
ব্যক্তিদের হাত হইতে মুক্ত
করিবেন, না, তাঁহাদের আত্মাকে
ইহাদের হাতে সমর্পণ করিয়া
ইহাদের প্রাণশক্তিকে দুর্ব্বল
করিয়া তুলিবেন?

মার্কিন সাহেবকে আমার
কার্যক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা তবে

ঘ

এবং প্রস্তুত। তোমার নিকট
ইহা অপেক্ষা আকাঙ্খার
বিষয় আর কিছুই হইতে
পারে না। ম্যাকমিলন কর্তৃ-
পক্ষ দিগকে পাণ্ডু লিখিতে
পারিবেন — কিন্তু তিনি
তাঁহাকে পাইবেন না —
এমন স্থায়ী ব্যবস্থা করিতেই
হইবে যাহাতে আমার কাছে
কোনো একটি না থাকে, যাহাতে
কর্তৃপক্ষের নিকট আবদ্ধ
হইতে কোনো আকাঙ্খা
না থাকে। যদি নিজেকে

নিরাপদ হওয়ার করিয়া
কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি
তবে বিপদ আমারই ঘনীভূত
হইয়া উঠিবে। মহাত্মাজির
নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা
এই যে শিশুবালিকাকে দিয়ে
নিজের মত সমর্থন ও প্রচার
হইতে দিবেন না। এখন ইহাকে
কঠোর দুঃসাধ্য সাধনা বোঝা
বহিয়া তুলিতে হইবে। মহাত্মার
অনুগামীদিগকে পাহারায় রাখিয়াছে
তাঁহারা মহাত্মাজির সঙ্গে

ইহাদের দুর্দিন উপস্থিত
থাকিতে পারে কিন্তু দুর্দিন
সাময়িক নহে — এইজন্যই
আমি সংবাদপত্রকে অনুরোধ
করিতেছি ইহাদের প্রতি
বিশেষ দৃষ্টি দিয়া অসন্তোষের
কারণ ঘটাইবেন না। বর্তমান
ঘটনা একটা সংকট, উহাতে কোন
সন্দেহ নাই। এমন যদি
সংস্থানের বিবেচনা করিয়া
না দেখেন যাহা ইহার সমাধান
পাইবেন না।

জ

রমণীর দ্বারা মহারাজের
কোন/সাহায্য হইবে কিনা আমি
জানি না — তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত
পাওয়া যাইবে কিনা তাহাও
বলিতে পারি না — তাহার
সম্বন্ধে বেশী অগ্রসর হইলে
তাহাতে কোনো সুবিধা
হইবে না। কিন্তু যে কারণেই
হউক এরকম সক্ষম ব্যক্তিকে
মহারাজের একান্ত হিতৈষী
প্রকৃতির অবস্থায় — তাঁহাকে
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া রাখা

...বাসনা পরিত্যক্ত হইবে। এমন
...লোকের প্রয়োজন যে ব্যক্তি
...মানের অন্তরে সাহিত ...
...কোন প্রকার দুর্নীতির
সাহিত কোন কোন সময়...
...দুর্নীতিপরায়ণ ...
...সাহিত ...
পারিবে- তাহাদিগকে ...
...অপরাধের তাহাদিগকে
নির্মমভাবে দমন করিতে
পারিবে। আমি সাহাবাকে

অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এবং
ধর্মের দিকে অগ্রসর হইয়া এই
সকল কথা বলিলাম। যদি
কোনো কথা রূঢ় হইয়া থাকে
মহারাজ ক্ষমা করিবেন।

আমি আমার সংসারের
সমস্ত জাল বন্ধন ছিন্ন কাটিয়া
নিষ্কৃতিলাভের জন্য ঈশ্বরের
নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি।
মহারাজের সহিত আমার
আমার সম্বন্ধ যত বাড়িয়াছে,
এই সম্বন্ধের দ্বারা আমার

অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ না
হইলে অন্যায় হওয়া নাই
এই কারণেই একে আমি মহা-
বাবুর দোষারোপকারীর আগে
ভাবের বিচার হইয়াছে এই সমস্ত
কঠিন ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে
জড়িত করিয়াছি। মহাবাবুকে
দুর্বল করিয়া অবিবাহিতার সঙ্গ-
করা দাবী না — তবে এখনো
নিবেদন করিলাম। এ উপবাস-
দিবসে যাহার অন্তর্যামী
সিদ্ধ হইবে — আমি কেবল
মহাবাবুর ব্যক্তির কামনা

৬

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ইতি ১৪ই

পৌষ ১৩৩৩

[illegible]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

সবিনয় কল্যাণীবরেষু

অনেকদিন পরে আজ
তোমার চিঠিখানি পাইয়া প্রথম
সংবাদ লাভ করিয়াছি। কিছুদিনের জন্য
সাহায্য করা কিছুমাত্র দুরূহ ব্যাপার।
যখন তোমাদের সুবিধা হইবে লিখিয়া
জানাইলে কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না।
সম্প্রতি তোমাদের রাজ্যের সুশৃঙ্খলা
বিধান ও শান্তিস্থাপন হইয়াছে সংবাদ
পাইলে আমি নিশ্চিন্ত হইব। তোমরা
দুইজন তোমাদের রাজ্যের মঙ্গল বিধান
হইতেছে এমন সুসংবাদ আমার কাছে
অতি আনন্দই আছে। [illegible]

খ

ইংরাজ গভর্ণমেন্ট সমস্ত শক্তি দিয়া চাপিবে।
তোমাদের বিপুল শক্তির সহিত তোমাকে যে
সংগ্রাম করিতে হইতেছে তাহাতে মহাশক্তির
প্রয়োজন হইবে। অথচ সহজে হইলে তাহারা
আক্রমণ করিবে। তোমাদের মাথার উপরে
প্রকাণ্ড কর্মভার আছে এবং ঘরে বাহিরে
তোমাদের শত্রুর অভাব নাই - ইহাতে
[illegible] অনেকখানি পরিমাণে সংযত
ও সতর্ক থাকিয়া চলিবে সন্দেহ নাই -
এই সকল উপসর্গ না থাকিলে ত্রুটীর
সুযোগ হয়ত দুর্নীতির পথকেই প্রশস্ত
করিত। যেমনি হউক তোমার জীবন ব্যর্থ
হইবে না এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়
আছে। ঈশ্বর তোমার শুভচেষ্টাকে

সাধন করিবেন। [illegible] উন্নতি-
অবনতিতে তোমার জীবনের সার্থকতা
প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। [illegible] তোমাকে
দীর্ঘজীবী করিয়া [illegible] তোমার
[illegible] এই [illegible]
[illegible] করিবে।

সম্প্রতি তোমার [illegible] আমি
তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। তোমাকে
আমার অন্তরের স্নেহাশীর্বাদ [illegible]
[illegible] করিব এবং [illegible]
[illegible] না। [illegible] এই
[illegible] তোমাকে
[illegible]
[illegible] করিব।

রথীন্দ্র দেশে ফিরিয়াছে। তোমার

মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারিলেই
সংসারে আমার দুঃখ মিটিবে।
আমার কাছে সুকুমার তোমার
ভবিষ্য কার্য্যক্ষেত্রে সাংসারিক সম্বল
আছে। তাহা হইলে তোমার সহিত
একত্রে কাজ করা আমাদের হইতে
পারিবে এবং আমাদের মন এক হইবে।
[illegible] এবং নিজের সংসারকে কার্য্যক্ষেত্র
তৈয়ার করিতে হইবে। ইতি ২৭ [illegible]
১৩১৩

শুভানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি বললুম, "আমার অটোগ্রাফ খাতার কোন প্রয়োজন হয় না — কারণ আমার কাছে আপনার চিঠিপত্রই সব চেয়ে বহু মূল্যবান অটোগ্রাফ হয়ে আছে!" তারপর গুরুদেবকে আগামীকাল সকালের গাড়ীতে বাড়ি যাচ্ছি বলে বিদায়ের প্রণাম জ্ঞাপন করলুম।

গ্রীষ্মের ছুটীর পর শান্তিনিকেতনে এসেই গুরুদেবের জন্য ত্রিপুরায় আমদানী খাঁটি মধু নিয়ে উত্তরায়ণের পথে রওনা হলুম। কারণ মধু কলাভবন হোষ্টেলে রাখা নিরাপদ নয় মনে করে তাড়াতাড়ি গুরুদেবের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা স্থির করেছিলুম। ছাত্রমহলে মধুর সন্ধান ঘটলে কোন সময় এটা মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়ে পড়ে তাই সব গোপন করেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন বিকেলবেলা গুরুদেব "কোনার্কে"র পূব বারান্দায় একটি বেতের কেদারায় বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে বাইরনের লেখা কাব্য পাঠ করছিলেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে উপস্থিত হতেই তিনি মাথা তুলেই আমার হাতের খাঁটি মধুর বোতলটি দেখে বলে উঠলেন, "মধু! মধু! এনেছো তা'হলে তোমার দেশের খাঁটি মধু?"

আমি তাঁকে প্রণাম করেই মধুর বোতলটি তাঁর টেবিলের উপর রেখে দিলুম। তিনি বনমালীকে ডেকে তুলে রাখবার জন্য মধুর বোতলটা তার হতে দিয়ে দিলেন।

তারপর আমাকে প্রশ্ন করলেন — "ছুটী কেমন কাট্‌লো! ছবি কেমন এঁকেছ?"

আমি বললুম — "বিশেষ ভাল বা উপযুক্ত কোন কাজই হয়নি?"

তখন তিনি বলেছিলেন — "আমি তো আগেই বলেছিলুম, কাজ হবে না, — শুধু শুধু ঘুরে বেড়াবে।" কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি বললেন, "সোমেন্দ্র কেমন আছে? তার ছেলেমেয়ে ও বউ কেমন আছে বলতো?"

আমি বললুম — "এদিকে আসবার সময় তিনি মধুর বোতলটা আমার বাক্সে ঢুকিয়ে বলেছিলেন — 'মধু নিয়ে গুরুদেবকে দেবে, আমার প্রণাম জানাবে।' তাঁরা সব ভালই আছেন।"

সেদিন গুরুদেব মধু পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন। কথায় কথায় সন্ধ্যে হয়ে আসছে দেখে গুরুদেব উঠ্‌লেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে এবারের মত বিদায় হলেম কলাভবনের পথে।

সন তারিখের কথা মনে নেই। সেদিনটি ছিল শীতের সকাল ও আমাদের ছুটীর দিন। গুরুদেব তখন "শ্যামলী" নূতন বাড়ীতে বাস করতেন। মন্দিরের উপাসনার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য কলাভবন থেকে শ্যামলীর পথে রওনা হলেম। তিনি তখন শ্যামলীর উত্তরের বাগানে বসেছিলেন। দ্বারে উপস্থিত হয়েই বনমালীকে জিজ্ঞেস করলুম — "গুরুদেব কোথায় আছেন?" সে আমাকে উত্তরদিকের পথ দেখিয়ে দিল। ঘরে প্রবেশ করে একটু অগ্রসর হতেই দেখতে পেলুম গুরুদেব একটী বেতের আরাম কেদারায় বসে পাখীদের খাদ্য বিতরণ করছেন আর পা দুলিয়ে দুলিয়ে তাদের কীর্ত্তিকলাপ

নিরীক্ষণ করছেন। এমন তন্ময়তার মধ্যে আমি যাব কিনা তাই ভাবছিলুম ও ইতস্ততঃ করছিলুম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ধীরে ধীরে তাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হলেম। দরজার ধারে গিয়ে দেখলুম সেখানে নানা জাতীয় পাখীরা এসে গুরুদেবের কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি কিছু কিছু করে খাদ্য ছিটিয়ে দিচ্ছেন আর তারা বেশ আনন্দে কলকাকলি করে খেয়ে যাচ্ছে ! পাখীদের মধ্যে কাক, শালিক, চড়ুই, কবুতরই বেশীর ভাগ ছিল আর অন্য কোন পাখী চোখে পড়েনি। আমি ধীরে ধীরে গুরুদেবের কাছে উপস্থিত হ'তেই সব পাখীগুলো উড়ে পালিয়ে গেল। আমি গিয়েই তাঁকে প্রণাম করলুম। আমি মাথা তুলতেই তিনি গম্ভীর সুরে বলে উঠলেন, "কী হে শৈলেশ, তুমি এসে আমার বন্ধুদের তাড়িয়ে দিলে? আমি তাদের নিয়ে সকাল বেলা কত আনন্দ করি জান? আজ তুমি সব মাটি করে দিলে।" বলে ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন। আমি এ ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত মনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর বললেন, "কী মনে করে এসেছ?" আমি বললুম, "রেণু মামা আপনার শারীরিক খবর জানতে লিখেছেন তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।" তিনি বললেন, "আমি সুস্থ শরীরেই আছি। তারপর তোমার খবর কি? কাজকর্ম্ম কেমন চলেছে? খুব ছবি আঁকছ, না?"

আমি বললুম, "ছবি তো খুব আঁকচি কিন্তু ভালমন্দ বিচার করতে পারচি না।"

তিনি বলিলেন, "কাজ করে যাও — ভালমন্দ বিচার পরে হবে? তারপর কিছু লিখতে অভ্যেস কচ্চ কি?"

আমি বললুম, "লিখবো কি? ভাষা তো আমার মাথায় একদম আসে না।"

তিনি বললেন, "কেন আসবে না? ভাষা তো তোমার কথার সঙ্গেই আছে? যেমন করে কথা বলচ এমন করে লিখে যাবে। দেখবে এমন করেই তোমার লেখা শেখা হয়ে যাবে। তারপর গান গাইতে জান?"

আমি বললুম, "গানে আমার গলায় সুর আসে না তাই গান গাইতে লজ্জা করে।"

তিনি বললেন, "কেন? ত্রিপুরার ছেলে হয়ে তুমি গান জান না, বড় দুঃখের বিষয়। তারপর বাঁশী বাজাতে জান?"

আমি বললুম, "বাঁশী বাজানো যে আরো কঠিন — এটা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

তিনি হেসে বললেন, "ত্রিপুরার ছেলে হয়ে তুমি এসব রস থেকে বঞ্চিত দেখে খুবই আশ্চর্য্য হলুম। এবার ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে এক আধটু লিখতে লেগে যাও, ভয় কিসের? আমাকে দেখাবে, আমি সব সংশোধন করে দেব।" (আমি গুরুদেবের উপদেশ পেয়ে এক আধটু করে লেখা আরম্ভ করে দিলুম। তবে গুরুদেবকে দেখাতে সাহস করিনি তাই নিজের কাছেই লেখাগুলো রয়ে গেল।) কথায় কথায় অনেক বেলা হোল তাই যাবার জন্য উদ্যোগ করচি — তিনি বললেন, "এবার থেকে কাজে লেগে যাও কেমন?" অতঃপর প্রণমান্তে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

১৯৩৬ ইং কলাভবনের যাবতীয় শিক্ষা সমাধা করে বাড়িমুখো হব, এমন দিনে গুরুদেবের কাছে বিদায় নিতে গেলুম। বিকেলবেলা তখন সবেমাত্র পশ্চিম দিগন্তে রাঙারবি ডুবে যাচ্ছে — সে সময়ে তিনি শ্যামলীর দক্ষিণ বারান্দায় বসে কী যেন লিখছিলেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এগিয়ে চললুম। কাছে আসতেই মাথা তুলে আমার দিকে তাকালেন ও বললেন, "কী খবর শৈলেশ।" আমি মাথা নত করে বললুম, "আমার কলাভবনের যথানির্দ্দিষ্ট শিক্ষা সমাধা হয়েছে — তাই দেখা করতে এসেছি। তারপর আপনার একটা Personal Certificate পেতে আকাঙ্ক্ষা করচি। আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তো পেতে পারি।" তিনি হেসে বললেন, "নন্দবাবু তোমায় কী Certificate দিয়েছেন দেখবো, তারপর হবে।" ভাগ্যিস আমি পূর্ব্বেই এইটুকু ভেবে মাষ্টার মশাইএর Certificateটা সঙ্গে নিয়েছিলুম, তা' গুরুদেবকে দেখিয়ে দিলুম। তিনি এটা পড়লেন এবং বললেন, "তোমার Certificate আমি কলাভবনে পাঠিয়ে দেব। সেজন্য তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। তারপর তুমি কবে বাড়ি যাচ্ছ?"

আমি বললেম, "এদিকে সব ঠিক হয়ে গেলে পর বাড়ি রওনা হবার ব্যবস্থা করবো।"

তখন তিনি আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন, "দেশে গিয়েই মহারাজকে ধরে একটা শিল্পবিদ্যালয় খুলবার চেষ্টা করবে। তারপর রেণু যখন তোমাদের রাজ্যে উচ্চপদে কাজ করচে, তার দ্বারাই এটা সম্ভব হ'তে পারে। তুমি এদিকে বিশেষ চেষ্টায় থাকলেই তোমারও কাজ হ'তে পারে।"

কথায় কথায় গুরুদেবের লেখার একটু ব্যাঘাত ঘটতে পারে এইটুকু মনে করে বিদায় নিতে চাইলুম — তিনি বললেন, "দেশে গিয়ে নিজের কাজের পথ খুঁজে নিতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না। যদি একটা কিছু করে নিতে পার তোমারই গৌরবের বিষয়।" এইটুকু বলে বিদায় দিলেন।

১৯৩৭ইং বিশ্বভারতীর সমাবর্ত্তন উৎসবে যোগদান করতে গিয়েছিলুম। সে হোল আমার Diploma গ্রহণ উপলক্ষে। Diploma গ্রহণান্তে বাড়ি যাবার উদ্যোগ করচি তখন মাষ্টার মশাই আমাকে একমাস শান্তিনিকেতনে থাকবার উপদেশ দিলেন। তাঁর অনুমতিক্রমে আমার শান্তিনিকেতনে থাকারই ব্যবস্থা করতে হোল। কারণ আমাদের মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসছেন, তাই মাষ্টার মশায়ের আদেশ মতে সেখানে থাকতে হয়েছিল।

একদিন সকালে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। তখন তিনি শ্যামলীর দক্ষিণের খোলা বারান্দার ধারে যে একটা কাঠ গুলঞ্চ গাছ আছে তার নিচে আরাম কেদারায় বসে পা দোলাচ্ছিলেন। আমি দর্শন দিতেই তিনি বলে উঠলেন, "তুমি এখনো বাড়ী যাওনি দেখচি? বাড়ী যাওনি যে ভালই করেছ। তোমার মহারাজা এখানে আসচেন — দেখা হলে তোমার ভালই হবে। তারপর সোমেন্দ্র এখন কোথায় আছে বল্‌তে পার?"

আমি বললুম, "তিনি বাড়িতেই আছেন।"

মহারাজ শান্তিনিকেতন পৌঁছবার চার দিন পূর্ব্বে বিকেল বেলা আমার বাল্যবন্ধু নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে গল্প করচি ----- তখন কথায় কথায় নির্ম্মলের কাছ থেকে খবর

পেলুম সোমেন মামা দু'দিন হয় শান্তিনিকেতনে এসেছেন। নির্ম্মলই তাঁকে উত্তরায়ণে টেনিস খেল্‌তে দেখেছিলো। এ খবরে তখন আমার মনটা বেশ আনন্দে মেতে উঠেছিল। সাধারণতঃ বিদেশে আত্মীয়-স্বজন কারো দেখা পেলে আমার খুব ভাল লাগে। তাড়াতাড়ি গল্পের আসর বন্ধ করে মাষ্টার মশাইর (নন্দবাবু) বাড়ীর পথে রওনা হলুম। কারণ সেখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা ছিল। সে রাতটা খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হল। মাষ্টার মশাই কখন উঠেই বাগান থেকে ফুলের গুচ্ছ নিয়ে ফুলদানিতে সাজাচ্ছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠেই মুখ হাত ধুয়ে মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে সকাল বেলার জলযোগ সমাধা করলুম। তারপর মাষ্টার মশাইকে জানালাম — সোমেন মামা উত্তরায়ণে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি — বলে বিদায় নিলুম। ধীরে ধীরে উত্তরায়ণে এসে "কোনার্কে"র ধার দিয়ে "শ্যামলী"র দ্বার প্রান্ত পর্য্যন্ত গেলুম। সেখানে সোমেন মামার বেশ উচ্চ ও হাস্যরসে ভরপুর কণ্ঠস্বর শ্রবণে এল। তিনি তখন গুরুদেবের সঙ্গে বেশ কথা জমিয়ে বসেছেন। সেখান থেকে তাঁর বের হতে দেরী হতে পারে মনে করে, কোনার্কের দক্ষিণ বারান্দায় এসে চুপ করে বসে রইলুম শ্যামলী থেকে তিনি বের হলেই দেখা হবে সে ভরসায়। প্রায় ঘন্টাখানেক পর তিনি শ্যামলী থেকে বের হয়ে কোনার্কের পথে আসতেই আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কবে আসলে?" আমি বললুম, "আমি ৭ই পৌষের সমাবর্ত্তনে Diploma নিতে এসেছিলুম, একমাস হোল এখানেই আছি। মহারাজা আস্‌ছেন বলে মাষ্টার মশাই রেখে দিয়েছেন, তাই রয়ে গেলুম।" "গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করেছো?" আমি বললুম, "দেখা হয়েছে।" তিনি আমার কথায় কোন কান না দিয়েই আমাকে ধরে হিড় হিড় করে টেনে গুরুদেবের সম্মুখে নিয়ে উপস্থিত করলেন।

গুরুদেব আমাকে দেখেই বললেন, "সোমেন্দ্র, তুমি শৈলেশকে ধরে আন্‌লে কেন? ওর সঙ্গে যে দেখাসাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা পূর্ব্বেই সেরে ফেলা হয়েচে। তোমার মহারাজা আস্‌বেন জেনেই নন্দবাবু তাকে ধরে রেখেচেন।"

সোমেন মামা হেসে বল্‌লেন — "শৈলেশ তা হোলে আমার পূর্ব্বেই কথাবার্ত্তা সব শেষ করে বসে আছে? বলে হাস্‌তে আরম্ভ করলেন। তারপর তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে ডাক্তার শচীনবাবু ও মীরাদির বাড়িতে নন্দিতা কৃপালনীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করলেন, এবং কলাভবনে গিয়ে মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে উত্তরায়ণে চলে গেলেন। আমি উত্তরায়ণের দ্বারপ্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে মাষ্টার মশাইর (নন্দবাবু) বাড়ি চলে এলাম।

সেদিন উত্তরায়ণের পশ্চিমের বারান্দায় গুরুদেবের লেখা "তাসের দেশ" অভিনয়ের সংগত করা হয়েছিল। তখন আমাদের কলাভবনের সকলেই ও মাষ্টার মশাই সহ আরো কয়েকজন ছিলেন। সোমেন মামাও গুরুদেবের পদপ্রান্তে বসেছিলেন। সেদিনকার "তাসের দেশে"র সংগত বড়ই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। সোমেন মামা তো এ অভিনয়টি দেখে খুব উৎফুল্ল হয়ে গুরুদেবকে বলে উঠেছিলেন, "এ অভিনয়টি মহারাজকে দেখালে খুবই ভাল হবে।" গুরুদেব হেসে বলেছিলেন, "সোমেন্দ্র, এ অভিনয় তোমার রাজাকে

দেখাবো না। এটা দেখ্‌লে তিনি অসন্তুষ্ট হ'তে পারেন। তাঁকে 'চণ্ডালিকা' অভিনয়টি দেখালে ভাল হবে।" তার পরদিন বিকেল বেলায় উত্তরায়ণের পশ্চিমের বারান্দায় মহারাজকে দেখাবার উদ্দেশ্যে "চণ্ডালিকা" অভিনয়ের সংগত করা হয়েছিল। তখনও আমরা সকলে উপস্থিত অভিনয়-সংগত দর্শনার্থী ছিলুম। সোমেন মামা এ অভিনয়-সংগতটি দেখে আরো উৎফুল্ল হয়ে দু'টো অভিনয়ই মহারাজকে দেখাবার জন্য গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করলেন। গুরুদেব গম্ভীর সুরে বল্‌লেন, "সোমেন্দ্র, শোন। 'তাসের দেশ' অভিনয়টি রাজাকে সাক্ষাৎ দেখানো সমীচীন নয়। এখানে রাজার দেশের শাসনের উলোট পালট রয়েছে যে। রাজার মনে এ বিষয়ে আঘাত আসতে পারে তাই দেখাতে ইচ্ছা করি না। এ অভিনয়ের পরিবর্ত্তে 'চণ্ডালিকাই' তাকে দেখাবার ব্যবস্থা করেছি। এটাই সব চেয়ে শোভন হবে।"

তারিখের কথা মনে নেই, সকালের গাড়ীতে কলকাতা থেকে আমাদের মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সপারিষদ একটি রিজার্ভ গাড়ীতে বোলপুর ষ্টেশনে এসে পৌঁছলেন। মহারাজাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সোমেন মামা, গুরুদয়াল মল্লিকজি, আরো কয়েকজন, ধীরেনদা [১] ও আমি গিয়েছিলুম।

মহারাজের সঙ্গে এসেছিলেন — ঁরাজা রানা বুধজঙ্গ চিফ্‌সেক্রেটারী, দ্বিজেন্দ্র দত্ত — পারশন্যাল সেক্রেটারী, ডাক্তার অবনীশ্বর সেনগুপ্ত, কাপ্তেন ঁযোগেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা। মহারাজের বোলপুর ষ্টেশনে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ীর কামরায় আমরা সকলেই গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ ও প্রণাম জ্ঞাপন করেছিলুম। অতঃপর মহারাজা রথীবাবুর সঙ্গে গাড়ী থেকে অবতরণ করে সপারিষদ মোটরে উত্তরায়ণের পথে রওনা হলেন। কারণ উত্তরায়ণেই মহারাজের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। মহারাজ রওনা হবার পর আমরা বিশ্বভারতী বাসে চেপে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলুম।

মহারাজ উত্তরায়ণে এসেই পোষাক পরিবর্ত্তন করে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। শ্যামলীতে মহারাজের সঙ্গে গুরুদেবের আলাপ আলোচনা হোল। শান্তিনিকেতনে শ্যামলীর সামনে গুরুদেবের সঙ্গে মহারাজের ফটো ধীরেনদা তুলে নিলেন।

অপরাহ্নে মহারাজকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আম্রকুঞ্জে আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে মাষ্টার মশাই কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সুন্দর পরিকল্পনায় আলপনা করিয়েছিলেন এবং গুরুদেব ও মহারাজের বসবার আসনটী অপরূপ নক্‌সাকাটা আসনের দ্বারা সাজিয়ে দিয়েছিলেন। গুরুদেব যথাসময়ে মহারাজের আম্রকুঞ্জস্থিত অভ্যর্থনা সভায় শুভ্র বসনে হাজির হলেন। মহারাজ সভামধ্যে হাজির হলে গুরুদেব উঠে মহারাজকে অভ্যর্থনা করে পাশে বসালেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনির দ্বারা রাজাকে অভ্যর্থনা করলো। তারপর একটী ছোট মেয়ে গুরুদেব ও রাজাকে কপালে চন্দনচর্চ্চিত করতঃ দু'জনকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে প্রণতি জানালো এবং সঙ্গে সঙ্গে অভ্যর্থনা সঙ্গীত গেয়ে উঠলো। সঙ্গীত শেষ হতেই সংস্কৃতভাষায় শাস্ত্রী মহাশয় ও ক্ষিতিবাবু মহারাজের

(১) ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মা।

অভ্যর্থনা-লিপি পাঠ করলেন। গুরুদেব শান্তিনিকেতনে মহারাজের আগমন উপলক্ষে কিছু বললেন আর মহারাজ তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন সম্পর্কীয় কিছু ভাষণ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হল।

প্রায় চার ঘটিকায় মহারাজ সদলবলে শ্রীনিকেতন পরিদর্শনে গেলেন। সেখানকার craft দেখে বিশেষভাবে খুশী হয়ে তিনি উত্তরায়ণে ফিরে এলেন। সেদিন ছয় ঘটিকায় উত্তরায়ণে বিশ্বভারতীর মাষ্টার মহাশয়দের সঙ্গে Tea party-র ব্যবস্থা ছিল। আমরাও মহারাজের সঙ্গে সেখানে Tea party-তে যোগদান করেছিলুম।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় 'সিংহসদনে' চণ্ডালিকা অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মহারাজ সেদিকে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে চলে গেলেন। আমরাও Tea party শেষ করে অভিনয় দর্শনার্থে সিংহসদনের পথে রওনা হলুম। সেখানে পৌঁছেই দেখ্‌লুম আশ্রমের সকলেই জায়গা দখল করে অভিনয় দেখ্‌তে বসে পড়েছেন। গুরুদেব পূর্ব্বেই এসে বসেছিলেন। আমরাও জায়গা ঠিক করে একধারে বসে পড়্‌লুম। কিছুক্ষণ পর মহারাজ সিংহসদনে এসে পৌঁছলেন। গুরুদেব এগিয়ে গিয়ে মহারাজের হাত ধরে তাঁকে পাশে বসালেন। মহারাজ গুরুদেবের পাশে উপবেশন করতেই চণ্ডালিকা অভিনয় আরম্ভ হল। সেদিনের অভিনয়টি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। অভিনয়-শেষে গুরুদেব মহারাজকে বললেন, "চণ্ডালিকা অভিনয় কেমন লাগ্‌লো?" মহারাজ সেদিন অভিনয়টির খুব সুখ্যাতি করেছিলেন।

তারপর দিন সকাল বেলায় মহারাজ কলাভবনে এলেন। মাষ্টার মশাই নন্দবাবুর সঙ্গে আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলুম। তিনি প্রথমে কলাভবনে আসতেই মাষ্টার মশাই তাঁকে অভ্যর্থনা করে Havell Hall এর মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর আগমন উপলক্ষে আমাদের ছবি Exhibit হয়েছিল। সেগুলি তিনি একটি একটি করে দেখেছিলেন এবং খুব খুশী হয়েছিলেন। তারপর মাষ্টার মশাই আমাকে দেখিয়ে মহারাজকে বলেছিলেন ঃ— "ত্রিপুরা থেকে শৈলেশকে বৃত্তি দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। আমরা তাকে শিখিয়ে মানুষ করে দিলুম।" কলাভবনের সব দেখা হয়ে গেলে তিনি উত্তরায়ণে চলে গেলেন।

সেদিন বিকালে সপারিষদ মহারাজ কলকাতার পথে মোটরে বোলপুর ষ্টেশনে চল্‌লেন। আমরাও বিশ্বভারতী বাসে চেপে মহারাজকে বিদায় নমস্কার জানাতে বোলপুর এলুম। মহারাজ একটী রিজার্ভ গাড়ীতে উঠ্‌লেন, পাশের রিজার্ভ গাড়ীতে L.K. Elmherst উঠ্‌লেন। L.K. Elmherst বিখ্যাত ধনী ও গুরুদেবের বন্ধু। তিনি সেবার এসে গুরুদেবের আঁকা অনেক ছবি ক্রয় করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সোমেন মামা L.K. Elmherst এর সঙ্গে তাঁর গাড়ীতে গিয়ে বসেছিলেন। আমরা মহারাজকে প্রণাম করে তাঁর কামরা থেকে বের হয়ে এলুম। মহারাজকে বিদায় দিয়ে আমরা বিশ্বভারতী বাসে করে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলুম।

সোমেন মামা কলকাতা ফিরবার আগে আমাকে শান্তিনিকেতনে থাকার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। তারপর রথীদাকেও আমার কাজের ব্যবস্থা করতে বলে গিয়েছিলেন। তাই

আমাকে শান্তিনিকেতনেই থাকতে হোল। সোমেন মামার যাবার কালে তাঁকে আমি বলেছিলুম, "আপনি কি এখন বাড়ি চলে যাচ্ছেন?" তিনি বলেছিলেন, "আমাকে বাড়ি গিয়েই মহারাজের আদেশ মত জরুরী কাজ করতে হবে।" তারপর জানি না তিনি কখন লক্ষ্ণৌ থেকে মামীমার টেলিগ্রাম পেয়ে দেরাদুন এক্সপ্রেসে লক্ষ্ণৌ রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। মনে হোল এযাত্রা যেন তাঁর কালগ্রাসের যাত্রা হয়ে গেল। প্রথমে খবরের কাগজে রেলদুর্ঘটনার খবর পড়লুম কিন্তু তখন সোমেন মামার কোন বিপদের কথা চোখেই পড়েনি। হঠাৎ বাড়ি থেকে এক টেলিগ্রাম এল Dehradoon Express disaster Renu going Lucknow no information "Jatindra" কুমার যতীন্দ্রমোহন দেববর্ম্মার এই টেলি পেয়ে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। সহসা কেবল মনে আসতে লাগলো — এ কী হোল! ভেবেই অধীর হয়ে পড়েছিলুম। মনকে আর প্রবোধ দিতে পারছিলুম না! তিনি আমার সর্ব্ববিষয়ের অভিভাবক ছিলেন, আজ তাঁকে হারিয়ে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলুম। এ মর্ম্মান্তিক খবরে কোন উপায় স্থির করতে না পেরে, সকালবেলা টেলিগ্রামসহ গুরুদেবকে সংবাদ দিতে গেলুম। তিনি তখন কোনার্কের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে পা নাড়িয়ে নাড়িয়ে কী যেন ভাব্‌ছিলেন। আমাকে সম্মুখে দেখেই তিনি বল্‌লেন, "কী খবর? তুমি কবে বাড়ি যাচ্ছ?" আমি টেলিগ্রামটি তাঁর হাতে দিয়ে কেঁদেই ফেলেছিলুম। গুরুদেব তারটা দেখেই ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন। দেখলুম তাঁর চোখ ছলছল করছে, আমাকে বললেন, "খবরের কাগজে তো তা' দেখিনি! কী ব্যাপার!" আর আমাকে বলে উঠলেন, "সোমেন্দ্র তার মহারাজাকে এখানে এনে তার শেষ গুরুদক্ষিণা আজ আমাকে দিয়ে গেল!"

অতঃপর আমাকে বল্‌লেন, "তুমি রওনা হয়ে যাও। তার কোন খোঁজ পাও কি না দেখো। দেরী করবে না। কোন অনুসন্ধান পেলে আমাকে চিঠি দিয়ে জানাবে। তারপর আমিও রথীকে জানাচ্ছি। কী ভাবে তার খোঁজ পাওয়া যায় এর একটা ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। শোকে অধীর হলে চলবে না। কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সাহসে ভর করে খোঁজ নেবে। জেনে রেখো শেষ পর্য্যন্ত ভগবানের হাত।"

মাতুল সোমেন্দ্রচন্দ্রের দেরাদুন রেলদুর্ঘটনার খবর জানাতে গিয়ে গুরুদেবের কাছ থেকে যে বিদায় নিয়ে এসেছিলুম, — এরপর থেকে আমার কবিতীর্থে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দূরে থাকলেও রবিতীর্থ-স্মৃতি শতসহস্র ধারায় আমার মনের কোণে এখনো বিরাজিত।

শান্তিনিকেতনের বাল্যস্মৃতি

শ্রীঅনাথবন্ধু চৌধুরী

সে আজ সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের কথা। তখন আমার বাল্যজীবন। আজ বার্দ্ধক্যের সীমারেখায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি। শান্তিনিকেতনের সেই পুণ্যস্মৃতি আজও আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে চিরজাগ্রত চিরনবীন হইয়া রহিয়াছে। সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনের সহিত আমার ছাত্রজীবনের বন্ধন ছিন্ন হইলেও এই ব্যবধান আজও অন্তরের যোগসূত্রকে ছিন্ন করিতে পারে নাই। আজ যতদূর স্মরণ হইতেছে ইংরেজী ১৯১০সনে নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বিদ্যাশিক্ষার জন্য শান্তিনিকেতনে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার জীবনে আসিয়াছিল। ক্ষুদ্র একটী সহরের সহিত জীবনপ্রভাতে প্রথম পরিচয় জন্মিয়াছিল। শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে যেদিন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম সেইদিন পথে যাহাই আমার দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে, তাহাই যেন আমাকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যের পাদদেশেই আমার পিতৃভূমি ছিল। অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় আজ তাহা পাকিস্তানের কুক্ষিগত।

ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুর হইতে জাহাজে তখন গোয়ালন্দ যাইতে হইত। চাঁদপুরে প্রথম জাহাজ দেখিয়া মনে যুগপৎ আনন্দ ও কৌতুহল জাগিয়াছিল কিন্তু প্রভাতে পদ্মাবক্ষে নদীর ভীষণতা দর্শনে ক্রমশই মন যেন ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। আনন্দের পরিবর্ত্তে ভীতির করাল ছায়া আমার বালসুলভ মনের কোণে জমাট বাঁধিয়া উঠিল। কখন ডাঙ্গায় উঠিব এই চিন্তাই আমাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল। গোয়ালন্দ পৌঁছিয়া Broad gauge গাড়ী দেখিয়া মনে একটা তাক লাগিয়া গেল। এই শ্রেণীর গাড়ীর সহিত জীবনে আমার এই প্রথম পরিচয়। গাড়ীর গতিবেগও পূর্ব্বে এইরূপ আর দেখি নাই। কোন কোন ষ্টেশন দেখিয়া মনে কেবল জিজ্ঞাসা হইতেছিল — ষ্টেশনে এতবড় দালান কেন? যাহা দেখিতেছিলাম তাহাই আমার চক্ষে সুন্দর ও অভিনব মনে হইতেছিল।

কলিকাতার গল্প পূর্ব্বে অনেক শুনিয়াছি। দর্শনের পূর্ব্বে ইহা যে এতবড় বৈচিত্র্যপূর্ণ সহর তাহা আমার কল্পনায় আসে নাই। সহরের আকাশস্পর্শী দালানশ্রেণী, তাহার সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল। সহরের ঐ জনসমুদ্র দেখিয়া এত লোক কোথা হইতে আসিতেছে চিন্তা করিতেছিলাম।

তের চৌদ্দ দিন কলিকাতা থাকার পর একদিন আমার দাদা আমাকে শান্তিনিকেতনে লইয়া রওনা হইলেন। হাওড়া ষ্টেশন দেখিয়া আমার চক্ষে যেন ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছিল। দুপুরে লুপ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে দাদা আমাকে লইয়া শান্তিনিকেতনে রওনা হইলেন। আমরা বোলপুর ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িলাম। বোলপুর ষ্টেশনে ছোট একটি দালান। চারিদিকের তৎকালীন পরিবেশ আমার চক্ষে বেশী ভাল ঠেকিতেছিল না। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম ষ্টেশনের পিছনে যাত্রীদের জন্য অপেক্ষমান গরুর গাড়ীর শ্রেণী।

একটি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। বোলপুর ষ্টেশন হইতে শান্তিনিকেতন মাত্র দেড় মাইল ব্যবধান। বোলপুর সহরের উপর দিয়া গরুর গাড়ী চলিয়াছে। চলমান গো-শকটের চাকার শব্দে সে যেন তাহার অস্তিত্বের খবর সকলকে দিয়া যাইতেছিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে খড়ের ছাউনীবিশিষ্ট অতি সাধারণ দোকানশ্রেণী ছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই তামাকের দোকান। জ্যোৎস্নাবিধৌত রজনী। চারিদিক বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। সহরটী অত্যন্ত অপরিষ্কার বলিয়া মনে হইল। গো-শকটের ঝাঁকুনি আমার ক্রমেই যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল। জীবনে এইরূপ যানের সহিত এই প্রথম পরিচয়। আমি হাঁটিয়া যাইব বলায় দাদাও গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। বুঝিলাম তিনিও অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। সহরের রাস্তাটী ধূলিময় ও আবর্জ্জনাপূর্ণ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পরিবেশটা যেন মোটেই প্রীতিপদ মনে হইতেছিল না।

বোলপুর সহর অতিক্রম করিয়া গাড়ী মাঠের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। মাঠের মাঝ দিয়া রাস্তা সোজাই চলিয়াছে। চারিদিকে মাঠে কোন শ্যামলতা দেখিতে পাইলাম না। পথিপার্শ্বে বৃক্ষরাজিও বিশেষ নাই। কেমন যেন একটা রুক্ষ চেহারা। দূরে দূরে দুই চারিটা তালগাছ তাহাদের সকল রুক্ষতা লইয়া আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া যেন দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। এ কোন্ দেশে চলিলাম মনে ভাবিতেছি, এই মরুরূপী দৃশ্য যেন আমাকে ক্রমশই পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল, আমি যে দেশ হইতে আসিয়াছি সেখানে তো শ্যামলতার কোন অভাব দেখি নাই। কতদূর পথ অতিক্রম করিয়া ভুবন-ভাঙ্গা গ্রাম পাওয়া গেল। এখানে কিছু গাছপালা দেখিলাম। রাস্তার রাঙ্গা ধূলায় বৃক্ষরাজি যেন গেরুয়া বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছে মনে হইতেছিল। ভুবনভাঙ্গা গ্রাম অতিক্রম করিয়া অল্প কতদূর অগ্রসর হইতেই শান্তিনিকেতন দৃষ্টিপথে আসিয়া পড়িল। চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠের মধ্যে শান্তিনিকেতন চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এত রুক্ষতা ও অপরিচ্ছন্নতার পর একটা মনোরম দৃশ্য নয়নগোচর হইল। বড় রাস্তা হইতে গাড়ী হঠাৎ বামদিকে মোড় হইয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়া প্রবেশ করিল। তখন রাত্রি অনুমান ৮টা। গাড়ী নাট্যঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাস্তা কঙ্করপূর্ণ সম্মুখে শালবীথি সারিবদ্ধভাবে রাস্তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। উত্তর পার্শ্বে আশ্রমের গৃহশ্রেণী; ঐ কালে সত্যকুটীর, সতীশকুটীর, মোহিতকুটীর, বীথিকাগৃহ ও বাগানবাড়ী আত্মপ্রকাশ করে নাই। নাট্যগৃহের উপরে খড়ের ছাউনী, তৎসংলগ্ন হলঘরের টালির ছাউনী ছিল। লাইব্রেরীর দালানের উপরে খড়ের ছাউনী ঘর। তাহার সংলগ্ন পশ্চিমধারে একটী একতলা দালান। তাহার নাম গুরুধাম। এইসব গৃহেই আশ্রমের ছাত্ররা তৎকালে বাস করিত।

ঐবার পূজাবকাশের পর শান্তিনিকেতন সবেমাত্র খুলিয়াছে। ছাত্ররা তখনও বন্ধের পর আশ্রমে আসিতেছিল। আমাদের গাড়ী আশ্রমে পৌছিলে ছেলের দল চারিদিক হইতে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিতে লাগিল — কে আসিয়াছে। তাহাদের দৃষ্টি কৌতূহলী, আমাদের সঙ্গে এদের কাহারও পূর্ব্ব পরিচয় নাই। কাজেই আমাদের আগমন তাহাদের কাহারও প্রাণে যেন কোন আনন্দ জাগাইতে পারিল না — বুঝিতে পারিলাম। রাত্রিতে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আশ্রম কর্ত্তৃপক্ষ করিয়া দিলেন।

পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। বেশ একটা সুন্দর পরিবেশ। রাত্রিতে যেন একটা মরুপ্রান্তর দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিলাম। আর শান্তিনিকেতনে চারিদিকেই শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজি দেখিলাম। এইগুলির ভিতর দিয়া প্রাতঃকালীন সূর্য্যরশ্মি যেন উঁকি মারিতেছিল। বড় সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্য। আশ্রমের কার্য্যাদি তখনও সঠিকভাবে আরম্ভ হয় নাই। বেলা তখন ৯/১০টা হইবে। আমার দাদা আমাকে শান্তিনিকেতনে (যে দালানে কবিগুরু বাস করিতেন) লইয়া গেলেন। আমি শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলাম। আমার খুল্লতাতই আমাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়াছেন। দাদার প্রতি আমার খুল্লতাতের আদেশ ছিল — সর্ব্বপ্রথমেই কবিগুরুর কাছে আমাকে নিয়া যেন আমার জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন।

শান্তিনিকেতনের উপরতলায় আমরা উঠিলাম। এক ভদ্রলোক আমাদের সেখানে নিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কে আজ আর স্মরণ হইতেছে না। শান্তিনিকেতনের উপরতলায় মাঝের হলে পূর্ব্বধারে মেঝের উপর ছোট একটী গদি-পাতা বিছানা। তাহার সম্মুখে নীচু একটী শ্বেত পাথরের ছোট টেবিল। উক্ত টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া এক ভদ্রলোক কি যেন লিখিতেছেন দেখিলাম। তাঁহার গায়ে একটী জাপানী কিমানো। চক্ষে স্প্রীংএ আঁটা চশমা। চশমার একধারে কাল রেশমী সূতা বাঁধা, তাহা গলায় ঝুলিতেছে। সৌম্য মূর্ত্তি, গায়ের রং তপ্তকাঞ্চনসদৃশ, মাথায় লম্বা চুল কোঁকড়ানো, ঘাড়ের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মুখে লম্বা দাঁড়ি ও গোঁফ। উন্নত নাসা। চুল দাঁড়ি তখন পাকিতে আরম্ভ হয় নাই। আমরা ঘরে প্রবেশ করিতেই হাতের কলমটী টেবিলের উপর রাখিয়া তিনি আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। আমার দাদা নতজানু হইয়া তাঁকে প্রণাম করিলেন। তারপর আমিও নতজানু হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। দাদা আমার সম্বন্ধে বলিলেন। তখন ভদ্রলোকটী বলিলেন, "হাঁ, আমি তো এই ছেলেটির সম্বন্ধে তাহার কাকার এক পত্র পাইয়াছি। তিনি একজন উলিক না?" দাদা, তখন "আজ্ঞে হাঁ" বলিলেন। তখনও আমার ধারণা যাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছে তিনি বোধহয় আশ্রমের একজন অধ্যক্ষ। তিনিই যে গুরুদেব এই কথা মনে করিতে পারি নাই। তারপর আবার তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমার মনে হচ্ছে ছেলেটি দুষ্টামি করে বেশী। তার বাবা নেই এইকথাও চিঠিতে লিখা ছিল। শৈশবে যেসব হতভাগ্য ছেলে পিতৃমাতৃহীন হয় তারা অনেক সময়ই পরিবারের সকলেরই অতিরিক্ত স্নেহ পায়। তাই একটু দুষ্ট হবে বৈ কি? তবে শুনুন, দুষ্ট ছেলেরাই তো পরে ভাল হয় দেখি।" এই কথায় আমি যেন একটু আশ্বস্ত হইলাম। এই শ্রেণীর কথা তো পূর্ব্বে কাহারও মুখে আর শুনি নাই। তারপর তিনি তাঁহার কাছে আমাকে ডাকিয়া নিলেন। আমার মাথায় হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, কেমন লাগছে তোর এখানে?" — ভালই লাগিতেছে, জবাবে আমি বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "বেশ, বেশ —" আমাকে আশীর্ব্বাদ করার জন্য দাদা আবার গুরুদেবকে বলিলেন, যাহাতে আমি মানুষ হইয়া উঠিতে পারি। উত্তরে তিনি বলিলেন, "এসব ছেলেদের তাদের বাপ মায়ের কোল থেকে আমি নিয়ে আসছি। এদের মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব তো আমাদেরই।" আমরা তাঁহার কাছ হইতে উঠিয়া আসার সময় আবার তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তখন গুরুদেব সহাস্যে আমাকে প্রশ্ন করিলেন,

"আমাকে প্রণাম করার জন্য তোকে কে বলেছে?" একটু ইতস্ততঃ করিয়া জবাব দিলাম, "কেউ বলে নাই।" "তবে আমাকে প্রণাম করেছিস কেন?" তিনি আবার আমাকে প্রশ্ন করিলেন। প্রণাম করা কি তবে অন্যায় হইয়াছে, আমি মনে মনে ভাবিতেছি এমন সময় কেন জানি বলিয়া ফেলিলাম, "গুরুজনকে তো আমরা প্রণাম করার শিক্ষা বাড়ীতেই পাইয়াছি।" শান্তিনিকেতন দালান হইতে নীচে নামিয়া দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল ইনি কে? "ইনিই তো সেই সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর," দাদা আমাকে বলিলেন। কথাটা যেন আমার কাছে কেমন লাগিতেছিল। যাঁর দেশজোড়া নাম, যিনি এতবড় লোক তিনি আমাদের সঙ্গে এত সহৃদয় ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিলেন — আমার যেন একটু বিস্ময় বোধ হইতেছিল। বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষের দর্শন ও তাঁহার পদধূলি বাল্যজীবনে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আজ সেইজন্য নিজকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। গুরুদেবের ঐ দিনের মুখনিঃসৃত বাণী ও তাঁহার ব্যবহার আজও আমার কাছে যেন সেই দিনের ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে।

গুরুদেবকে কেন্দ্র করিয়াই শান্তিনিকেতনে আমাদের বাল্যজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময় শান্তিনিকেতনের শৈশব অবস্থাই বলিতে পারি। এই সময় আশ্রমে আমরা একশত ছাত্র ছিলাম। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ব্রহ্মচারীর মতই আমাদের জীবন আরম্ভ হইয়াছিল। চারিদিকে একটা আড়ম্বরহীন পরিবেশ। আশ্রমকে তখন আশ্রমের মতই বোধ হইত। ঐকালে শান্তিনিকেতনে যে সব অধ্যাপকের সমাবেশ হইয়াছিল একসময়ে এত সুধীজনের একই স্থানে মিলন সচরাচর দেখা যায় না। পরমশ্রদ্ধেয় জগদানন্দ রায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায়, কালীমোহন ঘোষ, কালিদাস বসু, শরৎকুমার রায়, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, শচীন্দ্রনাথ বসু, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ আইচ, হীরালাল সেন, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তেজেশচন্দ্র সেন প্রমুখ সুধীজনকে শিক্ষক হিসাবে শান্তিনিকেতনে পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের জীবনে একদিন আসিয়াছিল। পরশমণির পরশে মানুষ মনুষ্যত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবে কেন? আলোচ্য শিক্ষকমণ্ডলীর সকলেই একে একে শান্তিময়ের ক্রোড়ে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই শান্তিনিকেতনের প্রাচীন স্মৃতির ধারক ও বাহকরূপে জীবিত রহিয়াছেন।

জীবনে কি সব মনীষী দেখিয়াছি, তাঁহাদের কথা স্মরণ হইলে আজও ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাঁহাদের চরণে স্বতঃই যেন মাথা নুইয়া পড়ে। কি সব পূতচরিত্র অনাড়ম্বরজীবন, ছাত্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ শিক্ষকের পদতলে বসিয়া আমরা শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম, সেই কথা আজ চিন্তা করিলেও প্রাণমন আনন্দে উদ্বেলিত হয়। গুরুদেবের আদর্শ ও ভাবধারাতেই শান্তিনিকেতনের শিক্ষক মহাশয়দের জীবনও গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার অভিব্যক্তিই তাঁহাদের কর্ম্মজীবনে রূপায়িত হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির কতকটা পরিপন্থী এই ক্ষোভ যেন গুরুদেবের হৃদয়ে আন্দোলিত হইয়াছিল। সেই জন্য প্রাচীন ভারতের আদর্শে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ঐ উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তাধারা গুরুদেবের অন্তরে

দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। গুরুদেবের অন্তর্নিহিত কল্পনাই পরবর্ত্তী কালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল। পরমভক্তিভাজন জগদানন্দ রায় প্রমুখ পূর্ব্বোক্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ একে একে শান্তিনিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একমাত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। এই সব সুধীজন শান্তিনিকেতনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আশ্রমের জন্য তাঁহাদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। লাভে উপেক্ষা তাঁহাদের জীবনেই দেখিয়াছি। আজীবন এঁরা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন, কিন্তু দারিদ্র্যের নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। তাঁহারা ছিলেন সদা হাস্যমুখ, গুরুদেবের অসীম কৃপায় তাঁহারা যেন ঐরূপ জীবনের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সব শিক্ষকই শান্তিনিকেতনের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। অর্থের দিক হইতে শান্তিনিকেতনের অবস্থা তখন সচ্ছল ছিল না। গরীব ছেলেও ঐ কালে শান্তিনিকেতনে ছিল। তাহারা বিনা বেতনেই সেখানে সকল রকম সুবিধা সুযোগ পাইয়াছে। তৎকালে শান্তিনিকেতনের আর্থিক অসঙ্গতি গুরুদেবকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। শান্তিনিকেতন যেন ছিল গুরুদেবের অস্থিমজ্জা। সেই জন্য বৃদ্ধ বয়সেও তিনি শান্তিনিকেতনের জন্য ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দেশ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন। এতদিনে তাঁহার স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে। যে বিদ্যালয় নানা প্রতিকূলতা ও আর্থিক অসঙ্গতির সহিত সংগ্রাম করিয়া একদিন যাত্রাপথে চলিয়াছিল; আজ তাহা ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে।

শান্তিনিকেতনে আমাদের কালে গুরুদেবকে যেভাবে আমাদের সান্নিধ্যে পাইয়াছিলাম পরবর্ত্তী কালে সেইভাবে তাঁহাকে কেহ শান্তিনিকেতনে পায় নাই, এই হিসাবে আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান ছিলাম। কিন্তু সেই দিনে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তিনি যে এত মহান ও বিশ্ববন্দিত তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি নাই। সহজলভ্য বস্তুর প্রতি মানুষের যেমন দরদ কম থাকে আমাদের অবস্থাও প্রায় সেইরূপ ছিল। যিনি মহিমায় মহিমান্বিত, যাঁহার প্রতিভায় বিশ্ব একদিন উদ্ভাসিত হইয়াছিল এহেন মনীষীকে বুঝিবার শক্তি তো সেইকালে আমাদের বালক হৃদয়ে থাকার কথা নহে। আজ বার্দ্ধক্যের রেখায় উপনীত হইয়াও তাঁহার বিশালত্বের কোন পরিমাপ করিতে পারিতেছি না। মাদৃশ জনের পক্ষে গুরুদেব সম্পর্কে কিছু বলিতে যাওয়া যেন ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হইতেছে। এ যেন গোষ্পদে চন্দ্রাবলোকনের অবস্থা। যে পরিবেশে শান্তিনিকেতনে আমাদের বাল্যজীবন কাটিয়াছে, আজ তো দেশে কোথাও সেই পরিবেশ দেখিতে পাইতেছি না। শান্তিনিকেতনে আমাদের দৈনন্দিন জীবন সর্ব্বক্ষণই আনন্দমুখর ছিল। দেশ বিদেশের যে সব সুধীমণ্ডলীর দর্শন ঐ কালে আমাদের ভাগ্যে জুটিয়াছিল তাহা সংখ্যাহীন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক ও নানাশ্রেণীর মনীষীরই আমরা দর্শনলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। পরমশ্রদ্ধেয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রমথনাথ চৌধুরী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাদ্রাজের কুমারস্বামী, পারশ্য দেশের কবি বোস্তানী, (যতদূর মনে হয়) বিলাতের লেবার পার্টির মেম্বার·রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রভৃতির দর্শন আমরা

শান্তিনিকেতনে পাইয়াছি। দেশবন্ধু সি, এফ, এণ্ড্রুজ ও ডবলিউ, ডবলিউ, পিয়ারসন সাহেবকেও শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসাবে পাইয়াছি। তাঁহারা বাঙ্গালীর মত ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিধান করিতেন। খালি পায় শান্তিনিকেতনের কঙ্করময় পথে হাঁটিয়া বেড়াইয়াচেন, আমাদের সঙ্গে পংক্তিভোজন করিয়াছেন। গুরুদেবের প্রতি যে কি অপরিসীম শ্রদ্ধা লইয়া তাঁহারা শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন তাহা বর্ণনার ভাষা আমার নাই। শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁহাদের একটা বিশেষ মমত্ববোধ ছিল। তাঁহাদের আচার ও ব্যবহারে তাহা যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাঁহাদের একটা আন্তরিক প্রীতি ও অপরিসীম স্নেহ ছিল। তাঁহাদের উভয়ের কাছেই পড়িবার সুযোগও আমরা কিছুকাল পাইয়াছি।

গুরুদেবের পিতা পরমভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বীরভূম রায়পুরের বিখ্যাত সিংহপরিবারের সহিত (লর্ড সিংহের পরিবার) একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। শুনিয়াছি মহর্ষিদেব একবার রায়পুর আসিয়াছিলেন। বোলপুর ষ্টেশন হইতে পাল্কী করিয়া মহর্ষিদেব বাধগড়ার মাঠের উপর দিয়া যাওয়ার কালে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে লোকালয় হইতে দূরে এক সুন্দর পরিবেশের মধ্যে দুইটী সপ্তপর্ণী দ্রুম (ছাতিম গাছ) তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। গাছ দুইটী যেন মহর্ষিদেবকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিয়া বসিল। পাল্কী ঐ গাছের নিকট লইয়া যাওয়ার জন্য পাল্কীবাহকদের তিনি আদেশ করিলেন। ছাতিমতলায় পাল্কী উপস্থিত হইলে মহর্ষিদেব পাল্কী হইতে নামিয়া সেই বৃক্ষের নীচে উপাসনায় বসিলেন। এই স্থানের বিস্তৃত ভূমি পরবর্ত্তী কালে বন্দোবস্ত লইয়া মহর্ষিদেব সেখানে এক দালান নির্ম্মাণ করাইলেন। তাহার নাম হইল শান্তিনিকেতন। কলিকাতার জনকোলাহল হইতে দূরে এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া মহর্ষিদেব অনেক সময়ই বাস করিয়া ভগবৎ আরাধনায় দিনপাত করিতেন। শান্তিনিকেতনের প্রতি ধূলিকণার সহিত মহর্ষিদেবের পূতরজ জড়িত আছে। সেই ছাতিম গাছ দুইটী অদ্যাপি শান্তিনিকেতনে বিরাজমান আছে। মহর্ষিদেবের উপাসনার বেদী আজও সেই পুণ্য স্মৃতি বহিয়া চলিয়াছে। কে জানিত পরবর্ত্তী কালে এই পুণ্যভূমিতেই শান্তিনিকেতনরূপী মহীরুহ আত্মপ্রকাশ করিবে। এই পুণ্যভূমিতেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় আত্মপ্রকাশ করিল। শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বদিকে নান্নুর গ্রাম — বৈষ্ণবাচার্য্য চণ্ডীদাসের জন্মভূমি ও পশ্চিমদিকে কেন্দুবিল্ব — বৈষ্ণব কবি জয়দেবের জন্মস্থান। শান্তিনিকেতন উভয় পল্লীরই মধ্যবর্ত্তী স্থানে রূপপরিগ্রহ করিয়াছে।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষার আদর্শ ও পদ্ধতি ছিল অন্যরূপ। শিক্ষক মহাশয়রা শিক্ষাটাকে আমাদের নিকট অত্যন্ত সহজ সুন্দর, প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমাদের উপর তাঁহাদের নির্ভরতা ও বিশ্বাস ছিল। পরীক্ষার সময়ও আমরা নানা গাছের নীচে বিচ্ছিন্নভাবে বসিয়াছি। তাহাতে কোন গার্ডের ব্যবস্থা ছিল না। শান্তিনিকেতনের ছেলেরা নকল করিবে না এই ধারণা তাঁহাদের ছিল। সেইজন্য নকল করার প্রবৃত্তি কোন দিনও আমাদের মনে জাগে নাই। পরীক্ষাকে আমরা কোন দিনই ভীতির চক্ষে দেখি নাই। পরীক্ষা যে একটা ভয়াবহ ব্যাপার সেই চিন্তাধারা আমাদের মনে আসে নাই। বিদ্যালয় হইলেই যেমন বর্ত্তমান যুগে প্রাসাদতুল্য এমারতের কথা উঠে, শান্তিনিকেতনে এই

মনোবৃত্তি ছিল না। বৃক্ষতলে আমাদের ক্লাস হইত। ছাত্র ও শিক্ষকের কম্বলের আসনে বসার ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রদের শিক্ষক মহাশয়কে ঘেরিয়া বসিবার রীতি ছিল। শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে পাঠ বলিয়া গিয়াছেন, আমরা মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছি। বলার ভঙ্গিমা এত চমৎকার ছিল যে স্বতঃই আমাদের মনকে সেইদিকে আকর্ষণ করিয়াছে। পরমশ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় একদিন ক্লাসে আমাদিগকে বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের ঘটনাবলী বলিয়াছিলেন। সুদীর্ঘকাল পরে আজও যেন সেই গৃহত্যাগের ছবিটী চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে। এই শ্রেণীর শিক্ষক ক্রমেই যেন দুর্লভ হইয়া পড়িতেছেন। শিক্ষক মহাশয়গণ যখনই যে বিষয় পড়াইয়াছেন তাহা আমাদের কাছে মনোমুগ্ধকর করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাতে সরসতা ও সজীবতা ছিল। শুষ্কভাব কখনও দেখি নাই। কোন কোন দিন গুরুদেব নিজেও আমাদের ক্লাসে আসিয়া পড়াইয়াছেন। আমার আজও স্মরণ আছে উতঙ্কের পৌষ্য রাজার প্রাসাদে রওনার কথাটি গুরুদক্ষিণা হইতে একদিন পড়াইতেছিলেন। আর একদিন কথা ও কাহিনীর

"অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যা সূর্য্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধভার করি আহরণ
বনান্তর হতে ...."

পড়াইতেছিলেন। সেই ছবিটি আজও যেন দানা বাঁধিয়া রহিয়াছে।

প্রকৃতির সহিত আমাদের একটা অন্তরের পরিচয় যেন শান্তিনিকেতনে জন্মিয়াছিল। আমরা শান্তিনিকেতনে ষড়ঋতুকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। গুরুদেবের রচিত সঙ্গীত প্রতিদিনই সকাল সন্ধ্যায় গীত হইত। ঐ সকল সঙ্গীত যেন আমাদের প্রাণে একটা স্পন্দন আনিয়া দিত। ষড়ঋতুর মধ্যে বর্ষা ও বসন্তই আমাদের বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। বর্ষার বারিধারার সঙ্গে শিক্ষক মহাশয়গণ আমাদের লইয়া মাঠে বাহির হইতেন। অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি বিস্তীর্ণ মাঠের অপর প্রান্তে মেঘ নামিয়া আসিতেছে। আমরা তখন গান ধরিয়াছি

"এসো হে এসো সজল ঘন
বাদল বরিষণে —
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এসো হে এ জীবনে" ইত্যাদি।

গানের সঙ্গে সঙ্গেই মেঘ নামিয়া আসিল। তখন কি আনন্দ! মুষলধারে বৃষ্টি। মাঠ জলে ভরিয়া গিয়াছে। জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমাদের অন্তরেও আনন্দের বান ডাকিয়া উঠিয়াছে। — প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অন্তরও যেন তখন দুলিয়া উঠিত।

গুরুদেব শান্তিনিকেতনে থাকিলে প্রতি সন্ধ্যায়ই আমাদের গানের ক্লাসে আসিতেন। সঙ্গীতাচার্য্য পরমভক্তিভাজন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদিগকে গান শিক্ষা দিতেন। নূতন গান লিখিয়া গুরুদেব নিজেই তাহাতে সুর যোজনা করিতেন এবং নিজে গাহিয়া

একবার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে শুনাইতেন। একবার গানটী শুনিয়াই দিনুবাবু গানের রাগ রাগিণী আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। বহু গানই গুরুদেবের নিজ মুখে শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। একদিন অবাক বিস্ময়ে দেখিলাম গুরুদেব গাহিতেছেন —

"আমার নয়ন ভুলানো এলে"

তাঁহার তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল তিনি যেন এ জগতের মানুষ নহেন। স্বর্গের জ্যোতিতে যেন তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই গান আজও যেন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে শুনিতেছি। জীবনে আর এই গান শুনিব না। আর এক দিনের কথা আজও আমার স্মরণ আছে। সেইদিন গুরুদেব কলিকাতা যাইতেছিলেন। ট্রেইনের অপেক্ষার বোলপুর ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে বসিয়া আছেন। আমরা কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। একজন অন্ধ ভিক্ষুক সেই সময় একটা বায়া বাজাইয়া গুরুদেবের রচিত

"সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ
দুখ জ্বালা সেই পাশরে"

গাহিতেছিল। গুরুদেব চিত্রার্পিতের মত চেয়ারে বসিয়া আছেন। দেহ যেন স্পন্দনহীন। এই সম্বন্ধে একদিন শ্রদ্ধাস্পদ ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কোন কোন গান শুনিলে গুরুদেবের এই শ্রেণীর ভাব হয় কেন? তিনি বলিয়াছিলেন, "ভগবানে সমর্পিত প্রাণ যাঁহাদের তাঁহাদের হৃদয়ে তখন একটা স্পন্দন আসে। তাহাতেই এইরূপ হয়।"

শান্তিনিকেতনে পূজার ছুটী ও গ্রীষ্মের ছুটীর পূর্ব্বে সেইকালে সর্ব্বদাই অভিনয় হইত। ছাত্ররা সকলে মিলিয়া অভিনয় করিত। শিক্ষক মহাশয়রাও কেহ কেহ আমাদের সহিত অভিনয়ে যোগ দিতেন। গুরদেবের রচিত "রাজা ও রাণী", "অচলায়তন", "বিসর্জ্জন", "শারদোৎসব", "প্রায়শ্চিত্ত", "বাল্মীকি-প্রতিভা" ইত্যাদিই বেশীর ভাগ অভিনীত হইয়াছে। গুরুদেব নিজে এইসব ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। শারদোৎসবে,

"আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আমরা গেঁথেছি শেফালি মালা
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা"

এই গানটী নিজে গাহিয়াই বিরত হয়েন নাই, কিভাবে নৃত্য করিতে হইবে তাহাও নিজে নাচিয়া দেখাইয়াছেন। সেও শুধু একবার বা দুইবার নহে, বহুবার। গুরুদেব আনন্দের যেন মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। অন্তরে অনাবিল আনন্দের উৎস না থাকিলে তাঁহার তৎকালীন বয়সে এইভাবে নৃত্য করিবেন কেন?

বিসর্জ্জন নাটকে কখনও রঘুপতির ভূমিকায় কখনও গোবিন্দ মাণিক্যের ভূমিকায় আবার কখনও অপর্ণার ভূমিকায় কিভাবে অভিনয় করিতে হইবে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। এই ব্যাপারে তাঁহার কোন ক্লান্তি লক্ষ্য করি নাই।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সর্ব্ববিষয়েই স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তোলার আদর্শই গুরুদেব আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, গতর খাটুনীতে আমাদের মর্য্যাদার হানি হইবে এই শিক্ষা আমরা বস্তুত সেখানে পাই নাই, এই শ্রেণীর কার্য্যে আমরা আনন্দই বোধ করিয়াছি, গুরুদেব সর্ব্বদাই আমাদের এই শ্রেণীর কার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইতেন। আশ্রমের ঠাকুর, চাকর, এমন কি মেথরদের কার্য্যও আমরা সপ্তাহে একদিন নিজেরা করিয়া তাহাদিগকে বিশ্রাম লাভ করিতে দিয়াছি, তাহাতেও আমরা কুণ্ঠিত হই নাই।

মহাত্মাজীর দক্ষিণ আফ্রিকার গণ-আন্দোলন আরম্ভ হইলে সেখানে আর্থিক সাহায্য দেওয়া আমরা স্থির করি। প্রতিদিন দুপুরের খাওয়ায় ভাতের সহিত ঘৃত খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমরা পাতে ঘি খাওয়া ছাড়িয়া দিলাম। এই অর্থ আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্যে পাঠাইব স্থির করিলাম। গুরুদেব এই কথা শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন না। তিনি অভিমত প্রকাশ করিলেন "বাঙ্গালী মৎস্যাশী। এখানে ছেলেরা নিরামিষ খাচ্ছে। তাদের একটু পুষ্টিকর খাওয়া ছাড়া স্বাস্থ্য রক্ষা হবে কি করে? তারা যদি দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে সাহায্য করতে চায় তবে তারা গতর খাটিয়ে অর্থ উপার্জ্জন করে সাহায্য করে না কেন? সেই সাহায্যই তো হ'বে প্রকৃত সাহায্য।" তখন আশ্রমে মাটি কাটিয়া আমরা অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি। অবসর সময়ে কোন কোন দিন এক এক দল শিক্ষক মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বোলপুর ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেনের যাত্রীদের মোট বহিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, ইহাতে আমাদের কোন সঙ্কোচ বোধ ছিল না বরং আনন্দই বোধ করিয়াছি। এক দিনের কথা আজ বিশেষভাবে আমার মনে হইতেছে। বোলপুরের মুন্সেফবাবু একদিন অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে ট্রেনে আসিয়া ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়াছেন। তাঁহার হাতে একটি গ্লাডষ্টোন ব্যাগ ছিল। আমি তাঁহার হাত হইতে ব্যাগটি লইলাম। আমার গায়ে ব্যাজটি দেখিয়া তিনি স্মিতহাস্যে ব্যাগটি আমার হাতে ছাড়িয়া দিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। ব্যাগটি লইয়া মুন্সেফবাবুর বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। মুন্সেফবাবু তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "দ্যাখ, শান্তিনিকেতনের ছেলেরা কেমন কাজ কচ্ছে। এরা কিন্তু অনেকেই দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। রবিবাবু দেশে কতগুলি ছেলে তৈরী করে যাবেন।" ব্যাগটি বহিবার পারিশ্রমিক বাবদ আমার ৫ টাকা মিলিয়াছিল। টাকা দিয়াই আমাকে বিদায় করা হইল না, মুন্সেফবাবুর স্ত্রী আমাকে পরিতোষ সহকারে মিষ্টি খাইতে দিলেন। তাঁহার সেই সময়ের আদর ও যত্নে যেন মাতৃহৃদয়ের পরশ পাইয়াছিলাম। সেই কথা আজও আমার অন্তরে সজীব রহিয়াছে। কার্য্যান্তে আমরা সকলে নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে মিলিত হইলাম। প্রত্যেকের উপার্জ্জিত অর্থ জমা হইল, সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা আশ্রমে রওনা হইলাম। সকলেই তখন সমস্বরে গাহিয়া চলিয়াছি

"আমাদের শান্তিনিকেতন
আমাদের সব হতে আপন।
তার আকাশ-ভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন"

এই গানটি আমাদের প্রাণে একটা উন্মাদনা আনিয়া দিত। যখনই আমরা এই গানটি গাহিয়াছি তখনই আমাদের প্রাণে যেন একটা আনন্দের বান ডাকিত। আজও সেই গানের মূর্চ্ছনা অন্তরকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে।

আশ্রমে ছাত্রদের সর্ব্বপ্রকারের স্বাধীনতা ছিল। ছাত্রদের বিচার সভা, আশ্রম সম্মিলনী, হাতের লিখা মাসিক ও দৈনিক কাগজ ছিল। দৈনিক কাগজটী এক শিট কাগজে লিখা হইত এবং তাহা হলঘরের বারান্দায় নোটীশ বোর্ডে পিন দিয়া আটকান হইত। ইহাতে আশ্রমের নানা বিষয়ের মধ্যে অভাব অভিযোগের কথাও লিপি হইত। গুরুদেব আশ্রমে থাকিলে প্রতি দিন বিকালে দৈনিক কাগজ পাঠ করিতেন। কাগজ পাঠ করিয়া যেখানে যাহা করা সঙ্গত সেই সম্পর্কে আশ্রম সচিব মহাশয়কে উপদেশ করিতেন। গুরুদেবকে কোন দিন কাহাকেও কোন বিষয়ে আদেশ করিতে দেখি নাই। তাহার বলার ভঙ্গিমা এমনই ধরণের ছিল, যাহা শুনিলে আপনা হইতেই তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার ইচ্ছা অন্তরে জাগ্রত হইত। তাঁহার শাসন ছিল স্নেহের। আমার মনে আছে, একদিন বিকালে আমাদের ঘর ঝাঁট দেওয়ার কার্য্য শেষ করিয়াছি। গৃহের ভিতর ও বাহির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গুছানো। ঘরের বাহিরে কোথাও এতটুকু আবর্জ্জনা আমরা লক্ষ্য করি নাই। এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার একটা প্রতিযোগিতা ছিল। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের চক্ষু সদাজাগ্রত ছিল। খেলার ঘন্টা বাজিবে আমরা সবাই খেলিতে যাইব। সকলেই আনন্দে মসগুল। এই সময় ধীর পদক্ষেপে হাতে একটি নোট বহি, বাম হাত পিছনদিকে ডান হাতের বাহুকে ধরিয়া গুরুদেব আমাদের ঘরের সম্মুখের রাস্তা দিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। অতি নগণ্য একটি কাগজের টুকরা রাস্তা হইতে কুড়াইয়া লইয়া গুরুদেব আমাদের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরে আসিয়াই বলিলেন, "কিরে তোদের ঘরের সামনে থেকে এই কাগজটী কুড়িয়ে পেলাম।" এই কথা শুনিয়া আমরা সকলে একেবারে হতবাক। আকাশটা যেন আমাদের মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। গুরুদেবকে আমরা সকলেই প্রণাম করিলাম, কিন্তু তিনি চলিয়া যাওয়ার পর কাগজ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে তখন গবেষণা আরম্ভ হইল। এত দেখার পর কাগজ কিভাবে ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। ইহার কোন হদিস করিতে পারিলাম না। সেই দিনের খেলাতেও আমাদের আর মন বসিল না। এই ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইল। এইভাবে গৃহের চারিধারে কাগজাদি পড়িয়া থাকা নিতান্ত অসমীচীন ও অশোভন, ইহা আমাদের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। আজ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াও সেই শিক্ষা ভুলিতে পারি নাই। এই ভাবেই এক এক বিষয়ে আমরা শিক্ষা পাইয়াছি।

যখন যাহা হইয়াছে তাহাই যেন অন্তরে দাগ কাটিয়া গিয়াছে। আশ্রমে আমাদের কালের ছাত্রসংখ্যার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আশ্রমে পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রসংখ্যাই ছিল সর্ব্বাধিক। তন্মধ্যেও ত্রিপুরা জিলার ছাত্রসংখ্যা ছিল সর্ব্বোপরি। আশ্রমের নিয়ম প্রণালীর তখন বেশ কঠোরতা ছিল। শীতগ্রীষ্ম বারো মাসই আমরা খালি পায় চলিয়াছি। প্রাতঃস্নান সর্ব্বদাই রীতিমতভাবে করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়াছি। প্রত্যহ ভোরে খোলা মাঠে ব্যায়াম চর্চ্চা হইত। স্নানের পর প্রত্যেক ছাত্রেরই তাহার নিজ নিজ ধর্ম্ম বিশ্বাস অনুযায়ী উপাসনা করা রীতি ছিল। উপাসনান্তে আবার সমবেতভাবে বেদমন্ত্র সঙ্গীতের ভঙ্গিতে গাহিয়া উপাসনার কাজ শেষ হইত। এইসব নানা বিধিবিধানের মধ্যেও একটা আনন্দ ছিল। তাহাতে গতানুগতিকতা বা কোনরূপ শুষ্কতা ছিল না।

আমরা শান্তিনিকেতনে থাকা কালে গুরুদেব নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তিনি বিলাত হইতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, কলিকাতার সুধীমণ্ডলী তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার জন্য শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে কলিকাতা হইতে বোলপুর পর্য্যন্ত স্পেশাল ট্রেন আসিল। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে অভিনন্দনের স্থান নিরূপিত ছিল। বেশ একটা গুরুগম্ভীর জমজমাট ভাব। গুরুদেবের বসিবার বেদীর চারিদিকে আলিপনা দেওয়া হইয়াছিল। আম্রকুঞ্জ অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। কোন দিকে কোন ক্রুটী নাই। সেইদিনের স্মৃতি আজও অন্তরে সজীব রহিয়াছে। শ্রদ্ধেয় ঁহীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অভিনন্দনটী পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানে গরদের ধুতি, গায়ে মুগার পাঞ্জাবী, স্কন্ধে উত্তরীয় — পরিবেশটী অতি মানানসই হইয়াছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। অভিনন্দন পাঠ পরবর্ত্তী কালে অনেক স্থানেই শুনিয়াছি। কিন্তু সেইদিনের পাঠ ছিল তুলনাহীন। এই শ্রেণীর অভিনন্দন পাঠ ও পরিবেশ জীবনে আর দেখিব না। অভিনন্দনের পর গুরুদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তৎকালে তাহা অনেকের নিকটই প্রীতিপদ হয় নাই, বুঝিতে পারিয়াছি। গুরুদেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অতি নির্ম্মম সত্য।

শান্তিনিকেতনে আর একটী মহাপুরুষের দর্শনলাভ আমাদের জীবনে ঘটিয়াছিল। তিনি গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ সহোদর পরমভক্তিভাজন ঁদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ দাশনিকদের অন্যতম। তাঁহার পুণ্যজীবন সম্পর্কে দুই-চারিটি কথা না বলিলে শান্তিনিকেতন সম্পর্কে যেন কিছুই বলা হইতেছে না। শান্তিনিকেতন আশ্রমের দক্ষিণ ধারে নীচুবাংলায় তিনি বাস করিতেন। নীচুবাংলা একটী নিভৃত নিকেতন। তাহাকেও একটী আশ্রম বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমরা এই মনীষীকে তাঁহার পরিণত বয়সেই দেখিয়াছি। গৌরবর্ণ তনু, চুল দাড়ি সব পক্ক। শরীর সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, উন্নত নাসা — সৌম্য মূর্ত্তি। ঋষিকল্প ব্যক্তি। তাঁহার সেবক হিসাবে মণীশ্বর নামীয় একজন উৎকলদেশীয় ভৃত্য ছিল। মণীশ্বর পরম সৌভাগ্যবান। সে জীবনে এহেন মহাপুরুষের সেবার অধিকারী হইয়াছিল। বড়মা পরমশ্রদ্ধেয়া হেমলতা দেবী (দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ) শ্বশুরের পরিচর্য্যার জন্য নীচু বাংলাতেই ছিলেন। প্রাণঢালা সেবা তিনি করিয়াছেন। ঁদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া নীচুবাংলার সম্মুখস্থ আমলকী বাগানে বেড়াইতেন। মণীশ্বর পেছনে। সে ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদাই এই মনীষীর অনুগামী ছিল।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে শীতকালে কখনও কখনও কূপে জলের অভাব হইত। ঐ সময় আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নীচু বাংলার কূয়োতে স্নান করিতে যাইতাম। পথে আমলকী বাগানে তাঁহাকে বেড়াইতে দেখিলে নতজানু হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতাম। সকলকেই ধরিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিতেন। একদিনের একটি বিশেষ ঘটনা আজও ভুলি নাই। তখন শীতকাল। ভোরের আলো তখনও পূর্ব্বাকাশে ফুটিয়া উঠে নাই। নীচুবাংলায় স্নানে গিয়াছি। বাংলার কাঁচের দরজায় ভিতর দিয়া তখন আলো দেখা যাইতেছিল। উঁকি মারিয়া দেখিলাম ঋষিকল্প ঁদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কি যেন লিখিতেছেন। ভৃত্য মণীশ্বর পিছনে দাঁড়ানো। তাঁহার হাতে ২/৩টী ঝরণা কলম। কূয়ো তলায় যাইয়া আমরা স্নান আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের হট্টগোলে মহাযোগীর যেন ধ্যান ভঙ্গ হইল। তারপর দেখিলাম তিনি প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বিকালে মণীশ্বরকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মণীশ্বরদা, ভোর রাত্রিতে তোমাদের ঘরে আলো জ্বলছিল দেখেছি। তুমি বাবু মশাইর (মণীশ্বর ঁদ্বিজেন্দ্রনাথকে বাবু মহাশয় বলিত) পিছনে দাঁড়ানো।" মণীশ্বর জবাবে বলিল, "গতকাল সন্ধ্যারাত থেকে বাবু মশাই কেবল লিখ্ছিলেন। কলম নিয়ে আমাকে কাছে থাক্‌তে হয়। কখন কোনটীর দরকার। রাত্তিরে আমাদের খাওয়া দাওয়াও হয়নি। আপনারা যখন কূয়োতলায় চান কচ্ছিলেন, তখন বাবু মশাই জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন, 'হ্যাঁরে, মনুশ্বর গোলমাল শুনছি কিসের।' আমি জবাবে বলিলাম, 'আশ্রম থেকে ছেলে বাবুরা কূয়োতে চান কত্তে এসেছেন।' বাবু মশাই তখন বল্লেন, হ্যাঁরে, তবে কি ভোর হ'য়ে এলো — এই যা'! মণীশ্বরের কাছে তখন জানিলাম অনেক রাতই তাঁহার এইভাবে কাটিয়া গিয়াছে। তিনি যখন লিখিতে বসেন তাঁহার আর তখন অন্য কোন জ্ঞানই থাকে না শুনিয়াছি। প্রাতে প্রাতঃরাশ করিতে বসিয়াছিলেন — সঙ্গী কয়েকটী কাঠবিড়ালী ও শালিক। হঠাৎ অপলক দৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়া আছেন যেন বাহ্যজ্ঞানহীন। কাঠবিড়ালী শালিক তাঁহার টেবিল হইতে নির্ভয়ে খাবার লইয়া যাইতেছে। এই পাওয়ার ভিতর এদের যেন একটা দাবী হইয়া গিয়াছিল। একদিন তো এক শালিক তাঁহার চক্ষের কোণে ঠোকর দিয়া বসিল। তিনি নির্ব্বিকার। সেইজন্য কোন বিরক্তি নাই। কি ঋষিতুল্য ব্যক্তির দর্শন জীবনে পাইয়াছি। লিখিতে বসিলে শান্তিনিকেতনের বহু স্মৃতি আজ মনের কোণে যেন ভীড় করিয়া তোলে। মনে হয় অনেক যেন বলার ছিল কিছুই যেন বলিতে পারিলাম না। সেই স্মৃতি অন্তরে আজও দানা বাঁধিয়া আছে তাহা জীবনে ভুলিবার নহে।

রবীন্দ্র-সান্নিধ্য ও আশ্রমস্মৃতি

শ্রী গিরিজানাথ চক্রবর্ত্তী

যতদূর মনে পড়ে ১৩১৫ বাংলার ২৬শে ফাল্গুন ত্রিপুরা হইতে শান্তিনিকেতনে যাই। বোলপুর ষ্টেশনে নামিয়া মুটে ঠিক করিলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল 'কোথায় যাবেন'? আমি বলিলাম, 'শান্তিনিকেতনে'; উত্তরে সে বলিল, 'কাঁচবাংলায়?' জানিলাম, সাধারণ লোকের নিকট শান্তিনিকেতন কাঁচবাংলা নামে পরিচিত। লাল কাঁকরের রাস্তা দিয়া ধূলিপাংশুল পথে শান্তিনিকেতনে গিয়া পৌঁছিলাম। তখন দ্বিপ্রহরের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের খবর জিজ্ঞাসা করিতেই কয়েকটা ছেলে আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিল। তিনি তাঁহার ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াই আমাকে চিনিলেন। পূর্ব্বের পত্রদ্বারা আমি সেখানে যাইতেছি, তাহা জানিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া বিদ্যালয়ের পুঁথিভুক্ত করিয়া লইলেন এবং আমার স্নান আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন সেখানে কালীমোহনবাবু ও ক্ষিতিমোহনবাবু উপস্থিত ছিলেন। আমার থাকিবার ঘর ঠিক করিয়া দিলেন লাইব্রেরী ঘরের উপরতলায়। সেই ঘর তখন 'উপরের ঘর' বলিয়া পরিচিত ছিল। ক্ষিতিমোহনবাবু কয়েকজন ছেলেকে আমার জিনিষগুলি উপরে উঠাইয়া দিবার জন্য উপদেশ করিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমিও পুরাতন হোলে আবার নূতনদের অভ্যর্থনা কোরবে।"

পরদিন শিক্ষক মহাশয় অজিতবাবু আমার মোটামুটি একটা পরীক্ষা লইলেন এবং কোন্ ক্লাসে কি পড়িব তাহা ঠিক করিয়া দিলেন। আমি ক্লাসেও যাইতে আরম্ভ করিলাম।

সপ্তাহকাল পর শরৎবাবুর নিটক বাংলা পড়িতে গেলাম। সেই ক্লাসটা বসিয়াছিল মেয়েদের বাড়ীতে, একটা বারান্দায়। তখন ক্লাসগুলি সমস্ত আশ্রমের স্থানে স্থানে গাছের তলায় বসিলেও, মেয়েদের সুবিধার জন্য কোন কোন ক্লাস বসিত মেয়েদের বাড়ীতে। আমাদের ক্লাসে তখন তিনজন ছাত্রীও ছিলেন বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেদিন প্রথম ঘন্টা শেষ হইয়া গেলে ক্লাস ছাড়িয়া অন্য ক্লাসে যাইতে আমাদের একটু বিলম্ব হইতেছিল। দেখিলাম দক্ষিণদিকে আরেকটা ঘরের বারান্দায় একটা উচ্চ আসনের উপর একটা আসন পাতা হইয়াছে। পায়ে চটীজুতা, পরিধানে সাদাধুতি, গায়ে একটা সাদা পাঞ্জাবী, চোখে এক জোড়া স্প্রিংএর সোনার চশমা একজন আসিলেন ও পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পড়িতে বসিয়াছেন কয়েকজন মহিলা ও কয়েকজন শিক্ষক। আমি তখন তাঁহাদিগকে চিনি না। যিনি পড়াইতেছিলেন তিনি একখানি বই হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন,

"বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি ত আর নাই।"

কণ্ঠস্বর কী সুমিষ্ট! এইটুকু পর্য্যন্ত পড়িয়াই বলিলেন, "কাজ থেকে এখন বিদায় নিতে হবে;" এই বলিয়াই তিনি আবার একটা ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করিলেন। এইটুকু

শুনিয়াই আমরা আমাদের অন্য ক্লাসে চলিয়া গেলাম। জীবনে এই প্রথম দেখিলাম রবীন্দ্রনাথকে। একজন সহপাঠী বলিলেন ইনিই "গুরুদেব"।

একদিন সন্ধ্যার পর দেখিলাম গুরুদেব দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। গায়ে একখানা বালাপোষ। আমি উপরে উঠিতেই শুনিলাম ছেলেদের মধ্যে আলোচনা হইতেছে, 'এই আস্তে, গুরুদেব নীচতলায় আছেন।' আমি এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়, তিনি কোথায় থাকেন?" সে উত্তর করিল, "এ কি তুমি কি তাঁকে দেখ্‌তে পাও না? তিনি ত এখানেই থাকেন। সারাদিন এদিকে সেদিকে ঘোরাফেরা করেন, এখনও এ ঘরের নীচেই দিনুবাবুর ঘরে বোসে আছেন।"

আমাদের দিনে শান্তিনিকেতনের নিয়ম ছিল, যে যে বিষয়ে যে ক্লাসের উপযুক্ত, সে কেবলমাত্র সেই বিষয়ের জন্য সেই ক্লাসে পড়িবে। মাসে মাসে পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং ফল ভাল হইলে তাহাকে সেই বিষয়ের জন্য উচ্চতর ক্লাসে তুলিয়া দেওয়া হইত। সেখানে তখন ক্লাসের বদলে বলা হইত "গ্রুপ"। প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ হইতে রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ চালিত হইত নির্দ্দিষ্ট ঘন্টার সঙ্গে সঙ্গে। প্রতিঘরে একজন ক্যাপটেন্, একজন সাব-ক্যাপটেন্ ও সর্ব্ববিদ্যালয়ের জন্য একজন 'জেনারেল ক্যাপটেন্' প্রতিমাসে ভোটদ্বারা নির্ব্বাচিত হইত। ঘন্টা বাজাইবার ভার ন্যস্ত থাকিত জেনারেল ক্যাপটেনের উপর। ঘন্টা পড়িলেই সকলকে লম্বাঘরের উত্তরের বারান্দায় লাইন করিয়া দাঁড়াইয়া নম্বর বলিতে হইত। তারপর দৈনন্দিন রুটিনমত ব্যায়াম, স্নান, উপাসনা, জলখাওয়া, ক্লাস,দ্বিপ্রহরের আহার, বিশ্রাম, আবার ক্লাস, খেলাধুলা, সায়ংকালীন উপাসনা ইত্যাদি সবকিছুই ঘন্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইত।

ক্লাস বসিত দিনে দুইবার। একবার সকালে, একবার দ্বিপ্রহরের পর বৈকাল পর্য্যন্ত গাছের তলায়। সেইজন্য প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করিয়া কম্বলের আসন থাকিত। বিকালের ক্লাসের পর জল-খাওয়া, তারপর ব্যায়াম বা খেলাধূলা। যাহারা খেলা করিত না তাহারা শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে মাঠে বেড়াইতে যাইত। কেহ কেহ ফুলবাগান সব্‌জীবাগান করিত।

উপাসনা হইত একবার সকালে এবং একবার সন্ধ্যার পর। দুইবারই লাইব্রেরীর সংলগ্ন খোলা মাঠে সমবেত স্তোত্রপাঠ হইত এবং গুরুদেব সমবেত স্তোত্রপাঠে প্রায়ই যোগ দিতেন।

বুধবার ও বৃহস্পতিবার মন্দিরে উপাসনা হইত। বুধবার বড়দের এবং বৃহস্পতিবার ছোটদের জন্য। বিদ্যালয় বুধবার বন্ধ থাকিত এবং মাসের পনরই তারিখ বিকালে ক্লাস হইত না। এই দিন গুরুদেব মাষ্টার মহাশয়দিগের সহিত বিদ্যালয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যার পর বসিত গানের ক্লাস। যাহারা গানের ক্লাসে যোগ দিত না তাহাদের জন্য গল্পের ক্লাস। গল্প করিতেন ক্ষিতিমোহনবাবু, জগদানন্দবাবু, অজিতবাবু, আরও অনেকে। ক্ষিতিমোহনবাবু বলিতেন বৌদ্ধযুগের কথা আর ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের কথা। জগদানন্দবাবু গল্প করিতেন বিজ্ঞানের, গ্রহ-নক্ষত্রের, চন্দ্রলোকের। আমরা মাঝে মাঝে রহস্য করিয়া বলিতাম, আমাদের এসব

বিশ্বাস হয় না। তিনি বিরক্ত না হইয়া হাসিয়া বলিতেন, ''বিশ্বাস না হোলেই হ'ল বুঝি।'' তিনি টেলিস্‌কোপ দিয়া আমাদিগকে গ্রহ, উপগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। হেলীর ধূমকেতু আমাদিগকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখাইয়াছিলেন। ''দি মুন এণ্ড দি আর্থ'' বইটির সব কথা তিনি আমাদের কাছে গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন, এ্যারোপ্লেন সম্বন্ধে কোথায় কি হইতেছে, প্রথম চেষ্টায় কি হইল, দ্বিতীয় চেষ্টায় কতদূর হইল হাসিয়া ও হাসাইয়া গল্প করিতেন। অজিতবাবু বলিতেন ইংরেজী বইয়ের গল্প আর কখনও কোনও মহাপুরুষদের জীবনকথা। প্রভাতবাবু বলিতেন গ্রীক জাতির ইতিহাসের কথা। এগুলি নামে গল্প কিন্তু কাজে ইতিহাস অধ্যয়ন। ছেলেদের অজ্ঞাতসারে এইসব গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালানোই ছিল গল্প বলার উদ্দেশ্য।

একদিন গুরুদেব আসিয়া ক্লাসে উপস্থিত হইলেন। সেদিন পড়াইলেন ''দি হিরোজ''। বই এর দ্বিতীয় গল্পটা সেদিন পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ক্লাস বসিয়াছিল শালতলায়। গুরুদেব এমন সুন্দর রিডিং পড়িতেন যে কেবল শুনিতেই ইচ্ছা করিত। সেইদিন ঘন্টা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বই বন্ধ করিলেন ও বলিলেন, ''আজকের মত তোমাদের পড়া এখানেই রইল, কাল তোমাদের নাকের জল চোখের জল এক কোরে ছাড়ব।'' মনে ভাবিলাম কি জানি কি হয়, কিন্তু ক্রমেই পড়া সহজ হইয়া আসিল। আমাদেরও সাহস বাড়িতে লাগিল। তিনিও খুশী হইলেন। পড়াইবার সময় তিনি অনেক গল্প করিতেন, আমরা মনে করিতাম বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়া যাইবে। কিন্তু সরস ও সংযত সীমায় গল্পগুলি দুই-তিন মিনিটেই শেষ করিয়া ফেলিতেন এবং আবার পড়া আরম্ভ করিয়া দিতেন।

একদিন আম্রকুঞ্জে একটা গাছের তলায় বসিয়া গুরুদেব তাঁহার এক ক্লাসে 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটি পড়াইতেছিলেন। আমরা আমাদের ক্লাস হইতে অন্য ক্লাসে যাইবার সময় দাঁড়াইয়া শুনিলাম। আমাদেরও যাইবার ইচ্ছা রহিত হইল, মনে করিলাম গুরুদেব কিছু না বলা পর্য্যন্ত আমরাও যাইব না। অতীতের চিত্র যেন দেখিতে পাইতেছিলাম। সত্যকাম কেমন করিয়া তাহার মায়ের কাছে গিয়াছিল, মা কেমন করিয়া তাহার আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, মহর্ষি গৌতম কেমন করিয়া সত্যকামকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া বলিলেন,

''অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুল জাত।''

সে কথা আজিও মনে জীবন্ত হইয়া আছে।

শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য গ্রীষ্মের দিনে, বর্ষায়, জ্যোৎস্নারাত্রে, মরানদীর বালুচরে, তালের বনে আমরা নানারূপে উপভোগ করিয়াছি। এক ছুটির দিনে দ্বিপ্রহরের পর বিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে, সুরুলের দিকে বেড়াইতে যাই। গিয়াছিলাম দুই দলে। এক দলে ছিল কেবল মেয়েরা, অন্য দলে ছেলেরা। মেয়েদের দলে ছিলেন অজিতবাবু, ছেলেদের দলে ছিলেন নরেনবাবু, সত্যেশ্বরবাবু। দল দুইটি বেশ দূরে দূরেই ছিল। ক্রমে যখন দুইটি দলই সমান্তরাল হইয়া পড়িল তখন দুই দলই দ্রুত হাঁটিতে আরম্ভ করিল। দুই দলেরই হাঁটিবার পর আরম্ভ হইল দৌড়। তারপর উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। আশ্চর্য্যের কথা,

মেয়েদের দলই আগে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিল। ছেলের দল পড়িয়া গেল পেছনে। যাঁহারা হারিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হাসিয়া মাঠের উপর গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

মনে আছে, একবার সকালে রাখীবন্ধন উৎসব শেষ করিয়া আমরা চলিলাম অজয় ভ্রমণে — দলপতি হইলেন ক্ষিতিমোহনবাবু। জল-খাওয়ার আয়োজন লইলাম, চিড়া ও নারিকেল। সকলেরই ইচ্ছা খাবার খাইবে অজয় নদীর বুকে বসিয়া। নদী তখন প্রায় শুষ্ক, কেবল একদিকে তার ক্ষীণ প্রবাহ। সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বে গিয়া নদীতে পৌঁছিলাম। নদীর মাঝখানে একটা বালুচরে বসিয়া আমরা নারিকেল-চিড়া খাইলাম। কেহ বালুর উপর শুইয়া পড়িল, কেহ বালি খুঁড়িতে লাগিল। জনকয়েক ক্ষিতিমোহনবাবুকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প শুনিতে ব্যস্ত। তিনি যখনই যাহা বলিতেন, শুনিতে যে কী সুন্দর লাগিত!

নদীর একদিক শুষ্ক ছিল কিন্তু তীরে উঠিতে হইলে একটা কাঁশবন পার হইয়া যাইতে হইত। গৌরদা গেলেন রাস্তা আবিষ্কারে কিন্তু ফিরিয়া আসিতেছেন না। 'গৌরদা!' কিন্তু উত্তর নাই। দুইজন চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, গৌরদার তবু উত্তর নাই। সবাই ভাবিলেন গৌরদা পথ হারাইয়াছেন। তখন সন্ধ্যাও হইয়া গিয়াছে। অবশেষে ক্ষিতিমোহন বাবু বলিলেন, "এ যে নবকুমারের অবস্থা দেখ্‌ছি।"

পুনরায় গম্ভীর ও উদাত্তকণ্ঠের উত্তরে গৌরদার ক্ষীণকণ্ঠের উত্তর আসিল, "রাস্তা পাইনে, আস্‌তে পারছিনে, কেবল চারদিকে কাঁটার গাছ।" তখন অনেকে একসঙ্গে সোরগোল তুলিয়া গৌরদাকে বলা হইল, "আমাদের শব্দ লক্ষ্য করে বরাবর চলে এসো।" শব্দ-সন্ধানী ঔষধে কাজ হইল এবং কিয়ৎক্ষণপরেই গৌরদা ফিরিয়া আসিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে একজন ক্ষিতিমোহনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাষ্টারমশাই, নবকুমারকে তো নিয়েছিল বাঘে, গৌরদার জন্যে এখানে বাঘ কোথা থেকে আস্‌বে?" ক্ষিতিমোহনবাবু বলিলেন, "আরে বাঘের নয় রে, ভয় করেছিলুম সাপের। এখানকার সাপ কেমন বিষাক্ত, তা' জানিস্‌নে।" যা হউক, সবাই ভিজা কাপড়ে রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

শান্তিনিকেতনে পড়াশুনার যেমন বিশিষ্ট পদ্ধতি ছিল, খেলাধূলা, গানবাজনা, চিত্র-নাটক, শিল্পকলারও তেমনি আদর ছিল। সেখানে আমরা প্রায়ই অভিনয় করিতাম এবং ছোটরাই করিত বেশী। ইহার বেশীর ভাগ হাস্যকৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুক। ইহার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা চলিত না। দুই একদিনের মধ্যেই অভিনয় আরম্ভ এবং শেষ হইয়া যাইত।

একবার এক অভিনয় হইল তাহার নাম "জাগরণ"। ইহা অভিনীত হইয়াছিল উপরের ক্লাসের ছেলেদের দ্বারা এবং ইহার লেখক ছিলেন শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন দাশ। ইহাও দু'একদিনেরই ব্যাপার। একদিকে লেখা হইতেছিল, আরেক দিকে দিনুবাবু তাঁহার অভিনয় দেখাইয়া দিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছিল রিহার্সেল। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল, — এক সরকার-ভক্ত জমিদারের ভয় ছিল স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে। কিন্তু একমাত্র পুত্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া দেশসেবার ব্রতই গ্রহণ করিল। নিজের বহুমূল্য সুবর্ণ অঙ্গুরীয় দান করিয়া সেবাকার্য্যের সাহায্য করিল। পিতা জানিতে পারিয়া রুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিলেন। জমিদারপুত্র সেবাব্রতের

অধিনায়ক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইল। শেষ পর্য্যন্ত জমিদারের মতের পরিবর্ত্তন হইল এবং জমিদার নিজেও গিয়া সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী তখন বলিলেন, "সত্যকে আশ্রয় করিলে একদিন না একদিন সকল মানুষেরই ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। ভুল ভাঙ্গিলেই 'জাগরণ' আসে এবং এই জাগরণই সত্য এবং মধুর।" এই অভিনয়ে সন্ন্যাসীর ভূমিকায় সরোজরঞ্জন মজুমদার, জমিদারের ভূমিকায় যোগেশচন্দ্র সেন এবং জমিদারের পুত্রের ভূমিকায় মনোরঞ্জন চৌধুরী অংশ গ্রহণ করেন।

একদিন সকালবেলা ক্লাস আরম্ভ হইবার একটু পরেই হঠাৎ জেনারেল কল্-এর ঘন্টা পড়িল, আমরা তখন ক্ষিতিমোহনবাবুর ক্লাসে পড়িতেছিলাম। অসময়ে ঘন্টা শুনিয়াই তিনি বলিলেন, "কিরে! যা শিগ্‌গির লাইনে যা।" কারণ জানিলাম, হরিচরণবাবু নাকি বড় ইন্দারাটির মধ্যে কিছু পড়িয়াছে এমন একটা শব্দ শুনিয়াছেন। কোনও ছেলে পড়িয়া গিয়াছে কিনা এই সন্দেহে এই পাগ্‌লা ঘন্টা বাজাইবার আদেশ দিয়াছেন।

এই হুঁশিয়ারী ঘন্টা শুনিয়া গুরুদেবও শান্তিনিকেতন বাড়ীর উপরতলা হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। ঘন্টার কারণ শুনিয়া বলিলেন, "কূয়োর মধ্যটা সকলের আগে দেখা উচিত, তারপর লাইন।" গৌরদা কূয়োতে নামিয়া গেলেন। দড়ি টানিয়া ধরিলেন বিশুদা, শ্যামদা আরও দুইতিনজন। অনুসন্ধানে আশঙ্কার কিছু পাওয়া গেল না। আশ্রমে কূয়োয় পড়া আশ্চর্য্যজনক ছিল না, কারণ অনেক সাহসী ছেলে লাফ দিয়া কূয়োর একদিক হইতে অন্যদিকে পার হইতে অভ্যস্ত ছিল। একবার দিনেন্দ্রনাথ দত্ত নামে একটি ছেলে হাসপাতালে কূয়োর মধ্যে পড়িয়া আঘাতও পাইয়াছিল।

এইরূপ দুঃসাহসিক কাজ সেখানে কেহ কেহ করিত। অশোক নামে বর্দ্ধমানের একটা ছেলে বিষাক্ত সাপ ধরিয়া ফেলিত। একবার একটা কোব্‌রা সাপ ধরিয়া সে শালগাছে টানাইয়া তাহার চামড়া খুলিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, "ভয় নেই, তার মুখে তামাক পাতা ঢুকিয়ে দিয়েছি।"

একদিন শোবার ঘন্টার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুরুদেব একটা ল্যাম্প হাতে লইয়া উপরে আসিয়া উঠিলেন সঙ্গে ক্ষিতিমোহনবাবু। ক্ষিতিমোহনবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিলেন যে কোন বিষয়েই নিয়মানুবর্ত্তিতাকে উপেক্ষা করা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না এবং ইহার প্রশ্রয় দিবেন না। আমরা একেবারে অবাক্। আকাশ হইতে পড়িলাম, কে কি অন্যায় করিলাম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সকলেই চুপচাপ। ক্ষিতিমোহনবাবু আসিয়া কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুহৃদকুমার সেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার মশাই, আপনি অমন করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "তোদের লাইনের শেষ ছেলেটা কতক্ষণে উঠে লাইনে যায় তাই দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।" সকলেই উঠিয়া লাইনে চলিয়া গেল।

সেবার গুরুদেব উপরের ঘরে আমাদের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। সে'সময়ে আমাদের চাল-চলতি নিজ থেকেই সংযত হইয়া অভ্যাসে আসিয়াছিল।

গুরুদেবের যেদিন ক্লাস থাকিত আমাদের ক্লাসে যাইবার আগেই তিনি আসিয়া পড়িতেন। উপাসনার পর তিনি যখন উঠিয়া যাইতেন তখন আমরা তাঁহার লেখা দেখিতাম।

সাজানো কাগজ-পত্রগুলির মধ্যে তখন শান্তিনিকেতন ও গীতাঞ্জলীর লেখাই বেশী থাকিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাণ্ডু লিপি। কোনটি একেবারে পরিষ্কার, কোনটার সংশোধন সংযোজন নানা রকম করিয়া সাজানো যেন একটা ছবির মত।

গুরুদেব যে তৎকালে কেবল নিজের লেখাই লিখিতেন তাহা নহে। অনেকের অনেক রচনার বই তিনি দেখিয়া দিতেন। একবার দেখিলাম আমাদের শিক্ষক শরৎকুমার রায়ের 'শিখজাতির ইতিহাসে'র পাণ্ডুলিপি। শরৎবাবু যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার স্বপক্ষে অপর একটি পৃষ্ঠায় গুরুদেব আরও অনেক কথা লিখিয়া সংযোজন করিলেন।

সমস্তদিন যে গুরুদেবের কতজনের কত পত্রের উত্তর লিখিতে হইত তাহার সীমা ছিল না। এর মধ্যে আবার লেখা বইয়ের প্রুফও দেখিতেন। সহায়তাকারী আর কোনো লোক ছিল না। তিনি সমস্তদিন অক্লান্তভাবে সমুদয় কাজ করিয়া যাইতেন।

মাঝে মাঝে তাঁহার কোন কবিতার ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলে তিনি তাহা খুব আনন্দের সঙ্গে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি যখন তাঁহার কবিতার ব্যাখ্যা করিতেন তখন তিনি যে এই কবিতার লেখক তাহার সঙ্গে যেন গুরুদেবের কোন সম্পর্ক থাকিত না। মনে হইত যেন তিনি অন্য কোন কবির কবিতা পড়িয়া তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছেন। "ধূপ আপনারে মিলাইতে চায় গন্ধে" কবিতাটি বুঝিবার সময় আমার এইরূপই মনে হইয়াছিল।

সকালে ৬/৪৫ মিনিটের মধ্যে ক্লাস আরম্ভ হইয়া যাইত। সকালের ক্লাসগুলি শেষ হইত বেলা এগারটার পর। আসিয়া দেখিতাম তিনি তাঁহার কাজে নিমগ্ন। আবার ক্লাস আরম্ভ হইত দেড়টার পর। দেখিতাম তিনি আগেই আসিয়া পড়িয়াছেন। বিকালের ক্লাস শেষ হইত চারিটার পর। আসিয়া দেখিতাম তিনি স্বীয় কার্য্যে নিমগ্ন। জল খাওয়ার ঘন্টা, ঘরে ফিরিবার ঘন্টা পড়িলে আসিয়া দেখিতাম তিনি সমভাবই স্বকাজে লিপ্ত। কোনও দিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি লেখাও বন্ধ করিতেছেন না, মাথাও উঠাইতেছেন না। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দেওয়া হইত। অবিরাম অবিশ্রাম তাঁহার কাজ। ইহার মধ্যেও আবার সরখানেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যাইত। সন্ধ্যা হইলেই উঠিয়া যাইতেন মন্দিরে। মন্দির হইতে প্রায়ই আসিতেন গানের ক্লাসে। এর মধ্যে সর্ব্বদাই নানা জায়গা হইতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য নানা দল আসিতেন।

আমি একবার অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিলাম। সেখানেও দেখিতাম গুরুদেব কখনও সকালে, কখনও দ্বিপ্রহরে, কখনও বৈকাল বেলায়, যখন তখন গিয়া আরোগ্যশালায় উপস্থিত হইতেন। একবার আমি ও বীরেন বসু (শিশু) কয়েকদিন যাবৎই জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলাম। গুরুদেব উদ্বিগ্ন হইয়া ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলে ডাক্তারবাবু বলিলেন বীরেন ও গিরিজার খাওয়ার ব্যবস্থা মেয়েদের হাতে দেওয়া হইয়াছে। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ও কালীমোহন ঘোষের স্ত্রী এই ভার লইয়াছিলেন। আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই আরোগ্য হইয়া উঠিলাম।

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে শান্তিনিকেতনের উপরতলা হইতে গুরুদেব দেখিতে পাইলেন, কে একটি ছোট ছেলে যেন তালগাছে উঠিয়াছে। তিনি নামিয়া আসিয়া ছোটদের ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের সব ছেলে ঘরে আছে?" তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান

করিয়া দেখা গেল সুবোধ ঘরে নাই। গুরুদেব বলিলেন, "একটা ছেলে তালগাছে উঠেছে তবে সেই হবে।" তাহাকে নামাইয়া আনিবার জন্য অনেকেই যাইতে উদ্যত হইল। গুরুদেব বলিলেন, "দাঁড়াও, তোমরা এখন আবার তাকে বাঁচাতে গিয়ে মেরো না। সে বরং ধীরে ধীরে নেবে আসুক।"

শান্তিনিকেতনে গুরদেবের সঙ্গে দেখা করিতে নানা জায়গা হইতে নানা রকমের লোক আসিতেন। কবি, সাহিত্যিক, সম্পাদক, গায়ক, বাদক আরো কত কি! একবার আসিলেন একজন কথক। উপরের ঘরে তাঁহার পাঠের ব্যবস্থা করা হইল। গুরুদেবও তাঁহার পাঠ শুনিবেন। তিনি গুরদেবকেই শুনাইতে আসিয়াছেন। তিনি আরম্ভ করিলে দক্ষযজ্ঞ। অভিনব ছিল তাঁহার বাচনভঙ্গি।

আমি ও আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে বিকালবেলা নীচু বাংলায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম একটা কাঠবিড়ালী তাঁহার গায়ের উপর দিয়া ছুটাছুটী করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে আর টেবিলের উপর কয়েকটা শালিকপাখী বসিয়া কলরব করিতেছে। টেবিলের একধারে একটি পাত্রে তাহাদের জন্য কিছু খাবার দেওয়া হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ নীরব নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায়, কলম হাতে লইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখের কাগজে একটি মস্তবড় গুণ অঙ্ক। আমাদিগকে দেখিয়া যখন পশুপাখী সকলেই চলিয়া গেল তখন তিনি যেন টের পাইলেন, সেখানে কেহ আসিয়াছেন। আমাদের দিকে চাহিতেই আমরা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু তিনি কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছেন না।

ইতিমধ্যে তপনমোহন বলিয়া উঠিলেন, "এসেছি আপনার মুখে জীবনের কথা শুন্‌তে। আমার সঙ্গীটি আপনার জীবনী লিখ্‌তে চায়।" তিনি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "না-না-না, আমার জীবনী তেমন ইন্টারেষ্টিং হবে না, রবির লাইফ লিখ্‌গে।" আমরা বলিলাম, "গুরুদেব তাঁর জীবনস্মৃতি লিখ্‌চেন।" তারপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আমাদের সময় আজকালকার মত এমন স্কুল ছিল না। আমরা লেখাপড়া শিক্ষা পেয়েছি বাড়িতেই, মহর্ষি বাড়িতেই আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।" তিনি তাঁহার জীবনী লিখিত হইবার ভয়ে কাহাকেও কিছু বলিতেন না এবং আগে জানিতে পারিলে তাঁহার ছবিও সহজে কাহাকেও তুলিতে দিতেন না। তিনি যে বাড়ীতে থাকিতেন তাহার নাম ছিল নীচু বাংলা। ইহা তখনকার আশ্রমের দক্ষিণ -পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত ছিল এবং তাঁহার ঘরটির প্রায় তিন দিকে গোলাপ ফুলের বাগান ছিল। ঐ বাগান হইতে প্রতিদিন এক সাজি গোলাপফুল তিনি গুরুদেবকে পাঠাইয়া দিতেন, ইহার ভার যে কেবল বাগানের মালীর উপর ন্যস্ত ছিল তাহা নহে। মালীকে ফুল তুলিয়া আনিয়া একবার তাঁহার সম্মুখে রাখিতে হইত। তিনি তাহাতে স্নেহদৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া দিতেন, "যা, রবিকে দিয়ে আয়।" মালী ফুলগুলি আনিয়া গুরদেবের টেবিলের উপর রাখিত। গুরুদেবের টেবিলের উপর আর একটি সাজি ছিল তাহাতে তিনি সুন্দর করিয়া ফুলগুলি সাজাইয়া রাখিতেন। একদিন — সকালবেলা শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে এই সুন্দর গোলাপ আবার কতক্ষণ পরেই মলিন হইয়া যাইবে। গুরুদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "মলিন গোলাপ যাইবে আবার নবীন গোলাপ আসিবে।"

আশ্রমস্মৃতির মধ্যে সেইবারের 'বিসর্জ্জন' অভিনয়ের কথা এখন বলি। অভিনয় শিক্ষণের ভার সেইবার লইয়াছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন সরোজকুমার মজুমদার, ভোলাদা, ত্রিগুণানন্দ রায়, পটল দা, মনোরঞ্জন চৌধুরী, মনোদা, সুধীরঞ্জন দাশ, সোমেন্দ্র দেববর্ম্মা, নরেন্দ্রচন্দ্র খাঁ, হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বীরেন বসু (শিশু বসু)। আমি নিযুক্ত হইলাম চিত্রকর, ঐকতান বাদ্যের সংগঠক ও মঞ্চনায়ক। ঐকতানে ছিলেন জগদানন্দবাবু, নারায়ণ, কাশীনাথ, দেবল, শ্যামদা ইত্যাদির সঙ্গে আমি।

চিত্রাঙ্কনে বিশুদা আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহ এবং যত্নেই আমি চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হই। বিশুদা আমাকে 'কপিরাজ' বলিয়া ডাকিতেন। আমি যে কপিরাজ শব্দের অর্থ বুঝিতাম না এরূপ নহে, ইহা যে আমার অপক্ক কবিত্বের আংশিক স্বীকৃতিদান ও জীবনের একটা প্রীতির সম্বোধনস্বরূপ ছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। আমি হাস্যমুখে এই লঘুপরিহাসটি মানিয়া লইতাম।

একদিন শাস্ত্রী মহাশয় ও হরিচরণবাবু রাত্রিতে রিহার্সেল দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন আমি নিবিষ্ট মনে চিত্র অঙ্কন করিতেছি। সীনের মধ্যে অঙ্কিত পরদাগুলি রেশমের দড়ি দিয়া বাঁধিয়া যেন ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও পরদার ভাঁজগুলি যেন বাতাসে হঠাৎ দুলিতেছে। তাঁহার সন্দেহ দুর করিবার জন্য হাত দিয়া দেখিলেন চিত্র না সত্যিকার কাপড়। অঙ্কন-কৌশল দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় এত খুশী হইলেন যে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন — "তুই এত সুন্দর আঁকতে পারিস্?"

বিপন্ন হইলাম প্রথম সীনখানা লইয়া। পরদায় আকাশ, সমুদ্র, সবই আনিলাম কিন্তু অনন্তশয্যায় অনন্তনাগের বিশাল ফণাটি আর ঠিক সাম্‌লাইতে পারিতেছিলাম না। মাথায় চক্র ও গলার হার দুইটিই দেখাইতে হইবে নতুবা তাহার মূল উপপাদ্য ফুটিবে না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইলাম। অবশেষে স্থির হইল, ঐ স্থানে বসানো হইবে একটি সরস্বতীর মূর্ত্তি, তাহা আঁকিয়া দিলেন শ্যামদা।

'বিসর্জ্জনে'র সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি নাট্যাভিনয় হইল 'মুকুট'। ইহাতে সরোজরঞ্জন যুবরাজের ভূমিকায় ও তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ইশা খার ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহার চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন মুকুল দে। চিত্রাঙ্কনে তাঁহার খ্যাতি ছিল তখনই যথেষ্ট।

অভিনয়ের দিন গুরুদেব আসিতে পারিলেন না। আসিলেন অভিনয়ের পরে। আসিবার পর অভিনয় কেমন হইয়াছে তাহা শুনিতে বসিলেন। কিছু বলিতেছিলেন না কেবল শুনিয়া যাইতেছিলেন। একটি স্থানে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল — এই জায়গাটি কিরূপ হইবে। সহসা শান্তমূর্ত্তির রূপান্তর ঘটিল। কুঞ্চিত ললাট, বিস্ফারিত নয়ন, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান মুখমণ্ডল করিয়া নক্ষত্ররায়ের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,

— বুঝেছ নক্ষত্র রায়, দেবীর আদেশ
রাজরক্ত চাই — শ্রাবণের শেষ রাত্রে।
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা — জ্যেষ্ঠ

যদি অব্যাহতি পায় — তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নেই বিচারের।

আরেক জায়গায় মন্দিরের সম্মুখের দৃশ্যে একটি গান আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, গানখানা কে গাইবে? গাহিবার কেহ উপস্থিত নাই দেখিয়া নিজেই গুন্‌গুন্ করিতেছিলেন। অনেকেই গানখানি শুনিতে চাহিল। তিনি গাহিলেন। এদিকে 'বিসর্জ্জন' পুনরায় অভিনীত হওয়ার কথা থাকিলেও অবশেষে মত বদলাইয়া গেল। মাষ্টার মহাশয়দের মধ্যে কথা উঠিল তাঁহারা অভিনয় করিবেন 'প্রায়শ্চিত্ত'। ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন অজিতবাবু, শরৎবাবু, জগদানন্দবাবু, সন্তোষবাবু, জ্ঞানবাবু, যতীনবাবু ও চুনিবাবু।

গুরুদেব সকলকে সাজাইয়া দিলেন। জগদানন্দবাবুকে সাজাইয়া গুরুদেব বলিলেন, "মানিয়েছে যেন কার্ত্তিকের মতো।" জগদানন্দবাবু অভিনয় করিতেন খুব সুন্দর। হাস্যরসের পাঠ তিনি খুব ভাল করিতেন। সকলকে সাজাইয়া দিয়া গুরুদেব নিজে গিয়া দর্শকের সঙ্গে আসনে উপবেশন করিলেন। প্রায়শ্চিত্ত নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান খুব সুন্দর হইয়াছিল।

অভিনয়ের পর এই উপলক্ষে একটা খেলাধূলা হইল। তাহাতে একটা খেলা হইল মাষ্টার মহাশয়গণ ও ছাত্রদের মধ্যে দড়ি টানাটানি। গুরুদেব মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এই নাও আমি মাঝখানে রইলুম।" সেদিনকার পুরস্কার বিতরণ হইয়াছিল মাঠেই। আমাকে একটা পুরস্কার দিতে গিয়া জিনিষটি হাতে লইয়া বলিলেন, 'এইটে তোর পক্ষে ঠিক হয় না' — বলিয়া একটা বেড্‌মিন্‌টনের র‍্যাকেট লইয়া আমার হাতে দিলেন ও বলিলেন, "তুই যেমন খেলা করিস্ না তোকে একটা খেলার জিনিষ দিলুম।" আমি প্রণাম করিয়া গ্রহণ করিলাম।

ইহার দুই একদিনের মধ্যেই আরেকটি খেলা হইল ইহার নাম বুদ্ধিপরীক্ষা প্রশ্ন ছিল দশটী—

১। একটি টেবিলের উপর দশটী জিনিষ রাখিয়া তাহা রুমাল দিয়া আবরণ করিয়া এক দুই তিন করিয়া দশ পর্য্যন্ত খুলিয়া আবার ঢাকিয়া রাখা হইল। উত্তর লিখিতে হইবে কে কি দেখিয়াছে। শুদ্ধ উত্তর কে কত আগে দিতে পারে তাহাই পরীক্ষা হইত।

২। একবার মাত্র দশটী কথা বলা হইবে, কে কয়টি কথা মনে রাখিতে পারে উত্তরে লিখিতে হইবে। দশটি কথা ছিল এইরূপ — খেজুরের রস, আমদুধ, দুধসাবু, মাস্‌তুতো ভাই, পশমের গলাবন্ধ পাল্কীবেহারা, সন্তোষবাবু, কণ্টকন্নিত, এলাহাবাদ, আহেরীটোলা।

৩। একটি সুর শুনাইয়া বলা হইল ইহা সা, আরেকটী পরদার সুর বাহির করিয়া বলা হইল ইহা কোন্ সুর।

৪। একটি মানচিত্র খুলিয়া দুইটি স্থান দেখাইয়া বলিলেন, "একস্থান হইতে আরেকটি স্থান কত ইঞ্চি দূর?"

৫। দশফুট দূরে মাটিতে একটি রেখা টানিয়া চোখ বাঁধিয়া দিয়া বলা হইল ঠিক রেখাটিতে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

৬। একটি জলভরা টব হইতে একটা বেগুন কামড়াইয়া উঠাইতে হইবে।

৭। একটি গাছের পাতা ছেঁচিয়া ন্যাক্ড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, গন্ধ শুঁকিয়া বলিতে হইবে ইহা কোন্ পাতার গন্ধ।

আর তিনটি প্রশ্ন মনে নাই। নরেন খাঁ খুব ভাল উত্তর দিয়াছিল।

ইহার পর পারিতোষিক বিতরণ করিলেন প্রতিমা দেবী। সেই পুরস্কার বিতরণ হইয়াছিল শান্তিনিকেতনের উপরতলায়। পারিতোষিক তাহাদিগকেও দেওয়া হইয়াছিল যাহারা কোনও কিছুতেই যোগ দেয় নাই বা স্বীয় কৃতিত্বের দ্বারা কোনও পারিতোষিক পায় নাই। এই পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছিল লটারী করিয়া। একটা পাত্রে ছিল পুরস্কারের জিনিষের নাম ও ব্ল্যাঙ্ক, আরেকটিতে ছিল নাম। যাহার নামে যে পুরস্কার উঠিল সে তাহা পাইল। যাহাদের নামের সঙ্গে ব্ল্যাঙ্ক উঠিয়াছিল তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্টকরা পুরস্কার ছিল, এইগুলি ব্ল্যাঙ্ক প্রাইজ। কাজেই কেহই আর পুরস্কারের বাকী রহিল না। ইহার পর রথীবাবু চিত্র ও নাটকের খরচের জন্য আমাদিগকে একশত টাকা দিয়াছিলেন।

বসন্তোৎসব শেষ হইল, চৈত্রের মাঝামাঝি। গুরুদেব পড়াইবার ভার নিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের ইতিহাস বিষয়ে। তখন ইতিহাসের পাঠ্য বই ছিল ইংরেজীতে। বইখানি হাতে লইয়া একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার কাছে পড়তে তোমাদের কোনও ভয় নেই, কেননা আমি তোমাদের কোনও পরীক্ষা করব না। তোমাদের কাছে এইটুকু অনুরোধ, আমি যা বলি তা যেন তোমরা মন দিয়ে শুনো।" এই বলিয়া তিনি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুকাল পরের কথা। শান্তিনিকেতনে 'মালিনী' অভিনীত হইবে। কাহাকে কি অংশ দেওয়া হইবে, তাহা ঠিক হইয়া গেল। মালিনীর ভূমিকায় সুধীরঞ্জন দাশ, সন্ন্যাসী — ভবানীদা, রাণী — নগেন লাহিড়ী, হাস্যরসে — দেবেন্দ্র বিশ্বাস। রিহার্সেল আরম্ভ হইল, গুরুদেব দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে যখন রাজকুমারীর প্রথম সাক্ষাৎ হইল তখন তাঁহার ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার সঙ্গে রাজকুমারীর অন্তরের সম্পর্ক, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন অভিনয়ের দিন।

নিজেই সাজাইয়া গুছাইয়া অভিনয় আরম্ভের একটু আগে ড্রপসীনের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "এখন যে নাটকের অভিনয় হবে, আমি হচ্চি তার দলপতি। সেই হিসাবেই এর ঐতিহাসিক ঘটনাটা একটু বোলে দিচ্ছি।" এই বলিয়া নাটকের মূল বিষয়বস্তুটি বিশ্লেষণ করিলেন। তারপর সমস্ত ছেলেদের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের বাহিরে আসিয়া বসিলেন। নাটক আরম্ভ হইল। সমস্ত নাটকটা এমন নিখুঁত সুন্দর হইয়াছিল যে এতদিনের কথা আজও যেন সেদিনের কথা বলিয়া মনে হইতেছে। গুরুদেব বড়দের অপেক্ষা ছোটদের আবদার শুনিতেন বেশী। খুব ছোটদের তিনি খুব বেশি ভালবাসিতেন। আশ্রমে শাস্ত্রী

মহাশয়ের এক ভাইপো ছিল তাহার নাম আজ আর মনে নাই। তবে তাহাকে সকলেই 'দুয়ানি' বলিয়া ডাকিত। একটি ছোট ছেলে আসিল, তাহার নাম ভুলু। সে দুয়ানি অপেক্ষাও বয়সে ছোট ছিল। একদিন দেখিলাম সে নির্ভয়ে নির্ভাবনায় গুরুদেবের একটা অঙ্গুলি ধরিয়া তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতেছে। ভুলু পথে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নাকি কবিতা লেখেন?"

গুরুদেব বলিলেন, "হ্যাঁ, লিখি।"

"আমিও লিখব।"

গুরুদেব বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই লিখ্‌বে।"

একবার আশ্রমে কুকুরের অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ হইল। ব্যবস্থা হইল, কুকুরগুলিকে আশ্রম হইতে দূরে কোথাও সরাইয়া দেওয়া। নির্দ্দেশমত কতকগুলি সাঁওতাল আসিয়া কুকুরগুলিকে ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সবশেষে একটি কুকুর লইয়া বড় গোল বাধিল। সে কুকুরটি ছোট ছেলেদের ছিল খুব প্রিয়। সে যে দেখিতে সুন্দর ছিল, এমন নয় — ওটা ছিল একটা দেশী কুকুর। তাহার লেজটি ছিল অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ছোট করিয়া কাটা। সেইজন্য, কুকুরটার নামকরণ হইয়াছিল 'বেড়ে'। ছেলেরা তাহাকে নানা রকমের শিক্ষা দিয়াছিল এবং এটাকে লইয়া সকলেই বেশ আমোদ পাইত। কিন্তু বেচারাকে রক্ষা করিবার উপায় কি! দু-একদিন তাহাকে নানারকম করিয়া লুকাইয়া রাখা হইল। কিন্তু কুকুরকে কে কেমন করিয়া লুকাইয়া রাখিবে? অবশেষে ছেলেরা গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার নির্ব্বাসন দন্ড মকুফ করিয়া আনিল।

লম্বাঘরের সম্মুখে ছোট ছেলেরা একটি ফুলের বাগান করিয়াছিল। গুরুদেব মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেন। একদিন বলিলেন, "যত্নের অভাবে গাছগুলি যেন হতশ্রী হয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখ্‌বে।" একসময়ে, বোধ হয়, গুরদেবের কানে এমন কথা পৌঁছিয়াছিল যে ছেলেরা খাওয়ার সময় বেশী হট্টগোল করে। ফলে দেখা গেল, একদিন তিনি আসিয়া পংক্তিভোজনে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার খাবার একটি পাতার উপর রাখা হইল। তিনি খাইতেন খুব হাল্‌কা রুটি অথবা একটি ছোট বাটিতে খুব নরম ভাত, কিছু আলুসিদ্ধ ও মিহি করিয়া কাটা আলুভাজা। তাঁহার জন্য কোনো স্থান নির্দ্দিষ্ট না রাখিবার উপদেশ ছিল। তাই আজ এখানে, কাল সেখানে বসিতেন। তাঁহার খাদ্য হইতে কিছু কিছু করিয়া দুই পাশের ছেলেদের দিতেন। একদিন গুরুদেবের দুইপাশে একদিকে বসিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও একদিকে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন তাঁহার আহার্য্য পরিবেশিত হইয়াছিল রুটি। তিনি দুই দিকেই রুটি, পাতলা আলুভাজা ও আলুসিদ্ধ বিতরণ করিলেন। চারুবাবু বলিলেন, "আপনি ত সব আমাদেরই দিয়ে দিলেন, আপনি খাবেন কি?"

গুরুদেব কোনও উত্তর করিলেন না, কেবল একটু হাসিলেন। এইরূপ নানাভাবে তিনি সকলের সঙ্গে অতি সাধারণভাবে চলিতেন।

শান্তিনিকেতনে তখন হাতে লিখিয়া একটি পত্রিকা বাহির হইত। তাহার নাম ছিল শান্তি। ইহাতে অনেকেই লিখিবার চেষ্টা করিত। ইহা সর্বপ্রথম দেওয়া হইত

গুরুদেবের হাতে, তিনি সযত্নে সবগুলি পাতাই উল্টাইয়া দেখিতেন। সেই পত্রিকা আমরা আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমীর সহপাঠী ছাত্রদের কাছেও পাঠাইয়াছি।

একবার আমার কয়েকটা গানের কথা ত্রিগুণানন্দ রায়ের মারফতে গিয়া পৌঁছিল হেমলতা দেবীর নিকট। এই কথা শুনিবামাত্র তিনি ত্রিগুণানন্দ রায়ের দ্বারাই আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমাদিগকে দেখিয়াই তিনি আসিলেন। সেখান হইতে ভিতরে আসিয়া আমাদিগকে দুই প্লেট খাবার খাইতে দিলেন। বলিলেন, 'আগে খাও, পরে তোমার গান শুনব।' আমি ইতস্তত করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি সব শুনেছি। এখন আমাকে গেয়ে শুনাও।" যাহা হোক, আমি আমার দুটী গান তাঁহাকে গাহিয়া শুনাইলাম। তিনি গান দুইটি তাঁহার খাতায় লিখিয়া রাখিলেন। আরও একদিন তিনি ডাকাইয়া আমার গান শুনিলেন। সেদিন গিয়াছিলাম আমরা তিনজন — ত্রিগুণানন্দ রায়, মনোরঞ্জন চৌধুরী ও আমি। তিনি বলিলেন, "সেদিনকার গান দুটী আমি গুরুদেবকে শুনিয়েছি। গুরুদেব বলিলেন, 'আমার এখানে যারা এসেছে, তারা সকলেই কিছু না কিছু পারে। কেউ ব্যর্থ হবে না।' তুমি বেশ মন দিয়ে পড়াশুনা কর। তোমার ভাব আছে, তুমি লিখ্‌তে পারবে।" ত্রিগুণানন্দ রায় ও মনোরঞ্জন চৌধুরীও লিখিত। আমরা কয়জন মধ্যে মধ্যে হেমলতা দেবীর নিকট যাইতাম, তিনি আমাদিগকে খুব স্নেহ করিতেন।

ইহার কয়েকদিন পর, একদিন সন্ধ্যার পর গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। আমার আগে অজিতবাবু সস্ত্রীক গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "গুরুদেবের কাছে যাচ্ছ, যাও তিনি একাই আছেন।" উপরে গিয়া দেখিলাম তিনি দক্ষিণের বারান্দায় নিবিষ্টমনে বসিয়া রহিয়াছেন। আমি একটু দাঁড়াইতেই তিনি চাহিয়া দেখিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো?"

"আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"বেশ, বেশ, বোস" বলিয়া নিকটে আরেকটা হেলান-দেওয়া কৌচে বসিতে বলিলেন। আমরা জানিতাম, তিনি বসিতে বলিলে না বসিলে বিরক্ত হইতেন। আমি তবুও ইতস্তত করিতেছি দেখিয়া আবার বলিলেন, "বোস, বোস।"

তিনি আমাদের ঘরে সর্ব্বদা থাকিতেন বলিয়া ও মাঝে মাঝে একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করিতেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গে ব্যবধানের দূরত্ব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। "আমার কিছু কিছু লিখবার ইচ্ছা হয়, লিখব কি?" গুরুদেব উত্তর করিলেন, "হাঁ, হাঁ, লিখবে বই কি, লেখাপড়ার সময় নষ্ট না করে লিখ্‌বে।"

আশ্রমে গানের ক্লাস বসিত দুই জায়গায়। এক ক্লাসে গান শিখাইতেন অজিতবাবু, অন্য ক্লাসে বসিতেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দিনেন্দ্রনাথ বসিতেন লাইব্রেরীর সম্মুখের কামরায়। গুরুদেবও বেশির ভাগ সেইখানেই বসিতেন। ওস্তাদরাও এই ঘরেই আসিয়া বসিতেন।

কেহ কেহ গুরুদেবকে গান বাজনা শুনাইতে আসিতেন, কেহ কেহ আসিতেন গুরুদেবের গানের স্বরলিপি গ্রহণের জন্য। একদিন আসিলেন বর্দ্ধমান হইতে এক উকিল। তিনি

আসিয়া বলিলেন, "আমরা দেশবিদেশে আপনার গান গেয়ে বেড়াই, এবার এখানে এসেছি আপনার গান শুন্‌তে।"

গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, "সে আমি বিলক্ষণ বুঝেছি। কিন্তু আমার এখন আর মোটেই গলা খেলে না।" তবুও গুণ গুণ করিয়া গাহিলেন।

আরেকবার আশ্রমে আসিলেন সুরেশ চক্রবর্ত্তী। সঙ্গে আনিলেন একটা সুরবাহার — একটু নতুন রকমের যন্ত্র। তিনি আসিয়াছেন গুরুদেবের গানের স্বরলিপি লইবার জন্য। গুরুদেব গাইলেন আর তিনি স্বরলিপি তুলিয়া লইলেন। গুরুদেব "নিশার স্বপন ছুটল রে" ইত্যাদি ৩/৪টি গান গাইলেন। "প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে" এই গানটার সম্‌ লইয়া এক তর্ক বাধিয়া গেল সুরেশবাবু আর দিনুবাবুতে। গুরুদেব "রোস, রোস" বলিয়া আঙ্গুলের কর গুণিয়া, তাল ও ফাঁক্‌ দিয়া গানটা বিলম্বিত লয়ে গাইতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "তৃতীয় তালের দুই মাত্রা বাদ দিয়ে গানটা আরম্ভ করলেই 'জাগে'তে এসে সম্‌ পড়বে।" শেষে তাহাই ঠিক হইল।

একদিন দেখিলাম তিনি গান শিখাইতেছেন শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশকে। তাঁহাকে দেখিয়া আমিও গিয়া যোগ দিলাম। গানখানি ছিল,

"আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।"

তিনি গানখানি শিখাইয়া যেন রক্ষা পাইলেন। গান লিখিয়াই, তিনি তাহাতে সুর সংযোজন করিতেন। যতক্ষণ সুরটী তিনি অন্য কোথাও না রাখিতে পারিতেন, ততক্ষণ যেন আর শান্তি পাইতেন না। দিনুবাবু ছিলেন তাঁহার সুরের ভাণ্ডারী। সেবার নববর্ষের ভাষণের পর বেলা প্রায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে। সূর্যের আলোক মন্দিরের নানা রং-এর কাঁচের মধ্য দিয়া আসিয়া গুরুদেবের উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের উপর পতিত হইয়া ঝলমল করিতেছে। গানে সুরে এক হইয়া বাহিরে ভিতরে এক অপূর্ব্ব রূপের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে!

আর একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে গুরুদেব শান্তিনিকেতনের উপরতলায় পায়চারী করিতেছিলেন ও গান গাহিতেছিলেন। আমরা আমাদের ঘর হইতে শুনিতে পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। কয়েকজন সাহস করিয়া গিয়া উপরে উঠিলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন মনোরঞ্জনদা, অতুলদা ও ত্রিগুণানন্দ রায়। আমাদিগকে দেখিয়া তিনিও বসিলেন এবং আমাদিগকেও বসিতে আদেশ করিলেন — গানের কথা আমরা কিন্তু বলিতেও সাহস পাইলাম না — তিনিও কিছু বলিলেন না।

সমকালীন আশ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই আজ ইহলোকে নাই। সবার আগে মনে পড়ে সরোজদার (ভোলাদা) কথা। তাঁর মৃত্যু হইয়াছিল ১৩১৭ বাংলার ৯ই ভাদ্র। গভীর রাত্রিতে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে ভোলাদা চলিয়া গেলেন। আশ্রম তখন সুষুপ্ত, কয়েকজন ছাড়া কেহই কিছু জানিতে পারিল না।

শুভমস্তু [illegible]

[illegible] মহারাজ শ্রী[illegible] বাহাদুর [illegible] বরাবরেষু।

বিপুল সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন —

মহারাজ,

সম্প্রতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা মহারাজকে নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, যদি ধৃষ্টতা হয় ক্ষমা করিবেন।

রাজকার্য্যে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা নানা লোকের নিকট হইতে আমার কর্ণগোচর হয়। আমি দূরে থাকি, আমার পক্ষে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করা কঠিন — অথচ আমি উদাসীন থাকিতে পারি না। আমার বুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হয়, মহারাজের হিতকল্পে তাহা যদি না জানাই তবে আমার পক্ষে অধর্ম্ম হইবে।

বর্ত্তমানে যুবরাজের প্রস্তাব এ রাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম আলোচ্য বিষয় হইয়াছে।

৩৫। মহারাজ রাধাকিশোরকে লিখিত পত্র

খ

এ সম্বন্ধে সকল পক্ষের তর্কই আমাকে শুনিতে হইয়াছে।

এক পক্ষে শুনিয়াছি, এক্ষেত্রে গবর্মেন্টের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ কালে সুদের জন্য একেবারে জোর করিয়া ফেলাই শ্রেয়স্কর। সে প্রস্তাব অনুসারে গবর্মেন্টের নির্দ্দিষ্ট একজন ইংরেজ পরিদর্শকের হস্তে মহাজনের জমীজমা শাসন ও তত্ত্বাবধানের আবশ্যক নিয়মাদির ভার অর্পিত হইবে।

অপর পক্ষে শুনা যায় — সুদসমেত ঋণের, পাওনাদারদের সহিত রফায় কিস্তিবন্দীর দ্বারা দেনা শোধ করা অসম্ভব নহে। বিশেষত পাওনাদারগণ উচ্চহারে সুদের দাবী করিতে পারে এমন সুযোগ তাহাদের হস্তে নাই।

আমি যে একান্ত পরস্পর-বিরোধী

জনসম্প্রতিমাত্র সুবিধার মত স্থির করিতে পারি, এরূপ সাহস আমার নাই। মহারাজ নিঃসন্দেহই সকল কথা অবগত হইয়াছেন। আমার কেবল অনুমান-মাত্র সম্বল — তথাপি তৎসত্ত্বেও যদি মহারাজের কাজে লাগে এই অনুমানও উপরে নির্ভর করিয়া সকল কথা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গোড়াতেই ইংরেজের দিকে ঝুঁকিবার ভয় হয়। ঐ জাতের হস্তে নিশ্চিন্তমনে আত্মসমর্পণ করা কোনো মতেই চলে না, অবশ্য যদি নিতান্ত বাধ্য হইতে হয়, তবে কথাই নাই।

যাঁহারা মহারাজের কর্তৃক এতদিন সম্যক পুষ্ট তাঁহারাও এক যোগে সমস্ত দেশ লোকের জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারা এখন প্রতিকূলতায়

ঘ

এমন সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারিতেছি
বলিয়া বোধ হইতেছে না। অন্য আইনকে
গ্রাহ্য না করিলে মতবাদ মাত্রে উহাকে
যাহা খুশি দিতে হইবে ইহা কি সত্য?
যদি যথা নিয়ম বিজ্ঞপ্তি করিয়া
জুলাই ৫/৬ তারিখের মধ্যে গ্রাহ্য করা
যায় তবে সাধারণতঃ শাস্তি হইবে
না হইলে কি বিশেষ সত্য? শাস্তি না
হইলে অন্যদের অন্য কোনো উপায়
আছে কি? এইরূপ অবস্থায়
স্কুলের দ্বারা স্থান গ্রাহ্য করিলে
যদি সরকারের কোনো কোনো
কর্মচারীর সাহায্যের বিশেষ হইতে
কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশা থাকে
তবে এরূপ সাহায্যের পরামর্শ মধ্যে
অসঙ্গতির কারণ আছে কি না
তাহাও বিচার্য। সেক্রেটারি যে কারণে

বলিলাম তাহা সম্পূর্ণ অমূলক হইতে পারে — তাহার হেতু সন্দেহ করিবার যোগ্য কোনোই প্রমাণ আমার সম্মুখে নাই — কিন্তু রাজকার্যের বৃহৎ ব্যাপারে অনুমানের সন্দেহও আলোচনার যোগ্য — ইহাতে যদি নিরপরাধের প্রতি অবিচার করিতে বাধ্য হই তবে আমি রাজনীতি অনুসারে ক্ষমা আশা করিব।

কিন্তু যখন লোকে কথা জোর করিয়া বলিবার মত অবস্থা আমার নহে তখন আমি একান্ত আকুলভাবে এই কথা মাত্র বলিব যে মহারাজের রাজ্য পরিচালনার সাহায্য করে এমন একজন অর্থনীতিজ্ঞ কর্মকুশল দূরদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, উৎসাহী লোককে

নিযুক্ত করেন যাহার বুদ্ধি ও কর্তব্য-
জ্ঞানের প্রতি মহারাজ সম্পূর্ণভাবে
নির্ভর করিতে পারেন। তাহার প্রতি
যথাযোগ্য কর্তৃত্বভার দিতে হইবে।
নানা পক্ষের নানা মত নানা স্বার্থের
দ্বারা রাজ্যের মঙ্গলকে প্রতিপদে
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে দিবেন না। মহারাজের
হৃদয় নিতান্ত কোমল, এই জন্যই
নিজের অসামর্থ্য হইতে নিজের
ঔদার্য্য হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে
একজন সুদক্ষ মন্ত্রীর সুদৃঢ় সহায়তা
মহারাজের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক
আমি দেখিতে পাইতেছি নানা
পক্ষের নানা বিরোধ ও সংঘাত মহা-
রাজকে নিয়তই উৎপীড়িত করিতেছে

আশঙ্কাও হইতেছে পাছে ক্রমশঃ
শরীর খারাপ হইয়া পড়ে ও মহারাজকে
কোনো প্রকার অসম্মানের মধ্যে পতিত
হইয়া পড়িতে হয়। পরের হস্তে একদিন
হার মানার চেয়ে নিজের সময়ে
নিজেকে সুকৌশলভাবে মুক্ত করা কর্তব্য।
মহারাজের শরীর দীর্ঘকাল হইতে
অসুস্থ হইতেছে দেখিয়া আমার মন
উদ্বিগ্ন হইতেছে। ঈশ্বর আপনাকে
নিরাময় দীর্ঘায়ু করুন এই আমি
একান্ত মনে প্রার্থনা করি। নানা
লোকের পরামর্শে- বিক্ষিপ্তচিত্ত না
হইয়া যে কোনো একজন ব্যক্তির
উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে
পারিলে মহারাজ শান্তি ও স্বাস্থ্য
লাভ করিতে পারিবেন বোধহয়

আমার বিশ্বাস। আমি স্বয়ং যাঁহার
নাম করিয়াছিলাম তাঁহাকেই পাইবার
জন্যই যে অনুরোধ করিতেছি, তাহা নহে, আমার
উদ্দেশ্য এই যে একজনের প্রতি
অযথা কর্তৃত্বভার না দিলে অনেক
সাংঘাতিক অনর্থপাত/ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে
থাকিবে। বর্ত্তমানে মহারাজের মন্ত্রী
নিম্নতর কর্মচারী প্রভৃতির দ্বারা কেবলই
অর্থ ও সম্মানহানি হইতেছে — ইহাতে
মহারাজেরই নাম ... কলঙ্কিত হইতেছে,
যদি ইঁহাকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন তবে
মহারাজের অবিচলিত রাজশক্তির
দ্বারা মহারাজই ইঁহাকে নিয়ত সুদৃঢ়
রাখিবেন। সুতরাং অবশেষে উভয়েরই
বৃদ্ধিই পাইবে — অনুরূপ সুযোগে এই সানু-
নয় কালে বর্ত্তমান বিভাগ মোহের সমস্ত
প্রাদুর্ভাব সংশোধন করিবেন — আমার আশা
আমি যাহা বলিলাম উপযুক্তরূপে পালিত হইলে
হইয়াছে। একান্ত অনুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সম্মানভাজনেষু

মহারাজ, বুদ্ধিমন্ত সিংহকে আশ্রমে পাঠাইয়াছেন দেখিয়া আমরা সকলেই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। ছেলেরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার নিকট নাচ শিখিতেছে। আমাদের মেয়েরাও নাচ। ও মণিপুরী শিল্পকর্ম্ম শিখিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। মহারাজ যদি বুদ্ধিমন্ত সিংহের স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবার আদেশ দেন তবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। আমাদের দেশের ভদ্র ঘরের মেয়েরা কাপড় বোনা প্রভৃতি কাজ শিখিয়া যাহাতে জীবিকা অর্জ্জনক্ষম হয় ইহাই আমাদের ইচ্ছা। এই জন্য আসাম হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী এখানকার মেয়েদের তাঁতের কাজ শিখাইতেছে। কিন্তু শিল্পকাজ আমি মণিপুরী মেয়েদের যে কাজ দেখিয়াছি তাহা ইহার চেয়ে ভাল। আমি বুদ্ধিমন্তের নিকট এ সম্বন্ধে প্রস্তাব জানাইয়াছি। সে মহারাজের সম্মতি পাইলেই তাহার স্ত্রীকে আনাইয়া এখানকার মহিলাদিগকে মণিপুরী নাচ ও শিল্পকর্ম্ম শিখাইবার ভারগ্রহণ করিতে পারিবে এরূপ বলিয়াছে। এই জন্য এসম্বন্ধে মহারাজের সম্মতি ও আদেশের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। ভগবান মহারাজের কল্যাণ করুন এই কামনা করি। ইতি ১৯ মাঘ ১৩২৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরকে লিখিত পত্র

৩৭। ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটের মূলনীতি নির্দ্ধারণ সম্পর্কে মহারাজ রাধাকিশোরের নিকট কবির নোট

ক

খ

গ

ঘ

(পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

করিয়াছিলাম যে, বিশ্বভারতীর হিতসাধনের
জন্য সমস্ত সময়োচিত দায়িত্বের কর্তব্যে
আমাকে নিযুক্ত হইতে হইবে।

কিন্তু এখন আমার দিন কর্মের
সময় নহে। এখন সংসারের সমস্ত কাজ
গুটাইয়া লইবার জন্য মন প্রায়ই ব্যাকুল
হয়। ঠিক এই সময়ে বিবিধ উৎপাতগুলি
তাহার রাজসভার ব্যাপারে উদ্বেগে কেবল
আমাকে উৎপাতের জন্যও আবর্তন
ঘটাইলেন তাহা বিচিত্র কাহিনী। এই
ক্ষেত্রে পথ থেকে দুর্গম জোয়ারে কণ্টকাকীর্ণ।
এই পথে যে যে বেলিয়াঘাটার উৎপাত করায়
বলে তাহার সঙ্গে আমাকেও পাইতে
হইল।

প্রথমত ঘোরতর সংশয়ের মধ্যে আমাকে
দিশাহারা হইয়া দাঁড়াইতে হইল।
মহারাজ যে কোন দিক হইতে
কি সঙ্কটে পড়িয়াছেন তাহা সম্যকরূপে

৩৮। মহারাজ রাধাকিশোরকে লিখিত কবির একটি পত্রাংশ (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

ওঁ

মংপু

কল্যাণীয়েষু

তোমার পিতৃদেবের
মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হলুম।
কিন্তু যাঁরা সংসারে শান্তি পেয়েছেন
মৃত্যুর শোচনীয়তা তাঁরা দূর করে
দিয়ে যান — তাঁদের জীবনের
সফলতা মৃত্যুতে পরিপূর্ণ হয়।
এই কথা স্মরণ করেই তোমরা
সান্ত্বনা লাভ করো এই আমি
কামনা করি। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর।
১৯৩৮

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৯। ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পিতৃবিয়োগে সমবেদনা জ্ঞাপন

৪০। শ্রী ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মাকে লিখিত পত্র



SANTINIKETAN
BENGAL

কল্যাণীয়েষু

ধীরেন, এবার বসন্ত উৎসবের অভিনয়ে তোর এসরাজের ছড়ির কথাটা বার বার মনে এসেছিল। তোরাই ত এতদিন এখানে ছিলি বসন্তরাজের দলবল, তোরা এখান থেকে দূরে চলে গেলে ঋতুদের মঞ্জরী শুকিয়ে ঝরবে। রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন হয়েছিল প্রাসাদ থেকে বনে, তোর নির্ব্বাসন হল বন থেকে প্রাসাদে। কিন্তু তোর কতদিনের মেয়াদ? চোদ্দবছর হলে ত চলবেনা। তোকে এমন করে বন্দী করে নিয়ে গেলে লালুকর্ত্তার সঙ্গে আমাদের লড়াই বাধবে

এখানে তোদের থাকবার কি রকম
ব্যবস্থা হতে পারবে ছুটির পরে এসে
সেইটে দেখে যাস। বাবুও সুদ্ধ যদি
একবার এসে দেখে যান ত ভালো হয়।

বৈশাখের প্রায় মাঝামাঝি হল
কিন্তু একটুও গরম পড়ে নি। প্রায়ই
থেকে থেকে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে
আসচে, আর "ঝরু ঝরু পুরবৈয়াঁ।"
আমি ঠিক করেচি সমস্ত ছুটি এইখানেই
কাটাব।

তোর নববধূকে আমি কখনো চক্ষে
দেখিনি এই কথা ওকে স্মরণ করিয়ে
দিস — আর তোরা উভয়ে আমার

গ

আশীর্বাদ গ্রহণ করিস। ইতি ১০ বৈশাখ
১৩৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Presidency Coll
5.4.1914

প্রিয় মহিম বাবু

[illegible]

শ্রী জগদীশচন্দ্র

৪১। জগদীশচন্দ্র বসুর পত্র ঃ কর্ণেল মহিম ঠাকুরকে লিখিত

গুরুদেব আসিলেন। হরিবাবু, জগদানন্দবাবু, ডাক্তারবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু, সন্তোষবাবু সবাই। গুরুদেব সরোজদার হাতখানি ধরিয়াই বাহিরে চলিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন — সব শেষ হইয়া গেছে।

পরদিন আশ্রমের ছেলেরা শুনিতে পাইল, ভোলাদার মৃত্যু হইয়াছে। দলে দলে গিয়া ভোলাদার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থান দেখিয়া আসিতে লাগিল। শ্যামদা দাহস্থানের উপর একটি গোলাপ ফুল রাখিয়া আসিলেন।

কিছুদিন পর ভোলাদার রচনাগুলি সংগ্রহ করিয়া সরোজ-স্মৃতি নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করা হইয়াছিল।

একে একে মনোদা, ত্রিগুণানন্দ রায়, সোমেনদা, হীরালাল ব্যানার্জ্জী, সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, চলিয়া গেলেন। আজ যাঁহারা আছেন তাঁহারাও স্মৃতি-বিস্মৃতি বিজড়িত হইয়া পরস্পর হইতে কে কোথায় বিচ্ছিন্ন।

আমার জীবনের আশা আদর্শের পথে মনোদা, ভোলাদা ও পটলদা ছিলেন প্রধান ও প্রথম সহায়ক। একবার গুরুদেব শিলাইদহ হইতে আসিবার পর শুনিলাম তিনি একখানি নূতন নাটক লিখিয়া আনিয়াছেন। একদিন তাহা সকলকে পড়িয়া শুনাইবেন। শুনাইবার তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইল।

আমরা রাত্রির আহার শেষ করিয়া তাঁহার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গিয়া দেখি, তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। সকলের শান্তভাবে বসা হইয়া গেলে, তিনি একবার সকলের দিকে চাহিলেন, তাহার পর খাতাখানি হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পড়িতে লাগিলেন এমন সুন্দর করিয়া যেন মনে হইতেছিল, একজনেই একটি পূর্ণাঙ্গ অভিনয় করিতেছেন।

সেই বৎসর ২৫শে বৈশাখ গুরুদেবের 'জুবিলি জন্মোৎসব' হইবে। অনেকেরই সেই সময় শান্তিনিকেতনে আসিবার কথা ছিল। আমার পিতৃদেব ঁকাশীতে অসুস্থ অবস্থায় আছেন, পত্রখানা তাঁহাকে দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিলাম।

পিতার শেষ অবস্থায় তিনি আমাকে আর তাঁহার নিকট হইতে অন্যত্র থাকিতে দিলেন না বলিয়া আমার শান্তিনিকেতনের আশ্রম-জীবন এখানেই চিরদিনের জন্য শেষ হইয়া গেল।

পিতৃদেব ঁকাশীলাভ করিলেন। ইহার একমাস পরই আমার মাতাঠাকুরাণীরও স্বর্গলাভ হইল। এই সংবাদ গুরুদেবকে আমি পত্রদ্বারা জানাইলে তিনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। তিনি আমাকে কত স্নেহ করিতেন তাঁহার এই শেষ নিদর্শনটিই আমার এ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন —

"অকস্মাৎ তোমার পিতৃমাতৃবিয়োগের নিদারুণ সংবাদে ব্যথিত হইলাম। ঈশ্বর তোমার সংসারে শান্তি ও তোমার সন্তপ্ত চিত্তে সান্ত্বনা বিধান করুন, এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ৭ ভাদ্র ১৩২১"

আশ্রম-স্মৃতি

শ্রীসত্যরঞ্জন বসু

পাঠশালা বা ইস্কুলের যখন কোনো আস্বাদন পাই নাই — এমনই এক সময়ে বোলপুর যাই। খুব সম্ভবতঃ ১৩১০ সালে গরমের ছুটির পর একদিন সন্ধ্যার সময় বোলপুর ষ্টেশনে নামি। সঙ্গে ছিলেন আমার এক কাকা, তিনি আগরতলা থেকেই আমাকে নিয়ে যান।

অভিজ্ঞতার সূত্রপাত প্রথম থেকেই। আমাদের জন্যে একখানা গরুর গাড়ী তৈরী ছিল। গো-যানে চড়ে পথ চলা — জীবনে প্রথম। যে পথে চলেছি তার দিশা না পাওয়ায় বালক মনকে একটু যে সন্ত্রস্ত করেছিলো তাতে সন্দেহ নাই। তাই ছাউনীর মুখে বসে দু'পাশ দেখবার তীব্র চেষ্টা চলছিলো। কিন্তু মাঝে মাঝে মিটমিটে আলোর রশ্মি দু'একটি দোকান ঘরকেই দেখিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্লথগতি যানের ঝাকুনী যেন আমাকে সজাগ করে দিচ্ছিলো — কেমন রাস্তায় যাচ্ছি। গাঢ় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ীখানা যেন কায়ক্লেশে রাস্তা করে যাচ্ছে। অন্ধকার নির্জ্জন রাস্তা, দু'পাশে জনমানবহীন প্রান্তর, গাড়ীর বিচিত্র শব্দ — স্বপ্নপুরীর পথের ভীতি ও ঔৎসুক্য মনে জেগে উঠ্‌লো। কিছুক্ষণ চলার পর 'গাঁয়ে এসেছি — ভুবনডাঙ্গা' গাড়োয়ানের কথায় আমার চিন্তাধারায় বাধা পেয়ে যেন জেগে উঠ্‌লাম। কয়েকখানা চালা ঘর চোখে পড়লো — একটু এগিয়ে বাঁ দিকে লম্বা জলা। সেই জলাধারকে লম্বা লম্বা বিরাট জমাট অন্ধকার যেন পাহারা দিচ্ছে। গাড়োয়ান বল্লে — 'ওটা বাঁধ, পাড়ে কতগুলি বড় বড় তাল গাছ।' এই বাঁধ আমাদের আশ্রমিক জীবনের অনেক স্মৃতিবিজড়িত। স্বল্পজল হলেও বিস্তৃতি নেহাৎ কম নয়। এই বাঁধেই 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' নৌকা দু'খানা ভাসানো থাক্‌তো — আমাদের নৌবিহারের আশ্রয়।

রাস্তায় গাছপালার দেখাই নাই। কিন্তু অল্প পরেই বাঁ দিকে মোড় ফিরে গাছের নিবিড় ছায়ায় লম্বা এক ঘরের পাশে গাড়ী থাম্‌লো। মনে কী রূপ বহন করছিলাম স্মরণ নেই, কিন্তু চারিদিক্‌কার নিস্তব্ধতা মনের সরসতাকে স্তিমিত করে দিল। সাম্‌নেই খড়ের ছাউনী — ছোট্ট মাটির ঘর — কয়েকজন বয়স্ক লোক আমাকে আদর করে টেনে নিলেন। বুঝ্‌লাম এঁদের স্নেহের আবেষ্টন আমার এখানকার আশ্রয়। গড় হয়ে প্রত্যেককে প্রণাম করে নিজে যেন একটু স্বস্তিলাভ করলাম।

আমার জিনিষপত্তর — ছোট একটা ট্রাঙ্ক ও বিছানা। আমার সংসারের মধ্যে — চার পাঁচখানা কাপড়, দুই তিনটি টেনিস সার্ট, দুটি ফতুয়া, একখানা তোষক, একটা বালিশ, দুইটি চাদর, একখানা সতরঞ্চ, থালা, গেলাস ও ঘটি। পড়ার বই বোধ হয় একখানা ছিল। শেষের দিকে জেনেছিলাম — এসব আশ্রমের নির্দ্দেশেই বাড়ী থেকে দেওয়া হয়েছিল। বাহুল্যবর্জ্জিত — কেবল নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু আনবার নিয়ম।

শেষ রাত্রিতে ঘন্টার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। টের পেলাম ছেলেদের আনাগোনা। যে গম্ভীর নিস্তব্ধতা আমাকে প্রথম কাতর করেছিল, — অরুণোদয়ে পাখীর কাকলীতে

যেন সে ভাব একটু একটু করে মুছে যাচ্ছিল। তারপর প্রভাতী আলো আশ্রমের চারদিকের অবারিত প্রান্তরে আমার বাধাহীন দৃষ্টিকে অভিসিঞ্চিত করলো। আশ্রমের স্নিগ্ধ শ্যামলিমা যেন আমাকে দু'হাত বাড়িয়ে টেনে নিল। আশ্রমজননীর কোমল স্পর্শে নিজে ধন্য হয়ে গেলাম। আশ্রমে সেই প্রথম প্রভাতের আবাহন প্রাণে আজও কত তৃপ্তি দিচ্ছে।

জান্‌তেও পারলুম না কেমন করে কোন্ সময়ে সকলের সঙ্গে জুটে গেলাম। দৈনন্দিন জীবন অন্য ছেলেদের মত আমারও আরম্ভ হয়ে গেল। আশ্রমে নেমে যে পায়ের জুতো খুলেছিলাম — তার সন্ধান — আর যে কয় বৎসর আশ্রমে বাস করার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার মধ্যে নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে ওঠে নাই।

লম্বা টালীর ঘরে আমাদের বাস। ঘরের পূব ও পশ্চিমের অংশে দু'টি প্রকোষ্ঠ — উত্তর ও দক্ষিণের ঘরের সমান দু'টি বারান্দা। উত্তরের বারান্দার সংলগ্ন বোধ হয় গাবগাছে ঘড়ির ঘন্টা ঝুলানো — সেটি বাজ্‌লে সকলকে একসঙ্গে জড় হ'তে হোতো। আর একটি ছিল, হাতে করে ক্যাপটেন বাজাতেন — প্রতি কর্ম্মে নিয়োজন-নির্দ্দেশ তা' থেকে আমরা পেতাম।

দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী — ঘুম থেকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠে শৌচ (আমাদের ভাষায় — 'মাঠে যাওয়া'), স্বল্প ব্যায়াম, বিছানা রৌদ্রে ফেলা, স্নান উপাসনা (সমবেত), জল খাওয়া ও পাঠ — সকলের দিকে প্রতিটি ঘন্টার সঙ্গে আমাদের সম্পাদন করে যেতে হতো। আবার পাঠান্তে হাতমুখ ধুয়ে দুপুরের খাওয়া। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার পাঠে যোগদান। দুপুরে বিশ্রামের সময় ঘুমানো চল্‌তো না। বেলা চারটে পর্য্যন্ত পাঠ চল্‌তো। তারপর জলখাবার খেয়ে — খেলা অথবা বাগান করা। কোনো কোনো দিন খেলার বদলে অনেককে বই বাঁধানো বা কাপড় বুনোনো শিখ্‌তে হোতো। আজও আমার পায়ে দাগ আছে — কাপড় বুনতে গিয়ে, পায়ে টানা ঠিক মত না হওয়ায়,সুতো ছিঁড়ে মাকু পড়ে পায়ে বিঁধে গিয়েছিলো। এই চিহ্নটুকু সেই স্মৃতি বহন করছে। সন্ধ্যায় উপাসনান্তে — গান শেখা, গল্প শোনা। মাঝে মাঝে উন্মুক্ত আকাশতলে বসে জগদানন্দবাবুর কাছে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা শোনা। আহারান্তে রাত ৯টায় শোয়া।

টালীর ঘরের নাম পরে হয়েছে 'আদি কুটীর'। তার মানে ছেলেদের থাকার এইটেই মাত্র ঘর ছিল। এর সংলগ্ন পশ্চিমে ছোট একতলা দালান — লাইব্রেরী ও লেবরেটরী। দক্ষিণে রাস্তা — কাঁকর-ঢালা, সঙ্গে শালবীথি। শালবীথির দক্ষিণে পুকুরের মত বড় গর্ত্ত (সম্ভবতঃ এখান থেকে মাটি তুলে টালীর ঘরের মেঝে তৈরী হয়েছিল) — এরই সংলগ্ন খেলার মাঠ। এই গেল আশ্রমের দক্ষিণ সীমানা। লাইব্রেরীর সংলগ্ন উত্তরে রান্না ও খাবার ঘর। আগে যে ছোট্ট মাটির ঘর বলেছি — নাম মৃন্ময় কুটীর — সেটি আদি কুটীরের উত্তরে। এই দুই ঘরের প্রায় মাঝামাঝি — কূয়ো ও চৌবাচ্চা। আমাদের এই সব ঘরের বাইরে উত্তর-পশ্চিম কোণে ছাতিম-তলা। উত্তর-পূব কোণায় দোতলা শান্তিনিকেতন দালান। আর একটু উত্তরে মন্দির। এই ছিল তখনকার ঘরবাড়ীর অবস্থা। সীমানার ভেতরে আমলকী, আম গাছের সার ছিল অনেক।

আশ্রমের ছায়া শীতলতার বাইরে চারিদিকেই অবারিত মাঠ — শ্যামলিমার নামগন্ধ নাই। মাঝে মাঝে বুনো খেজুরের ছোট ছোট ঝোপ। এগুলোর পেছনে বসেই আমরা 'মাঠে যাওয়া'র কাজ সেরে নিতুম। প্রথম দিন তো মাঠে যাওয়ার কথা বুঝে উঠ্‌তে পারি নাই। তারপর রপ্ত হয়ে গেল। আমাদের কাজ সারার অনতিকাল পরেই সেই অবতারের বংশধরদের আবির্ভাব হোতো — যারা সব পরিষ্কার করে নিজেরাই তৃপ্তি পেত। এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যাপারটি আমার মত প্রত্যেক নবাগতকে বিস্ময়াবিষ্ট করতো সত্যি, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আর ভীতি থাক্‌তো না। মাটি সব দিক সমতল নয় — এক একদিকে বেশ ঢালু।

বোলপুর থেকে যে রাস্তায় এসেছিলাম — সেটি আশ্রমকে বেষ্টন করে উত্তর দিক ঘুরে পশ্চিমে চলে গেছে। উঁচু নীচু মাঠে বৃষ্টির জলধারা মাটি কেটে নেমে গেছে। তাতে মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঢিবি সৃষ্টি হয়েছে। টুক্‌রো টুক্‌রো পাথর, নুড়ি আর কাঁকড়ে সব ঢাকা। জলের ধারায় যেন ছোট্ট ছোট্ট নদী সৃষ্টি হয় বৃষ্টি নাম্‌লে। একেই আমরা 'খোয়াই' বলে থাকি। খোয়াই এর মাঝে মাঝে জল পাওয়া যেত — বিশেষ বালু খুঁড়লেই — চারিদিকই ঊষর — গাছপালার বালাই নাই। জলের আশে পাশে একপ্রকার কীট-ভুক্ ছোট ছোট ঝোপে তৃণজাতীয় উদ্ভিদের জন্ম। এদের ছোট ছোট ছড়ানো পাতায় আঠাজাতীয় জলীয় পদার্থেই ছোট ছোট পোকা বোধহয় মধু লোভে আকৃষ্ট হয়ে আট্‌কা পড়ে মারা যেত। আমাদের শিশুমনে, এই উদ্ভিদগুলিকে পোকা ধরায় সক্রিয় হতে দেখে, এক অভিনব অনুভূতির দ্যোতনা হোত। পোকা একবার কাছাকাছি এগুলেই আর নিস্তার ছিল না। আমরা চেষ্টা করেও তাদের বাঁচাতে সক্ষম হইনি। এই উদ্ভিদ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জগদানন্দবাবুর কাছেই শুনেছি — উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের। বর্ষায় খোয়াই-এর রূপ অন্যধরনের। খরস্রোত অসংখ্য, জলধারায় গা ভাসিয়ে না-দিয়েছে, এমন ছেলে কমই ছিল। সে কী উন্মাদনা, সে কী আনন্দ।

পোকা — আর একরকম — শীতের সময় আশ্রমেই শিশির-ভেজা জমিতে ঘুরে বেড়াতো। রং লাল — পশমী নয়, পরিষ্কার মকমল জাতীয় কুচি কুচি শুঁয়ার আস্তরণে তা'দের দেহ ঢাকা। লালনে প্রয়াসী হয়ে খুব বেশী ফল পাওয়া যায়নি — কারণ তাদের খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় নাই। প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণে মাষ্টার মশাইদের সহায়তায় এই প্রথম পদক্ষেপ। যে যা বুঝতো, অনুভব করতো আঁকা বাঁকা হস্তাক্ষরে খাতায় লিখে মাষ্টার মশাইদের দেখাতে হতো।

চারিদিকেই এই মাঠের মাঝখানে মরুউদ্যানের মতো আমাদের আশ্রমটি। নানাজাতীয় ফুল ফলের গাছ ও লতা তীব্র সূর্য্যরশ্মি থেকে আশ্রমকে আচ্ছাদন করে শীতল করে রাখ্‌তো। বিভিন্নজাতীয় পাখীর আনা-গোনা ঋতুভেদে লক্ষ্য করেছি। উত্তরকালে এই নানা জাতীয় পক্ষি-পরিচয়ের গবেষণাও হয়েছে। নিস্তব্ধ দুপুরে ঘুঘুর ডাক আজও যেন কানে বাজে — তাদের স্বাধীন বিচরণ লক্ষ্য করে মনে কী আনন্দই না পেয়েছি! মহুয়া ও শালের ফুলের সময়ে মৌমাছিদের অবিরাম গুন্ গুন্ গীতি কেবল শ্রুতিমধুরই ছিল না, বালকমনকে ব্যাকুলও করতো। এই সমবেত গুন্ গুন্ গীতি যেন এক ডাল থেকে অন্য ডালে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত শব্দ — প্রথমদিকে খুবই বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল। কিন্তু

মাঝে মাঝে যখন কোনও পাখী মৌমাছিদের স্বচ্ছন্দ বিচরণে বাধা দিতে চেষ্টা পেত তখন মৌমাছিদের ক্ষোভজনিত শব্দে আমাদের মনেও ক্ষোভের সঞ্চার হতো। কিন্তু পাখী তার অন্যায় আচরণের ফল সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে পলায়ন করতো।

মাঠের ওপর মেঘ ও রোদের খেলা — অপূর্ব্ব! মেঘের আড়ালে দিনমণির দিনশেষের অপরূপ সজ্জা — দিকচক্রবালকে দিনের পর দিন নতুন নতুন পরিচ্ছদে যেন সাজিয়ে রাখ্‌তো। এরকম আস্বাদন মনে যে কী ভাবের দ্যোতনা করতো বলা কঠিন। তারপর মাঠের উপর দিয়ে বাতাসের দৌড় — তাই বা কত বিচিত্র! দখিনা হাওয়া, ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টির দৌড়, মেঘের নাচন — সব মিলে যখন আশ্রমের শ্যামলিমায় আলোড়ন আনতো — অবাক হয়ে চেয়ে থাক্‌তাম। মুক্ত মাঠের দূর প্রান্ত থেকে তাদের গতি, নাচন প্রত্যক্ষ করতে করতে মনে হতো আশ্রমে এসে যেন তা'রা নিজেদের বিলিয়ে দিতো — আমাদের সঙ্গে নিবিড় হ'বার যেন প্রয়াস।

প্রকৃতির খেলায় নিজকে হারিয়ে ফেলে আশ্রমে প্রথম প্রভাতের কথা বাদ পড়ে যাচ্ছিল। আসন নিয়ে সকলের মতো গাছতলায় বসে আছি। এদিক ওদিক চুপি দৃষ্টি দিচ্ছিলাম, কিন্তু সকলের নির্ব্বাক নিস্তব্ধতা আমাকেও চুপ্‌টি করে বসিয়ে রাখ্‌লো। উপাসনা কি বা কিসের জানি না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি অনেকে চোখ বুজে যেন ভাব্‌ছে। কেউ কেউ আবার গাছতলার কাঁকড় নিয়ে নিরিবিলি খেল্‌ছে। কিন্তু এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে মৌনী হয়ে থাকার অভ্যাস উত্তর জীবনে অনেক কিছু দিয়েছে — যার ফল আজও পেয়ে যাচ্ছি। ঘন্টা বাজ্‌তেই সকলে উঠে গাছতলায় সারিবদ্ধ হয়ে সমবেত উপাসনা। প্রথম ক'দিন বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে পারিনি সত্যি — কিন্তু সেই উদাত্ত গম্ভীর সমবেত স্বর মনে যেন কিসের অনুভূতি এনে দিতো — বুঝতে না পারলেও দেহে পুলক সঞ্চরণকে ভুল্‌তে পারা যায় না। ছুটির সময় বাড়ী এসেও এই উপাসনা না করে পারতুম না — মাদকতা এর এতই।

পাঠে যাওয়ার আগে সকলের সঙ্গে শালবীথিকায় দাঁড়িয়ে আছি। ছেলেদের মধ্যে গুঞ্জন কানে এলো 'গুরুদেব আস্‌ছেন'। গুরুদেব কি পদার্থ আমার কোনো জ্ঞান নাই। শালবীথি প্রভাতী সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত। সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন এক অভিনব অপরূপ দীর্ঘকায় সৌম্য মূর্ত্তি। পরনে যেন ঢোলা পায়জামা, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, পায়ে চটি, হাত দু'খানা পেছন দিকে, সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে হেঁটে আসছিলেন। আয়তলোচন দু'টি বেশীরভাগ নীচের দিকে — মাঝে মাঝে মাথা তুলে এদিক ওদিক তির্য্যক নয়নে দেখে যাচ্ছিলেন। ছেলেরা এক এক করে পদধূলি নিয়ে ধন্য হচ্ছিল। তাঁর স্নেহসিঞ্চিত প্রখর দৃষ্টিতে প্রত্যেকে আপ্লুত — আমি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে চেয়েই আছি। চমক ভাঙল — 'এই তুই কাল রাত্তিরে এসেছিস' — সেই মূর্ত্তির কথায়। কত স্নেহ, কত মমতা মাখানো সেই ক'টি শব্দ। অভিভূতের মত পায়ে মাথা দিতেই — মাথায় হাত দিয়ে কি কি যেন বলে গেলেন — কিছুই মনে নেই। উত্তরকালে কতদিন তাঁর পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছি, তাঁর পাঠ, সঙ্গীত, কৌতুকবহ কথা শুনবার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু সেই বিস্ময়ানুভূতির কথা পরমলাভ হয়ে আজীবন রোমন্থনের বস্তু হয়ে আছে।

বাড়ীর কথা আর মনেই ওঠে নাই। কাকা সেদিনই ফিরবেন — আমাকে খোঁজ করে তাই জানিয়ে গেলেন।

সম্ভবতঃ সুবোধ মজুমদার মশাই আমাকে ক'জন ছেলের সঙ্গে বসে পাঠগ্রহণের নির্দ্দেশ দিলেন। দেখলুম গুরুদেব তখন কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কি যেন আলোচনা করছেন। আমরা গাছতলায় মাষ্টারমশাইকে প্রণাম করে ঝাড়ন দিয়ে পা মুছে যার যার ঘরে আসন নিয়ে বসে পড়লুম। মনে হয় বাংলা ইংরেজী একই জায়গায় বসে পাঠ নিয়েছি, কিন্তু অঙ্কের বেলায় আমাকে নীচের গ্রুপের ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিতে হলো। বুঝা গেল, আমার অঙ্কের জ্ঞান সাহিত্যের নিম্নে।

সকলেরই নগ্নপদ — সাধাসিধে ধরনের পোষাক — আড়ম্বরহীন। কিছুদিনের মধ্যেই আশ্রম শিক্ষার্থীর প্রতীক গৈরিক 'আলখাল্লা' পরিধান করেছি। আমাদের খাতা-পেন্সিল সঙ্গে — বই এর বালাই নাই। মাষ্টার মশাই পড়িয়ে লিখিয়ে দিচ্ছেন — নিজেরা লিখে নিচ্ছি। মস্ত একটা ভুল ভেঙে গেল — মাষ্টার মশাইদের ব্যবহারে। ইস্কুলে যারা পড়তো, এখানে আসবার আগে শুনেছি, পড়া না পারলে তাদের শাস্তি পেতে হোতো অনেকরকম। সে আস্বাদনের ভীতি মনে যে না ছিল এমন নয়। কিন্তু এখানে ঠিক তার উল্টো। মাষ্টার মশাইরা পাঠ পড়িয়ে শিখিয়ে আমাদের দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। পড়া শেখা ও হাতে লেখা এক সঙ্গেই চল্‌তো। এখন দেখ্‌ছি শিশুদের এই-ই দরকার। মাষ্টার মশাইদের কথাবার্ত্তা মোটেই ভীতিপ্রদ নয়। ছেলেদের আবদারকে অযথা ভ্রূকুটি করে তাঁরা তিক্ত করে তোলেন না। তাঁর কথা প্রত্যেকে বুঝ্‌লো কিনা ভাল করে পরখ করে নিচ্ছেন — যেন সমবয়সী আর একটি ছেলে। নতুন আস্বাদন।

ছেলে ছিলুম আমরা তেইশ চব্বিশটি — আর শিক্ষক ছিলেন আটজন। প্রতি কাজে — শোয়া, বসা, খেলাধুলা সবটাতে শিক্ষকই ছিলেন সঙ্গী — যেন আমাদেরই একজন। তাঁদের সস্নেহ আচরণ, সমান হাসি তামাসা আমাকে অবাক করে দিত। অথচ স্বীয় মর্য্যাদাহানিকর ব্যবহার কোনো ছেলে যা'তে করতে সুযোগ না পায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে ভাষা বল্‌তেন। কাজেই, গা-ঢেলে মিশলেও বালক আমাদের কথাবার্ত্তায় সংযম আপনা থেকেই হয়ে আস্‌ছিলো — আজ সেগুলি বিশেষ করে অনুভব করছি। প্রত্যেকের মর্য্যাদা জ্ঞান ও পরের মর্য্যাদা বোধে এই শিক্ষা পরবর্ত্তী জীবনে, আমার মনে হয়, আশ্রমের ছেলেদের বিশিষ্ট ছাপ বহন করেছে।

প্রথম দিকে গান শেখাতেন দিনুবাবু। তাঁর দেহ তখনও তত বিরাট হয়নি। হারমোনিয়ম্ ও অর্গানের ব্যবহার চল্‌তি। সন্ধ্যায় গান শেখাবার সময় প্রথমেই আমাকে গান জানি কিনা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। তখন পর্য্যন্ত বাড়ীতে প্রতি সন্ধ্যায় ভাই বোনেরা মিলে যে হরিকীর্ত্তন করতুম — তা-ই গান বলে জানতুম। 'হ্যাঁ, জানি' বলে উত্তর করলে আমাকে গান গাইতে বল্‌লেন। ইতস্তত করে গাইলাম — সেই কীর্ত্তনের একটি। তিনি ভারী খুশী — 'বেশ, বেশ' বলে আমাকে উৎসাহিত করে অন্য ছেলেদের যেন কি কি বল্‌লেন। সঙ্গীরাও আমাকে বেশ পেয়ে বস্‌লো। পক্ষিবিশেষের নামের সঙ্গে 'কণ্ঠী' শব্দ যোগ করে নানাভাবে আমাকে জেরবার করতো। সেটা ঈর্ষামিশ্রিত না হলেও তা'দের চতুরালি আমাকে এমনই ব্যথিত করেছিলো যে কেঁদে ফেল্‌লাম। আমার এই দৌর্ব্বল্যের সদ্ব্যবহার

তারা মাঝে মাঝেই অন্য কথার ভেতরেও করতো। "ওরে নোনা-কল্সী উবু হয়েছে রে" বলে তা'রা খুবই আমোদ পেত। স্মৃতির রোমন্থনে প্রায় ষাট বছর পরেও এসব ছোট ছোট প্রাসঙ্গিক কথাগুলি কতই না মধুময়।

এ হেন পরিবেশে আমরা বর্দ্ধিত। আশ্রমের নিয়মানুবর্ত্তিতায় দৈনন্দিন জীবনের গতি আস্তে আস্তে একটা বিশেষ ধারায় বয়ে চল্লো। মনে আছে, বাইরের লোকেরা যেন আমাদের একটু আলাদা সম্ভ্রমের চোখেই দেখ্তেন। এখন চিন্তা করি — আনন্দ পরিবেশনই যেন আশ্রমে ছিল মুখ্য। নেপথ্য পরিবেশক ছিলেন আশ্রমগুরু — তা' রূপায়িত হতো তাঁর সহচর শিক্ষকবর্গের ভিতর দিয়ে। আর ঈশ্বরানুভূতিই ছিল সর্ব্ব-আচ্ছাদক। এই অনুভূতি ছেলেদের ভিতর যাতে প্রেরণা দেয় — তাই উপাসনা করা দৈনন্দিন কর্ম্মের অঙ্গীভূত।

আশ্রমে প্রথম দিকে যাঁদের পায়ের তলায় বসে কেবল পাঠই গ্রহণ করিনি — জীবন গঠন করার সুযোগ পেয়েছিলাম — তাঁদের মধ্যে সম্ভবত জগদানন্দ রায় মশাই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর নধর দেহে আকর্ষণ ছিল নাসিকাটি। সদা স্মিতহাস্যে সংযত ব্যঙ্গ-বাক্যাবলী ছিল তাঁর স্বভাবজ। কিন্তু তাতে আমাদের সম্ভ্রম আকর্ষণে কোনো ব্যত্যয় হয়নি। অসময়ে আমাদের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব খুবই সচকিত করে তুলতো সকলকে। নগ্নদেহে কোঁচার খোটটি গলায় জড়ানো। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, মুখে বর্ম্মা চুরুট — অচঞ্চল পদক্ষেপে আমাদের ঘরে এসে ঘুরে যেতেন। পরবর্ত্তী কালের একটি ঘটনা মনে আস্ছে। রাত্রিতে শোবার ঘন্টা পড়ে গেছে — সকলেই বিছানায়। ঘরের দরজা জানালা তো সব সময়েই খোলা। আমাদের চোখে পড়লো দক্ষিণ দিকে দূরে ধানক্ষেতের ভিতর একটা আলো যেন জ্বল্ছে আর নিভ্ছে। যে জায়গায় এই ব্যাপার চল্ছে — সেখানে ঝির্ ঝির্ করে ছোট একটি ঝরণাও বয়ে যাচ্ছে। আমাদের ধারণা সেখানে কেউ মাছ ধরছে। যদিও আমরা নিরামিষভোজী তবুও মাছ-ধরার কথায় সকলেই উৎসাহিত হয়ে কয়েকজন অতি সত্বর উদ্যোগী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে ভোঁ দৌড়। দলে কে কে ছিলেন কিছুতেই নাম স্মরণ করতে পারছিনে — দুঃখ হচ্ছে। যেমনি দৌড়ে তা'রা গিয়েছিলো — তেমনি তাড়াতাড়ি ফিরে এলো, একটু ভয় পেয়ে। আলোটা জ্বলে এখানে ওখানে — অথচ কোনো লোককে ধরা গেল না। চুপি চুপি কথা বলার ফাঁকে একজন বলে উঠ্লো — 'জগদানন্দবাবু আস্ছেন।' তাড়াতাড়ি যে-যার বিছানায় শুয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন। লণ্ঠনটি হাতে করে আস্তে আস্তে একেক জনার মুখ দেখ্তে দেখ্তে জোরে বলে উঠ্লেন, "আরে এ যে ঘুমোতে ঘুমোতে হাঁপিয়ে পড়েছে।" আর একজনার কাছে গিয়ে — "কেবল হাঁপানো নয় পায়ে কাদাও যে। ওঠ্ ওঠ্" — বলায় বাধ্য হয়ে উঠ্তে হলো। কিন্তু চোখ রগড়াতে কেউ ভুল করেনি। তিনি আমাদের নীরব নিশীথ অভিযান টের পেয়েই খোঁজে এসেছিলেন। সেদিন আর কিছু না বলায় 'বাঁচা গেছে' ভাবলুম। পরদিন সবিস্তারে মাষ্টার মশাই যখন সকলের কাছে 'মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁপায়' — এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানিয়ে দিলেন — অপরাধীর মত আমরা চুপ। সঙ্গে সঙ্গে আলোটা যে সত্যি নয় ------ ও যে মাটির তলা থেকে গ্যাস বেরিয়ে বাতাসের সংস্পর্শে জ্বলে ওঠে বুঝিয়ে দিলেন। সেদিনই জেনেছি 'আলেয়া' কি। গুরুদেবের কানে যখন তিনি খুব রসায়ন দিয়ে ঘটনাটি

বিবৃত করেছিলেন — তখন উপস্থিত সকলেই হাস্যরোলের সঙ্গে সেটি উপভোগ করেছেন, শুনেছি।

'মৃন্ময় কুটীরে' — রাজেনবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়), ভূপেন্দ্রচন্দ্র সান্যাল ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়-রা বাস করতেন। রাজেনবাবু ছিলেন ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। ছেলেদের সব কিছুর তদারকের ভার তাঁর ওপর। ছোটখাটো দপ্তরও তাঁর সেখানেই। ছেলেদের অভাবের অভিযোগ কোনো সময়েই তিনি উঠ্‌বার সুযোগ দিতেন না। কার কবে বাড়ীতে চিঠি লেখা উচিত — না চাইতেই তিনি একখানা কার্ড অথবা খাম দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কোথ্‌থেকে এর ব্যয় বহন করেন কোনোদিনই মনে উদয় হয়নি। অপব্যবহার অথবা অতিরিক্ত ব্যবহারের হাত থেকে এই ভাবেই আমরা মুক্তি পেয়েছিলেম। কাজেই অভাব বোধ যে আমাদের ক্লেশ দেয়নি — সেই অভ্যাস আজও আমাকে রক্ষা করে নিচ্ছে। রাজেনবাবু দৃশ্যতঃ কোনো কাজের ভিড়ে থাক্‌তেন না, কিন্তু সব কিছুর ব্যবস্থাপনাতেই যে তাঁর হাত সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিলো না।

উন্নত গৌর দেহ, উন্নত নাসায় চশমা-প্রদীপ্ত চক্ষু দুটিতে যেন সস্নেহ আবাহন লেগেই আছে — এহেন হরিচরণবাবু ছিলেন সংস্কৃতের শিক্ষক। মনে পড়ে — আমাদের পড়ার জন্যে তিনি লিখে আন্‌তেন। আমরাও সেগুলো খাতায় লিখে নিতাম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। গুরুদেব কাছে দাঁড়িয়ে মাঝে পড়াবার সময় 'বতুপ্‌' 'মতুপ্‌' প্রত্যয় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন। বুঝা গেল সংস্কৃত পড়াবার পদ্ধতি নিয়ে হরিবাবুর সঙ্গে আগেই তিনি আলোচনা করেছেন। আমাদের যা পড়াতেন তা'ই ছাপা হয়ে "সংস্কৃত প্রবেশ" বই হলো। কিছুকাল পর থেকে তাঁর অভিধান সংকলনের কাজে অবসর সময়ে মন দিয়েছিলেন। এই অভিধান প্রণয়ন তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। তখন ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারিনি — তাঁর এই কাজে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা যে কত প্রবল ছিল।

তাঁর সঙ্গে সেই ঘরেই থাক্‌তেন ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল। নাতিদীর্ঘ দেহে চাদর জড়ানো। জামা গায়ে দিতে তাঁকে দেখেছি বলে মনে হয়নি। নগ্নপদ, বেশ বা কেশ বিন্যাসে সদা সংযত — পূর্ণ ব্রহ্মচারী। তিনি ও হরিবাবু নিজেরাই রান্না করে খেতেন — আমাদের খাওয়ার ঘরে কোনো দিন তাঁদের দেখিনি। অপরিসীম সেবাযত্নে ছেলেদের তিনি যে কত আপন করে নিয়েছিলেন অবাক হয়ে ভাবি। এই চঞ্চলতা-বিবর্জ্জিত নৈষ্ঠিক শিক্ষকটির হৃদয় কতদূর স্নেহ-সিঞ্চিত ছিল তা' আমি ভুল্‌তে পারবো না কোনো দিন। ছেলেদের সেবার বসন্ত প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়েছে। আমার বাঁ হাতে পাঁচড়া ছিল; তা'র ওপরেই টিকা দেওয়ায় সমস্ত হাতে আরও অনেক পাঁচড়ার মত বেরিয়ে পেকে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর — বিছানায় একরকম অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছি। বোলপুর সহরের ডাক্তার আমাদের নিয়মিত দেখাশুনা করতেন। হঠাৎ দেখি চোখ মেলে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ভূপেনবাবু, খুব মৃদু স্বরে জেনে নিচ্ছেন শরীরের অবস্থা। পাশেই গরম জল সাবান। সযত্নে পাঁচড়ার ক্লেদ পরিষ্কার করলেন নিজ হাতে — ব্যথা বেদনা ভুলে আমি চেয়ে আছি তাঁর মুখের দিকে। তাঁর কোমল প্রাণে, মাতৃসেবার অভাব যাতে আমার বোধ না হয়, সেটি বেজে উঠ্‌ছিল নিশ্চয়ই। তাঁর স্নেহ সেবায় যে আমার চোখ গড়িয়ে

জল পড়ছিলো — না বললেও অনুমেয়। চোখের জল মুছিয়ে বল্লেন — 'একটু খাও'। লুচির মধ্যে হালুয়া দিয়ে আমার মুখে বার বার একটু একটু করে তুলে দিয়ে যেন তিনিও তৃপ্তি পাচ্ছিলেন। যুবকের প্রাণে এই মাতৃস্নেহের অনুপ্রেরণা কে দিল ভেবে পাইনি। আজ তিনি কোথায় জানি না। কিন্তু আমার কৃতজ্ঞ অন্তরের অনুভূতিটুকু জ্ঞাপন করার ব্যাকুলতা আজ আমাকে উদ্বেল করেছে — এই স্মৃতি মনকে ভরপুর করে তুলেছে। আশ্রম-জীবনের এই উপলব্ধি আশ্রম-জননীর বিশিষ্ট দান বলেই নতমস্তকে বরণ করে নিয়েছি।

সতীশ রায় ছিলেন আর এক যুবক শিক্ষক। দেখলেই চিন্তাশীল মনে হতো। কথা বেশী বল্‌তেন না, কিন্তু যা বল্‌তেন সেটা বেশ দাগ কেটে মনে বস্‌তো। তাঁর লেখা 'গুরুদক্ষিণা' — উতঙ্কের উপাখ্যান নিয়ে — আমাদের জন্যই রচিত হয়েছিল। এই উপাখ্যানটি লেখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পাঠের সময়ে তাঁর বিবৃতি কী হৃদয়স্পর্শী! অল্পদিনের জন্যই তাঁকে পেয়েছিলাম। এর ভিতরেই তাঁর কোমল অন্তরের পরশ প্রত্যেকেই অনুভব করেছেন। কী নিষ্ঠা নিয়েই তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন আশ্রমে। আজও মনে আছে গুরুদেবের সেই বাণী "জীবনে যে ভাগ্যবান সফলতা লাভ করেছেন — মৃত্যুতে তাঁর পরিচয় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

নগেন রায় ছিলেন প্রধান অধ্যাপক, বয়স্ক লোক। পণ্ডিত ব্যক্তি। সেকালের এম্‌-এ। খুব গম্ভীর না হলেও একটু চুপচাপ থাকতেন। আমাদের সঙ্গে মেলামেশাটা কমই ছিল। খুব দৃঢ়চিত্ত — বেশীদিন আমরা তাঁকে পাই নাই। শুনেছি তিনি সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনবাসী হয়ে শেষ জীবন কাটিয়েছেন।

দিনুবাবু যে কেবল গানই শেখাতেন তা নয়। বাংলা ক্লাসও নিতেন। তাঁর সঙ্গ পাওয়ার জন্যে ছেলেদের বেশ আকাঙ্ক্ষাই থাক্‌তো। কর্ত্তব্য ও কাজের ভিতর দিয়ে নানা কথায় আমাদের মজিয়ে রাখার ছিল তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। নবীন যুবা, আকর্ষণীয় স্বাস্থ্য ও অবয়ব, আভিজাত্যপূর্ণ অথচ সকলের সঙ্গে সরস ব্যবহার তাঁর সঙ্গীত সাধনাকে আরো রসায়িত করে তুল্‌তো। এস্‌রাজে ছড়ের টান দিয়ে যখন দরাজ গলায় উঁচু নীচু পর্দ্দায় সুর খেলিয়ে যেতেন — সূক্ষ্ম কাজগুলি যখন তাঁর কণ্ঠ-নিসৃত হতো, আমাদের বালক মনে কি অভিনব রূপ সৃষ্টি করতো, এখন আর বলতে পারি না। বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয় — তাঁর গাওয়া অনেক গান, আমাদের শেখানো অনেক গান, আজকাল রেডিয়োতে অনেককে গাইতে শুনি — কিন্তু তাতে কোথায় যেন কি বাদ পড়ে যাচ্ছে। মনে হয় সে প্রাণের প্রাচুর্য্য নেই।

অধ্যাপকদের মধ্যে এই যে বিশিষ্টতা আমরা দেখেছি — সে সব আহরণের যোগ্যতা কি করে তাঁরা পেলেন। এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে ওঠে। সাধারণ শিক্ষার অধিকারী হয়ে কেউ বা জমিদারী সেরেস্তার কাজ করতেন, কেউ বা গৃহশিক্ষকের পদে থেকে জীবিকা অর্জ্জন করতেন, কেউ বা কলেজে পড়তেন ইত্যাদি ইত্যাদি। একথাটা এখনই মনে ওঠে, কারণ আমরা তখন অধ্যাপক বল্‌তে এই ধরনের শিক্ষকদেরই বুঝতাম — সে ভুল ভেঙে গিয়েছিলো আশ্রম ছেড়ে আসার পর। সাক্ষাৎভাবে অধ্যাপকরাই তখন গুরুদেবকে পেয়েছেন — আমরা নয়। শিক্ষক গঠন করাই ছিল তাঁর চিন্তা — আর সেই পঠনপদ্ধতি

কিভাবে রূপায়িত হয় ছেলেদের ভিতর দিয়ে, তাই গুরুদেবের ছিল লক্ষ্য। শিক্ষক তৈরী না হলে ছেলে তৈরী সুদূরপরাহত — আশ্রম-জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়ে গুরুদেব এ বিষয়ে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন — সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যে প্রাচীন আদর্শবাদ — গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যে শিক্ষা গ্রহণ — গুরুদেব তখন প্রচার করতে প্রয়াসী, সেই অনুপ্রেরণাই অধ্যাপকরা তাঁর নিত্য-সাহচর্য্য থেকে পেয়েছিলেন — তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁরাও নিজ নিজ জীবনকে ধন্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই ভাবেই।

আশ্রমে দৈনন্দিন জীবনধারায় যে মাদকতা বালকমনে পেয়ে বসেছিল তার অভিনবত্ব নিত্য নব-নব ভাবে আমার চিত্তকে গভীরভাবে অনুরণিত করছিল। নিজেদের কাজ যথাসম্ভব আমাদেরই করতে হোতো। সেই সকাল বেলায় বিছানা রোদে দেওয়া ও তোলা, স্নান করে কাপড় ধোয়া, নিজের জিনিষপত্তর ঠিক করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা, যে যে-ঘরে থাকে সেটি পরিষ্কার করা ইত্যাদি সবই করণীয়। এই কাজগুলি কেহ যে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছিলেন — এই অববোধ কোনো সময়েই মনে ওঠে নাই। কারণ শিক্ষক মশাইও সমভাবে নিজের কাজ নিজে করে যেতেন। এটাই স্বাভাবিক — একথাই মনে জাগ্‌তো। স্নানের জল তুলতো কোদে মহাতো। খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণকায় এই মানুষটিকে যারা দেখেছেন বা তার সংস্পর্শে এসেছেন, তাকে ভুল্‌তে পারবেন না। আমাদের কাজ দেখিয়ে সাহায্য করে যে সে আত্মতৃপ্তি পেতো — তা তার হিন্দী মেশানো ভাঙা বাংলায় সহাস্য মুখে বুঝিয়ে দিতে কোনো সময়েই কসুর ছিল না। আশ্রমে একটি মাত্র ইঁদারা — পাশে বড় চৌবাচ্চা, সবরকম ব্যবহারের জলই তাকে সরবরাহ করতে হতো। ক্লান্তি বলে কিছু সে জান্‌তো না। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার যত্ন চেষ্টায় নিজকে নিয়োজিত করে যে কি আনন্দ পেতো — তার মুখের দিকে চাইলেই বুঝা যেত। এই কোদের নির্দ্দেশও আমরা পালন করে খুশীই হয়েছি। আমাদের সমাজে এই অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও যে কতখানি ব্যবহারিক শালীনতা গ্রহণ করতে পারে কোদের ভিতরে তা আমরা দেখেছি।

আর একজন ছিল দারোয়ান গোছের — নাম স্মরণ নেই। বিশেষ কাজ তার ছিল বোলপুর ডাকঘর থেকে আশ্রমের ডাক আনা আর সেখানে আমাদের চিঠি পত্র সব ডাকে পৌছোনো। তখন সে বৃদ্ধই — ছ'ফুটের উপর লম্বা, মাথা কেশবিরল হলেও — যে-ক'টি চুল ছিলো — লম্বাই বলা চলে। দেহ তখন ক্ষীণ। কোটরগত হলেও উজ্জ্বল চোখ দু'টি। হাতে লম্বা একখানা লাঠি — দীর্ঘ পদক্ষেপে তখনও চলার অভ্যাস। এই সেই ডাকাতের সর্দ্দার যে মহর্ষিদেবের পাল্কী আটকিয়ে তাঁকে মারতে উদ্যত হয়েছিলো। আশ্রমের ছাতিমতলা সেই কাহিনীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। মহর্ষিদেব যাচ্ছিলেন রায়পুর — এই নির্জ্জন মাঠের মধ্যে ছাতিমগাছ তাঁকে আকর্ষণ করে আনে। ডাকাতের দল সেখানেই মহর্ষিদেবকে পাকড়াও করে। তিনি সর্দ্দারকে নাকি বলেছিলেন তাঁর ভগবৎ-আরাধনা সমাপনে ডাকাতদের অভিলাষ পূরণ করতে কোনো বাধা থাক্‌বে না। ছাতিমতলায় ধ্যান-অচঞ্চল মহর্ষিদেবের মূর্ত্তিতে কি জ্যোতিই সর্দ্দার প্রত্যক্ষ করেছিল — সে মুগ্ধ বিস্ময়ে মহর্ষির চরণতলে তখনই নিজ দেহ লুটিয়ে ফেলে তাঁর সেবকের জীবন বেছে নিলো। কাহিনীটি অনেকেই লিপিবদ্ধ

করেছেন মনে হচ্ছে। সর্দ্দার নিজে কিছু বলতে চাইতো না, তবে এটুকু বলেছে — তখনও লাঠি ঘোরালে সাম্‌নের দিক থেকে ঢিল মেরে তাকে কেউ কাবু করতে পারবে না। সর্দ্দারকে দেখলেই আমাদের বালক মনে কত রোমাঞ্চকর কল্পনা ভিড় করে বস্‌তো।

বুধবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ছুটি বলে ঘুমানো চল্‌তো না। যার যার সিটে বসে খুশিমত যা-হয় কিছু করতে হতো। শুনেছি গুরুদেবের বন্ধু ত্রিপুরার মহারাজের জন্মদিনকে* স্মরণে রাখার উদ্দেশ্যেই নাকি বুধবার ছুটির ব্যবস্থা — আজও সেটি, চলে আস্‌ছে। ত্রিপুরাতেও বুধবার ছুটির দিন ছিল — আজ আর নেই। ছুটির কথা শুনে তখন বুঝ্‌তে পেরেছিলেন পিতৃদেব কেন আমাকে আশ্রমে আসবার আগে মহারাজকে প্রণাম করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহারাজও অনেক কিছু বলেছিলেন তখন। কারণ, ত্রিপুরা থেকে আমাকেই প্রথম আশ্রমে পাঠানো হয়।

ছেলেদের মধ্যে বেশীর ভাগই রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়, বন্ধু বা অনুরাগীদের পরিবারের। বাইরে তখনও ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রসার লাভ করেনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিদ্যালয়ের তখন কোনো যোগ ছিল না। সেবারকার ৭ই পৌষ উৎসব আমি প্রথম উপভোগ করি। এইজাতীয় উৎসব ও মেলা আর কখনো প্রত্যক্ষ করি নাই। অতিথিভাবে সেবার মোহিত সেন মশায়কে দেখি। সেই অন্ধকার থাক্‌তে উঠে স্নানাদি সেরে সকলে আলখাল্লা পরে লাইন বেঁধে ছাতিমতলায় উপাসনায় যোগদান — সকলেরই নগ্ন পদ, শীতের প্রারম্ভ হলেও কাঁকড়ের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া অনভ্যস্ত পদে ক্লেশকর হলেও কারো উৎসাহের কম্‌তি ছিল না। গুরুদেবের ভাবগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ ও ব্যাখ্যা — একদিকে বৃক্ষলতা মণ্ডপের ভিতর দিয়ে প্রভাতী রবিকিরণ, অন্যদিকে উদার বিস্তীর্ণ দিকচক্রবাল — বালককণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি — সব মিলিয়ে আমাকে যেন কিরকম করে ফেল্‌লো, প্রকাশ করার ভাষা পাই না।

মন্দিরে ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আবার সার বেঁধে আমরা চলেছি। গাছের তলায় তলায় শান্তিনিকেতন দোতলা দালানকে পাশ কাটিয়ে মন্দিরে ঢুকবার আগেই বাইরে গুরুদেবকে পেয়ে এক এক করে প্রণাম সেরে ভিতরে আসন গ্রহণ করলাম। নানা রংএর কাঁচে তৈরী মন্দির। শ্বেতপাথরের মেঝে—কোনো বেদী নেই। দু'তিন খানা ছোট ছোট শ্বেতপাথরের টেবিল— সঙ্গেই আসন বিছানো। গুরুদেব আসন অলঙ্কৃত করলে মন্দিরের কীর্ত্তনীয়া—সম্ভবতঃ শ্যামবাবু নাম—তানপুরা নিয়ে গাইলেন "কর তার নাম গান" সঙ্গীতটি—সঙ্গত বোধহয় খোলে চল্‌ছিল। যথারীতি উপাসনার মন্ত্রোচ্চারণের পর গুরুদেবের উপদেশবাণী। কিছুই মনে নেই ভাষণের বিষয়বস্তু; কিন্তু ৭ই পৌষ উৎসব কেন পালিত হচ্ছে—এর সার্থকতা আশ্রম-জীবনের সঙ্গে কিভাবে জড়িত -এসবও

* খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বুধবার গুরুদেবের বন্ধু মহারাজ রাধাকিশোরের জন্মদিন নয়। তাঁ'র পিতা মহারাজ বীরচন্দ্রের জন্মদিন। গুরুদেব বীরচন্দ্রের স্নেহ ও আদর লাভ করেছেন — খুব অল্প বয়েস থেকেই। তাঁর সম্বন্ধেই গুরুদেব বলেছেন — "জীবনে যে যশ আজ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তার প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা।" কাজেই, ত্রিপুরায় যে দিনটি ছুটি বলে গ্রহণ করা হয়েছিল — সেটিকে সম্মাননা দেওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের স্থাপনা কাল থেকেই রাধাকিশোরের সহযোগিতা ও নিয়মিত সাহায্য গুরুদেবকে কতদূর ঘনিষ্ঠ করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। রাধাকিশোর এই বিদ্যালয়কে 'বেদ-বিদ্যালয়' বল্‌তেন।

বলেছিলেন, মনে হয়। নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনছিলাম ও দেখছিলাম। সেই শুদ্ধ পরিবেশে চন্দন ধূপের সুবাস মধ্যে রেশম বস্ত্র ও উত্তরীয়ে গুরুদেবকে কী অপরূপই দেখাচ্ছিল। সে রূপ ভুলবার নয়।

মন্দিরের সীমানার বাইরে মাঠে মেলার সমাবেশ। তখনও জমে ওঠে নাই। মাঝে মাঝে ডুগডুগি ও একতারার শব্দ আস্‌ছিল। দোকান-পাটের মধ্যে গালার তৈরী নানারকম জিনিষ — কাঁচের চুড়ি এই জাতীয়ই ছিল অনেক। খাবারের দোকানও বেশী নয়। নাগরদোলায় অনেকেই চড়েছিলো। আর ভীড় ছিল গরুর গাড়ীর — আস্‌ছে, যাচ্ছে, অনেক দাঁড়িয়েও। এক জায়গায় দেখি অনেক লোক জড় হয়ে দু'জন বাউলের গান শুন্‌ছে। একটু দাঁড়াতেই তাদের নৃত্যভঙ্গিমা গানের আত্মভোলা সুরের সঙ্গে খঞ্জনি ও একতারার ধ্বনি আমাদেরও আকর্ষণ করেছিল। আমাদের সম্বিত ফিরে এলো খাবারের ঘন্টা কানে আস্‌তেই। সন্ধ্যায় বাজি পোড়ানো দেখ্‌তে সকলে জড় হয়ে গিয়েছি মেলার মাঠে। চাঁদোয়া খাটিয়ে রাত্তিরে যাত্রা গান। মেলায় আনাগোনা সব চাইতে বেশী সাঁওতালদের, আশে পাশে এবং দূর থেকেও গরুর গাড়ীর যাত্রীও কম নয়। বেশীর ভাগ নিরক্ষর দুস্থ অধিবাসী — ছেলেপুলে নিয়ে দু'দিন আমোদ আহলাদে একঘেয়ে জীবনকে সজীব করে তোলা তাদের অভিলাষ।

শুনেছি, মেলার সব বন্দোবস্ত ও তদারকির ব্যবস্থা ছিল দিনেন্দ্রনাথের পিতা দ্বিপেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে। শান্তিনিকেতনের উত্তরের নীচের বারান্দায় সপারিষদ তাঁকে আমরা দূর থেকে দেখেছি। তাঁর রাসভারী চেহারা আমাদের বেশী আকর্ষণ না করলেও শুনেছি প্রাণটি ছিল অত্যন্ত কোমল। রায়পুরের সিংহী পরিবারের এক ভদ্রলোককে সর্ব্বদাই দ্বিপুবাবুর কাছে দেখেছি — চশমা চোখে মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা কপালে, মনে হতো বিশেষ কোনো সাধক।

আমাদের কাছে টাকা পয়সা কিছুই থাক্‌তো না — দরকারও পড়তো না। কিন্তু মেলার সময় আমাদের হাতখরচা দেওয়া হোতো, জিনিষ কিনবার জন্যেই — দোকানের খাবার খাওয়া একদম বারণ। এই উৎসবের রূপ, মেলার হৈচৈ, গান বাজনা, বাজি পোড়ানো — সব মিলিয়ে আমার বালকমনে একটা রঙিন ছাপ দিয়েছিল।

মনে আছে, এই ৭ই পৌষ উৎসব উপলক্ষে গুরুদেব ছেলেদের দিয়ে 'বিসর্জ্জন' নাটক করিয়েছিলেন। নাটকটি কাট ছাঁট করে একরকম নতুন করেই গড়া হয়। অপর্ণার অভিনয় অংশ একেবারেই বাদ দিয়ে একমাত্র নারীর ভূমিকা — গুণবতী ছিল। আর বালকের ভূমিকায় 'ধ্রুব' সংযোজন করা হয়। সম্ভবতঃ আশ্রমে ছেলেদের এই-ই প্রথম অভিনয়। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন যতদূর মনে পড়ে —

গোবিন্দ মাণিক্যের ভূমিকায় —	সন্তোষদা
জয়সিংহ	রথীদা
রঘুপতি	দিনুবাবু
নক্ষত্ররায়	নয়নদা
গুণবতী	ব্রহ্মবিহারীদা

আর আমাকে মাথায় পাগড়ী বেঁধে ধ্রুব সাজিয়ে বলে দেওয়া হলো — "আমায় ডেকেছেন

রাজা" — এই আমার পার্ট। অভিনয় ভালই হয়েছিল। পরের দিন গুরুদেব ও মোহিতবাবু সহ আশ্রমের শিক্ষক ও ছেলেদের ছবি তোলা হয়। এটিই বোধহয় আশ্রমের সকলের সবচেয়ে পুরানো ফটো। বহুদিন ছবিখানা আমার কাছে ছিল। পরে দেখেছি অমল হোম সম্পাদিত Calcutta Municipal Gazette-এর রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়েছে। ছবিখানা সাম্‌নে রেখে সকলকে স্মরণ করতে চেষ্টা করেছি — কিন্তু কয়েকজনার নাম মনেই আস্‌ছে না।

লিখ্‌তে বসে ভাবছি — অনেকেই হয়ত পরলোকে বা যাঁরা আছেন — কিভাবে কে কোথায় আছেন জানবার উপায় নাই। যাদের সঙ্গে, বিশেষ করে সমবয়সীদের মধ্যে, অন্তরঙ্গতা ছিল তাদের কথা আজ কতভাবেই স্মরণ পথে উদয় হচ্ছে। সেই ছোটবেলাকার স্নেহ-প্রীতির নিশানা আর এই পরিণত বয়সে নাই, কিন্তু সেই স্মৃতিকে মুছে ফেলবার উপায় নাই, সংসারের টান যত বলবানই হোক না কেন। জীবনে অনেকেই কৃতী হয়েছেন — কারো কারো স্বভাবের মাধুর্য্য, কারো সদাস্মিত বয়ান, কারো কোনদিনের রুক্ষ ব্যবহার — আরো কত কি লিখ্‌তে গিয়ে মনে আস্‌ছে। আর বেশী করে মনে আস্‌ছে — 'লুসি গ্রে' কবিতার 'ট্রিপিং ওভার দি স্নো' ছবিটির মতো 'নতুন বাড়ী' থেকে সোজা শালবীথি রাস্তা ধরে রোজ শমীর লাফাতে লাফাতে আস্‌বার ভঙিটি। ছবিতে যে তিনজন মাটিতে আমরা বসেছি তার দু'জনাই নাই। জগতের বিচিত্রতায় অভিশপ্ত হওয়ার জন্যই যেন বেঁচে আছি।

সেবার মাঘোৎসবে আমরা চার পাঁচটি ছেলে গিয়েছিলাম কলকাতা মাঘোৎসবে — গান গাইতে। চোখে এখনও ভাসে লম্বা বিস্তীর্ণ তেতলা বারান্দায়, জোড়াসাঁকো বাড়ীতে, ইজিচেয়ারে শয়ান অবস্থায় মহর্ষিদেব। আমরা প্রণাম করতেই, সম্ভবতঃ দিনুবাবু বলে দিলেন আমাদের কথা। সেই বয়সেও তাঁর আমাদের প্রতি স্নেহদৃষ্টি বয়ানে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল। জীবনে এই মহাপুরুষের পদধূলি গ্রহণ করার সৌভাগ্য যে হবে তা' কোনো দিনই ভাবি নাই — সম্ভব হয়েছিল কেবল আশ্রম-জীবনে নিজকে জড়িত করার সুযোগ পেয়ে। জোড়াসাঁকো বাড়ীর ভিতরের চকমিলানো বিস্তীর্ণ চত্বরেই মনে হয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয় — গুরুদেব আচার্য্যের আসন অলঙ্কৃত করেন। আচার্য্যের আসনের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে অর্গানের সঙ্গে আমাদের গান হয়। সেই ভাবগম্ভীর পরিবেশে বেদমন্ত্র আবৃত্তি বালকমনকে এক অভিনব কল্যাণকর অনুভূতিতে পূর্ণ করে দিল। উপাসনা অথবা গুরুদেবের ভাষণ কিছু না বুঝলেও শব্দ ও অক্ষরের অন্তর্নিহিত শক্তি অপরূপ উপলব্ধি সঞ্জাত করেছিল — যা'তে আনন্দানুভূতি হৃদয়ে লাভ করা সহজসাধ্য হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, আমরা যেসব গান গেয়েছিলাম তার এক পংক্তিও মনে আস্‌ছে না।

শীতের ছুটির পর আশ্রমে গিয়ে শুনলুম সতীশবাবু বসন্ত রোগে আক্রান্ত। সেইজন্য বিদ্যালয় শিলাইদহে বসেছে। আশ্রমে কোদে আর কে যেন আছেন ---- সতীশবাবুর পরিচর্য্যার জন্যে। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাঁকে দেখ্‌তে গিয়েছি। বাইরে জানালা দিয়ে দেখা যায়। লেবরেটরী ঘরের মেঝের উপর যেন তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে নীরবে বসে রয়েছেন। আমাকে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে দেওয়া হলো না। ক'দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে এসে শিলাইদহ যাত্রার ব্যবস্থা হলো। কুষ্টিয়া

থেকে নৌকো করে শিলাইদহে আসা গেল। কুঠিবাড়ীতে বিদ্যালয় — অধ্যাপক ও ছেলেরা থাকে। গুরুদেব বোটে — নদীতে। বিস্তীর্ণ দীর্ঘ লতাবিতানে আমাদের পাঠের স্থান — খেলার স্থানও বটে। শান্তিনিকেতনের চারিদিককার রুক্ষ গৈরিক পরিবেষ্টনী থেকে নদী, জল, ধানের ক্ষেত,ঘন বনানীর আবাহন আমাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণের হয়ে উঠ্‌লো। প্রকৃতির দুই বিভিন্ন রূপ বালকমনকে কিভাবে রাঙিয়েছিল বলা এখন কঠিন। গোরাই নদীতে আমরা লাইন করে নিজেদের কাপড় গামছা নিয়ে স্নান করতে কী আনন্দ অনুভব করেছি। গোরাই পদ্মার ছোট শাখা, শীতের সময় অপেক্ষাকৃত ক্ষীণধারা। জলে নিজেদের মাতামাতি পুরোদমে চল্‌তো। কিন্তু সাঁতরিয়ে পরপারে যাওয়া নিষেধ ছিল। কি আকর্ষণে একদিন আমি নদী পার হয়ে গেছি। গিয়েই মাষ্টার মশাইএর নির্দ্দেশের কথা মনে হতেই তাড়াতাড়ি সাঁতরিয়ে সকলের আগেই স্নান সেরে উঠে পড়েছি। ভেবেছি ফাঁড়া কেটে গেছে। ফিরবার সময়ে আমাকে লাইনে ঢুকতে দেওয়া হলো না। আমাকে একা একা ঐ লাইনের পাশেই যেতে হলো। কেউ কথাটি পর্য্যন্ত কয় না। মাথা নিচু করে চুপটি করে হেঁটে কুঠিবাড়ি পৌছলাম। আশ্চর্য্য! আমার অন্যায়ের জন্যে আর কিছুই বল্‌লেন না, কিন্তু যে শিক্ষা সেদিন পেয়েছিলাম — আজ পর্য্যন্ত ভুল্‌তে পারিনি। আমরা কিন্তু ছোটদের এইভাবে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে উঠ্‌তে পারিনি, কারণ অবিশ্যি আমাদের পারিবারিক গঠন।

শিলাইদহের কাছাকাছি গ্রামে আমরা অনেক ঘুরেছি। মাঠে কেমন করে চাষ আবাদ করে — বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে মাষ্টার মশাইরা তাদের সুখ দুঃখের অনেক কিছু জেনে নিতেন। আমাদের মধ্যে যারা সহরের বাইরে যায় নাই, তাদের কাছে নতুন অনেক কিছু লাগ্‌তো। মাঠের আলে আলে চলা তাদের কল্পনার বাইরে ছিল।

এখানে নতুন অধ্যাপক আস্‌লেন মনে হয় নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও নগেন্দ্রনাথ আইচ। নরেনবাবু কবি ও শিল্পী আমাদের বাংলা পড়াতেন, নগেনবাবু ড্রইং শেখাতেন। সে সময়ে ম্যাকমিলান কোং-এর ড্রইং-এর বই ছিল, তাই দিয়ে রেখাঙ্কনে আমাদের হাতে খড়ি। পেন্সিলের মধ্যে যে ড্রইং পেন্সিল আছে, সেই প্রথম জেনেছি। আমাদের অঙ্কন বিদ্যার প্রথম পদক্ষেপ সরল-রেখা টানা যে কী দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়েছিল, আজও মনে আছে। শিলাইদহে থাকা সময়ে নতুন ছেলেদের মধ্যে আগরতলা থেকে যোগেনদা (গাঙ্গুলী) এসেছিলেন মনে হচ্ছে। গুরুদেব মাঝে মাঝে আমাদের সব কিছুই দেখ্‌তেন। নিয়মিত ছিল তাঁর মাষ্টার মশাইদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা।

গরমের ছুটির পর আমরা পুনরায় বোলপুরে বিদ্যালয়ে যোগদান করি। তখন নতুন অনেক ছেলে এলো। এর ভিতর ত্রিপুরা থেকে সোমেনদা, উপেনদা, যোগীন, যোগেশ প্রফুল্ল-প্রশান্ত যমজ ভাই, সত্যেন্দ্র প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে অনেকেই জুট্‌লেন। মনে হয় ভাগলপুর থেকে বিশুদা ও আরো কে কে বড় ছেলেও এসেছিলেন। আমাদের সংখ্যা বেশ বেড়ে গেল। মোহিত সেন মশায় অল্পকালের জন্য সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে ছিলেন। আমাদের শারীরিক ব্যায়ামের দিকে মাষ্টার মশাইদের বিশেষ নজর। খেলাধুলা বাদে কোদাল মেরে বাগান করার প্রতিযোগিতা খুব চল্‌তো। এক একজন বড় ছেলের সঙ্গে আরেকটি ছোট ছেলেকে দেওয়া হতো। আমি পড়েছিলাম রথীদার সঙ্গে। আমাদের বাগান ছিল ইঁদারার

সংলগ্ন পূবদিকের জমিতে। কী উৎসাহ আমাদের। প্রায় সকলেরই জলের জোগান দিতে হতো কোদেকে। সে সময়ে জলে বৃষ্টিতে বেড়ানো ছিল আর এক আমোদ। আমাদের আর পায় কে! কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে তাড়াতাড়ি কাপড় বদলানোও নিয়মিত মাষ্টার মশাইরা দেখ্তেন — নইলে জ্বর হতে পারে। প্রকৃতির কোলে ছেলেরা যাতে বর্দ্ধিত হতে পারে — এই ছিল গুরুদেবের অভিপ্রায় ও অনুশাসন। তাকেই রূপায়িত করতে অধ্যাপকরা চেষ্টিত ছিলেন।

সেবার পুজোর ছুটির পর দেখা গেল বড় ছেলেরা আস্‌লেন না — অবিশ্যি রথীদা, সন্তোষদা আমাদের সঙ্গেই আছেন। দশ পনরজন ছেলে পাঁচ ছয়জন শিক্ষক নিয়েই বিদ্যালয় বস্‌লো। শুনলুম বার বছর বয়সের বেশী কাউকে বিদ্যালয়ে নেওয়া হবে না। কাজেই এরপর যারা আস্‌ছিলেন তারা সবই বার বছরের নীচে। বিদ্যালয়ের কথা এতদিনে দেশের লোকের গোচর হয়েছে। শিক্ষাদানের বিশিষ্টতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে গুরুদেবের লেখনী নতুন ভাবধারা প্রচার করে যাচ্ছে। দেশ বিদেশের কাহিনীর সঙ্গে দেশের কথাও আমরা শুন্‌ছি!

পোর্ট আর্থার দখল করে জাপানীরা পূর্ব্বজগতে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের ভাষা, তাদের সাহিত্যে নতুন নতুন সম্পদ সন্নিবিষ্ট হচ্ছে। নবজাগরণে দেশ বিদেশে তারা নিজেদের কথা বল্‌তে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সব শুনে আমাদের বালকমনের প্রথম প্রতিক্রিয়া নকল পোর্ট আর্থার দখল করতে হবে। হলঘরের সোজা একটু দক্ষিণে যে জলশূন্য ডোবাটি ছিল সেটিকে দখল করবে একদল, আর একদল রক্ষা করবে। তুমুল যুদ্ধ চল্‌লো মাটির ঢেলায়। পোর্ট আর্থার দখল হলো — হত না হলেও আহতের সংখ্যা ছিল বেশ। তার জের কয়েকদিন চলেছিল। সাবু ধোপী আমাদের কাপড় ধুয়ে বোলপুর থেকে গাধার পিঠে করে অত লোকের কাপড় চোপড় নিয়ে আস্‌তো। বিদ্যালয়ের কম ছেলেই ছিল, যে সাবুর গাধার পিঠে না চেপেছে। সাবু কাপড় বুঝ দিতে গেলেই হতো অবসর। গাধার বিকট আওয়াজ আমাদের আনন্দধ্বনির সঙ্গে মিশে এক অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ মাষ্টার মশাইদের আকর্ষণ করে আন্‌তো। বেচারা গর্দ্দভ তখন নিষ্কৃতি লাভ করতো।

একবার চৈত্রমাসে ইঁদারার জল অসম্ভব কমে গেল। পরিমিত জলে স্নান সারতে হবে। বরাদ্দ হলো ছয় মগ জল, এর বেশী কেউ পাবে না। কেমন করে এত অল্পজলে স্নান সারবো চিন্তা হলো। মাষ্টার মশাই একজন নির্দ্দেশ দিচ্ছিলেন। 'প্রথমে এক মগ জল খুব হুঁশিয়ারভাবে আস্তে আস্তে মাথায় ঢাল — মাথার বাইরে যেন এক ফোঁটাও না পড়ে। আর এক মগ জল ঠিক এভাবেই ঢাল। মাথা থেকে জল গড়িয়ে শরীর বেশ ভিজিয়ে দিল। গামছা দিয়ে তখন সমস্ত শরীর গা, হাত, পা রগড়াও যেন শরীরের ময়লা উঠে যায়। তারপর উভয় কাঁধের উপর দিয়ে এক এক মগ জল ঢাল — সেই জল শরীর ধুইয়ে পরনের কাপড় যেন ভিজিয়ে দেয়। এখন সেই প্রথমবারের মত দুই মগ জল মাথায় আস্তে আস্তে ঢাল। এখন গা মুছে দু'মগ জল দিয়ে কাপড় কেচে নিংড়িয়ে স্নান শেষ কর।' কয়েকদিনের মধ্যেই এ ব্যবস্থা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল — অসুবিধার নিরসন হলো। আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও তোলা জলে স্নানে সেই অভ্যাস চলে আস্‌ছে। আর সব

চাইতে লাভের বিষয় — জীবনের নানা অপচয়ের এ স্মৃতি আমাকে রক্ষা করেছে। নিয়মিত তেল মাখ্‌তে হতো। সাবানের ব্যবহার না থাকার মধ্যেই।

বল্‌তে ভুলে গেছি ঘুম থেকে জেগে খুব ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌বার আগেই যে স্তোত্রটি বলতাম অভ্যাসবশতঃ আজও সেটি উচ্চারণ করতে ভুল হয় না।

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব,
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থম্,
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।।"

মাটিতে পা দেওয়ার সময় "সর্ব্বংসহা পৃথ্বী" — এই বলে প্রণাম করে ধরণীর কাছে আজও ক্ষমা প্রার্থনা করি। জন্মভূমিকে জননী বলার সার্থকতা কোথায়, এই থেকেই পরিণত বয়সে বুঝতে সহজ হয়েছে।

দিনের কাজ শেষ করে আগেই বলেছি গান শেখার পালা অথবা গল্প শোনা বা বুদ্ধির দৌড়ের নানা খেলা। এই খেলাগুলো গুরুদেব এক এক সময় দেখিয়ে দিয়ে যেতেন। রুমালে ঢাকা অনেকগুলো জিনিষ একনজরে দেখে প্রত্যেককে লিখতে হতো কি কি দেখেছি। আবার হয়ত অনেকগুলো উল্‌টা-পাল্‌টা শব্দ থেকে এক একটি পদ তৈরী করতে হতো। কোনো কোনো সময় জিজ্ঞাসা করা মাত্র কোনো জিনিষের উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি অনুমান করে ফুট ইঞ্চি বলা। সঠিক নজর ও বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষের সহায়ক অনেক কিছু খেলাই সে সময়ে জেনেছি। সব চাইতে চমৎকার লাগ্‌তো 'বারোয়ারি' গল্প বলায়। আমাদের ভেতর একজন গল্প বল্‌তে আরম্ভ করলো। কয়েক মিনিট পর আর একজন সেটি বাড়িয়ে চল্‌লো। এমনি করে কয়েকজনের পর একজনকে সেটি শেষ করতে বলা হলে দেখা যেতো — যে আরম্ভ করেছিল তার কল্পনার সমাপ্তির সঙ্গে বারোয়ারি গল্পটি অন্য রূপ পেয়ে গেছে। কী আমোদ তখন সকলের।

"লা-মিজারেবল্‌" গল্পটি যেদিন থেকে শুন্‌তে আরম্ভ করেছিলাম সারাদিন যেন পাগল হয়ে থাকতাম রাত্রি কখন হবে। কিন্তু রোজ তো আমাদের গল্প শোনার পালা থাক্‌তো না — ভারী দুঃখ হতো। সেই জিন ভ্যালজিনের দুঃখ দৈন্যে — সেই বরফ-পড়া রাত্রিতে ক্ষুধার জ্বালায় কুকুরের মতো কুণ্ডলী হয়ে কাটানো ইত্যাদি বালকমনকে সহানুভূতির চাইতে আরো কিছু ক্লিষ্ট করতো। সময়ে সময়ে অনেকে চোখ মুছতো। জগদানন্দবাবুর গল্প বলার ভঙ্গি ছিল অপূর্ব্ব আকর্ষণীয়। এই রকম আরো বিদেশী কাহিনী এই সময়ে আমাদের শুনবার সুযোগ হয়েছিল — যা বহুকাল পরেও নিজের পড়ার চাইতেও অনেক বেশী মনের উপর ছাপ দিয়েছিল।

আমাদের গান শেখার প্রথমদিকে নানা সুরের ব্রহ্মসঙ্গীত অভ্যাস করানো হয়েছিল। আগেই বলেছি, দিনুবাবু গান শেখাতেন। অজিত বাবু যখন এলেন, তিনিও গান শিখিয়েছিলেন। রাগিণীর বৈচিত্র্য বা তারতম্য কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু যত শক্ত সুরই হোক না কেন তার খোঁজ-খাজগুলো সহ আমাদের কণ্ঠে আদায় করে নিতেন মাষ্টার মশায়রা। সেদিনের কথা আজও মনে জাগে। অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশতলে যে রাত্রিতে "আজি

যত তারা তব আকাশে” গানটি শিখেছিলাম, তখন যেন কি এক অনুভূতি মনকে আচ্ছন্ন করে বালসুলভ চাঞ্চল্য স্তব্ধ করে দিয়েছিল। একদিকে বিশুদ্ধ রাগরাগিণী, অন্যদিকে আরাধনা — প্রার্থনার — আকুতির ভাবভরা পদ, শরীর ও মনে অপরূপ ক্রিয়া করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তারপর আবার যেদিন —

“দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে,
কর্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে।
দিন-অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে তোমায় নিশীথ-বিরাম-সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি,
ওগো অন্তরযামী।” —

গানটি শিখেছিলাম তাতে অন্তরযামীর স্পষ্টধারণা না হলেও অন্তরে অনুভববেদ্য একটি রূপ যেন ফুটে উঠেছিল।

এইভাবে কোনো কোনো দিন মনে গুরুগম্ভীর ভাবের দ্যোতনা। কোনো কোনো দিন বিনোদন পর্ব্বের হাস্যকৌতুক। আহারান্তে রাত্তিরে শোবার সময় কিন্তু নিত্য স্তোত্র পাঠ করতে ভুলতাম না।

“ত্বমেব মাতা চা পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেবঃ।”

স্তোত্রগুলি শিখিয়েছিলেন — ভূপেন সান্যাল মশায়। এর মানে জানবার নিজেদের প্রয়াস না হলেও — মাষ্টার মশায় যেভাবে আমাদের বুঝিয়েছিলেন তাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথাই মনে লেগেছিল।

আগে যে সব মাষ্টার মশায়দের কথা বলেছি — তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কিছুকাল পরে চলে যান। আবার নতুন কয়েকজনাকেও পাই। বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায় যখন এলেন তখন তাঁকে আমাদের বড়দের একজন বলেই মনে হোত। ছোট্ট মানুষটির মৃদু-মধুর কথা সকলকে আকর্ষণ করতো খুব বেশী। পরনে সাধারণ কাপড় — গায়ে সাধারণ জামা। কিন্তু অল্পদিনেই জেনেছিলাম তাঁর বিদ্যাবত্তার কথা। সামান্য বিছানা নিয়ে নিজের আস্তানা করেছিলেন লাইব্রেরী ঘরের একধারে। সারাদিন বই নিয়েই থাকতেন। খেতেন নিজে রেঁধে। এহেন মানুষটি দিলেন এনট্রান্স পরীক্ষা, হলেন ফেল। শিক্ষক দেন পরীক্ষা — আমরা অবাক। গুরুদেব বল্লেন ‘ভালই হয়েছে ফেল হয়ে।’ তাতেই তো তাঁর বিদ্যাবত্তা ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর কথা কি ভোলা যায়? সতীশ রায় মহাশয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তাঁর বন্ধু অজিত চক্রবর্ত্তী যোগদান করেছেন। কানাইবাবু ছিলেন আর একজন। তিনি পড়ানোর চাইতে তদারকিতেই নিযুক্ত থাক্‌তেন বেশী। শরৎ রায় মশায় — বর্ণটি কৃষ্ণ হলেও, ‘এসো’ বলে সম্ভাষণটি তাঁর খোলা মনকে বলে দিত। তিনি ভারতের ইতিহাসের কথা বল্‌তেন। শিখজাতি সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা ও গ্রন্থ গুরুদেবের অনুপ্রেরণায় তাঁকে স্মরণীয় করেছে। কলকাতায় কলেজে পড়বার সময়

তাঁকে পেতাম 'সঞ্জীবনী' কার্য্যালয়ে — পত্রিকা চালাতেন অর্থাৎ লিখতেন। জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় মশায়, মনে হয় আমাদের উদ্ভিদের কথা বল্‌তেন। তাঁর কথা শুনে শুনে গাছের বিভিন্ন অংশ ও পাতা দেখে দেখে আমাদের খাতায় আঁকতে হোত। গুরুদেবের মধ্যম জামাতা সত্যেন ভট্টাচার্য্য মশায় কিছুকাল সর্ব্বাধ্যক্ষের কাজে ছিলেন। লেবরেটরীতে যে একটি কঙ্কাল ঝুলানো থাক্‌তো — সেটি দেখিয়ে দেখিয়ে শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানাতেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে — কিছুদিন পরের কথা। বোলপুরের ডাক্তার, যিনি আমাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদারক করতেন, তিনিও আমাদের কাছে শরীরের মাংসপেশী, শিরা-উপশিরা এসব তাঁর সঙ্গে আনা কাটা-পাঁঠার মাংস এনে বুঝিয়ে দিতেন। একদিন বল্‌লেন ও দেখালেন যে মাংস-পেশী কাট্‌লে রক্ত বেরোয়। কিছুক্ষণ থাক্‌লেই রক্ত জমে যায়। এ সব চোখের সাম্‌নে দেখে আমাদের উৎসাহ খুবই বেড়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল হঠাৎ সত্যভূষণ (মজুমদার) — আমাদের সঙ্গী — একটা বোতল ভাঙার ভেতরে কতক রক্ত নিয়ে এসেছে, সেটা জমেও গেছে। সকলেই অবাক। ডাক্তারবাবু কোথা থেকে রক্ত পেল জিজ্ঞাসা করায় সত্যভূষণ তা'র বাঁ হাত দেখিয়ে দিল। বোতল ভাঙা দিয়ে কেটে সেই রক্তই ধরেছে। বললো — 'মশায় বল্‌লেন, সেটা পরীক্ষা করে দেখলাম ঠিক কিনা।' — যেভাবে হাত কেটেছে তাতে অসহ্য বেদনা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তার মুখে কোনো উদ্বেগের ভাবই ছিল না। কিন্তু ডাক্তারবাবুর দুশ্চিন্তা, ওষুধ দিয়ে তখন তখন ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। সত্যভূষণের কাণ্ডজ্ঞানবিহীন সাহসিকতার পরিচয় কেবল বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ হয় নাই। গুরুদেবের সঙ্গে বিলেতে গিয়েও গুণ্ডামির অপভ্রংশ দেখিয়ে নানা সময়ে গুরুদেবের উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছিল বলে শুনেছি।

আরও কয়েকজন ছেলের কথা মনে আস্‌ছে। নরভূপ বলে নেপালী একটি ছেলে তখন এসেছে। বাংলা বলা ও পড়া নিয়ে বেশ কসরৎ বেচারাকে করতে হয়েছে। ঠিক এরকমই মহারাষ্ট্রীয় বালক নারায়ণ কাশীনাথ দেবল — তারও সেই ভাষাবিভ্রাট। তার ছিল নানা উদ্ভাবনী বিদ্যা। পাল দেওয়া নৌকো গড়া — তাকে ভাসানো — ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাষার অসুবিধা কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাদের মিশ্‌তে কোনো বাধা হয় নাই। বালকমনের মিলনক্ষেত্র ভাবে - ভাষায় নয়। বরিশালের দুই ভাই দেবরঞ্জন, যোগরঞ্জন (গুহঠাকুরতা) এলো। সুধীরঞ্জন দাশের নখ-কামড়ানো ছিল সাংঘাতিক অভ্যাস — কিন্তু পড়াশুনোয়, গানে ছিল পারদর্শিতা। রাজসাহী থেকে এসেছিলেন নরেন খাঁ — ব্রাহ্মণাত্মজ। রং ময়লা, দোহারা চেহারায় সহাস্য মুখ আজও মনে পড়ে। আবৃত্তিতে পটু, গানও যে চেষ্টা না করতো এমন নয়। আমাদের ভিতর তখন গৌরদা (গৌরগোপাল ঘোষ) ও যোগেনদা (গাঙ্গুলী) একটু বড়। গৌরদা নাতিদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ গড়নের। ফুটবল খেলায় পরে মোহনবাগানের একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হয়েছিলেন। চাট্‌গাঁ থেকে ফণী (সেনগুপ্ত) এসেছিল, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের ছোট ভাই। তার সরলতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই তার উপর ঠিক অত্যাচার না হলেও ঐ জাতীয় কিছু না কিছু করতে আমোদ পেত।

আমরা জুজুৎসু বিশারদ সানো সান-এর কাছে জাপানী মল্লবিদ্যা শিক্ষা করি। কী সুগঠিত গৌরবর্ণ দেহ অথচ সাধারণ জাপানীদের মত খর্ব্বাকৃতিও নয়। শান্তপ্রকৃতি, মৃদুভাষী, কত যত্ন নিয়েই কুস্তি শেখাতেন বিশেষ ধরনের — মোটা দোসুতি খদ্দরের মত

মোটা 'কিমানো' পরতে হোত সে সময়ে। যোগেনদা ও গৌরদা খুব ভাল জুজুৎসুর মারপ্যাঁচ শিখেছিল। সানো সান-এর সঙ্গে তারা বেশ যুঝ্‌তো। কুস্তির সময়ে একদিন যোগেনদাকে সানো সান আঘাত করলেন এমনভাবে যে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়লো। আমরা তো ভীত সন্ত্রস্ত। আশ্চর্য্য, পেটের একদিকে একটু টিপে দিতেই আবার যোগেনদার স্বাভাবিক নিঃশ্বাস বইতে লাগ্‌লো। ভয় ও উৎকণ্ঠা থেকে আমরা রেহাই পেয়ে বাঁচলাম। বাস্তবিক পক্ষে ব্যাপারটা আমাদের কাছে ভোজবাজির মত লেগেছিল। কিন্তু যোগেনদা যা কাণ্ড করেছিলেন — তা ভীতিপ্রদ।

গুরুদেব তখন সুরেনঠাকুর মহাশয়কে আনিয়েছেন। মহাভারতের গল্প লিখে আমাদের পড়ে শোনাতে। গল্পগুলি ছাপা হয়েছিল মনে হয়। সেদিন আমরা শুন্‌ছি ধৃতরাষ্ট্রের লোহার ভীম চূর্ণের কথা। কী গায়ের জোর, এই সব আমাদের খুব উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা। ফণী বেচারা ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করে নিতে পারছিল না। যোগেনদা বল্‌লে 'এসো আমি দেখিয়ে দিই।' এই বলে ফণীকে এমন আলিঙ্গনই করলো যে সে 'মারা গেলুম' বলে চীৎকার। তার পরের খবর সহজেই অনুমেয়। বেচারা ক'দিন বেশ ভুগলো।

আমরা কয়েকজন সানো সান্‌-এর কাছে জাপানীভাষা শিখ্‌তাম। ইংরেজী ও জাপানী হরফে প্রাথমিক পুস্তক। জাপানী বর্ণমালা — ''ই রো হা নি হো হে টো'' — ইত্যাদি আজও মনে আছে। দু'চার কথা যে বল্‌তে না-পারতাম এমন নয়। কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারি নাই। সানো সান্‌ও চলে গেলেন।

জাপানী ছুতার কুসুমতো সান্‌ কাঠের কাজ শেখাবার জন্যে এসেছিলেন সানো সান্‌-এর আগে। তাঁর কাজের একাগ্রতা ও একক করণ-পদ্ধতি আমাদের খুবই তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিল। কাজের সময় কথাবার্ত্তা একদম বল্‌তেন না। আমরা ছিলাম তাঁর কাঠের জোগানদার। তাঁকে কুসুমবাবু বলে সকলে ডাকতো। বেশ আলাপী ও সদা হাস্যমুখ। অল্পদিনের মধ্যেই দু'খানা নৌকা তৈরী করলেন। কাঠ-বাঁকানো ও জোড়া দেওয়ার পদ্ধতি নতুন ধরনের। একখানার তলদেশ চেপ্টা — নামকরণ হলো 'চিত্রা' আরেকখানা 'সোনার তরী' শিরতোলা তলদেশ। নৌকার গায়ে নাম লিখ্‌লেন নরেন ভট্টাচার্য্য মশায় রং দিয়ে। ভাসানো হলো বাঁধে। পালাক্রমে নৌবিহার ও দাঁড় চালানোর জন্য উদগ্রীব থাক্‌তাম আমরা। কুসুমবাবু কিছুদিন আগরতলায় আর্টিজেন স্কুলে কাঠের কাজ শিখিয়েছিলেন। এখানে ব্যবহারের জন্য তিনি ছোট্ট একটি বই-এর সেল্‌ফ আমাকে তৈরী করে দিয়েছিলেন। নিপুণতা তাঁর এতেও বেশ প্রকাশ পেয়েছিল। অত ছোট শেল্‌ফের সঙ্গে দু'টি টানা ড্রয়ারও যুক্ত।

জগদানন্দবাবু গিয়েছিলেন ক'দিনের জন্য বাড়ীতে — কৃষ্ণনগর। তখনও তাঁর ছেলে পটলদা (ত্রিগুণানন্দ) আশ্রমে আসেন নি। তাঁর মা বেঁচে। ফিরলেন যেদিন, রাত্তিরে বোলপুর থেকে গরুর গাড়ী করে আস্‌ছেন। খোলা মাঠে রাস্তার পাশে কোথাও ঘর বাড়ী নেই। হঠাৎ 'হারে-রে-রে' করে এক ডাকাতের দল তাঁর গাড়ীর ছাউনির ওপর দড়াম্‌ দড়াম্‌ করে লাঠি মারতে লাগ্‌লো। জিনিষপত্র তচ্‌ নচ্‌ করে ফেলে দিয়ে কিছু

না পেয়ে তারা পালালো। মাষ্টার মশায় যখন আশ্রমে এসে পৌছুলেন, তখনও যেন তাঁর কথা ফোটে না। দেখা গেল, গাড়োয়ান জিনিষপত্র সবই পেয়েছে। কেবল সরভাজার হাঁড়িটা পায় নাই। সম্ভবতঃ ভেঙ্গে গিয়েছে ভাব্‌লো। সরভাজার ফরমাইস ছিল আমাদেরই। একটু ঠাণ্ডা হয়ে মাষ্টার মশায় ডাকাতদের ও ডাকাতির যে বিশদ বর্ণনা দিলেন, তাতে আমরা সকলে ভীত হয়েছিলেম বটেই, কিন্তু শোনার আগ্রহ কমেনি। খেতে বসেও মাষ্টার মশায় সবিস্তারে বলে যাচ্ছেন — ইয়া গোঁফ, ইয়া লম্বা লাঠি হাতে, গাল-পাট্টা চক্‌চকে ইত্যাদি। কিন্তু পাতে যখন সরভাজা পড়লো মাষ্টার মশায় চীৎকার করে উঠ্‌লেন — "বুঝেছি, এ কাদের কাজ" — আর তাঁর গল্প চল্‌লো না। এরকমই ছিল নির্দ্দোষ আমোদ — যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ে সমভাবেই অংশগ্রহণ করতেন। এর ওপর পরদিন গুরুদেবের অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে বাক্যের রসায়ন, জগদানন্দবাবুকে বেশ একটু বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল।

জীবনারম্ভের প্রত্যুষ থেকেই সাহস ও বীর্য্যলাভে যাতে নিষ্ঠা আমাদের ভিতর অনুপ্রাণিত হয় সেই শিক্ষাও পেয়েছিলাম। তখন সেটা ছিল আনন্দধারার মধ্যেই। স্বদেশী আন্দোলন। গুরুদেবের জাতীয় সঙ্গীতের জোয়ার এসেছে। 'একলা চলরে', 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্', 'জননীর দ্বারে আজি ওই', 'এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে', 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী', 'আমার সোনার বাংলা', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', ইত্যাদি বহু গান সর্ব্বদার জন্য আমাদের কণ্ঠে থাক্‌তো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে এক একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে গাঁয়ে গাঁয়ে গান গেয়ে ফিরেছি। কাঁচবাংলার ছেলেদের গান — নিরক্ষর দরিদ্র গ্রামবাসীরা কতভাবেই না সমাদর করতো। সেদিন আমরা গিয়েছি আশ্রমের পূর্বদিকের মাট পেরিয়ে পারুল বন ছাড়িয়ে বহুদূর এক গাঁয়ে। সূর্য্যি মাথার উপর। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। আমরা ক্লান্ত সে অবস্থায় আশ্রমে ফিরে আসা সম্ভব নয়। মাষ্টার মশায় কাঁদ থেকে হারমোনিয়াম নামিয়ে সকলকে নিয়ে ছায়ানিবিড় এক গাছতলায় বস্‌লেন—বিশ্রাম নেবার জন্যে। গ্রামটি খুবই ছোট—পনর বিশ ঘর বাসিন্দার বেশী বোধ হয় ছিল না। ঘর দরজার চেহারা তাদের দারিদ্র্যকে যেন আরো প্রকট করছিল। আমাদের আশে পাশে উলঙ্গ বালক বালিকারা জড়ো হয়েছে। প্রস্তাব হলো— ডাল চাল ভিক্ষে করে আহারের ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে। কয়েকজন ভিক্ষেতে গিয়ে আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাদের সেই কাঁকড়-ভরা মোটা চাল আর কড়াই ডাল নিয়ে এলো। মাটির হাঁড়ি আর কিছু শালপাতাও জোগাড় হলো। আমাদের প্রার্থনায় গাঁয়ের, বিশেষ করে গৃহিণীদের প্রথমতঃ কুণ্ঠাবিজড়িত করেছিল। কিন্তু দেওয়ার সময় বাড়ীতে যা ছিল সব দিয়েই যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। কথাটা ঘরে ঘরে রটে গেল—আমরা ভিক্ষেয় বেরিয়েছি। আমাদের প্রয়োজন কয়েক ঘরে পূরণ হয়ে গেল। অন্য সকলে দেবার আগ্রহ নিয়ে হাজির। না নিলে মন-ক্ষুন্ন হবে, তাই মুষ্টি ভিক্ষা সকলকার কাছ থেকেই নেওয়া হলো। হাঁড়িতে খিচুড়ি চাপানো হলো। খড় কুটো জোগাড়, উনুন জ্বালানো — বাতাসে আগুন নিভে না যায়, তার ব্যবস্থা। কী উৎসাহ, কী আনন্দ। ওদিকে খিচুড়ি পোড়া লেগে গন্ধ বেরুতেই 'নামাও-নামাও' করে হাঁড়ি নামানো হলো। দীর্ঘ সময় অভুক্ত, আরো পরিশ্রমে কাতর আমরা। সেই পোড়া খিচুড়িই অমৃতের মত সকলে শাল পাতায় পাতায়

নিয়ে নিঃশেষ করে ফেলা গেল। সে আস্বাদন আজও ভুলি নাই। এটুকু লিখবার সময় সেই গন্ধও যেন আমার নাকে আস্‌ছে।

কিছুকাল পরের কথা। ভূপেশ রায়কে গুরুদেব এনেছেন আশ্রমে। ঁসতীশ রায়ের ভাই তিনি; গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহ। তিনি গুরুদেবের জমিদারীতে পল্লীসংগঠন কাজে নিয়োজিত ছিলেন। চাষ আবাদে গ্রামবাসীদের সাহায্য ছাড়াও শারীরিক ব্যায়ামাদিও গ্রাম্য যুবকদের শেখাতেন। লাঠি ও সড়কি চালানোতে তিনি ছিলেন পারগ। কাজেই পুলিশের উৎপাত আরম্ভ হওয়াতেই তাঁকে গুরুদেব আশ্রমে নিয়ে এলেন। আমরা তাঁর কাছে লাঠিখেলা শিখ্‌তে লাগলাম। গুরুদেবের নির্দ্দেশে ও পরিকল্পনায় ভূপেশবাবুর নেতৃত্বে "অভয়ব্রতীর দল" তৈরী হলো। দেহমনকে সুগঠিত করে সমাজ-সেবার সেই প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের ভিতর মাথায় যারা একটুও বড় — তাদেরই অগ্রণী হওয়ার সুযোগ হয়েছিল দলে কাজ করবার।

রথীদা, সন্তোষদাকে আশ্রমের পাঠ সমাধা করার পর কৃষি ও গো-পালন বিদ্যা শিখ্‌বার জন্য গুরুদেব পাঠিয়ে দিলেন আমেরিকায়। এই ঘটনাটি আমাদের মনে এইভাবে প্রতিভাত হলো যে এখানকার পাঠ সমাধার অবশ্যম্ভাবী ব্যবস্থাই বিদেশে গিয়ে উচ্চ পর্য্যায়ের পাঠ গ্রহণ। এতে যে অনেকেই উত্তরকালে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সন্দেহ নাই।

বিদেশে যাওয়ার আগেই রথীদা, শমী ও গুরুদেবের সঙ্গে 'নতুন বাড়ী'তে বাস করছিলেন। এই বাড়িটিই আশ্রমের পূর্ব্ব সীমানার রাস্তার ধারে — খড়ের ছাউনী কয়েকখানা ঘরের পাশে ছোট্ট একটু দোতলা পাকা কোঠায় গুরুদেব থাক্‌তেন। দিনের কাজ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাঝে গুরুদেবের আবির্ভাব সকলেই আগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষা করতো। কোনো কোনো দিন আমাদের পাঠের স্থান 'নতুন বাড়ী'র কাছে গাছতলায় হলে, আমরাই গুরুদেবের দর্শন পেতাম সবার আগে। গর্ব্বে সেদিন আমাদের প্রাণ ভরে উঠতো। একদিন লেবরেটরী থেকে শাল গাছে গাছে তার টাঙানো হচ্ছিল। আমাদের ঔৎসুক্য খুব বেশী হলেও তখনও বুঝতে পারি নাই — ব্যাপার কি! লেবরেটরী ঘরে বসে কিছুক্ষণ পরে দিনুবাবু কথা বলার একটা যন্ত্রের কাছে গান গাইতে লাগলেন। আমাদের বলা হলো 'নতুন বাড়ীতে গিয়ে দিনুবাবুর গান শোন'। দৌড়ে সেখানে গিয়ে কানে শোনবার যন্ত্র দিয়ে দিনুবাবুর গান শুনে অবাক। আবার ফিরে এলাম লেবরেটরী ঘরে — এ কেমন করে হয় পরখ করার জন্যে। একদিকে গানের আকর্ষণ, অন্যদিকে তারের ভিতর দিয়ে দিনুবাবুর গান কি করে আসে — আমাদের চমৎকৃত করেছিল। জগদানন্দবাবু তখন ব্যাপারটি যতদূর সম্ভব সহজ করে বলে দিলেন। তড়িতের যোগে তার একদিক থেকে অন্যদিকে শব্দ বহন করে নেয় — তাই আমরা শুন্‌তে পাই — আর এরই নাম টেলিফোন সেদিন থেকে জেনেছি। আর তার ব্যবহার যেভাবে হয়, তাও তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন। অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনে সদা উন্মুখ বালকমনের আগ্রহকে এইভাবে রূপ দেওয়া ছিল শিক্ষার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি।

এই যে শিক্ষা ও বিনোদন পর্ব্বের ভিতর দিয়ে আমরা বেড়ে উঠছিলাম — এতে আনন্দানুভূতিই সজীব করে রাখ্‌তো সবাইকে। নিয়মের নিগড় ছিল না কোথাও —

প্রয়োজনানুযায়ী নিয়মকে নিয়মিত করতাম আমরাই। কাজেই নিয়মভঙ্গের চিন্তা মাষ্টার মশায়দের সেভাবে পেত না। ব্যতিক্রম অবিশ্যি ছিল — কাজেই শাস্তির অভিনব বিধানও ছিল। খুব ভাল একটা পেয়ারাগাছ ছিল ইঁদারার কাছে। গাছ থেকে নিজেরা পেয়ারা পেড়ে খাওয়া নিষেধ। কে একজন পেয়ারা খেয়েছে — জিজ্ঞাসা না করে। এই অন্যায় আচরণের জন্য তার শাস্তি হলো 'নুন ভাত খাওয়া'। ভাতের বদলে 'সাগু খাওয়া' কোনো কোনো সময়ে শাস্তি দেওয়া হতো। সব চাইতে কষ্টকর হতো কেউ যখন কথা বলতো না। তখন খেলা খাওয়া সব কিছুই কেমন যেন হয়ে যেত। সমাজের বাইরে যেন ঠেলে দেওয়া হয়েছে — এই অনুভূতি মনকে পীড়া দিত।

একদিকে এই বিধান, অন্যদিকে আমাদের প্রথম পর্য্যায়ে যখন শিশুমন সারাক্ষণ খেলায় মগ্ন থাক্‌তে অভ্যস্ত, তখন পাঠাভ্যাসের পাশে তৈরী থাক্‌তো খেলার সরঞ্জাম। নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে যারা পাঠ সমাপন করতে পারতো — তাদের সেই সময়ে খেলার সুযোগ হতো। ফুটবল তো ছিলই। আর ছিল বিলাতী খেলা 'ক্রোকে' (Croquet)। এই খেলার সরঞ্জাম কাঠের বড় বল, তাকে ঠুকে ঠুকে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে — খিলানের আকারে মাটিতে বসানো কয়েকটি লোহার খুঁটির ভিতর দিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে কে আগে পৌঁছুতে পারে। লোহার খুঁটির গায়ে বল লাগ্‌তেই তাকে আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হবে। ঘন্টা শেষ হওয়ার আগেই কে ঠিকভাবে নিজের বলটিকে নির্দ্দিষ্ট সীমানায় ঠুকে নিতে পারে — তার জন্য আমাদের অভিনিবেশই বা ছিল কত! এই খেলার সময়েই hoop ও mallet শব্দ দু'টি শিখেছিলাম মনে আছে।

শীতকালে কুয়াসার মধ্যে আর এক খেলা ছিল। তাকে জাপানী খেলা বলেই জানতাম। মুখোমুখি দুই সারি ছেলে দাঁড়াতো। কুয়াসার ভেতর একজন দৌড়াল — তাকে খুঁজে ধরবার জন্য অন্য লাইনের আর একজন তার পেছন নিল। এইভাবে একের পর এক। প্রায়ই দেখা যেত কুয়াসা কমে গেলে — অনেকেই উল্টো দিকে তার প্রতিপক্ষের জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন হাসির হুল্লোড় বয়ে চল্‌তো।

মিঃ কেলকার নামে শিক্ষকশ্রেণীর এক মারাঠী যুবক ছিলেন কিছুকাল। তিনি আমাদের ক্রিকেট খেলার পত্তন করে যান। কী জোরে বল করতেন! আমার তো বুড়ো আঙ্গুলের নখই উঠে গিয়েছিল। তখন তো আমরা এই খেলায় গ্লাভ্‌স্ ইত্যাদি পরা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ — কিছু ছিলও না সেখানে।

দুবেলা পরিশ্রমের পর মুখরোচক খাওয়ার আকাঙ্ক্ষার চাইতে পেটভরে খাওয়ার জন্য প্রত্যেকেই ব্যস্ত ছিল। আহারের ব্যবস্থায় পুষ্টিকর যা সম্ভবপর — ডাল, তরকারী, ঘি, দুধ ইত্যাদি সবই পেয়েছি। আর জলখাবারে মাঝে মাঝে দেওয়া হতো চিনির রসে ভেজান ভাজা চীনে-বাদাম। তখনকার খাদ্য সম্বন্ধে প্রখ্যাত ছিলেন — ডাঃ চুণীলাল বসু। তিনি মাঝে মাঝে আস্‌তেন। চীনে-বাদাম ব্যবহারের উপর ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক; সেই সময় আমরাও কিছুকাল চীনে-বাদাম চাষে মনোযোগী ছিলাম।

বরিশালনিবাসী লম্বা সতীশঠাকুর ছিলেন রান্নাঘরে, তাঁর সহকারী চণ্ডীঠাকুর। আমাদের প্রথম আমলে সতীশঠাকুরের আগে কে ছিলেন স্মরণ নাই। সম্ভবতঃ বিপিন

নামধেয় ছিলেন ঠাকুরদের জোগানদার। আমাদের খাবার সময় জায়গা করা, শালপাতার থালা ধুয়ে প্রত্যেককে দেওয়া ইত্যাদি বিপিনের কাজের মধ্যে। সতীশঠাকুর খুব যত্ন নিয়েই সকলকে পরিবেশন করতেন। তাঁরই দেশে আমার মামার বাড়ী, তাই সতীশঠাকুরকে আমার প্রতি পক্ষপাতিত্বের খোঁটা কেউ কেউ দিতে ছাড়তো না।

'নীচু বাংলা' তৈরী হয়ে গেলে ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ সেখানে এলেন। আমলকী গাছের তলায় তলায় কাঁকড়ের রাস্তায় টুক্‌টুক্ করে তাঁর বেড়ানো যেন আজো চোখে ভাস্‌ছে। আর তাঁর ঘন ঘন উচ্চহাস্য নীচু বাংলা থেকে আমাদের আশ্রমে যখন পৌঁছুতো তখন বুঝতাম গুরুদেব ও তাঁর সঙ্গী শিক্ষকরা এই ঋষি কবিকে আলোচনায় মত্ত করে রেখেছেন। কর্ম্মজীবনে আশ্রমের সঙ্গে তাঁর যোগ না থাক্‌লেও তাঁর মহান চরিত্রের প্রভাব আশ্রম জীবনকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। পশুপাখী ফুল লতা পাতা সব কিছুই তিনি কিভাবে দেখ্‌তেন আর তাদের ব্যবহার করতেন — আশ্রমে তখন যাঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষ করে ধন্য হয়েছেন। খাওয়ার সময় কাঠবিড়ালী, শালিকের চাহিদা মেটাতে তিনি থাক্‌তেন ব্যস্ত। বাগানের ফুল অযথা ছিঁড়লে তিনি যে কি ব্যথা অনুভব করতেন তা ছেলেদের মধ্যে অনেকেরই মনে থাক্‌বে। জগৎপিতার পূজার ডালিরূপে ফুটেছে — এরা নিঃসহায় — এদের নখাঘাতে ছিন্ন করার অধিকার আমাদের নেই — এই সব দার্শনিক মন্তব্য অর্থবোধ না হ'লেও আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে দিত। আর দেখেছি, লেখা যখন ছাড়তেন, তখন কাগজ ভাঁজ করে বইয়ের মলাট, চশমার খাপ, ছোট বড় নানা-ধরনের বাক্স তৈরী করতেন। ছুরি কাঁচির সাহায্য নিতেন না, ভাঁজ করার এমনই কৌশল ছিল।

এ হেন ঋষি কবির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তাঁর পুত্রবধূ হেমলতা দেবী, আমাদের "বড়-মা"। তাঁর স্নেহের আকর্ষণ, মধুর আলাপনে আমাদের বালক মনকে কি অনুভূতিতে টেনে নিত, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মা-কে ছেড়ে এসেছি, সে অনুভূতি যেন তাঁরই ছিল। তিনি তাঁর স্নেহকোমল ভাষায়, আদর আপ্যায়নে, নতুন নতুন খাবার তৈরী করে আমাদের খাইয়ে যেন কত পরিতোষ লাভ করতেন, — এই সব আজ ভাবি আর ভাবি। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে যখন তিনি বিশ বাইশ বছরের কোঠা পেরিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ, তখন আমাদের মত কতগুলি শিশুপ্রাণের মাতৃ-সম্বোধনের মূর্ত্তপ্রকাশ তাঁর হৃদয়ে উদ্বোধিত হয়েছিল কার ইঙ্গিতে? "ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে" — কবির একথার পূর্ণ অভিব্যক্তি, পরিচয় আজ 'বড়-মা'র কথা স্মরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই স্নেহ ও ভালবাসার পরিচর্য্যা জীবনপ্রভাতে যে হৃদয়ে অবিশ্রাম সঘন কম্পন দিচ্ছিল — সংসারের শোক, দুঃখ বা সুখের ভিতর দিয়েও নিজ কর্ম্মের পরিধি তাঁর পরিণত জীবনকে সেই ভাবেই ধন্য করে আসছে। তৃষিত শুষ্ক অপরিতৃপ্ত বন্ধনীঘেরা হৃদয়-গুলিকে বাক্যহীন প্রকৃতির স্পর্শানুভূতির মত শান্তি, স্নেহ ও করুণাদানই যেন তাঁর জীবনের ব্রত। এ হেন মহীয়সী স্নেহময়ীর কথা কি ভুলে থাকা যায়? কৃতজ্ঞ অন্তরের প্রণতি তাই আপনা থেকেই এসে পড়ে। জীবনে এ অনুভূতি বা শিক্ষার সুযোগ তাও আমরা পেয়েছি আশ্রম-জীবনে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদিযুগের কথা, ভাষার দৈন্যে, শোনাবার যোগ্যতাকে আবৃত করে ফেলেছে। নিষ্কলুষ দৃষ্টিভঙ্গি, সহজ অনাড়ম্বর অথচ পরিপাটি জীবনযাপন, অপচয় থেকে নিজকে বাঁচিয়ে নেওয়ার অভ্যাস, নীরব অথচ নিবিড়ভাবে গ্রহণে উন্মুখ মন নিয়ে দুর্য্যোগের মধ্যে অবিচলিত থেকে যে পথ চলা — শিশু, বালক, কিশোর আশ্রমবাসীর প্রাণে কেমন করে সে সব শিক্ষা দিনের পর দিন সঞ্চারিত হয়েছে — তাহা চিন্তনীয়।

এ কথাটাই সব চাইতে আজ বেশী মনে আস্ছে — শিশু বা বালকের অবচেতন মনে যে আনন্দানুভূতির বীজ নিহিত রয়েছে, তা'কে প্রকৃতির কোমল আবেষ্টনে নীরব চিন্তায় — তা'কে উপাসনা বা যা-ই বলুন — নিয়ত অভ্যাসে অনুভব করা, তা'কে জীবন ভ'রে সঞ্চারিত করাই আশ্রমের কল্যাণকর, মঙ্গলকর দান। অধ্যাত্ম-চিন্তা-বিগর্হিত নীতি যে, শিক্ষা-জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করতে পারে না — সেই শিক্ষার ভিতর যে শিথিল হতে বাধ্য আমাদের আশ্রম-জীবনের প্রতি কর্ম্মের ভিতর দিয়ে তা'কে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন গুরুদেব।

সেই আনন্দানুভূতিতে যে ছেদ পড়তে পারে, মনে আসে নাই। বিধানকর্ত্তার বিধান, সংসারের ঘটনা প্রবাহ আমাকে সরিয়ে আন্‌লো গতানুগতিক জীবনস্রোতে। অভাববোধ নতুন করে অনুভব করেছি, কিন্তু কিসের!

গুরুদেব সেদিন বালকের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ-লিপিতে যে-বাণী পাঠিয়েছিলেন, তাতে এই কথাই স্পষ্টতর ছিল —

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে —"।

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথের আগরতলায় রচিত সংগীতসমূহ

(সম্ভাব্য রচনাকাল ঃ— ১০ই হইতে ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৩২)

(১)

দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা হৃদয়-আকাশে,
দোল-ফাগুনের চাঁদের আলোয় সুধায় মাখা সে।
কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে বচনহারা ধ্যানের পারে
কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে ছিল ঢাকা সে।।
দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল গোপন রেণুকা।
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে
আমার গানের সুরে সুরে রইল আঁকা সে।।

(২)

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।।
দিল তারে বনবীথি কোকিলের কলগীতি
ভরি দিল বকুলের গন্ধে।।
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে।।

(৩)

এসো আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে।।
স্বপনদুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।
ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে
এসো আমার ঘরে।।
দুঃখসুখের দোলে এসো, প্রাণের হিল্লোলে এসো।
ছিলে আশার অরূপবাণী ফাগুনবাতাসে
বনের আকুল নিশ্বাসে —
এবার ফুলের প্রফুল্লরূপ এসো বুকের 'পরে।।

(৪)

বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি।
কোন্ সুদূরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি।।
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে, পাতায় পাতায় নাচন লাগে গো —
এমন মধুর গানের বেলায় সেই শুধু রয় বাকি।।
উদাস-করা হৃদয়-হরা না জানি কোন্ ডাকে
সাগরপারের বনের ধারে কে ভুলালো তাকে।
আমার হেথায় ফাগুন বৃথায় বারে বারে ডাকে - যে তায় গো —
এমন রাতের ব্যাকুল ব্যথায় কেন সে দেয় ফাঁকি।।

(৫)

আপনহারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে —
ওগো সাকী, দেবে না কি পেয়ালা মোর ভ'রে ভ'রে।।
রসের ধারা সুধায় ছাঁকা, মৃগনাভির আভাস মাখা,
বাতাস বেয়ে সুবাস তারি দূরের থেকে মাতায় মোরে।।
মুখ তুলে চাও, ওগো প্রিয়ে — তোমার হাতের প্রসাদ দিয়ে
এক রজনীর মতো এবার দাও-না আমায় অমর ক'রে।
নন্দননিকুঞ্জশাখে অনেক কুসুম ফুটে থাকে —
এমন মোহন রূপ দেখি নাই, গন্ধ এমন কোথায় ওরে।।

দেশীয় রাজ্য *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(আগরতলায় ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনীতে কবি কর্ত্তৃক পঠিত)

দেশ ভেদে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভেদ হইয়া থাকে, একথা সকলেই জানেন। সেই ভেদকে স্বীকার না করিলে কাজ চলে না। যাহারা বিল খালের মধ্যে থাকে, তাহারা মৎস্যব্যবসায়ী হইয়া উঠে; যাহারা সমুদ্রতীরের বন্দরে থাকে, তাহারা দেশ বিদেশের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়; যাহারা সমতল উর্ব্বরা ভূমিতে বাস করে, তাহারা কৃষিকে উপজীবিকা করিয়া তোলে। মরুপ্রায় দেশে যে আরব বাস করে, তাহাকে যদি অন্য-দেশবাসীর ইতিহাস শুনাইয়া বলা যায় যে, কৃষির সাহায্য ব্যতীত উন্নতিলাভ করা যায় না, তবে সে উপদেশ ব্যর্থ হয়; এবং কৃষিযোগ্য স্থানের অধিবাসীর নিকট যদি প্রমাণ করিতে বসা যায় যে, মৃগয়া এবং পশুপালনেই সাহস ও বীর্য্যের চর্চ্চা হইতে পারে, কৃষিতে তাহা নষ্টই হয়, তবে সেরূপ নিষ্ফল উত্তেজনা কেবল অনিষ্ট ঘটায়।

বস্তুত ভিন্ন পথ দিয়া ভিন্ন জাতি ভিন্ন শ্রেণীর উৎকর্ষলাভ করে — এবং সমগ্র মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিলাভের এই একমাত্র উপায়। য়ুরোপ কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধাবশত যে বিশেষ প্রকারের উন্নতির অধিকারী হইয়াছে, আমরা যদি ঠিক সেই প্রকার উন্নতির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি, তবে নিজেকে ব্যর্থ ও বিশ্বমানবকে বঞ্চিত করিব। কারণ আমাদের দেশের বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে আমরা মনুষ্যত্বের যে উৎকর্ষলাভ করিতে পারি, পরের বৃথা অনুকরণ চেষ্টায় তাহাকে নষ্ট করিলে এমন একটা জিনিষকে নষ্ট করা হয়, যাহা মানুষ অন্য কোন স্থান হইতে পাইতে পারে না। সুতরাং বিশ্বমানব সেই অংশে দরিদ্র হয়। চাষের জমিকে খনির মত ব্যবহার করিলে ও খনিজের জমিকে কৃষিক্ষেত্রের কাজে লাগাইলে মানব সভ্যতাকে ফাঁকি দেওয়া হয়।

যে কারণেই হউক, য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের কতকগুলি গুরুতর প্রভেদ আছে। উৎকট অনুকরণের দ্বারা সেই প্রভেদকে দূর করিয়া দেওয়া যে কেবল অসম্ভব, তাহা নহে, দিলে তাহাতে বিশ্বমানবের ক্ষতি হইবে।

আমরা যখন বিদেশের ইতিহাস পড়ি বা বিদেশের প্রতাপকে প্রত্যক্ষ চক্ষে দেখি, তখন নিজেদের প্রতি ধিক্কার জন্মে — তখন বিদেশীর সঙ্গে আমাদের যে যে বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাই, সমস্তই আমাদের অনর্থের হেতু বলিয়া মনে হয়। কোনো অধ্যাপকের অর্ব্বাচীন বালক-পুত্র যখন সার্কাস দেখিতে যায়, তাহার মনে হইতে পারে যে, অমনি করিয়া ঘোড়ার পিঠের উপরে দাঁড়াইয়া লাফালাফি করিতে যদি শিখি এবং দর্শকদলের বাহবা পাই, তবেই জীবন সার্থক হয়। তাহার পিতার শান্তিময় কাজ তাহার কাছে অত্যন্ত নির্জ্জীব ও নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ স্থলে পিতাকে ধিক্কার দিবার কারণ থাকিতেও পারে। সার্কাসের খেলোয়াড় যেরূপ অক্লান্ত সাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা নিজের ব্যবসায়ে উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, সেইরূপ উদ্যম ও উদ্‌যোগের অভাবে অধ্যাপক যদি নিজের কর্ম্মে উন্নতিলাভ না করিয়া থাকেন, তবেই তাহাকে লজ্জা দেওয়া চলে।

* প্রথম প্রকাশিত — বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়), ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য অনুভব করিয়া যদি আমাদের লজ্জা পাইতে হয়, তবে লজ্জার কারণটা ভাল করিয়া বিচার করিতে হয়, নতুবা যথার্থ লজ্জার মূল কখনই উৎপাটিত হইবে না। যদি বলি যে, ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট আছে, ইংলণ্ডের যৌথ কারবার আছে, ইংলণ্ডে প্রায় প্রত্যেক লোকই রাষ্ট্রচালনায় কিছু না কিছু অধিকারী, এইজন্যই তাঁহারা বড়, সেইগুলি নাই বলিয়াই আমরা ছোট, তবে গোড়ার কথাটা বলা হয় না। আমরা কোনো কৌতুকপ্রিয় দেবতার বরে যদি কয়েকদিনের জন্য মূঢ় আবুহোসেনের মত ইংরেজী মাহাত্ম্যের বাহ্য অধিকারী হই — আমাদের বন্দরে বাণিজ্যতরীর আর্বিভাব হয় — পার্লামেন্টের গৃহচূড়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠে, তবে প্রথম অঙ্কের প্রহসন পঞ্চম অঙ্কে কি মর্ম্মভেদী অশ্রুপাতেই অবসিত হয়! আমরা একথা যেন কোনো মতেই না মনে করি যে, পার্লামেন্ট মানুষ গড়ে — বস্তুত মানুষই পার্লামেন্ট গড়ে। মাটি সর্ব্বত্রই সমান; সেই মাটি লইয়া কেহ বা শিব গড়ে, কেহ বা বানর গড়ে; যদি কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে মাটির পরিবর্ত্তন নহে, যে ব্যক্তি গড়ে, তাহার শিক্ষা ও সাধনা, চেষ্টা ও চিন্তার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি সংস্কৃত বাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি — **"কিলবিদুর্বীরতাং সারমেকং"** — বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেন্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্য্যই সার। এই বীর্য্য দেশ-কাল-পাত্র ভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয় — কেহ বা শস্ত্রে বীর, কেহ বা শাস্ত্রে বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্ম্মে বীর , কেহ বা কর্ম্মে বীর।.বর্ত্তমানে আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রতিভাকে আমরা পূর্ণ উৎকর্ষের দিকে লইয়া যাইতে পারিতেছি না, তাহার কতকগুলি কারণ আছে — কিন্তু সর্ব্বপ্রধান কারণ বীর্য্যের অভাব। এই বীর্য্যের দারিদ্র্যবশত যদি নিজের প্রকৃতিকেই ব্যর্থ করিয়া থাকি, তবে বিদেশের অনুকৃতিকে সার্থক করিয়া তুলিব কিসের জোরে?

আমাদের আম বাগানে আজকাল আম ফলে না, বিলাতের আপেল বাগানে প্রচুর আপেল ফলিয়া থাকে। আমরা কি তাই বলিয়া মনে করি যে, আমগাছগুলো কাটিয়া ফেলিয়া আপেলগাছ রোপণ করিলে তবেই আমরা আশানুরূপ ফল লাভ করিব? এই কথাই নিশ্চয় জানিতে হইবে, আপেলগাছে যে বেশী ফল ফলিতেছে, তাহার কারণ তাহার গোড়ায়, তাহার মাটিতে সার আছে — আমাদের আম বাগানের জমির সার বহুকাল হইতে নিঃশেষিত হইয়া গেছে। আপেল পাই না, ইহাই আমাদের মূল দুর্ভাগ্য নহে; মাটিতে সার নাই, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। সেই সার যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত, তবে আপেল ফলিত না, কিন্তু আম প্রচুর পরিমাণে ফলিত এবং তখন সেই আম্রের সফলতায় আপেলের অভাব লইয়া বিলাপ করিবার কথা আমাদের মনেই হইত না। তখন দেশের আম বেচিয়া অনায়াসে বিদেশের আপেল হাটে কিনিতে পারিতাম, ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিয়া একরাত্রে পরের প্রসাদে বড়লোক হইবার দুরাশা মনের মধ্যে বহন করিতে হইত না।

আসল কথা দেশের মাটিতে সার ফেলিতে হইবে। সেই সার আর কিছুই নহে — **"কিলবিদুর্বীরতাং সারমেকং"** — বীরতাকেই একমাত্র সার বলিয়া জানিবে। ঋষিরা বলিয়াছেন — 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" — এই যে আত্মা, ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন। বিশ্বাত্মা, পরমাত্মার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্ — যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, সে নিজের আত্মাকে পায় না — নিজের আত্মাকে যে ব্যক্তি নিজে সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়াছে, সে অপর কিছুকেই লাভ করিতে পারে না। য়ুরোপ নিজের আত্মাকে যে পথ দিয়া লাভ করিতেছে, সে পথ আমাদের সম্মুখে নাই; কিন্তু যে মূল্য দিয়া লাভ করিতেছে, তাহা আমাদের পক্ষেও অত্যাবশ্যক — তাহা বল, তাহা বীর্য্য। য়ুরোপ যে কর্ম্মের দ্বারা যে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছে, আমরা সে কর্ম্মের দ্বারা সে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিব না — আমাদের সম্মুখে অন্য পথ, আমাদের চতুর্দ্দিকে অন্যরূপ পরিবেশ, আমাদের অতীতের ইতিহাস অন্যরূপ, আমাদের শক্তির মূল-সঞ্চয় অন্যত্র, কিন্তু আমাদের সেই বীর্য্য আবশ্যক, যাহা থাকিলে পথকে ব্যবহার করিতে পারিব, পরিবেশকে অনুকূল করিতে পারিব, অতীতের ইতিহাসকে বর্ত্তমানে সফল করিতে পারিব এবং শক্তির গূঢ় সঞ্চয়কে আবিষ্কৃত, উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহার অধিকারী হইতে পারিব। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ---- আত্মা ত আছেই, কিন্তু

বল নাই বলিয়া তাহাকে লাভ করিতে পারি না। ত্যাগ করিতে শক্তি নাই, দুঃখ পাইতে সাহস নাই, লক্ষ্য অনুসরণ করিতে নিষ্ঠা নাই; — কৃশ সঙ্কল্পের দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণ শক্তির আত্মবঞ্চনা, সুখবিলাসের ভীরুতা, লোকলজ্জা, লোকভয়, আমাদিগকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যথার্থভাবে আত্মপরিচয়, আত্মলাভ, আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে দূরে রাখিতেছে। সেই জন্যই ভিক্ষুকের মত আমরা অপরের মাহাত্ম্যের প্রতি ঈর্ষা করিতেছি এবং মনে করিতেছি, বাহ্য অবস্থা যদি দৈবক্রমে অন্যের মত হয়, তবেই সকল অভাব, সকল লজ্জা দূর হইতে পারে।

বিদেশের ইতিহাস যদি আমরা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখি, তবে দেখিতে পাইব, মহত্ত্ব কত বিচিত্র প্রকারের — গ্রীসের মহত্ত্ব এবং রোমের মহত্ত্ব একজাতীয় নহে — গ্রীস বিদ্যা ও বিজ্ঞানে বড়, রোম কর্ম্মে ও বিধিতে বড়। রোম তাহার বিজয়-পতাকা লইয়া যখন গ্রীসের সংস্রবে আসিল, তখন বাহুবলে ও কর্মবিধিতে জয়ী হইয়াও বিদ্যাবুদ্ধিতে গ্রীসের কাছে হার মানিল, গ্রীসের কলাবিদ্যা ও সাহিত্য বিজ্ঞানের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তবু সে রোমই রহিল, গ্রীস হইল না — সে আত্মপ্রকৃতিতেই সফল হইল, অনুকৃতিতে নহে — সে লোক সংস্থান কার্য্যে জগতের আদর্শ হইল, সাহিত্য বিজ্ঞান কলাবিদ্যায় হইল না।

ইহা বুঝিতে হইবে, উৎকর্ষের একমাত্র আকার ও একমাত্র উপায় জগতে নাই। আজ য়ুরোপীয় প্রতাপে যে আদর্শ আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে, উন্নতি তাহা ছাড়াও সম্পূর্ণ অন্য আকারের হইতে পারে — আমাদের ভারতীয় উৎকর্ষের যে আদর্শ আমরা দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার, বলসঞ্চার করিলে জগতের মধ্যে আমাদিগকে লজ্জিত থাকিতে হইবে না। একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানের দ্বারা, ধর্ম্মের দ্বারা চীন-জাপান, ব্রহ্মদেশ-শ্যামদেশ, তিব্বত-মঙ্গোলিয়া, — এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশই জয় করিয়াছিল; আজ য়ুরোপ অস্ত্রের দ্বারা, বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে — আমরা ইস্কুলে পড়িয়া এই আধুনিক য়ুরোপের প্রণালীকেই যেন একমাত্র গৌরবের কারণ বলিয়া মনে না করি।

কিন্তু ইংরেজের বাহুবল নহে, ইংরেজের ইস্কুল ঘরে-বাহিরে, দেহে-মনে, আচারে-বিচারে সর্ব্বত্র আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। আমাদিগকে যে সকল বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, তাহাতে অন্তত কিছুকালের জন্যও আমাদের আত্মপরিচয়ের পথ লোপ করিতেছে। সেই আত্মপরিচয় ব্যতীত আমাদের কখনও আত্মোন্নতি হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির যথার্থ উপযোগিতা কি, তাহা এইবার বলিবার সময় উপস্থিত হইল।

দেশ বিদেশের লোক বলিতেছে, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িতেছে। জগতের উন্নতির যাত্রাপথে পিছাইয়া পড়া ভাল নহে, একথা সকলেই স্বীকার করিবে, কিন্তু অগ্রসর হইবার সকল উপায়ই সমান মঙ্গলকর নহে। নিজের শক্তির দ্বারাই অগ্রসর হওয়া যথার্থ অগ্রসর হওয়া— তাহাতে যদি মন্দগতিতে যাওয়া যায়, তবে সেও ভাল। অপর ব্যক্তির কোলে-পিঠে চড়িয়া অগ্রসর হওয়ার কোনো মাহাত্ম্য নাই — কারণ চলিবার শক্তিলাভই যথার্থ লাভ, অগ্রসর হওয়ামাত্রই লাভ নহে। বৃটিশ রাজ্যে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের কৃতকার্য্যতা কতটুকু! সেখানকার শাসন-রক্ষণ-বিধি-ব্যবস্থা যত ভালই হউক না কেন, তাহা ত বস্তুত আমাদের নহে। মানুষ ভুল ত্রুটি ক্ষতি ক্লেশের মধ্য দিয়াই পূর্ণতার মধ্যে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমাদিগকে ভুল করিতে দিবার ধৈর্য্য যে বৃটিশ রাজ্যের নাই। সুতরাং তাঁহারা আমাদিগকে ভিক্ষা দিতে পারেন, শিক্ষা দিতে পারেন না। তাঁহাদের নিজের যাহা আছে, তাহার সুবিধা আমাদিগকে দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা স্বত্ব দিতে পারেন না। মনে করা যাক্ — কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটির পূর্ব্ববর্ত্তী কমিশনারগণ পৌরকার্য্যে স্বাধীনতা পাইয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, সেই অপরাধে অধীর হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। হইতে পারে, এখন কলিকাতার পৌরকার্য্য পূর্ব্বের চেয়ে ভালই চলিতেছে, কিন্তু এরূপ ভাল চলাই যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের নিজের শক্তিতে ইহা অপেক্ষা খারাপ চলাও আমাদের পক্ষে ইহার চেয়ে ভাল। আমরা গরীব

এবং নানা বিষয়েই অক্ষম, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যে ধনি-জ্ঞানী বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তুলনীয় নহে বলিয়া শিক্ষাবিভাগে দেশীয় লোকের কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করিয়া রাজা যদি নিজের জোরে কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের নকল প্রতিমা গড়িয়া তুলেন, তবে তাহাতে আমাদের কতটুকুই বা শ্রেয় আছে — আমরা গরীবের যোগ্য বিদ্যালয় যদি নিজে গড়িয়া তুলিতে পারি, তবে সে-ই আমাদের সম্পদ্। যে ভাল আমার আয়ত্ত ভাল নহে, সে ভালকে আমার মনে করাই মানুষের পক্ষে বিষম বিপদ। অল্পদিন হইল, একজন বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট দেশীয় রাজ্যশাসনের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিলেন — তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, তিনি মনে করিতেছেন, ব্রিটিশ রাজ্যের সুব্যবস্থা সমস্তই যেন তাঁহাদেরই সুব্যবস্থা; — তিনি যে ভারবাহী মাত্র, তিনি যে যন্ত্রী নহেন, যন্ত্রের একটা সামান্য অঙ্গমাত্র, একথা যদি তাঁহার মনে থাকিত, তবে দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার প্রতি এমন স্পর্দ্ধার সহিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রিটিশ রাজ্যে আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা যে আমাদের নহে, এই সত্যটি ঠিকমত বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে। এই কারণেই আমরা রাজার নিকট হইতে ক্রমাগতই নূতন নূতন অধিকার প্রার্থনা করিতেছি এবং ভুলিয়া যাইতেছি — অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া একই কথা নহে।

দেশীয় রাজ্যের ভুলত্রুটি-মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের প্যায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলা দেশে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই কারণেই এখানকার রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে যে সকল অভাব ও বিঘ্ন দেখিতে পাই, তাহাকে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। এই কারণে, এখানকার রাজ্যশাসনের মধ্যে যদি কোনো অসম্পূর্ণতা বা শৃঙ্খলার অভাব দেখি, তবে তাহা লইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আলোচনা করিতে আমার উৎসাহ হয় না — আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়। এই কারণে, যদি জানিতে পাই, তুচ্ছ স্বার্থপরতা আপনার সামান্য লাভের জন্য — উপস্থিত ক্ষুদ্র সুবিধার জন্য, রাজ-শ্রীর মন্দির-ভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তবে সেই অপরাধকে আমি ক্ষুদ্র রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। এই দেশীয় রাজ্যের লজ্জাকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের লজ্জা এবং গৌরবকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের গৌরব বলিয়া না বুঝি, তবে দেশের সম্বন্ধে আমরা ভুল বুঝিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় প্রকৃতিকেই বীর্য্যের দ্বারা সবল করিয়া তুলিলে তবেই আমরা যথার্থ উৎকর্ষলাভের আশা করিতে পারিব। ব্রিটিশরাজ ইচ্ছা করিলেও এ সম্বন্ধে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন না। তাঁহারা নিজের মহিমাকেই একমাত্র মহিমা বলিয়া জানেন—এই কারণে ভাল মনেও তাঁহারা আমাদিগকে যে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে আমরা স্বদেশকে অবজ্ঞা করিতে শিখিতেছি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্যাট্রিয়ট্ বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদের অনেকেই এই অবজ্ঞাকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এইরূপে যাঁহারা ভারতকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করেন, তাঁহারাই ভারতকে বিলাত করিবার জন্য উৎসুক—সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের এই অসম্ভব আশা কখনই সফল হইতে পারিবে না।

আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িয়া থাকুক,আর যাহাই হোক, এইখানেই স্বদেশের যথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখিতে চাই। বিকৃতি-অনুকৃতির মহামারী এখানে প্রবেশ লাভ করিতে না পারুক্, এই আমাদের একান্ত আশা। ব্রিটিশরাজ আমাদের উন্নতি চান, কিন্তু সে উন্নতি ব্রিটিশ মতে হওয়া চাই, সে অবস্থায় জলপদ্মের উন্নতি-প্রণালী স্থলপদ্মে আরোপ করা হয়। কিন্তু দেশীয় রাজ্যে স্বভাবের অব্যাহত নিয়মে দেশ উন্নতি লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিবে, ইহাই আমাদের কামনা।

ইহার কারণ এ নয় যে, ভারতের সভ্যতাই সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপের সভ্যতা মানবজাতিকে যে সম্পত্তি দিতেছে, তাহা যে মহামূল্য, এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা ধৃষ্টতা।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে, একথা আমার বক্তব্য নহে — তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই, অসাধ্য বলিয়াই স্বদেশী আদর্শের প্রতি আমাদের মন দিতে হইবে — উভয় আদর্শের তুলনা করিয়া বিবাদ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই — তবে একথা বলিতেই হইবে যে, উভয় আদর্শই মানবের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

সেদিন এখানকার কোন ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, গবর্মেন্ট আর্ট স্কুলের গ্যালারী হইতে বিলাতী ছবি বিক্রয় করিয়া ফেলা কি ভাল হইয়াছে?

আমি তাহাতে উত্তর করিয়াছিলাম যে, ভালই হইয়াছে। তাহার কারণ এ নয় যে, বিলাতী চিত্রকলা উৎকৃষ্ট সামগ্রী নহে। কিন্তু সেই চিত্রকলাকে এত সস্তায় আয়ত্ত করা চলে না। আমাদের দেশে সেই চিত্রকলার যথার্থ আদর্শ পাইব কোথায়? দুটো লক্ষ্নৌ ঠুংরি ও "হিলিমিলি পনিয়া" শুনিয়া যদি কোন বিলাতবাসী ইংরেজ ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তবে বন্ধুর কর্ত্তব্য তাহাকে নিরস্ত করা। বিলাতী বাজারের কতকগুলি সুলভ আবর্জ্জনা এবং সেই সঙ্গে দুটি একটি ভাল ছবি চোখের সামনে রাখিয়া আমরা চিত্রবিদ্যার যথার্থ আদর্শ কেমন করিয়া পাইব? এই উপায়ে আমরা যেটুকু শিখি, তাহা যে কত নিকৃষ্ট তাহাও ঠিকমত বুঝিবার উপায় আমাদের দেশে নাই। যেখানে একটা জিনিষের আগাগোড়া নাই — কেবল কতকগুলো খাপছাড়া দৃষ্টান্ত আছে মাত্র, সেখানে সে জিনিষের পরিচয় লাভের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষায় আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয় — পরের দেশের ভালটা ত শিখিতেই পারি না, নিজের দেশের ভালটা দেখিবার শক্তি চলিয়া যায়।

আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পকলার আদর্শ যে কি, তাহা আমরা জানিই না। যদি শিক্ষার দ্বারা ইহার পরিচয় পাইতাম, তবে যথার্থ একটা শক্তিলাভ করিবার সুবিধা হইত। কারণ, এ আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে — একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায়, তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপ্‌ড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে, ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ একটি সমগ্র মুর্ত্তিরূপে দেখিতে পাইতাম, ইহার প্রতি আমাদের সচেষ্ট চিত্তকে প্রয়োগ করিতে পারিতাম। পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহাকে ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিতাম।

এই কারণে, আমাদের শিক্ষার অবস্থায় বিলাতী চিত্রের মোহ জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া ভাল। নহিলে নিজের দেশে কি আছে, তাহা দেখিতে মন যায় না — কেবলি অবজ্ঞায় অন্ধ হইয়া যে ধন ঘরের সিন্দুকে আছে, তাহাকে হারাইতে হয়।

আমরা দেখিয়াছি, জাপানের একজন সুবিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ পণ্ডিত এ দেশের কীটদষ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছেন — তিনি একখানি পট এখান হইতে লইয়া গেছেন। সেখানি কিনিবার জন্য জাপানের অনেক গুণজ্ঞ তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিক্রয় করেন নাই।

আমরা ইহাও দেখিতেছি, য়ুরোপের বহুতর রসজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের অখ্যাত দোকান বাজার ঘাঁটিয়া মলিন ছিন্ন কাগজের চিত্রপট বহুমূল্য সম্পদের ন্যায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সে সকল চিত্র দেখিলে আমাদের আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ নাসাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, কলাবিদ্যা যথার্থভাবে যিনি শিখিয়াছেন, তিনি বিদেশের অপরিচিত রীতির চিত্রের সৌন্দর্য্যও ঠিকভাবে দেখিতে পান — তাঁহার একটি শিল্পদৃষ্টি জন্মে। আর যাহারা কেবল নকল করিয়া শেখে, তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পায় না।

আমরা যদি নিজের দেশের শিল্পকলাকে, সমগ্রভাবে, যথার্থভাবে দেখিতে শিখিতাম, তবে আমাদের সেই শিল্পদৃষ্টি, শিল্পজ্ঞান জন্মিত, যাহার সাহায্যে শিল্প সৌন্দর্য্যের দিব্য নিকেতনের সমস্ত দ্বার আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইত। কিন্তু বিদেশী শিল্পের নিতান্ত অসম্পূর্ণ শিক্ষায়, আমরা যাহা পাই নাই, তাহাকে পাইয়াছি বলিয়া মনে করি, যাহা পরের তহবিলেই রহিয়া গেছে, তাহাকে নিজের সম্পদ জ্ঞান করিয়া অহঙ্কৃত হইয়া উঠি।

"পিয়ের্‌-লোটি" ছদ্মনামধারী বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের দেশের রাজনিকেতনগুলিতে বিলাতী আস্‌বাবের ছড়াছড়ি দেখিয়া হতাশ হইয়া গেছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, বিলাতী আসবাবখানার নিতান্ত ইতরশ্রেণীর সামগ্রীগুলি ঘরে সাজাইয়া আমাদের দেশের বড় বড় রাজারা নিতান্তই অশিক্ষা ও অজ্ঞতাবশতই গৌরব করিয়া থাকেন। বস্তুত বিলাতী সামগ্রীকে যথার্থভাবে চিনিতে

শেখা বিলাতেই সম্ভবে। সেখানে শিল্পকলা সজীব, সেখানে শিল্পীরা প্রত্যহ নব নব রীতি সৃজন করিতেছেন, সেখানে বিচিত্র শিল্পপদ্ধতির কালপরম্পরাগত ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত বিশেষ দেশকালপাত্রের সঙ্গতি সেখানকার গুণী লোকেরা জানেন — আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া কেবল টাকার থলি লইয়া মুর্খ দোকানদারের সাহায্যে অন্ধভাবে কতকগুলো খাপ্‌ছাড়া জিনিষপত্র লইয়া ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলি — তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই আসবাবের দোকান যদি লর্ড কার্জ্জন বলপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন, তবে দায়ে পড়িয়া আমরা স্বদেশী সামগ্রীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হইতাম — তাহা হইলে টাকার সাহায্যে জিনিষ ক্রয়ের চর্চ্চা বন্ধ হইয়া রুচির চর্চ্চা হইত। তাহা হইলে ধনিগৃহে প্রবেশ করিয়া দোকানের পরিচয় পাইতাম না, গৃহস্থের নিজের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাইতাম। ইহা আমাদের পক্ষে যথার্থ শিক্ষা, যথার্থ লাভের বিষয় হইত। এরূপ হইলে আমাদের অন্তরে বাহিরে আমাদের স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে আমাদের গৃহভিত্তিতে আমাদের পণ্যবীথিকায় আমরা স্বদেশকে উপলব্ধি করিতাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে সকল দেশেরই ইতর সম্প্রদায় অশিক্ষিত। সাধারণ ইংরেজের শিল্পজ্ঞান নাই — সুতরাং তাহারা স্বদেশী সংস্কারের দ্বারা অন্ধ। তাহারা আমাদের কাছে তাহাদেরই অনুকরণ প্রত্যাশা করে। আমাদের বসিবার ঘরে তাহাদের দোকানের সামগ্রী দেখিলে তবেই আরাম বোধ করে, — তবেই মনে করে আমরা তাহাদেরই ফরমায়সে তৈরী, সভ্য পদার্থ হইয়া উঠিয়াছি। তাহাদেরই অশিক্ষিত রুচি অনুসারে আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্য্য সুলভ ও ইতর অনুকরণকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। এ দেশের শিল্পীরা বিদেশী টাকার লোভে বিদেশী রীতির অদ্ভুত নকল করিতে প্রবৃত্ত হইয়া চোখের মাথা খাইতে বসিয়াছে।

যেমন শিল্পে, তেম্‌নি সকল বিষয়েই। আমরা বিদেশী প্রণালীকেই একমাত্র প্রণালী বলিয়া বুঝিতেছি। কেবল বাহিরের সামগ্রীতে নহে, আমাদের মনে এমন কি, হৃদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করিতেছে। দেশের পক্ষে এমন বিপদ আর হইতেই পারে না।

এই মহা বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য একমাত্র দেশীয় রাজ্যের প্রতি আমরা তাকাইয়া আছি। একথা আমরা বলি না যে, বিদেশী সামগ্রী আমরা গ্রহণ করিব না। গ্রহণ করিতেই হইবে, কিন্তু দেশীয় আধারে গ্রহণ করিব। পরের অস্ত্র কিনিতে নিজের হাতখানা কাটিয়া ফেলিব না। একলব্যের মত ধনুর্বিদ্যার গুরুদক্ষিণাস্বরূপ নিজের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দান করিব না। একথা মনে রাখিতেই হইবে, নিজের প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিলে দুর্ব্বল হইতে হয়। ব্যাঘ্রের আহার্য্য পদার্থ বলকারক সন্দেহ নাই, কিন্তু হস্তী তাহার প্রতি লোভ করিলে নিশ্চিত মরিবে। আমরা লোভবশত প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার যেন না করি। আমাদের ধর্ম্মে-কর্ম্মে, ভাবে-ভঙ্গীতে প্রত্যহই তাহা করিতেছি, এই জন্য আমাদের সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে — আমরা কেবলি অকৃতকার্য্য এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। বস্তুত জটিলতা আমাদের দেশের ধর্ম নহে। উপকরণের বিরলতা, জীবন যাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব — এইখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিভা। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিলাতী কারখানাঘরের প্রভৃত জঞ্জাল যদি ঝাঁট দিয়া না ফেলি, তবে দুই দিক্ হইতেই মরিব — অর্থাৎ বিলাতী কারখানাও এখানে চলিবে না, চণ্ডীমণ্ডপও বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই কারখানা-ঘরের ধুমধুলিপূর্ণ বায়ু দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে- সহজকে অকারণে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, বাসস্থানকে নির্ব্বাসন করিয়া দাঁড় করাইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজের হাতে মানুষ হইয়াছেন, তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না যে, ইংরেজের সামগ্রীকে যদি লইতেই হয়, তবে তাহাকে আপন করিতে না পারিলে তাহাতে অনিষ্টই ঘটে — এবং আপন করিবার একমাত্র উপায় তাহাকে নিজের প্রকৃতির অনুকূলে পরিণত করিয়া তোলা — তাহাকে যথাযথ না রাখা। খাদ্য যদি খাদ্যরূপেই বরাবর থাকিয়া যায়, তবে তাহাতে পুষ্টি দূরে থাক্, ব্যাধি ঘটে। খাদ্য যখন খাদ্যরূপ পরিহার করিয়া আমাদের রসরক্তরূপে মিলিয়া যায় এবং যাহা মিলিবার নয় তাহা পরিত্যক্ত হয়, তখনই তাহা

আমাদের প্রাণবিধান করে। বিলাতী সামগ্রী যখন আমাদের ভারত প্রকৃতির দ্বারা জীর্ণ হইয়া, তাহার আত্মরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের কলেবরের সহিত একাত্ম হইয়া যায়, তখনই তাহা আমাদের লাভের বিষয় হইতেপারে — যতক্ষণ তাহার উৎকট বিদেশীয়ত্ব অবিকৃত থাকে, ততক্ষণ তাহা লাভ নহে। বিলাতী সরস্বতীর পোষ্যপুত্রগণ একথা কোনোমতেই বুঝিতে পারেন না। পুষ্টিসাধনের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, বোঝাই করাকেই তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞান করেন। এইজন্যই আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিও বিদেশী কার্য্যবিধির অসঙ্গত অনাবশ্যক বিপুল জঞ্জালজালে নিজের শক্তিকে অকারণে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। বিদেশী বোঝাকে যদি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিতাম, যদি তাহাকে বোঝার মত না দেখিতে হইত, রাজ্য যদি একটা আপিসমাত্র হইয়া উঠিবার চেষ্টায় প্রতি মুহূর্ত্তে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া না উঠিত, যাহা সজীব হৃৎপিণ্ডের নাড়ীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল, তাহাকে যদি কলের পাইপের সহিত সংযুক্ত করা না হইত, তাহা হইলে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। আমাদের দেশের রাজ্য কেরানীচালিত বিপুল কারখানা নহে — নির্ভুল নির্ব্বিকার এঞ্জিন্ নহে — তাহার বিচিত্র সম্বন্ধ-সূত্রগুলি লৌহদণ্ড নহে, তাহা হৃদয়তন্ত্র—রাজলক্ষ্মী প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার কর্ম্মের শুষ্কতার মধ্যে রসসঞ্চার করেন, কঠিনকে কোমল করেন, তুচ্ছকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া দেন, দেনাপাওনার ব্যাপারকে কল্যাণের কান্তিতে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন এবং ভুলত্রুটিকে ক্ষমার অশ্রুজলে মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। আমাদের মন্দ ভাগ্য আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিদেশী আপিসের ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগকে কলরূপে বানাইয়া না তুলে — এই সকল স্থানেই আমরা স্বদেশলক্ষ্মীর স্তন্যসিক্ত স্নিগ্ধ বক্ষস্থলের সজীব কোমল মাতৃস্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি, এই আমাদের কামনা। মা যেন এখানেও কেবল কতকগুলো ছাপমারা লেফাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন — দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের রুচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃবক্ষে আশ্রয় লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত আপনাকে অতি সহজে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিতে পারে।

ভারত রাজন্য-সভা *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের নিকট উপস্থাপিত খসড়া প্রস্তাব)

দেবসেবা ও দেবোত্তর সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার লইতে ইংরেজ গবর্মেন্ট কিরূপ কুণ্ঠিত, তাহার বিবরণ হান্টার সাহেবের 'উড়িষ্যা' গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত আনন্দ চার্লু মহাশয় মঠ ও দেবোত্তর সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিবার জন্য মন্ত্রী সভায় নূতন বিধি প্রচলনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্মেন্ট সম্মত হন নাই।

সামাজিক ব্যাপারেও গবর্মেন্ট পারতপক্ষে হস্তক্ষেপ করেন না। করিলেও দেশে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে ভিন্নদেশীয় রাজার শাসনাধিকারে প্রজারা স্বভাবতই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। বোধ করি এই জন্যই সহবাস-সম্মতি আইন লইয়া এত অধিক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। অথচ মহীশুরে বিবাহ সম্বন্ধে চিরাগত প্রথার বিরুদ্ধে যে সকল রাজবিধি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা তথাকার হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছে।

ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে বৃটিশ গবর্মেন্ট যে সঙ্কোচ প্রকাশ করেন, ইহা বৃটিশ গবর্মেন্টের মাহাত্ম্য। অথচ ধর্ম্ম ও সমাজে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে অথবা কোন সংশোধনের প্রয়োজন হইলে, এ পর্য্যন্ত রাজারাই মনোযোগী হইয়া যথাকর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন। বল্লাল সেন যদিচ ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তথাপি রাজাসনে বসিয়া তিনি ব্রাহ্মণ সমাজে যে কৌলীন্য-বন্ধন স্থাপন করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত তাহা চলিয়া আসিতেছে। সেই কৌলীন্যে যদি কোন বিকার উপস্থিত হয়, তবে তাহা অদ্য কে সংশোধন করিবে?

বহু লোকের দ্বারা সংশোধন সম্ভবপর নহে কারন, নানা লোকের নানা স্বার্থ, নানা মত - সকলের বা অধিকাংশ লোকের ঐক্য হওয়া অতি কঠিন। সেস্থলে দেশের একমাত্র যিনি শীর্ষস্থানীয়, তাঁহার মত ও প্রভাব কার্য্যকর।

ইংরাজ রাজত্বকালে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের মত ও ভাবের পরিবর্ত্তন দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। কিন্তু ব্যবহারের ও সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তন অত্যন্ত গোপনে ঘটিতেছে। এই পরিবর্ত্তনগুলি চোরের মত সুরঙ্গদ্বার দিয়া সমাজের ভিত্তি খনন করিয়া প্রবেশ করিতেছে। মিথ্যা ব্যবহার, কপটাচরণ, নির্লজ্জভাবে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, দেশকালোচিত সামাজিক পরিবর্ত্তনগুলি হিন্দুরাজার অনুমতি ও সহায়তা পাইতেছে না। বিধান প্রচার করিবার কেহ নাই — সুতরাং সুবিধা ও আরামের খাতিরে লোকেরা প্রাচীন আচার লঙ্ঘন করে, অথচ বিধানের অভাবে তাহা স্বীকার করিতে সাহস করে না। যাহারা সাহসপূর্ব্বক স্বীকার করে, তাহাদের সামাজিক দুর্গতি যে কতদূর হইতে পারে তাহা বলা কঠিন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। বিলাত-ফেরতা বাঙ্গালী যদি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে না উঠে, তবে তাহার ছেলের পৈতৃকধনে অধিকার ও হিন্দুমতে বিবাহ সিদ্ধ হইবে কি না, তাহা বিচারকের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। কোন্ বিচারক কিরূপ মত দিবেন তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। অথচ বর্ত্তমানকালে জ্ঞান, শিক্ষা ও সাংসারিক উন্নতিলাভের জন্য বিলাতযাত্রা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এরূপস্থলে বিলাতযাত্রাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলে তাহাতে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না। কিন্তু কে বিধান দিবে যে, বিলাতযাত্রায় হিন্দুত্ব নাশ হয় না। ব্রিটিশ গবর্মেন্ট সে ভার গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত। লোকসাধারণের মত সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য।

*প্রকাশিত-'রবি' ত্রৈমাসিকপত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ (১৩৩২ বাং)

এরূপ স্থলে একটি মাত্র সদুপায় আছে। ভারতবর্ষের হিন্দু রাজন্যমণ্ডলীকে এই ভার দিতে হইবে। তাঁহারা যে প্রথাকে হিন্দুচিত বলিয়া গণ্য করিবেন, গবর্মেন্টি তাহাকেই যদি হিন্দু আচার বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে গবর্মেন্টের সঙ্কোচের কারণ থাকে না; অথচ সমাজকে নিশ্চল, নির্জ্জীব হইয়া থাকিতে হয় না।

প্রথমতঃ এই রাজসভাগুলি পাঁচভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। কারণ, ভারতবর্ষে দেশভেদে প্রথার অনৈক্য অত্যধিক, বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যা এক, উত্তর-পশ্চিম দুই, পঞ্জাব-সিন্ধু তিন, গুজরাটি-মারাঠি চার এবং মাদ্রাজ পাঁচ। ভাগ আমার ঠিক হইল কিনা তাহা পরে বিচার্য্য, কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে, প্রাদেশিক ক্ষুদ্র অনৈক্যগুলিকেও ধরিতে গেলে সমস্ত নিষ্ফল হইবে।

গবর্মেন্টের নির্দ্দিষ্ট সভাগৃহে প্রত্যেকভাগের রাজন্যগণ শীতকালে বিশেষ কোন মাসে সমবেত হইয়া বৎসরে যদি পনেরো দিনও একত্র হইয়া কাজ করেন, তাহা হইলে বিস্তর উপকারের আশা করি। রাজগণ নিজমত উপযুক্তরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য উপযুক্ত মন্ত্রী বা প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারেন। সভা চালনার নিয়মাবলী গবর্মেন্টি স্থির করিয়া দিবেন।

স্বদেশের হিতসাধনে দেশীয় রাজাদের অধিকার যতই বিস্তৃত হইবে, ততই তাঁহাদের দায়িত্ব ও আত্মসম্মানবোধ বৃদ্ধি পাইবে। গৌরবকর কার্য্যে যত তাঁহাদের যোগ থাকিবে, ততই স্বভাবতঃ তাঁহাদের বিচার-শক্তি, বহুদর্শিতা ও চরিত্রগৌরব বৃদ্ধি পাইবে। বহু লোকের মঙ্গলসাধনের জন্য চিন্তা করা, একত্র হইয়া বিচার করা, লোকহিতকর কর্ত্তব্যসাধনে মনোনিবেশ করা — ইহাই রাজোচিত মহত্ত্ব লাভের সাধনা। প্রভুত্ব, বিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতার চর্চ্চা রাজধর্ম্মের বিকার। স্বরাজ্যে পারিষদবর্গ কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকিয়া স্বেচ্ছাধীন রাজকার্য্যে যথার্থ মাহাত্ম্য লাভ করা কঠিন। কিন্তু যদি সাধারণ ভারতবর্ষের কোন মঙ্গলকার্য্যভার রাজাদের হস্তে থাকে এবং তাহা যদি বিচার ও পরামর্শ দ্বারা তাঁহাদিগকে সম্পন্ন করিতে হয়, যদি সভার নিয়মরক্ষাপূর্ব্বক বিশ্বজনের উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে এই সকল বিশেষ কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, ইহার দ্বারা রাজন্যগণের বিচারশক্তি, শুভবুদ্ধি ও সংযমের চর্চ্চা হইতে পারে এবং স্বদেশের কর্ত্তব্যপালন করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করিতে পারেন।

প্রস্তাবটি সাধারণভাবেই করা হইল। যদি ইহা সমীচীন হয়, তবে আলোচনা দ্বারা ইহাকে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার ভার বিজ্ঞমণ্ডলীর উপর অর্পণ করা গেল।

আগরতলায় কিশোর-সাহিত্য-সমাজে

কবি-সম্রাটের বাণী *

এই ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে আমার যে প্রথম পরিচয়, তা খুব অল্প বয়সে। সদ্য England থেকে ফিরে এসেছি; তখন একখানি মাত্র কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। বাল্যের রচনা, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি অনেক ত্রুটি থাকায়, পুনঃ প্রকাশিত হয় নাই।

সেই সময়ে আমাকে এবং আমার লেখা সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেই জানতেন। আমার পরিচয় তখন কেবল আমার আত্মীয়স্বজন নিকটতম বন্ধুজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। একদিন, এই সময়ে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের দূত আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা কর্‌লেন। বালক আমি, সসঙ্কোচে আমি তাঁকে অভ্যর্থনা কর্‌লাম। আপনারা হয়ত অনেকেই দূত মহাশয়ের নাম জানেন — তিনি রাধারমণ ঘোষ। মহারাজ তাঁকে সুদুর ত্রিপুরা হ'তে বিশেষভাবে পাঠিয়েছিলেন কেবল জানাতে যে, আমাকে তিনি কবি-রূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বালক কবির বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

এরপর থেকে নানা সময়ে নানা উপদেশ এবং বিশেষ করে "রাজর্ষি" লিখবার সময়ে "রাজমালা" থেকে সংস্কৃত বিষয়গুলি ছাপিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তার থেকে আমি গোবিন্দমাণিক্যের প্রকৃত ইতিবৃত্ত জান্‌তে পেরেছিলুম।

তিনি কার্সিয়াং-এ যা'বার সময় আমাকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় তিনি আমার লেখা শুনতেন আর গান গাইতে বলতেন। তাঁর স্নেহ, আদর আমার প্রাণে স্থায়ী রেখা টেনে গেছে।

মহারাজ বীরচন্দ্র অসাধারণ সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন। তাঁর কাছে আমার মত অনভিজ্ঞের গান-গাওয়া যে কতদূর সঙ্কোচের ছিল তা' সহজেই অনুমেয়। কেবলমাত্র তাঁর স্নেহের প্রশ্রয় আমাকে সাহস দিয়েছিল।

তিনি যে আমার কাছে আবৃত্তি ও সঙ্গীত আলাপ শুনেই আমাকে রেহাই দিতেন তা নয়, তিনি তাঁর বিষয়কর্ম্মেও আমার শক্তিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন।

জীবনে যে যশ আমি পাচ্ছি, পৃথিবীর মধ্যে তিনিই তা'র প্রথম সূচনা করে দিয়েছিলেন, তাঁর অভিনন্দনের দ্বারা। তিনি আমার অপরিণত আরম্ভের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি তাঁর বিচক্ষণ দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেয়েই তখনি আমাকে কবি সম্বোধনে সম্মানিত করেছিলেন। যিনি উপরের শিখরে থাকেন, তিনি যেমন যা সহজে চোখে পড়ে না তা'কেও দেখতে পান, বীরচন্দ্রও তেমনি সেদিন আমার মধ্যে অস্পষ্টকে স্পষ্ট দেখেছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে যখন আমি তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছিলেম, সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানারকম আলাপ হতো। বৈষ্ণব পদাবলী যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ ও প্রকাশ করবার অভিপ্রায়ে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল। কিন্তু তার পরই তাঁর সহসা মৃত্যু হওয়াতে সে সঙ্কল্প সফল হতে পারে নি।

বীরচন্দ্রের পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য আমার প্রতি তাঁর পিতৃদত্ত সমাদরের ধারাকে রক্ষা করেছিলেন। অকৃত্রিম স্নেহে তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। সেদিন রাজার হাত থেকে যখন কবির তিলক পরেছিলাম, তখনও কবির যশ সংশয়িত ও সঙ্কীর্ণ ছিল। আমার সেদিনকার বহু নিন্দা-লাঞ্ছিত খ্যাতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তিনি সমভাবে রক্ষা করেছিলেন। কেবলমাত্র কবি বলেই নয়, সুহৃদ ও ভ্রাতৃভাবে তিনি আমাকে আত্মীয় ক'রে নিয়েছিলেন। সে এমন আত্মীয়তা, যা মিথ্যাস্তুতির প্রত্যাশা কর্‌ত না, যা বিরুদ্ধ বাক্যকেও স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হত না। মনে আছে, তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন — "রবিবাবু, আপনি আমাকে আমার ইচ্ছার ও প্রকৃতির প্রতিকূলেও রক্ষা কর্‌বেন।"

*রবি ত্রৈমাসিকপত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ (১৩৩২ বাং)

তাঁর সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আমি বারংবার এসেছি, তাঁর এই অকৃত্রিম স্নেহের টানে।

সেদিনও চলে গেছে। শুভ দৈববশতঃ অনেক সম্মান — এমন কি য়ুরোপীয় রাজহস্তেও — আমার ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু আমার এই ঘরের এবং স্বদেশের রাজার কাছ থেকে যে সম্মান লাভ করে এসেছি — ব্যক্তিগত জীবনে আমার কাছে তার মূল্য অনেক বেশী। এই জন্যই এই ত্রিপুরার সঙ্গে আমার ক্ষণেক অতিথির সম্বন্ধ নয়। এ সম্বন্ধ এখানকার রাজপিতা ও পিতামহের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। আমি একান্তমনে এই রাজ্যের কল্যাণ কামনা করি। এই রাজ্যের যে দুইজন রাজাকে বিশেষভাবে জান্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেম, তাঁদের রাজোচিত গুণে ও রসজ্ঞতায় আমি মুগ্ধ। এমন সৌজন্য, দাক্ষিণ্য এ সহৃদয়তা দেখা যায় না।

এই রাজপরিবারে বহু কাল থেকে বাংলা ভাষার সম্মান চলে আসছে। বস্তুতঃ সকল দেশের ইতিহাসে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশের ভাষা কেবল মাতৃভাষা নয়, তা রাজভাষা। দেশের রাজার যেমন কর্ত্তব্য প্রজাকে পালন করা, তেমনি ভাষাকে রক্ষা করা। বিদেশী আচারের মোহে বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে, কোনোদিনই দেশীয় রাজন্যবর্গ এই মহৎ দায়িত্ব থেকে যেন বিচ্যুত না হন। এই পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আমি দেখেছি। এই পরিবারের সঙ্গে আমার যোগ সেই অনুরাগসূত্রে দৃঢ়তর হয়েছিল।

রাধাকিশোর ও বীরচন্দ্রের লেখার মত চিঠি আমি খুব অল্পই দেখেছি। সেগুলি যেমন সংযত, তেমনি সুসংস্কৃত — তেমনি সরস। মাতৃভাষাকে এমন সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা এ যে তাঁদের রাজোচিত সৌজন্যেরই অঙ্গ। এই বৈদগ্ধ্যে, স্বদেশের সঙ্গীত-শিল্প-সাহিত্যের এই রসজ্ঞতায় তাঁদের আভিজাত্যের গৌরব ঘোষণা করে। এই সঙ্গে তাঁদের স্বাভাবিক নম্রতা দেখেছি, সেই নম্রতা আমার কাছে তাঁদের চরিত্রের উচ্চতারই পরিচয় দিয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রকিশোর তখন বালক, যখন তিনি আমার নিকটে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ব্যবহারে ও আচরণে আমার নিকটতম আত্মীয়ের স্থান গ্রহণ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি আমার সঙ্গে পত্রব্যবহার কর্‌তেন। ইহা যে ব্যর্থ হয় নাই, ইহাই আমার পরম আনন্দ। আমি ত্রিপুর রাজ্যের আর কোনো হিত যদি না করে থাকি, কেবলমাত্র যদি ব্রজেন্দ্রকিশোরের চরিত্রকে কর্ত্তব্যের দীক্ষায় দৃঢ় করতে পেরে থাকি, তবে তার দ্বারা ত্রিপুরার স্থায়ী কল্যাণ সাধন করেছি বলে গৌরব কর্‌তে পারবো। এই উপলক্ষে আমি তাঁকে আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাচ্ছি। আজকের দিনে এখানকার পূর্ব্ব স্মৃতি আমার মনে বিষাদের ছায়া ফেলেচে। আমার একমাত্র আনন্দ, এখানে ব্রজেন্দ্রকিশোরকে দেখ্‌লাম। নিজের স্বাস্থ্য ও কাজ উপেক্ষা করেও তাঁর আমন্ত্রণে এখানে উপস্থিত হয়েছি। এঁর পিতার ও পিতামহের কাছ থেকে যে সমাদর পেয়েছি, আজও তা এঁরই হাত দিয়ে ভোগ কর্‌তে পার্‌চি। সেইজন্য আজ বসন্তে, ত্রিপুরার বন-শ্রী যখন দক্ষিণ বাতাসে দিকে দিকে পুষ্পোৎসবের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, তখন আমি এঁরই কাছ থেকে এঁর পিতৃসখারূপে সেই মাল্য গ্রহণ কর্‌তে এসেছি, যা এঁর পিতা পিতামহ তাঁদের প্রীতিভাজন এই অতিথির জন্য সজ্জিত করে রেখে দিতেন।

আমি এঁর কল্যাণ কামনা করি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কামনা করি যে, এঁর চরিত্র মহিমায় ত্রিপুর রাজ্যের কল্যাণ বর্দ্ধিত হউক।

এই উপলক্ষে ত্রিপুরার রাজগণের প্রতি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌তে ইচ্ছা করি। আর বিশ-বৎসরের উর্দ্ধকাল শান্তিনিকেতনে বিদ্যায়তনী স্থাপন করেছি। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোকের মধ্যে একমাত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে আমি নিয়মিত আনুকুল্য পেয়েছি। তিনি স্বয়ং আমাদের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করে, আমাদের আনন্দিত ও সম্মানিত করেছেন। সে সময় আমার এই প্রতিষ্ঠান দৈন্য-পীড়িত ও অধিকাংশের অপরিজ্ঞাত ছিল। অথচ তখনই রাধাকিশোর কেবল যে বার্ষিক অর্থদানের দ্বারা এই শুভকর্ম্মের সাহায্য করেছিলেন তা নয়, ত্রিপুরার অনেক বালককে ছাত্রবৃত্তি দিয়ে শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র বীরেন্দ্র মাণিক্যও যে কেবলমাত্র এই দানকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা

করেছিলেন তা নয়, সেকালকার হাসপাতাল নির্ম্মাণ কর্‌তে পাঁচ হাজার টাকা দান করেছিলেন এবং আরো পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করে গিয়েছিলেন। আমার কর্মের প্রতি প্রথম থেকেই তাঁদের এই শ্রদ্ধার স্মৃতি আমার পক্ষে একান্ত সমাদরের সামগ্রী।

অবশেষে কিশোর-সাহিত্য-সমাজ ও ত্রিপুরার জনসাধারণকে অদ্যকার দিনে আমার জন্য তাঁদের এই সম্মান আয়োজনের প্রতিদান স্বরূপ আমার শুভ ইচ্ছাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে যে অভিবাদন করেছেন, তারই প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। তাঁদের কাছে আমার এই শেষ কথাটি জানিয়ে যাই যে, আমি যশোভাগ্যবান কবির মত এখানে মান নিতে আসিনি; আমি স্বর্গগত মহারাজদের বন্ধুরূপে যেমন আমার তরুণ বয়সে এখানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছি, আজ আমার শেষ বয়সেও সেই আত্মীয়তার শেষ রসটুকু ভোগ করে বলে যেতে এসেছি —

সর্ব্বস্তরতু দুর্গানি সর্ব্বো ভদ্রানি পশ্যতু।

শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে মহারাজ বীরবিক্রমকে কবির সম্বর্দ্ধনা

(২২শে পৌষ, ১৩৪৫)

শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য

কল্যাণীয়েষু —

আজকের এই অস্তোন্মুখ সূর্য্যের মতোই আমার হৃদয় আমার জীবনের পশ্চিম দিগন্ত থেকে তোমার প্রতি তাঁর আশীর্ব্বাদ বিকীর্ণ করছে।

তোমার সঙ্গে আজ আমার এই মিলন আর একদিনকার শুভ সম্মিলনের আলোকেই উদ্দীপ্ত হয়ে দেখা দিলে। সে কথা আজ তোমাকে জানিয়ে দেবার উপলক্ষ্য ঘটল ব'লে আমি আনন্দিত। তখন তোমার জন্ম হয়নি, আমি তখন বালক। একদা তোমার স্বর্গগত প্রপিতামহ বীরচন্দ্র মাণিক্য তাঁর মন্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, কেবল আমাকে এই কথা জানাবার জন্যে যে তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দিতে চান। দেশের কাছ থেকে এই আমি প্রথম সমাদর পেয়েছিলুম। প্রত্যাশা করিনি এবং এই বহুমানের যোগ্যতালাভ করবার দিন তখন অনেক সুদূরে ছিল। তারপরে স্বাস্থ্যের সন্ধানে কার্সিয়াঙে যাবার সময়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে ডেকে নিয়েছিলেন। তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা করতেন প্রিয় বয়স্যের মতো। তাঁর সঙ্গীতের জ্ঞান অসাধারণ ছিল কিন্তু আমার সেই কাঁচাবয়সের রচিত ছেলেমানুষি গান তিনি আদর করে শুনতেন, বোধ হয় তার মধ্যে ভাবী পরিণতির সম্ভাবনা প্রত্যাশা ক'রে। এ যেন কোন্ অদৃশ্য রশ্মির লিপি অঙ্কিত হয়েছিল তাঁর কল্পনার পটে। আজ সকলের চেয়ে বিস্ময় লাগে এই কথা মনে ক'রে যে, বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে মহারাজার মনে যে সকল সংকল্প ছিল আমাকে নিয়ে তার পরামর্শ করতেন এবং আমাকে সেই সাহিত্য অনুষ্ঠানের সহযোগী করবেন ব'লে প্রস্তাব করেছিলেন। তার অনতিকাল পরেই কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর মৃত্যু হলো, মনে ভাবলুম এই রাজবংশের সঙ্গে আমার সম্বন্ধসূত্র এইখানেই অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তা যে হোলো না সেও আমার পক্ষে বিস্ময়কর। তাঁর অভাবে ত্রিপুরায় আমার যে সৌহৃদ্যের আসন শূন্য হোলো মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য অবিলম্বে আমাকে সেখানে আহবান করে নিলেন। তাঁর কাছ থেকে যে অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সমাদর পেয়েছিলুম তা দুর্লভ। আজ একথা গর্ব ক'রে তোমাকে বলবার অধিকার আমার হয়েছে যে, ভারতবর্ষের যে কবি পৃথিবীতে সমাদৃত, তাঁকে তাঁর অনতিব্যক্ত খ্যাতির মুহূর্তে বন্ধুভাবে স্বীকার করে নেওয়াতে ত্রিপুরা রাজবংশ গৌরব লাভ করেছেন। তেমন গৌরব বর্ত্তমান ভারতবর্ষের কোনো রাজকুল আজ পর্য্যন্ত পান নি। এই সম্মিলনের যে একটা ঐতিহাসিক মহার্ঘতা আছে আশা করি সে কথা তুমি উপলব্ধি করেছ। যে সংস্কৃতি, যে চিত্তোৎকর্ষ দেশের সকলের চেয়ে বড়ো মানসিক সম্পদ, একদা রাজারা তাকে রাজৈশ্বর্য্যের প্রধান অঙ্গ ব'লে গণ্য করতেন, তোমার পিতামহেরা সে কথা মনে মনে জানতেন। এই সংস্কৃতির সূত্রেই তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল, এবং সে সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য ছিল। আজ তোমার আগমনে সেদিনকার সুখ-স্মৃতির দক্ষিণ সমীরণ তুমি বহন করে এনেছ। আজ তুমি বর্ত্তমান দিনকে সেই অতীতের অর্ঘ্য এনে দিয়েছ, এই উপলক্ষ্যে তুমি আমার স্নিগ্ধ হৃদয়ের সেই দান গ্রহণ করো যা তোমার পিতামহদের অর্পণ করেছিলুম, আর গ্রহণ করো আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ।

স্নেহানুরক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগ্রহ — দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

"ভারত ভাস্কর" পদবী গ্রহণের পর উত্তরায়ণে প্রদত্ত কবির ভাষণ

পরম কল্যাণীয়েষু

বহুমানাস্পদ শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য দেব বাহাদুর

ত্রিপুরার রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলেম, আজ তা বিশেষ করে স্মরণ করবার ও স্মরণীয় করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এ রকম অপ্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্লভ। যেদিন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এই কথাটি আমাকে জানাবার জন্য তাঁর দূত আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন যে তিনি আমার তৎকালীন রচনার মধ্যেই একটি বৃহৎ ভবিষ্যতের সূচনা দেখেছেন সেদিন এ কথাটি সম্পূর্ণ আশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার তখন বয়স অল্প, লেখার পরিমাণ কম, এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রুপ করত। বীরচন্দ্র তা' জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখ বোধ করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল লক্ষটাকা দিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলংকৃত কবিতার সংস্করণ ছাপানো হবে। তখন তিনি ছিলেন কার্শিয়াং পাহাড়ে, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য। কলকাতায় ফিরে এসে অল্পকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমি মনে ভাবলুম এই মৃত্যুতে রাজবংশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়ে এই যে তা হয় নি। কবি বালকের প্রতি তাঁর পিতার স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধারা মহারাজ রাধাকিশোরের মধ্যেও সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেল। অথচ সে সময়ে তিনি ঘোরতর বৈষয়িক দুর্যোগের দ্বারা দিবারাত্রি অভিভূত ছিলেন। কিন্তু আমাকে একদিনের জন্যও ভোলেন নি। তারপর থেকে নিরন্তর তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছি। এবং আমার প্রতি তাঁর স্নেহ কোনোদিন কুণ্ঠিত হয়নি। রাজসান্নিধ্যের পরিবেশ নানা সন্দেহ বিরোধের দ্বারা কন্টকিত। রাজা সর্বদা ভয়ে ভয়ে ছিলেন পাছে আমাকে কোন গোপন অসম্মান আঘাত করে। এমন কি তিনি আমাকে নিজে স্পষ্টই বলেছেন, "আপনি আমার চারিদিকের পারিষদদের ব্যবহারের বাধা অতিক্রম করেও যেন আমার কাছে সুস্থ মনে আসতে পারেন, এই আমি কামনা করি।" এ কারণে যে অল্পকাল তিনি বেঁচেছিলেন কোনও বাধাকেই আমি গণ্য করিনি। যে অপরিণত বয়স্ক কবির খ্যাতির পথ সম্পূর্ণ সংশয়-সঙ্কুল ছিল তাঁর সঙ্গে কোনো রাজত্বগৌরবের অধিকারীর এমন অবারিত ও অহৈতুক সখ্য সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সেই রাজবংশের সেই সম্মান মূর্ত পদবী দ্বারা আমার স্বল্পাবশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দীপ্যমান করেছে। আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে — যখন বুঝলেম বর্ত্তমান মহারাজা অত্যাচার-পীড়িত বহুসংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে অসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয় দান করেছেন তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম তাঁর বংশগত রাজ-উপাধি আজ বাংলাদেশের সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হোল। এর সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মীর সকরুণ আশীর্ব্বাদ চিরকালের জন্য তাঁর রাজকুলকে শুভ শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত করে রাখল। এ বংশের সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ যখন পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠল ঠিক সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলেম তা সগৌরবে গ্রহণ করি এবং আশীর্ব্বাদ করি এই মহাপুণ্যের ফল মহারাজের জীবনযাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে যেন অগ্রসর করতে থাকে। আজ আমার দেহ দুর্বল, আমার ক্ষীণকণ্ঠ সমস্ত দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর জয়ধ্বনিতে কবিজীবনের অন্তিম শুভকামনা মিশ্রিত করে দিয়ে মহানৈঃশব্দ্যের মধ্যে শান্তি লাভ করুক; ইতি ৩০ বৈশাখ, ১৩৪৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রিপুর দরবারে রবীন্দ্রনাথ *

স্বর্গীয় কর্ণেল ঠাকুর মহিমচন্দ্র দেববর্মা

স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র ছিলেন বাংলার বিক্রমাদিত্য। তিনি একাধারে বৈষ্ণব-কাব্যরসিক, কবি এবং সঙ্গীত ও ললিতকলাবিদ্ ছিলেন। এহেন রসিক-চূড়ামণি, সাহিত্যের পাকা জহুরী মহারাজ বীরচন্দ্রের দরবার — বহু গুণী ব্যক্তির সমাবেশে ভরপুর ছিল; সুবিখ্যাত তানসেন - বংশজাত বীণ-কার কাশেমালী খাঁর রবাব বীণা ঝঙ্কারে ধ্বনিত — কবি মদন মিত্রের কবিতাধারায় প্লাবিত — যদুভট্টের কণ্ঠনিঃসৃত অপূর্ব্বসঙ্গীত পঞ্চানন মিত্রের পাখোয়াজ সহযোগে মুখরিত ছিল। সর্ব্বোপরি বৈষ্ণব-সাহিত্য-রসিক রাধারমণ ঘোষের বৈষ্ণব পদাবলীর সুললিত আলোচনায় মণি-কাঞ্চন যোগ সঙ্ঘটন করিয়াছিল। বীরচন্দ্রের দরবার তদানীন্তন ভারতের দৃষ্টান্তস্থল ছিল। বীরচন্দ্র স্বয়ং বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী আশ্রয় করিয়া অজস্র কবিতা এবং গান লিখিতেছিলেন এবং মনোহরসাই রাগিণীর মনোমোহিনী শক্তির সাধনায় তন্ময় থাকিতেন।

প্রিয়তমা প্রধানা মহিষীর অকাল মৃত্যুতে প্রৌঢ় বীরচন্দ্রের হৃদয় অসহনীয় প্রিয়া-বিরহ-শোকাকুল হইয়া পড়ে। তখন তিনি বিরহীর মর্ম্মবেদনা কবিতার লহরে লহরে গাঁথিতেছিলেন। এমনি সময়ে কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "ভগ্ন হৃদয়" নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবি বীরচন্দ্রের তখনকার মানসিকভাবের সহিত 'ভগ্ন হৃদয়ের' কবিতাগুলি সায় দিয়াছিল। গুণগ্রাহী বীরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের তখনকার এই কাঁচালেখার মধ্যেও তাঁহার অদ্যকার বিশ্ববিমোহন কাব্য-প্রতিভার প্রথম সূচনা দেখিতে পাইয়া, তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বর্গীয় রাধারমণ ঘোষকে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করেন, "ভগ্ন হৃদয়" কাব্যগ্রন্থ মহারাজকে প্রীত করিয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে। ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের বা তাঁহার পরিবারের কাহারো সহিত মহারাজ বীরচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। এ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছেন; —

"মনে আছে, এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যর মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভাল লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্য-সাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এইটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।"

বাস্তবিক এ ঘটনা রবিবাবুর পক্ষে অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়-উৎপাদক হইয়াছিল। বাংলার রাজা বাংলার এই কবিকে কিশোর বয়সেই এরূপ অযাচিত সম্মান দান করিলেন, ইহা এক অপূর্ব্ব ঘটনা বলিতে হইবে। শাস্ত্র বলে; —

"গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ।"

গুণগ্রাহী বীরচন্দ্রের পক্ষে ইহা স্বাভাবিকই বলিতে হইবে। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম, বীরচন্দ্রের পিতা মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কোন গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া কলিকাতায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যার্থী হন। প্রিন্স দ্বারকানাথ (রবীন্দ্রনাথের পিতামহ) তখনকার কলিকাতা সমাজের এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নেতা। তাঁহারি সহায়তায় মহারাজ কৃষ্ণকিশোর সে যাত্রায় সফলকাম হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। সেই সময়েই ত্রিপুর রাজপরিবারের সহিত জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের প্রথম পরিচয় হয়। কলিকাতায় পঠদ্দশায় লাট দরবারে ও কলিকাতার সমাজে মিশিবার আমার একটা বাতিক ছিল। তখনকার দিনে সহপাঠী কবি ˚বলেন্দ্রনাথের সহযোগে ঠাকুর পরিবারে মিলিবার অধিকার লাভ করি। বাংলায় প্রকাশিত নূতন নূতন গ্রন্থ মহারাজ বীরচন্দ্রের নিকট পেশ করিবার ভার ামার মত কিশোর সেবকের উপর অর্পিত ছিল, সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

* এই প্রবন্ধটি ১৩৩০ ত্রিপুরাব্দে লিখিত হইয়া লেখকের 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ইহা 'রবি' ত্রৈমাসিক পত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় (১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দে — ১৩৩২ বাং) প্রকাশিত হয়।

বীরচন্দ্র মাণিক্য কলিকাতায় যখনই যাইতেন, তখনি রবিবাবুকে ডাকাইয়া আনিতেন। বয়সে এই দুই কবির বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও বীরচন্দ্র বাৎসল্যভাবে কিশোর সৌম্যদর্শন কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে কবিতা পাঠ এবং সঙ্গীত শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। তখন আমিও বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বীরচন্দ্রের সেবায় দরবারে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের নিকট কবিতা পাঠ, বিশেষতঃ গান করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কিন্তু বীরচন্দ্রের স্বভাবসুলভ উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম করা সহজসাধ্য হইত। আমরা যখন কলিকাতা হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারকল্পে রুগ্ন মহারাজ বীরচন্দ্রকে লইয়া কার্সিয়াং-এ গমন করি, তখন মহারাজ কবি রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। তখনকার কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া যাইত, অবিশ্রামভাবে মহারাজ রবীন্দ্রনাথকে লইয়া সঙ্গীত ও কাব্য আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন; বৈষ্ণব-মহাজন-পদাবলী প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেন। আলোচনান্তে প্রতি রাত্রে মহারাজ উঠিয়া রবিবাবুকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিয়া যাইতেন। মহারাজ বীরচন্দ্র অসুস্থ, অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হাস্য মুখেই তিনি আলোচনায় যোগ দিতেন, একথা রবিবাবু জানিতেন। তিনি একদিন, মহারাজ অনর্থক কেন কষ্ট করিয়া সিঁড়ি পর্য্যন্ত তাঁহাকে আগুয়াইয়া দেন এরূপ অনুযোগ করিলেন। তখন বীরচন্দ্র বলিয়াছিলেন — "রবিবাবু, পাছে অলসতা আসিয়া কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটায়, আমি সে ভয় করি, আপনি আমাকে বাধা দিবেন না।" পিতৃতুল্য বীরচন্দ্রের এরূপ ব্যবহার দর্শন এবং উত্তর শ্রবণ করিয়া রবিবাবু বলিতেন — "আমি অভিজাত বংশের মহিমার পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম।"

বীরচন্দ্র মাণিক্যের সভায় একটি রত্নের পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দ পাইয়াছেন বলিয়া রবিবাবুকে বলিতে শুনিয়াছি; তিনি ছিলেন রাধারমণ ঘোষ। কার্সিয়াং-এ রবিবাবুর পরিচর্য্যার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। একত্রে আহার বিহার করিয়া পরম আনন্দে দিন কাটিত। প্রায়ই সকালে ৮টার সময় আমি মহারাজের মনস্তুষ্টির জন্য নানা স্থানের ছায়াচিত্র সংগ্রহে বাহির হইয়া পড়িতাম। আর রবিবাবু রাধারমণবাবুকে লইয়া বৈষ্ণব দর্শন এবং পদাবলী আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। একদিন Photo তুলিয়া প্রায় ১টার সময় বাসায় আসিয়া দেখিলাম, রাধারমণবাবু ও রবিবাবু আলাপে তন্ময় হইয়া আছেন। তখন বৈষ্ণব-দর্শনের সহিত এমার্সনের (Emerson) লেখার তুলনামূলক আলোচনা চলিতেছিল। আমি আসিয়া রসভঙ্গ করিয়া দিলাম; কারণ, আমার উদরে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রবিবাবুকে সে আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইল। ভাবে বুঝিলাম, এই শীর্ণকায় রাধারমণ ঘোষ তাঁহাকে বেশ পাইয়া বসিয়াছেন। রবিবাবু রাধারমণের গভীর পাণ্ডিত্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বৈষ্ণব-দর্শন পাঠ করিতে হইবে একথা তিনি স্বীকার করিলেন; অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বেড়াইতে বাহির হইলে রবিবাবু মহারাজ বীরচন্দ্র এবং তাঁহার সহচর রাধারমণের প্রসঙ্গ অনর্গল আলোচনা করিতেন। ইহাতে বুঝা যায় রবিবাবুর গুণগ্রহণ করিবার শক্তির প্রখরতা।

বীরচন্দ্র মাণিক্য কলিকাতায় দেহত্যাগ করিলেন। রাধারমণবাবু আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়িলে, রবিবাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের সরকারে উচ্চকর্ম্মচারী পদে বরণ করিয়াছিলেন। রাধারমণবাবু সেকার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সারাজীবন বীরচন্দ্রের সেবা যিনি করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অন্যত্র কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তিনি সংসার হইতে অবসর লইয়াছিলেন, কিন্তু সংসার তাঁহাকে অবসর মোটেই দেয় নাই। বৈষ্ণব দার্শনিক, বৈষ্ণব ভাবের নির্য্যাস লইয়া জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। রবিবাবু ইদানীংও দেখা হইলে তাঁহার খবর লইতেন।

বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসন লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমারও জীবনের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন হইল। বৃদ্ধ মহারাজের বাৎসল্যরসের চালে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়াছিল। হঠাৎ আমাকে শুয়াপোকা হইতে পূর্ণ প্রজাপতির রূপ ধারণ করিতে হইল। নূতন নূতন জটিল সমস্যা এবং কার্য্যভার আমার স্কন্ধদেশে চাপিয়া বসিল।

রবিবাবুর সঙ্গে রাধাকিশোর মাণিক্যের যুবরাজ-জীবনে কলিকাতায় পিতার দরবারে একবার মাত্র ক্ষণকালের জন্য দেখা হইয়াছিল। বিশিষ্ট ইংরাজ কর্ম্মচারীর হঠাৎ আবির্ভাবে, আলাপ বেশীদূর অগ্রসর

হইতে পারে নাই। সেই মুহূর্ত্তকাল দর্শনেই একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, গুণী ব্যক্তি গুণীকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

রাধাকিশোর যখন ত্রিপুরার "মাণিক" হইলেন, তখন বহুদিনের সঞ্চিত অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিতে শক্তিসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। যুবরাজী আমলে নানা কারণবশতঃ নিজ রাজধানীর বাহিরের কাহাকেও ঘনিষ্ঠভাবে চিনিবার সুযোগ পান নাই। বন্ধু-বল বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না। তিনি বলিতেন, অর্থবল কিম্বা যে কোন প্রকারের বলই বল না, বন্ধু-বল সকলের অপেক্ষা মূল্যবান। তিনি প্রথমে রবিবাবুকে কাছে টানিয়া লইলেন। রবিবাবু সেইবার প্রথম আগরতলায় রাজধানীতে আসিলেন; তখন বসন্তকাল — রাজধানীর উত্তরভাগে পাহাড়ের উপর কুঞ্জবনের বসন্তোৎসবে কবি-সম্মিলনের ঘটা, রাজা-প্রজার সমব্যবহার, কবি রবীন্দ্রনাথের যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিল। মহারাজ রাধাকিশোরের মহৎ চরিত্রের মহানুভবতা দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে রবিবাবুর যোগে স্যার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার জগদীশ বসু, মহারাজা স্যার যতীন্দ্রনাথ, নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গের খ্যাতনামা মহাপুরুষেরা রাধাকিশোরের বন্ধুতার জালে আসিয়া ধরা দিলেন। একে অন্যের সহযোগে দেখিতে দেখিতে, স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন (Lord Sinha), স্যার রাজেন্দ্রলাল, স্যার টি, পালিত, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহারাজের গুণাকৃষ্ট হইয়া বন্ধু-বল বৃদ্ধি করিলেন। এ বন্ধু-বলের দ্বারা যেমন রাজনৈতিক অনেক সমস্যার সমাধান করিলেন, অপরদিকে ত্রিপুরার রাজা বঙ্গহৃদয়ে জয়লাভ করিলেন। সে সময়ে কলিকাতা সঙ্গীত-সমাজে মহারাজের অভ্যর্থনার যে আয়োজন হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তাঁহাকে দেখাইবার নিমিত্ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই রচিত 'বিসর্জ্জন' নাটকের 'রঘুপতি'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজ —

"গুণী রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে।
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে।"

গাহিয়া মাল্য-চন্দনে মহারাজ রাধাকিশোরকে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি এবং বিসর্জ্জনে ত্রিপুরার নাম অমর এবং জগদ্বিখ্যাত হইল, এ কি ত্রিপুরার কম গৌরবের কথা!

যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের 'শিক্ষা' সম্বন্ধে মহারাজ রাধাকিশোর বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িলে, রবীন্দ্রনাথ আসিয়া সে সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান করিলেন। তাঁহারি চেষ্টায় প্রফেসর নগেন্দ্রনাথ এবং মোক্ষদাকুমার বসু বি,এ মহাশয়ের মত শিক্ষক পাওয়া সহজ হইয়াছিল। তৎপর যুবরাজের শিক্ষা লইয়া যখন গভর্ণমেন্ট পীড়া পীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের অন্যতম সমকক্ষ কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্র-নারায়ণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলেন এবং এই বঙ্গ-গৌরব মহারাজদ্বয়ের পরস্পর পরিচয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সে সময়ে মহারাজ রাধাকিশোরকে রবিবাবু লিখিত এক পত্র হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। তখন ত্রিপুরার অদৃষ্ট-আকাশে অনেক রাজনৈতিক মেঘ সঞ্চিত ছিল; সেই অবস্থায় এই দুই মহারাজের মিলন, অনেক সুফলপ্রদ হইয়াছিল।

"কোচবিহারের মহারাজের সহিত কিরূপ সম্মিলন ও পরামর্শ হইল তাহা জানিবার জন্য আমি নিরতিশয় উৎসুক আছি। দুই মহারাজের মধ্যে বন্ধুত্ব হইলে মন্ত্রণাদি দ্বারা উভয়ে বললাভ করিবেন। ইহা মনে করিয়া আমি পরিশেষে উদ্যোগী হইয়াছিলাম এবং করুণা ও নির্ম্মলের সহায়তায় এই অভিলষিত মিলন সংঘটনের উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলাম। এই মিলনে আমি উপস্থিত থাকিতে পারিলে বড়ই আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম। আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য , ঠিক সময়টিতে আমাকে চলিয়া আসিতে হইল। রাজকার্য্য সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের সহিত কোন গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইলে নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ ও মহারাজের সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শযোগে মহারাজের সেই অভাব মোচন হইবে কল্পনা করিয়া আমি আশ্বস্ত হইতেছি।"

রাধাকিশোর মাণিক্যের বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ ছিল বলিয়াই তিনি সাহিত্যিকদিগের সঙ্গ পাইতে অভিলাষ করিতেন এবং প্রয়োজনবোধে তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে

মুক্তহস্ত ছিলেন। কিন্তু এসব কথা যাহাতে গোপন থাকে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতেন। "সঞ্জীবনী" পাঠে মহারাজ কবিবর হেমচন্দ্র যখন অন্ধ এবং অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন জানিতে পারিলেন, তখন নিজ তহবিল হইতে মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তি তাঁহার সাহিত্য সাধনার প্রতিদানস্বরূপ দিবার প্রস্তাব, রবিবাবুর মারফৎ কবিবরের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং এ সংবাদ গোপন রাখিবার ভার গ্রহণ করিতে রবিবাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। এরূপ উপযুক্ত সময়ে সৎপাত্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত দান সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে রবিবাবু আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"হেমবাবুর সাহায্যার্থে মহারাজ যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে এখানে চতুর্দ্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়াছে। একথা গোপন রাখা আমার সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে হেমবাবুও অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাবোধ করিতেছেন। মাঝে হইতে মহারাজের কল্যাণে যশের কিয়দংশ আমার কপালেও পড়িয়াছে। আমার পিতাঠাকুর, হেমবাবুর জন্য মাসিক ২০ টাকা এবং গগন ১০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।"

তারপর হেমবাবুর সম্বন্ধে যেরূপ বন্দোবস্ত হইবার দরুন তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন পাইয়াছিলেন এবং কতকটা আরামে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। বন্ধুবর দীনেশচন্দ্র সেন সহ স্বর্গগত কবির মুখে সে পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া যখন আমি সে সংবাদ মহারাজের নিকট পেশ করি, তখন মহারাজ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়াছিলেন, —

"আমি বাংলার ক্ষুদ্র রাজা হইলেও আমি বর্ত্তমানে তাঁহাকে যদি কবি মাইকেল মধুসূদনের মত দাতব্য চিকিৎসালয়ে পড়িয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয়, তবে দেশের পরম দুর্ভাগ্য। তোমরা আমার পারিষদেরা নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে, আর আমাকে যে কতদূর যাইতে হইবে তাহা জানি না। তোমাদের চক্ষু কর্ণ যেন এইরূপ ব্যাপারে বন্ধ না থাকে মুখ যেন সদা-সর্ব্বদা খোলা থাকে।"

বন্ধুবর দীনেশচন্দ্রও স্বর্গীয় বীরচন্দ্রের আনুকূল্যে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনিও মহারাজ রাধাকিশোর হইতে তাঁহার বঙ্গবাণী সেবার পুরস্কারস্বরূপ মাসিক ২৫ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইয়াছিলেন; আজও সে বৃত্তি লোপ পায় নাই।

একবার কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র রবিবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে স্বীয় গবেষণার ফলাফল দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তখনও রাধাকিশোরের জগদীশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। মহারাজ এ খবর পাইয়া বিনা নিমন্ত্রণে উক্ত কলেজের বিজ্ঞানাগারে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। জগদীশবাবু ইংরাজীতে স্বীয় গবেষণার ফলাফল ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। মহারাজ ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ছিলেন না বলিয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহার বক্তব্য বুঝিয়াছেন কিনা অতি সঙ্কোচের সহিত জিজ্ঞাসা করায়, মহারাজ স্বয়ং দু'একটি Experiment নিজেই সম্পন্ন করিয়া দেখাইলেন এবং বলিলেন, "বাংলাতে আপনার আবিষ্কার সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা আমি পড়িয়াছি এবং বিজ্ঞান আলোচনায় আমি বিশেষ আনন্দ পাই, আমিও আপনার একজন ছাত্র।" জগদীশবাবু বলেন, "M.A., M.Sc. ক্লাসের ছাত্রদের এ তথ্যগুলি বুঝাইতে গলদঘর্ম্ম হইতে হয়, মহারাজ কেমন সুন্দরভাবে এবং সহজে এসব বুঝিতে পারিয়াছেন।" তারপর একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্য্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত নহে। রবিবাবু ইহাতে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করিলেন; বিশেষতঃ বুঝিলেন, জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাঁহার বিজ্ঞানের নতুন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে; ১০,০০০ টাকা রবিবাবু নিজে আত্মীয় স্বজন বন্ধু- বান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন, বাকি টাকার জন্য ত্রিপুর রাজদরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন। মহারাজ রাধাকিশোর তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। কবিকে ভিক্ষুকবেশে আসিতে দেখিয়া বলেন, "এ বেশ আপনাকে সাজে না, আপনার বাঁশী বাজানই কাজ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিক্ষার ঝুলি বহন করিব। প্রজাবৃন্দের প্রদত্ত অর্থই আমার রাজভোগ যোগায়। আমাদের অপেক্ষা জগতে কে আর বড় ভিক্ষুক আছে? এ ভিক্ষার ঝুলি আমাকেই শোভা পায়, আমাকেই ইহা পূর্ণ করিতে হইবে।" তখন যুবরাজ

বীরেন্দ্রকিশোরের বিবাহ উপস্থিত। মহারাজ বলিলেন — "বর্ত্তমানে আমার ভাবী দুধ্‌মাতার দু-এক পদ অলঙ্কার নাই বা হইল, তৎপরিবর্ত্তে জগদীশবাবু সাগর-পার হইতে যে অলঙ্কারে ভারতমাতাকে ভূষিত করিবেন, তাহার তুলনা কোথায়!"

জগদীশবাবুর বিজ্ঞানাগারের ব্যবস্থা হইল। তৎপর জগদীশবাবু বিলাতে বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীয় গবেষণা প্রচারের বাসনায় বিলাত যাত্রা করেন। তথায় নানা কারণে তাঁহার আবিষ্কারের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে বিলম্ব হইতে লাগিল। অথচ ছুটী ফুরাইয়া আসায় ভগ্ন-মনোরথ হইয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইত, এমনি অবস্থায় রাধাকিশোরের ঐকান্তিক উৎসাহবাণী এবং ২০,০০০ টাকা অর্থ সাহায্যলাভে, বিলাতের বৈজ্ঞানিক সমাজের জয়মাল্য লইয়া দেশে ফিরিলেন। সে কাহিনী স্বয়ং আচার্য্য জগদীশবাবু বিজ্ঞান-মন্দিরের অভিভাষণে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। নীরব-দাতা রাধাকিশোরের বিশেষ অনুরোধে একথা আমরা ছাড়া কেহই জানিত না — অদ্য তিনি অমরলোকে — হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার এ সুযোগ জগদীশবাবু ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"When his first experiments brought vividily before him the universal sensitiveness of matter and the outcome of this generalisation in different realms of thought, he had a visit from late Maharaja of Tipperah, Radhakishore Manikya. The Maharaja was a great scholar in the Vernacular, though he was totally unacquainted with English language. According to the prevailing standard, the cultural value of his acquirements would be questioned. But the Maharaja's ignorance of English did not stand in the way of his instantly realising the significance of the lecturer's experiments. Indeed his own mind was put to its fullest activity in answering the Maharaja's most intelligent questionings as regards the trend of his work in clearing up many difficult problems. The reference to this subject may be opportune in view of the controversy whether the great Akbar was literate or illiterate and whether the University Commission should recommend the Vernacular language as suitable vehicle for scientific instruction. The Govt. of India sent him on his second scientific deputation to the West to announce his discovery and he experimentally demonstrated before the meeting of Royal Society the sensitiveness of ordinary plants. The discovery was refused publication to reach the scientific world. The period of his deputation was then nearing its end and he has to make his choice of returning of India discredited or overstay in England risking his appointment or the chance of convincing some unbiased scientific men. While in this dilemma he received a communication from the Maharaja assuring him of his firm belief and also a large remittance towards the possiblity of continuation of his researches. He was thus enabled to prolong his stay and thus secure many true friends among scientific men in England who stood for fair play, resulting finally in the acceptance of his work. It was the special request of the late Maharaja that he wished to remain unknown in this connection. He has now passed away and it is permissible to speak now of one who stood by him at a time when such friendship was most needed."

(The Englishman - 12th March, 1918)

মর্ম্ম — "আচার্য্য বসু তখন জড়জগতে অনুভূতির স্পন্দন বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিতেছিলেন এবং তাঁহার এই চিন্তাধারা যখন নানাভাবে তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, তখন একদিন ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর বিজ্ঞানাচার্য্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাজ মাতৃভাষায় যেমন কৃতবিদ্য ছিলেন, তেমন ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞাতসার ছিলেন না। বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত শিক্ষার মাপকাঠিতে তাঁহার বিদ্যাবত্তার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু ইহা খাঁটি সত্য যে তাঁহার ইংরেজী ভাষার অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বসু মহাশয়ের ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মর্ম্মকোষে প্রবেশ করিতে তাঁহার তিলমাত্র বিলম্ব হয় নাই; কেন না, বসু মহাশয়কে তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ধারা সম্পর্কে মহারাজ এরূপ সব সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা পরিচায়ক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে, সেই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর যোগাইতে আচার্য্যের মত মনীষীকেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

"উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখদ্বারা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে যে, আকবর বাদশাহ শিক্ষিত কি নিরেট মূর্খ ছিলেন এবং বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈঠক মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার ব্যবস্থা করিবেন কিনা। ভারত-গভর্ণমেন্ট অধ্যাপক বসুকে দ্বিতীয়বারের জন্য পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার নূতন আবিষ্কার বাণী প্রচারকল্পে প্রেরণ করেন এবং তিনিও রয়েল সোসাইটিতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহার আবিষ্কার সপ্রমাণ করেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার গবেষণা জগতের বিজ্ঞান-সমাজে প্রকাশিত করিবার সুযোগ হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তখন তাঁহার উভয় সঙ্কট। একদিকে তাঁহার কলেজের ছুটী শেষ হইয়া আসিতেছিল, অন্যদিকে যদি বিফলমনোরথ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবে অপমানের একশেষ। অথবা বিলাতে থাকিয়া যদি নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিকের মনে ইহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ খুঁজেন, তবে চাকুরীর দায় ঘটার সম্ভাবনা ছিল। জীবনব্যাপী সাধনার এই সন্ধিস্থলে তিনি মহারাজ রাধাকিশোর হইতে উৎসাহসূচক গভীর আশ্বাস এবং বিলাতে থাকিয়া গবেষণা প্রচারের জন্য বিপুল অর্থ সাহায্য পাইলেন। এরূপ অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তা এবং সাহায্যে আচার্য্য বসু পাশ্চাত্য দেশে আরও কিছুকাল বাস করিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে অনেক সহৃদয় বন্ধু লাভ করিলেন এবং তাঁহাদের সত্যপ্রিয়তার বলে অবশেষে তাঁহার আবিষ্কার গৃহীত ও অনুমোদিত হইল। মহারাজের ঐকান্তিক অনুরোধ ছিল, এ সম্পর্কে তাঁহার নাম যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশিত না হয়। কিন্তু মহারাজ এখন পরলোকে এবং সেই সন্ধিক্ষণে যাঁহার বন্ধুতা তাঁহার পার্শ্বে শক্তি-স্তম্ভরূপে দাঁড়াইয়াছিল এক্ষণে তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার এ সুযোগ গ্রহণ করার কোন বাধা নাই।"

রবিবাবুর প্রতি রাধাকিশোরের বন্ধুতা এবং আত্মীয়তার সীমা ছিল না। সাহিত্যের প্রচার বা রাজকার্য্যে সুশৃঙ্খলতা এবং উন্নতি সম্পর্কে তিনি রবিবাবুর মত এবং সাহায্য গ্রহণ করিতেন। রবিবাবুর কাব্যপ্রতিভায় যেমন আকৃষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁহার কর্ম্মভূমি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি ছিল। স্বয়ং মহারাজ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইয়া, বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রাদি দান করিয়া আসেন। বৃত্তি দান করিয়া ছাত্র প্রেরণ করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে বাৎসরিক ১০০০ এক হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এখনো সে বৃত্তি বোলপুর বিদ্যালয় ভোগ করিতেছে। এমন কি, স্বীয় পুত্র ব্রজেন্দ্রকিশোরকে বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্ররূপে প্রেরণ করার অভিপ্রায় ছিল — কিন্তু কোন কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ত্রিপুর রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি রবিবাবুর আন্তরিক দৃষ্টি ছিল — মন্ত্রী নির্ব্বাচনেও মহারাজ তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। এসব ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় এই রাজ্যের কর্ম্মচারী মহলে তাঁহার সঙ্গে এ রাজ্যের সম্বন্ধ লইয়া নানা কথা উঠিয়া আগরতলার মত ক্ষুদ্র স্থানকেও তোলপাড় করিত। সে জন্য কবির মনে সময় সময় চাঞ্চল্য এবং এ রাজ্য সম্বন্ধে বীতস্পৃহা উপস্থিত হইত, কিন্তু রাধাকিশোরের অকৃত্রিম বন্ধুতা এবং স্নেহ তাঁহাকে ত্রিপুরার সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইতে দেয় নাই। সেই জন্যই এই দুই মহানুভবের বন্ধুত্বের গভীরতা ক্ষুদ্র দলাদলি ফাঁকা সোরগোলে কিছুমাত্র বিচলিত হইত না। বাংলা দেশের রাজা, বাঙ্গালী কর্ম্মচারী চালিত রাজ্যের ত্রুটিবিচ্যুতি, বাঙ্গালীরই কলঙ্কের পরিচায়ক বলিয়া রবিবাবুর মনকে আঘাত দিত। সে জন্যই ত্রিপুরার মঙ্গল এবং উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদা উৎসুক এবং চেষ্টিত আছেন। এই রাজ্যেই বাঙ্গালী মস্তিষ্কের সু-ব্যবহার হইবে, বাঙ্গালী প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হইয়া অন্যান্য রাজ্যের দৃষ্টান্তস্থল হইবে, এ আশা এখনো তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন।

৪২। ত্রিপুরাধিপতি প্রদত্ত "ভারত ভাস্কর" মানপত্র

ক

True Copy

নং ১৫২।





দরবার বিনয়-সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চশ্রীযুক্ত ত্রিপুরাধিপতি ক্যাপ্টেন হিজ হাইনেস মহারাজ মাণিক্য স্যার বীরবিক্রম কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর কে-সি-এস-আই। এলাকে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য।

নরপতেরাদেশোয়ং কারকবর্গেষু প্রচরতু পরমশ্রী বিরাজতে রাজধানী—হস্তিনাপুরী। ইতি—

১৩৫১ ত্রিপুরাব্দ, তারিখ ২৫শে বৈশাখ।

যেহেতু বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসব হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত:—

যেহেতু মর্ত্য দেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যের চরম [illegible] —'মর্ত্যোঃ মৃত্যো [illegible] এতাবদনুশাসনম্', ঋষির কাব্যের ভিতর দিয়া [illegible] উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগৎকে দিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনায় অঙ্কুরোদ্গত সেই অমর জ্যোতিঃ প্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অধীশ্বর, এ পক্ষের প্রপিতামহ গুণী [illegible] মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ করে—তিনিই [illegible] রবিকে রাজ-অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

যেহেতু এ পক্ষের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নব-যুগ-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহার্দ্য-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যে, কাব্যে ও চিন্তাধারায় এ রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া আসিতেছেন—

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা নগরীতে যোগ্যকার্য্যে যুক্ত হইবার গৌরব লাভ এ পক্ষের হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্ম-বার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভ স্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভা-যুগে সসম্মানে অভিনন্দিত করা ত্রিপুর-রাজের কর্ত্তব্য—"জ্যোৎস্নাভিনাহন্ত মহন্তু দ্যাষকারম্"—

অতএব

এই উৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত

কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে

"ভারত-ভাস্কর"

আখ্যায় ভূষিত করা যায় ;—

এবং

শ্রীভগবান্ তদীয় আশীর্ব্বাদে কবিবরকে সুস্থ দেহে

শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।

———

Uttarayan
Santiniketan, Bengal

পরম কল্যাণীয়েষু
বহুমানাস্পদ শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য দেব বাহাদুর।

ত্রিপুরার রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলেম আজ তা বিশেষ করে স্মরণ করবার ও তাকে স্মরণীয় করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এরূপ অপ্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্লভ। সেদিন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এই কথাটি আমাকে জানাবার জন্য তাঁর দূত আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন যে তিনি আমার তৎকালীন রচনার মধ্যেই একটি বৃহৎ ভবিষ্যতের সূচনা দেখেছেন। সেদিন এ কথাটি সম্পূর্ণ আশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার তখন বয়স অল্প, লেখার পরিমাণ কম, এবং দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করত। বীরচন্দ্র তা জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখ বোধ করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলংকৃত কবিতার সংস্করণ ছাপানো হবে। তখন তিনি ছিলেন কার্শিয়াং পাহাড়ে, বায়ু পরিবর্তনের জন্য। কলকাতায় ফিরে এসে

৪৩। 'ভারত ভাস্কর' মানপত্র গ্রহণান্তর কবির উত্তরের অংশ বিশেষ
(শেষ অংশ পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত করে রাখল। এ বৎসর সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠল ঠিক সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলেম তা [illegible] ফল মহারাজের জীবন যাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে প্রবর্তিত করতে থাকে। আজ আমার দেহ দুর্বল, আমার ক্ষীণ কণ্ঠ সমস্ত দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর জয় ধ্বনিতে কবি জীবনের অন্তিম শুভ কামনা মিশ্রিত করে দিয়ে মহা নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শান্তি লাভ করুক। ইতি ৩০ বৈশাখ, ১৩৪৮

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ অপরাহ্নে ঠাকুর বোর্ডিং দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। ইতি [illegible] ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৪। আগরতলা ঠাকুর বোর্ডিং পরিদর্শনপুস্তকে স্বাক্ষর

I am grateful for the reception given to me by the students and teachers of this school and am greatly pleased with what I saw there.

Rabindranath Tagore

Nov. 10.
1919

৪৫। আগরতলা উমাকান্ত একাডেমী পরিদর্শনপুস্তকে স্বাক্ষর

সুখং বা যদি বা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ং
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত
হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥

হোক্ বা সুখ হোক্ বা দুখ
প্রিয় বা অপ্রিয়,
অপরাজিত চিত্তে তুমি
বরণ করি নিয়ো।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮ আশ্বিন
১৩১৭
গিরিডি।

৪৬। মহারাজকুমার শ্রী ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রতি আশীর্ব্বাণী

কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইলা দেবীর সহিত
কল্যাণীয় শ্রীমান রমেন্দ্র দেববর্ম্মার
শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে
আশীর্ব্বাদ —
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২ জুন
১৯৩৬

খ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইলা

তোমরা যুগল প্রেমে রচিতেছ যে আশ্রয়খানি
আমি কবি তার পরে দিনু মোর আশীর্ব্বাদ আনি।
মিলন সুন্দর হোক, সংসারের বাধা হোক দূর,
জীবনযাত্রার পথ হোক শুভ, হোক সুমধুর॥

আশীর্ব্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
১২ জুন
১৯৩৬

৪৭। কুমার শ্রী রমেন্দ্রকিশোরের সহিত রাজকুমারী ইলার শুভপরিণয়োপলক্ষে আশীর্ব্বাদ



নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং।
অদ্যৈব মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

~~[illegible]~~
লক্ষ্মী গৃহে আসুন বা ছাড়ুন ঘর,
— আজ মৃত্যু হোক কিম্বা হোক যুগান্তরে
ন্যায্য পথ হতে ধীর এক পা না সরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৮। শ্রী সত্যরঞ্জন বসুকে আশীর্ব্বাদ

ত্রৈপুরী ১৩১৫ সালে ১৭ই আষাঢ় তারিখে আগরতলায় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রশস্ত গৃহে, সাহিত্য সভা স্থাপনোপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিতে এক সভার অনুষ্ঠান হয়। সে বিরাট সভার মঞ্চোপরি একটি আসন মহারাজ রাধাকিশোরের জন্য, অপরটি সভার সভাপতি রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সভারম্ভে রবিবাবুকে সভাপতি পদে বরণ করিয়া, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য সর্ব্বসাধারণের সমসূত্রে আসন গ্রহণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ সসঙ্কোচে মহারাজকে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে অনুরোধ করিলে মহারাজ বলেন — "সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার স্থান সর্ব্বোপরি, আপনি সাহিত্যের রাজা, আমি আপনার ভক্ত বন্ধু মাত্র, এ উচ্চমঞ্চে আমার স্থান নহে।" দর্শক এবং উপস্থিত প্রজাবৃন্দ মহারাজের বিনয়নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ এবং গৌরবান্বিত বোধ করিল, কবি রবীন্দ্রনাথ এ দৃশ্য দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। ত্রিপুর রাজ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের গভীর আকর্ষণের কারণ তিনি সেদিনকার অভিভাষণে স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি —

"এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি সংস্কৃত বাক্য অঙ্কিত দেখিয়াছি — "**কিলবিদুবীরতাং সারমেকং**" — বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এ কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। পার্লামেন্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্য্যই সার। এই বীর্য্য দেশকালপাত্রভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয় — কেহ বা শস্ত্রে বীর, কেহ বা শাস্ত্রে বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্ম্মে বীর, কেহ বা কর্ম্মে বীর।

* * * *

"অল্পদিন হইল, একজন বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দেশীয় রাজ্য শাসনের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিলেন — তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, তিনি মনে করিতেছেন, বৃটিশ রাজ্যের সুব্যবস্থা সমস্তই যেন তাঁহাদেরই সুব্যবস্থা; — তিনি যে ভারবাহী মাত্র — তিনি যে যন্ত্রী নহেন, যন্ত্রের একটা সামান্য অঙ্গমাত্র, একথা যদি তাঁহার মনে থাকিত, তবে দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার প্রতি এমন স্পর্দ্ধার সহিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। বৃটিশ রাজ্যে আমরা যাহা পাইতেছি, তাহা যে আমাদের নহে এই সত্যটি ঠিকমত বুঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে। এই কারণেই আমরা রাজার নিকট হইতে ক্রমাগতই নূতন নূতন অধিকার প্রার্থনা করিতেছি এবং ভুলিয়া যাইতেছি — অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া একই কথা নহে। দেশীয় রাজ্যের ভুল ত্রুটি মন্দগতির মধ্যেও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে, তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরারাজ্যের প্রতি উৎসুক দৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না।"

আশাকরি তাঁহার বাণী ত্রিপুরায় ব্যর্থ হইবে না, ভবিষ্যৎ মাণিকগণ কবির বাণী সফল করিয়া তুলিবেন।

চন্দন বনে এরণ্ডগাছও যেমন সংসর্গ বলে চন্দন গন্ধের ভাগী হয়, সেরূপ রাধাকিশোর মাণিক্যের সেবাধিকার পাইয়া আমারো ভাগ্যে রবিবাবুর বন্ধুত্বের কিয়দংশ লাভ হইয়াছিল। বাংলা লেখা, তাঁহারি বিশেষ উৎসাহে মোক্স করিতে আরম্ভ করি। সে সাহিত্য-সভায় কোন প্রবন্ধ পাঠের গৌরব আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। রাজকীয় কার্য্যে উন্নত আদর্শ স্থাপন করিতে তাঁর অমূল্য উপদেশাবলী কর্ত্তব্যের পথে চলিতে অনেক সময় সাহায্য এবং বলদান করিয়াছে। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া বিশ্রাম সুখ লাভ করিতেছি — এখন গত জীবনের স্মৃতি আঁকড়িয়া জীবন শেষ করিতে পারিলে ধন্য হইব। রবিবাবুও ত্রিপুরার দরবার হইতে দূরেই আছেন। কিন্তু ত্রিপুরার প্রতি তাঁর আন্তরিক শুভ ইচ্ছা সর্ব্বদা জাগ্রত আছে, তাহা তাঁহার বর্ত্তমান পত্রাদিতে স্পষ্ট দেখিতে পাই। রবিবাবুকে লইয়া টানাটানি করা আজকালকার ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে — কিন্তু ত্রিপুররাজ্যের সহিত তাঁহার শুভ সম্বন্ধের ইতিহাস বিকৃত করিতে যাইয়া যদি ভুলচুক কিছু ঘটিয়া থাকে তবে তিনি মাপ করিবেন — কারণ তিনি জানেন, আমি তাঁহার একান্ত অনুগত।

স্মরণ-শিখা *

*ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্,-এ

সাহিত্যের প্রতি একটা অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ জীবনের প্রায় প্রথম প্রভাতেই জাগিয়া উঠিয়াছিল, বিদ্যালয়ের দুরূহ শাসনের ব্যুহ ভাঙ্গিয়া পলাতক মন কাব্য-গ্রন্থের নিত্য নব বিচিত্র বর্ণের বলাকার পেছনে উধাও হইবার জন্য সুযোগ খুঁজিত। পাঠ্য পুস্তকের শর-শয্যায় থাকিয়া কখন গ্রীষ্ম বা আশ্বিনের 'উত্তরায়ণ' দেখা দিবে এবং পিতামহের মুক্তি প্রতীক্ষার ন্যায় আমারও কাব্য-পিপাসু মন, কাব্য-গ্রন্থের অলকানন্দায় কখন অনবসর অবগাহনে ধন্য হইবে তাহার একটা করুণ চাঞ্চল্য বাল-হৃদয় ছাপাইয়া তুলিত। এই তীব্র উন্মাদনায় শিক্ষালয়ের দিকে যে কতকটা শৈথিল্য জমাট বাঁধাইয়া দেয় এবং অধ্যয়নের 'অষ্টপ্রহর' সঙ্কুচিত করাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রূকুটি আহবান করে, তাহা জাগ্রত সত্যরূপে অনেকের জীবনে স্বীকৃত হইতে বাধ্য।

আমরা বঙ্কিমযুগের 'নবাগত-অতিথি' নহি। আমাদের চোখের কচি-আঁখিপাতা যখন ফুলদলের ন্যায় প্রথম মেলিতেছিল, তখন মেরুপ্রান্তে বঙ্কিম মিলাইয়া গিয়াছে, আকাশের ছায়া-পটে তখন নূতন সূর্য্য উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্যাহ্ন ভাস্কর, তখন আমাদের জীবনবৃন্তে কুসুম-কোরক এই সবেমাত্র ফুটি ফুটি করিতেছে, জীবনের সেই ঊষালোকে ভোরের পাখীর কল কাকলির ন্যায়, এই রবীন্দ্রনাথের মুরজ-মন্ত্রে জীবন-সঙ্গীতের প্রথম প্রভাতী শুনিতে পাই। শ্রবণের সুর, চক্ষুর সুষমা, হৃদয়ের ভাব-বিহবলতা না হইলে সংসারের বাহিরের আচরণ ঘুচিয়া শ্যামল বসুন্ধরার জগ-মোহিনী রূপ উন্মোচিত হয় না। সে সাধনার চাবি যাহার হাতে নাই, তাহার জগৎ সংসার, বাহ্য-দৃষ্টি-গ্রাহ্য নারায়ণ যেন প্রস্তরীভূত — শিলার বহিরাবরণ ভেদী দৃষ্টিতে সাধক যেখানে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের বৈকুণ্ঠধাম দেখিতে পায়, অনভিজ্ঞ আগন্তুকের কাছে সেখানে শিল নোড়ার বাড়া আর কি লক্ষিত হইতে পারে?

শৈশবের ঊষালোকে যখন বন্ধ-কলিকার অন্ধ আঁখিটি উন্মীলনের প্রতীক্ষায় "ভাষাহীন ভাব কলগুঞ্জনে আকুলি বিকুলি ফেরে" অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিত, তখন নব-নন্দনের সে কোন মাধবী হাওয়ায় ফুল-বন্ধ ঘুচিয়া বিশ্বপ্রকৃতির অনবদ্য একখানি নিটোল ছবি আঁখি তারকার নীলাঞ্জনে আঁকিয়া দিল! ধ্যান-গম্ভীর গুরুর নিবাতনিষ্কম্প সৌম্য নিশ্চলতা যেমন তপোবনের দুরান্ত অন্তেবাসীর চপলতা অলক্ষ্যে শাসিত করিয়া তাহাকেও তপস্যার যাদু-মন্ত্রে ধ্যানতন্ময় করিয়া তোলে, এই শান্তিনিকেতনের সিদ্ধ-তপার, কাব্য-সাধনার ধূপ গুগ্‌গুল্, আকাশ বাতাস ছাপাইয়া বঙ্গের একপ্রান্তে জাগরণোন্মুখ চিত্তের অলক্ষিত জাগরণে প্রভাব ছড়াইয়াছিল। কাব্য-গ্রন্থের সোনার তুলি পরশে যেন আকাশে নীল পাতে, ধরণীর সবুজ মাঠে মাঠে, কনক-নিকষ-স্নিগ্ধ শ্রবণ-মনোহর মেঘ-মল্লারে একটা বিচিত্র রসের আস্বাদন শ্রবনে, দর্শনে, মননে পরিবেশিত করিত।

সেই হইতে দীপ্ত সূর্য্যের আলোকচ্ছটা সাহিত্য-বাতায়নে উদ্ভাসিত দেখিতাম, যখন বুঝিবার মত বয়স হইল এবং নোবেল-সম্মানের মর্য্যাদাবোধ জন্মিল, তখন প্রতীচ্যজয়মাল্যধারী কবির স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনে মনের বীণায় যে সুরের মীড়মূর্চ্ছনা জাগাইত, তাহা যেন কথার বাঁধনে কহিত, —

তুমি
ভারতের অঙ্কে উচ্চশির!
পাঞ্চজন্য শঙ্খে শুন পুরলক্ষ্মীর
জয়-তিলক শুভাশীর্ব্বাদ
হে ধীর
এসো বীর!

---

* প্রকাশিত — 'রবি' ত্রৈমাসিক পত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ (১৩৩২ বাং)

মনে পড়ে, কিছুকাল আগে আমার ছাত্র-জীবনে যখন অসহযোগের প্রচারমন্ত্রে হিন্দী শিক্ষার জন্য বাঙ্গালীকে উদ্বুদ্ধ হইতে হয়, এবং বাঙ্গালীর জিহ্বা হিন্দীর অক্ষরমালায় অভ্যস্ত হইতে থাকে, বাঙ্গালীর হিন্দীকে নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা উচিত কি না, তৎসম্বন্ধে আমার মনে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী কেনই বা স্থান পাইবে এবং বাংলা কেনই বা উপেক্ষিত হইবে, তাহার কোনই সমস্যা জুটিতেছিল না; ভাষা হিসাবে, সাহিত্য হিসাবে হিন্দীর মূলধন কত? কথিত ভাষারূপে উত্তর-ভারতে ইহার জয়-জয়কার হইলেও দক্ষিণ-ভারতে ইহার নামোল্লেখ নাই — দাক্ষিণাত্য ভারতের আধা! অথচ বাংলা ভাষার চিন্তার সুরধুনীতে রবীন্দ্রনাথ য়ুরুপের জাতিসঙ্ঘের ভাষাসঙ্ঘের মধ্যে একটা নূতন তীর্থ গড়িতেছেন, তাঁহার দ্যোতনার সম্মোহনে য়ুরুপকে মন্ত্রচালিতের ন্যায় ভাবাবিষ্ট করিয়া তুলিতেছেন, সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। কংগ্রেসের সভাপতিরূপে লালা লজপত ইংরেজী গীতাঞ্জলির ছত্র আওড়াইতেছেন এবং বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপনা সুরু হইয়াছে। এই সব জল্পনা আলোচনা স্বর্গগত কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরের সহিত হওয়ায়, তিনি আমাকে বিষয়টির সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নিবন্ধ চাহেন, তিনি উহা রবিবাবুর নিকট আমেরিকায় প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহারই Cover-এ পুরিয়া আমার উপলক্ষে এক প্রত্যুত্তর পাঠান। আমি তাঁহার চিঠিসহ দুইটি প্রবন্ধ মানসী ও মর্ম্মবাণীতে ছাপাই। প্রথম সংখ্যায়, বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে, অপর প্রদেশের পনরটি ভাষার প্রবেশাধিকার এবং অন্যান্য প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্র প্রবেশ নিষেধ ইত্যাদি বহুল অসামঞ্জস্যের নিদর্শন দেওয়া হয়। দ্বিতীয় সংখ্যায় য়ুরুপের রাষ্ট্রীয়ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস এবং বর্ত্তমান বহু উত্তর-পক্ষের মধ্যে পূর্ব্বপক্ষরূপে বাংলাকে রাষ্ট্রীয়ভাষার সম্মান দান বিবেচিত হয়। রচনার নাম ছিল 'ভারতের জাতীয় মহাশঙ্খ।'।

যখন রবীন্দ্রনাথ ফিরিলেন এবং আমারও অবকাশ ঘটিল, তখন কর্ণেল ঠাকুরের সঙ্গে বোলপুর গেলাম সেখানে সেই আমার প্রথম যাওয়া, তাঁহার সেই আশ্রমভবনের দিগ্‌দিগন্ত খোলা — আকাশ যেন নুইতে নুইতে মাটীর সমতলে অসীম স্নেহে উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। ঠিক্ দুয়ের মধ্যে এমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অন্য কোথাও লক্ষ্য করি নাই। সন্ধ্যা-রাত্রিতে তাঁহার চিত্র সম্বন্ধে ভাষণ শুনিলাম। দিনগুলির মধ্যে একটা অশ্রান্ত কলগুঞ্জন পুলক ছড়াইত, বাণীর কানন, কর্লহংসের নূপুর নিক্কণ, সহকার পল্লবে পল্লবে, শালবীথির পত্রমর্ম্মরে ফুলের রাশে রাশে একটা নিরুদ্দেশ সুরলহরের মত, বাতাস নাচাইত মাতাইত, নৈশ তারকার সারির মাঝে তাহাকে উধাও করিয়া দিত! একদিন ভোরের অবকাশে কবি-কুঞ্জে ঢুকিলাম — তখন কবি একাকী। ইহার মধ্যে কর্ণেল ঠাকুর আমার লিখিত প্রবন্ধ দুইটি রবীন্দ্রনাথকে দিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গ উৎথাপিত হইল। তিনি বলিলেন, 'তোমার লেখা পেয়েছি।' জিজ্ঞাসা করিলাম 'পড়েচেন কি?' 'হাঁ পড়েচি।' * * তুমি ভাষার উচ্ছ্বাসের উৎস যতটা খুলেছ, তাতে হ'বে না, ইতিহাস দিতে হবে। এই বয়সে তোমাকে ভাব্‌তে হবে আমি কতটা Create কর্‌তে পারি। Produce করে কিছু লাভ নেই, তাতে দেবার মত কিছুই হয় না। Produce করে দেশকে কি দেওয়া যায়? কিছুই নয়। Create কর্ত্তে শিখ, দেশকে দিতে হবে জেনো!' Creation Production এর কথাটা আগেকার সন্ধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন — 'য়ুরুপে দেখ্‌লাম সৃষ্টির খোঁজ নেই শুধু তৈয়ার হচ্ছে — আমাকে এঁরা সব দেখালেন দেখুন মোটরের বিরাট কারখানা! দেখ্‌লাম বটে বিপুল automachine হা করে আছে এবং material পড়তেই ক্ষণিকের মাঝে এক একটা মোটর বেড়িয়ে আসছে, তাতে কি হল? মিনিটে মিনিটে সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে না হয় মোটর বেরুতে থাক্‌ল কিন্তু এটা কি? এ তো কখনো Creation নয় এ যে পুরাদস্তুর Production.'

আমি তাঁহার মৃদু তিরস্কার পাইয়া ভাবিলাম, আমার লেখা সব তিনি পড়েন নাই, বলিলাম, 'কেন আমাকে দোষ দিচ্চেন, ইতিহাসের বনিয়াদে এ মনটা আবাল্য গড়্‌তে প্রয়াস পেয়েছি, কোন কিছু লিখ্‌তে গেলে ইতিহাসের কাঠাম ঠিক করে তবে লিখলে মনে সুখ পাই, এখানেও ত মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রারম্ভ-পত্রটি দিয়ে য়ুরুপীয় প্রধান জাতির আত্মগত ভাষা বৈষম্যের এবং জাতীয় ভাষা সামঞ্জস্যের দিক্ দুইটি রাজনৈতিক ঘটনার সংক্ষেপ অবতারণা দ্বারা পরিষ্কার করে একটা নক্সা তৈরী করেচি। সেই রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুপাতে এদেশের নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে ভাষার একত্ব প্রতিষ্ঠায় ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্চে'

তিনি বলিলেন, 'তোমার এ লেখাটা ত আমি পাইনি, আমি শুধু প্রথম সংখ্যা পড়েছিলুম।'

আজও থাকিয়া থাকিয়া মনে জাগে এই তিরস্কারের ফাঁকে যে অমূল্য উপদেশ শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহার প্রতিধ্বনি কোথাও শুনিব কি? মেঘের ভ্রূকুঞ্চনে বিজলী খেলিয়া যায়, তাহার বা মাধুরী কত!

কহিলাম — 'আপনি যদি এই বাংলার "সুরের আগুন" দিকে দিকে না ছড়িয়ে দিন, বাংলা ভাষার দিকে পঞ্জাব গুর্জ্জর-কর্নাটের সম্মান চক্ষু না ফোটান, তবে ইতিহাসে কাঙাল বাংলা জাতির মর্য্যাদা যে তিমিরে সে তিমিরে।'

তিনি কহিলেন — 'উপায় নেই! যত সহজ মনে কর তত নয়, তোমার চাইতে আমি অনেক দেশ দেখেচি, দেশে দেশে ঘুরে সম্মান পেয়েছি সত্য, কিন্তু আমি জানি, তাতে মনের টান কোন্‌খানে কতটা!

* * * যে দিন ভাগ ভাগ ঠাঁই ঠাঁই মন জোড়া লাগ্‌বে, জান্‌বে ভারতের ভাগ্য-লিপির পরিবর্ত্তন হবে।'

অক্ষরে অক্ষরে সেই কথাগুলি মনের লোকে সুপ্ত শক্তির ন্যায় লুকাইয়া আছে। আর একবার জোড়াসাঁকো ভবনে তাঁহার অনর্গল আলাপ প্রায় পাঁচ ঘন্টা কাল শুনি — অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান লইয়া উহাদের অবতারণা। কিন্তু অনেক কথাই প্রকাশে বাধা আছে। সাহিত্যের ছায়াপথে যখন মনের রথ ঘুরিয়া ফিরে এবং কিশোরের কাব্য-জগৎ করুণ উন্মাদনায় যখন জীবন-স্বপ্নের শেফালী-বিভ্রম-জ্যোৎস্না-নিশীথিনীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস ভাসাইয়া আনে, তখন আকাশ-গঙ্গার পূর্ব্বতীরে এই তনুক্ষীণ শীর্ণ তারাটির দিকে চাহিয়া ভাবি, ইহার নির্ব্বাসনের কবে অবসান?

আগরতলার রবীন্দ্রনাথ *

* হরিদাস ভট্টাচার্য্য

১০ই ফাল্গুন, রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কুঞ্জবন-প্রাসাদে পদার্পণ করেন। দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ হইল। রাস্তা হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া প্রাসাদের দরজায় আসিতে রীতিমত পরিশ্রম বোধ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিলাম। সমবেত ভাইস্ প্রেসিডেন্ট বাহাদুর ও চিফ্ সেক্রেটারী মহোদয় প্রভৃতির সহিত সাদর সম্ভাষণান্তর আহারে বসিয়া তিনি রাজ-পরিবারের সকলের কুশল প্রশ্নাদি করিলেন।

তাঁহার পরিচর্য্যার ভার আমার উপর পতিত হইয়াছিল, এজন্য সর্ব্বদা তাঁহার সাহচার্য্য লাভের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। কুমিল্লায় অবস্থানবিষয়ক প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি অভয়াশ্রমের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিলেন। কুমিল্লায় কবিকে দেখিবার জন্য এত জনসমাগম হইয়াছিল যে, প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে নিদ্রার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে লোকে ঘিরিয়া থাকিত। এইসব কারণে অসুস্থ কবির যে শান্তিভঙ্গ হইয়াছিল, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বীরপূজার (Hero worship) ঘটা এত অধিক যে, পূজার বিল্বপত্র ও ফুলের চাপে বীরের প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম!

আহারের পর অধিক রাত্রি হইয়া যাওয়ায়, কবি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, আখাউড়া হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর ও রণবীরকিশোর আহারের পর কবির বিদায় গ্রহণ করা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। খুব সম্ভব সেই রাত্রি শুক্লপক্ষের দশমী তিথি ছিল। জ্যোৎস্নালোকে কুঞ্জবন ও তৎপার্শ্বস্থিত সমুদয় স্থানসমূহ এক অপূর্ব্ব শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ — কবি পূর্ব্ব দিকে খোলা বারান্দায় বসিয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। আমরা আহারাদি সমাপনকরিয়া নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কবি নিদ্রা গিয়াছিলেন কি প্রকৃতির ধ্যানেই রাত্রি প্রভাতে করিয়াছিলেন, তাহা জানি না।

পরদিন (১১ই ফাল্গুন) খুব ভোরে উঠিয়া দেখি, কবি তাঁহার বসিবার কোঠা হইতে অনিমেষ নয়নে সূর্য্যোদয়ের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন। রক্তিম আভায় পূর্ব্ব দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে — নানা রঙের পাখীগুলি নানা সুরে গান করিয়া কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছে বলিয়া মনে হইল। কবির হৃদয়ে বড়ই পুলক সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে দেখিয়া অনুমান করিলাম।

কিছুকাল পরে চায়ের ডাক পড়িল। চা-টেবিলে আসিয়া তিনি স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজোচিত বিনয় ও সৌজন্য সম্বন্ধে যে দুই একটি কথা বলিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। ব্যাপারটা এই — কবি মহারাজের সহিত যখন কার্সিয়াং-এ বাস করিতেছিলেন, তখন প্রত্যহই কবিকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় মহারাজের নিকট থাকিতে হইত। একদিন মহারাজের শরীর খুব অসুস্থ ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেদিনও নিয়মিতভাবে সন্ধ্যায় তথায় গিয়া মহারাজের অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিলেন। এদিকে মহারাজ কবির আগমন সংবাদে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এই অসুস্থ শরীর নিয়াও দরজা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে নিয়া আসিলেন। নানা প্রকার আলাপ আলোচনার পর কবির আবাসগৃহে যাওয়ার সময় হইলে, মহারাজ পুনরায় তাঁহাকে দরজা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে উদ্যত হইলে, কবি নিষেধ করিলেন। তদুত্তরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, "এই সকল নিয়ম রাজার পক্ষে অবশ্যপালনীয়। শরীর অসুস্থ বলিয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করা রাজধর্ম্ম হইতে পারে না।" ইত্যাদি। এই কথা বলিয়া তিনি দরজা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছিলেন।

---

* 'রবি' ত্রৈমাসিক পত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ (১৩৩২ বাং)।

তারপর কবির পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলে বলিলেন, "তোদের দেশটা (পূর্ব্ববঙ্গ) কর্ম্মীর দেশ — কলেজের নিষ্ফল উচ্চ শিক্ষার তোদের কোন দরকার নেই — তোরা কিছু লেখাপড়া শিখে জমি সংগ্রহ করে রীতিমত চাষ আবাদ আরম্ভ করে দে।" আজ এই দুর্দ্দিনে পূর্ব্ববাঙ্গালা সম্বন্ধে কবির এই বাণী বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। এমন কি, মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকেও এই মত কাজকর্ম্ম ছেড়েছুড়ে দিয়ে তাঁর সাবরুম তালুকে বসে বিস্তৃতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে agriculture করবার পরামর্শ দেন।

সেদিন বিকালে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর ও রণবীরকিশোর কবিকে লইয়া মোটরে সহরে বেড়াইতে যান। রাত্রিতে আহারাদির পর কবি পূর্ব্বদিকের বারান্দায় জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া কতক্ষণ ছিলেন তাহা ঠিক বলিতে পারি না।

পরদিন প্রাতে (১২ই ফাল্গুন) কবি "কিশোর" সাহিত্য সমাজে যান, সেখানে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। বিকালে মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়ীতে মণিপুরীদের দোলযাত্রার নাচ ও গান হয়। রাত্রিতে স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য সম্বন্ধে আলাপ উঠিলে তিনি বলিলেন, — তাঁহার লোক চিনিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। আমি তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম। মহারাজ বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোরের যে সকল চিঠি আমার কাছে আছে, সেগুলি অমূল্য সম্পদ বিশেষ। এমন চমৎকার চিঠি আজকালকার দিনেও লেখা অসম্ভব। তাঁহাদের কি প্রকার high culture ছিল — সেই চিঠিগুলি পড়িলেই সহজে অনুমান করা যায়। রাধাকিশোর মাণিক্যের মতন এমন বড় নীরবদাতা পাওয়া বড়ই কঠিন।"

তার পরদিন (১৩ই ফাল্গুন) প্রাতে 'রাজমালা' সম্পাদক কালীপ্রসন্নবাবু মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর সহ কবির সহিত কুঞ্জবনে দেখা করিতে যান। কালীপ্রসন্নবাবু তাঁহার লিখিত পাণ্ডুলিপিও মুদ্রিত রাজমালার কতগুলি ফর্ম্মা ও 'গীত-চন্দ্রোদয়' নাম অপ্রকাশিত বৈষ্ণব-পদাবলী গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। কবি রাজমালা সম্পাদকের লিখন ও সম্পাদন প্রণালী আলোচনা করিয়া বড়ই প্রীত হইয়া সানুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। এইভাবেই যত সত্বর হয় পুস্তকখানা মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পাণ্ডুলিপিখানা লইয়া কবি প্রথমেই হস্তাক্ষরের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং কাব্যরসের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, এই পুস্তকখানা অতিসত্বরই যাহাতে স্থানীয় 'কিশোর' সাহিত্য সমাজ প্রকাশ করেন, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। পুস্তকখানা যাহাতে পরহস্তগত না হয় তদ্বিষয়েও সাবধানতা অবলম্বন করিতে বারম্বার বলিলেন। সেদিন বিকালে কবি প্রতাপগড় কৃষিক্ষেত্র (দি টিপারা হিল্ ডেভেলপমেন্ট কোং লিমিটেডের বাগান) দেখিতে যান। সেখানে তাঁহার ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর জন্য সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। বাগানটি দেখিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হন। চাষ-আবাদ সম্বন্ধে তিনি নিজে বড়ই উৎসাহী। জমিতে রস সংরক্ষণ সম্বন্ধে তিনি নিজে যে experiment করিয়াছেন, তাহা ভদ্রচাষীদের পক্ষে বিশেষ উপকারে আসিবে। জমিতে একহাত পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া জমির সমুদয় মাটি একস্থানে জমা করিয়া রাখিয়া সমস্ত জমিটাকে খুব দুরমুশ করিয়া দিতে হইবে। তারপর জমা-করা মাটি সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া জমিতে ছড়াইয়া দিবে। ইহাতে শীত বা গ্রীষ্ম, কোন ঋতুতেই জমিতে রসের অভাব হইবে না। প্রত্যেক বর্ষার পরই মাটি আলগা করিয়া দিতে হইবে।

তখন বেশ মেঘ ঘনাইয়া, আকাশটা কালো হইয়া আসিতেছিল। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া আন ন্দে অধীর হইয়াছিলেন। সেই সময়, তিনি মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরকে বলিতেছিলেন, "আমার নাম বদলাইয়া তোমরা এখানে আমাকে একখানা কুটীর বাঁধিয়া দাও। জীবনের শেষকয়টা দিন প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াই অতিবাহিত করিব।" কবি কালিদাস বোধ হয় এই ভাবাপন্ন হইয়াই তাঁহার 'মেঘদূত' লিখিয়াছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের বাড়ীতে কবিকে মণিপুরী মেয়েদের রাসলীলা দেখান হয়। বর্ত্তমান মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কবির আগমনকালে রাজধানীতে ছিলেন না — পরে আসিয়াছিলেন।

এই সান্ধ্য-সম্মিলনে কবির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপাদি হইয়াছিল। ধ্বংসমুখে পতিত ত্রিপুরার প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ সংরক্ষণ জন্য মহারাজকে কবি বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

রাসলীলা দেখিয়া কবি বড়ই মুগ্ধ হন। সখীদের নৃত্য-ভঙ্গী বাস্তবিকই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। কবি বলিয়াছিলেন, "ইহা দেখায় আমার পূর্ব্ববঙ্গে আসা সার্থক হইল।"

তার পরদিন (১৪ই ফাল্গুন) দ্বিপ্রহরে কবি রবীন্দ্রনাথ কুঞ্জবন ত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কবি অসুস্থ, এবং বিশ্রামলাভ করাই এখানে আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এজন্য সাধারণের পক্ষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হয় নাই এবং অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কিশোর সাহিত্য সমাজেই তাঁহার সহিত জনসাধারণের সম্মিলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

কিশোর-সাহিত্য-সমাজের কবি সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে

সভাপতি মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোরের অভিভাষণ

আজ আমাকে আপনাদের যে সভার নেতৃত্ব করিতে আহবান করিয়াছেন, সেই সভায় এই গৌরবান্বিত আসন গ্রহণ করিতে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ হইতেছে। যোগ্য অযোগ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও---জীবনে যাঁহারা বহু সকাল-সন্ধ্যা দেখিয়াছেন, তাঁহাদেরই আজ এই আসন গ্রহণ করিলে মানাইত বেশী। আপনাদের শুভেচ্ছা আমার সহায় হউক।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুর-রাজ্যের পরিচয় বহু দিনের। সেই পরিচয়ের ফলস্বরূপ আমার মত অকৃতীও যে তাঁহার স্নেহ-কোমল প্রাণের পরশ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে---আজ তাহাই আমার মনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আসিতেছে। কবিবর সম্বন্ধে আপনাদের কাছে আমার কিছু বলা, নেহাৎ অন্ধের পথ-দেখানোর মত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে--আমাদের যে সম্পর্কটি এতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহারই একটু আপনাদের কাছে বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

ভোগ বিলাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ হইবার পক্ষে অন্তরায় আসিয়া জোটে অনেক। এই অন্তরায়-গুলিকে ঠেলিয়া ফেলা সাংসারিক জীবের পক্ষে আয়াস-সাধ্য। কিন্তু ভাগ্যবান যাহারা, তাহারা সময়মত এমন এক একজনার স্নেহাশিস লাভ করিয়া ফেলেন--যাঁহার প্রেরণা--সকল প্রকার আবরণগুলিকে দূর করিয়া দিয়া, নির্মল করিয়া দিয়া, প্রাণে ফাল্গুনের পাগ্‌লা-হাওয়ার আলোড়ন দিয়া, নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার পথ দেখাইয়া দিয়া যায়। মানুষ তখন ধন্য হয়, কৃতার্থ হয় ঠিক যেমন শীতের জড়তার মধ্যে প্রথম ফাগুন-পরশে মঞ্জুরিত গাছগুলি নীল আকাশের পানে চেয়ে হাস্‌তে চায়।

আমার জীবনে এমন অনেক দিন গিয়াছে, যে সময়ে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র বাণীই আমাকে সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ দেখাইয়া জীবন দিয়াছে। তাঁহার উপদেশপূর্ণ পত্রগুলি আমার অমূল্য সম্পদ। আমার মনে যখন কোনওপ্রকার দুঃখ অথবা নৈরাশ্য আসিয়া দেখা দেয়, আমি সেই পুরাতন পত্রগুলি বাহির করিয়া একটির পর একটি পাঠ করিয়া যাই, আমার মনের কালিমা দূর হইয়া যায়।

আজ আপনারা সেই রবীন্দ্রনাথকেই সম্বর্দ্ধনা করিতে সমবেত; আর সেই সভার নেতৃত্ব করিবার ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। আমি এ বিষয়ে মূক ; কারণ আমি এমন কোনও ভাষা পাই না, যে আপনাদিগের নিকট আমার অন্তরের আনন্দকে প্রকাশ করিতে পারি।

কবিবরের আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। তিনি আমাদের এই 'কিশোর' সাহিত্য-সমাজকে আশীর্ব্বাদ করুন--এই কামনা।

অভিনন্দন পত্র

কবি সম্রাট

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের

শ্রীশ্রীকরকমলে

দেব,

তুমি বাংলার কবি--ভারতের কবি--বিশ্ব কবি। তোমায় নমস্কার! অতীত-গৌরবের যে রেশটুকু লইয়া এই সুপ্রাচীন ত্রিপুর-রাজ্য ও রাজপরিবার তোমার লেখনীসম্পাতে কাব্যে অমর হইয়াছে, তাহারই রাজধানীতে তোমাকে পাইয়া আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

এই সেই মাণিক্য-প্রসূ বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর ও বীরেন্দ্রকিশোরের লীলাভূমি যাহার প্রত্যেক অণু-পরমাণু তোমার প্রীতি-পরশে ধন্য হইয়াছে--যেখানে বাংলা ভাষা রাজভাষার সম্মানিত আসন লাভ করিয়াছে--যেখানে বঙ্গভাষা রাজ ইতিহাস 'রাজমালার' জীবন--যেখানে তুমিই সাহিত্য সভার উদ্বোধন করিয়াছিলে--আজ সেই স্থানে আমাদের নব- গঠিত কিশোর সাহিত্য-সমাজ মাতৃভাষার সেবাব্রত গ্রহণযোগ্য শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তোমার মত সিদ্ধ-সেবকের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার্থ নতমস্তকে দণ্ডায়মান। তোমার বাণী আমাদের প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ করুক।

আমরা জানি, দেশদেশান্তরে ভারতের বাণী প্রচারকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্প্রতি তোমার শরীর অসুস্থ। এই অবস্থায়ও ত্রিপুরার প্রতি অশেষ স্নেহবশতঃ তুমি আজ আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে---ধন্য করিতে আগমন করিয়াছ। এই অপার করুণার নিমিত্ত আজ আমরা জনসাধারণের পক্ষ হইতেও তোমাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা সর্ব্বান্তকরণে তোমার নিরাময় ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। তুমি মানবকুলের বহু বহু আনন্দের ও কল্যাণের কারণ হইয়া দেশ-মাতৃকার মুখ উজ্জ্বল কর।

তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাধনা বিশ্বভারতী সমগ্র মানব সমাজের শাশ্বত সম্পত্তি; এই অতুল কীর্ত্তি তোমাকে জগতে অবিনশ্বর করুক। হে কবি, তোমার অমর লেখনী অমৃত বর্ষণ করিয়া তোমার দেশবাসীকে চৈতন্য দান করুক---আমরা ধন্য হই।

একান্ত অনুরক্ত
'কিশোর' সাহিত্য সমাজের
সভ্যবৃন্দ

আগরতলা---ত্রিপুরা রাজ্য,
তারিখ---১২ই ফাল্গুন, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ।

রবীন্দ্র- প্রশস্তি*

বিশ্বব্যাপি যশঃ কিরণ কিরীটিন্।

প্রভাতে ভানু পক্ষিগণের কল-কাকলিতে বিশ্বকে মুখরিত করিয়া তোলেন, দিবসে জীবকুলের সংরাবে ধরাকে শব্দায়মান করিয়া রাখেন; এবং সায়াহ্নে বিশ্রামের কলরবের মধ্যে সকলের জন্য শান্তির ছায়া পাতিয়া দেন। এইরূপে বিবিধ রব উত্থিত করেন বলিয়াই তিনি 'রবি' হইয়াছেন। তাঁহার আলোকে বিশ্বের অশেষ বৈচিত্র্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাই তিনি "ভাস্কর" অর্থাৎ বিশ্ব-শিল্পী।

তিনি জীবজগতের চৈতন্যের সঞ্চারকারী; তাঁহা হইতে জীবলোক নূতন জীবন প্রাপ্ত হয়; তাই তিনি 'সবিতা'। চৈতন্যের পরম পরিণতি জ্ঞান; জ্ঞানেরও প্রবর্ত্তক তিনিই। তাহাতেই সাবিত্রী মন্ত্রে তাঁহার নিকট জ্ঞানের প্রেরণার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

তুমি রবির এই সমস্ত নামেরই নূতন সার্থকতা সম্পাদিত করিয়াছ। তুমি জীবন প্রভাতে 'ভানুসিংহের পদাবলীতে", বৈষ্ণব সঙ্গীত---

"গহন কানন কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসঁরি সব লোক লাজে;
সজনি আও আওলো।"

আগমনী গাইয়া, অপূর্ব্ব আনন্দ কাকলিতে সকলকে জাগাইয়াছ; জীবন মধ্যাহ্নে কত সুধাবর্ষী সঙ্গীত আলাপে কত অনুপম কাব্য-নাট্য-চিত্রের অঙ্কনে লোকের মন প্রাণ হরণ করিয়াছ। জীবনের সায়াহ্নে তোমার বীণার সুর উচ্চগ্রামে চড়াইয়া "গীতাঞ্জলি"র মোহন তানে গভীর পরমার্থ সঙ্গীত শুনাইয়া, "শান্তিনিকেতনে"র "বিশ্ব-ভারতী"তে বিশ্বের মহা সম্মিলনের মহা আয়োজন করিয়াছ। ইহাতে বিশ্বের জ্ঞানের সঙ্গে শিল্পকলাও নূতনরূপে স্ফূর্ত্তি ধারণ করিবে।

তোমার সায়াহ্ন প্রতিভার সুদূরগামী কিরণচ্ছটায় পাশ্চাত্য জগৎকে এক নব জাগরণে জাগাইয়া তুলিয়াছ। আজ প্রতীচীর চক্ষু প্রাচীরই দিকে ফিরিয়াছে।

তুমি প্রতীচীতে প্রাচীর যে অমৃতময়ী বাণী শুনাইয়াছ, তাহাতে প্রতীচী জড় বিজ্ঞানের মোহ ত্যাগ করিয়া অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের দীক্ষা লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া প্রাচীর দ্বারস্থ হইয়াছে। প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিনিময়ের দ্বারা সভ্যতার যে অভিনব যুগের সূচনা হইতেছে, তোমাকেই তাহার বরেণ্য ঋত্বিক্ জানিয়া, চতুর্দ্দিক হইতেই তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য অর্পিত হইতেছে। অকৃতী, অক্ষম আমিও নীরস নীরূপ, নির্গন্ধ পত্রপুষ্পের এই সামান্য অর্ঘ্য তোমাকে প্রদান করিতে সাহসী হইয়াছি। তোমার দেবোচিত মহত্ত্বগুণে, ইহা গৃহীত হইলে, পরম কৃতার্থম্মন্য হইব।

আগরতলা।
১২ই ফাল্গুন, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ,
(১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

একান্ত শ্রদ্ধাবিনত
শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

---

*'রবি' ত্রৈমাসিক পত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ (১৩৩২ বাং)

ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের প্রতি

শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীদের অভিনন্দন

আ প্র দ্রব পরমস্যাঃ পরাবতঃ
শিরে তে দ্যাবাপৃথিবী উতে স্তাম্।

বহুদূর হইতে সমাগত তুমি অতিথি, আমাদের মধ্যে সত্বর বিরাজিত হও; দ্যুলোক ও ভূলোক সবাই তোমাকে কল্যাণযুক্ত করুন।

আ ত্বা গন্ রাষ্ট্রং সহ বর্চসোদিহি
প্রাঙ্ বিশাং পতিরেকরাট্ ত্বং বি রাজ।
সর্বাস্ত্বা রাজন্ প্রদিশো হবয়ন্ত
উপসদ্যো নমস্যো ভবেহ।।

হে রাজা, তোমাতে রাজ্য আশ্রয় করিয়াছে, বীরত্বের ও শক্তির সহিত তুমি উদিত হও; পূর্ব হইতেই সকল মানবের পতি হওয়ায় তুমি একচ্ছত্র রাজারূপে বিরাজিত হও। সকল দিগ্‌বিদিক্ তোমাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করুক; এইখানেও সকল জনের সেবার যোগ্য হইয়া তুমি নমস্য হও।

সীদতা বর্হিরুরু বঃ সদস্কৃতম্।

তোমার জন্য রচিত হইয়াছে যে উদার আসন, তাহাতে তুমি উপবেশন কর।

পথ্যা রেবতীর্বহুধা বিরূপাঃ
সর্বাঃ সংগত্য বরীয়স্তে অক্রন্।
তাস্ত্বা সর্বাঃ সংবিদানা হবয়ন্ত
দশমীমুগ্রঃ সুমনা বশেহ।।

জলস্থলের অধিদেবতা তোমার ক্লান্তি দূর করুন, নানাভাবে প্রভূত কল্যাণবিধান করুন; এইস্থানে সেই অধিদেবতার আশীর্বাদেই কল্যাণমনে শতায়ু লাভ কর।

ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায় ত্বামিমাঃ প্রদিশঃ পঞ্চ দেবীঃ।
বর্ষ্মন্ রাষ্ট্রস্য ককুদি শ্রয়স্ব।।

হে রাজা, জনগণ তোমাকে অন্তরের সহিত বরণ করুক; সকল দিক্ তোমার কীর্তিতে উজ্জ্বল হউক; মানবরাজ্যের উচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হও।

শতং তে রাজন্ ভিষজঃ
সহস্রমূর্বী গভীরা সুমতিস্তেহস্ত।

হে রাজন্, তোমার শতবৎসরের আয়ু-লাভ কল্যাণপ্রদ হউক এবং সকল বিঘ্ন হইতে মুক্ত হউক; তোমার সুমতি উদার ও গভীর হউক।

অয়মস্ত ধনপতির্ধনানাময়ং বিশাং বিশ্‌পতিরস্ত রাজা।
এই রাজা সকল ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান্ হউন; ইনি নিখিল জন-গণের অধিনায়ক হউন।
অস্মৈ দ্যাবাপৃথিবী ভূরি বামং দুহ'থাং ঘর্মদুঘে ইব ধেনূ।

ধেনু যেমন দুগ্ধদানে দোহনকারীকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি, হে দ্যৌ, হে পৃথিবী, তোমরা এই রাজাকে সর্ববিধ ঐশ্বর্য-দানে সমৃদ্ধ কর।

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্বরিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম।।

ওষধিসকল মধুময় হউক, দ্যুলোক মধুময় হউক, জল মধুময় হউক, অন্তরিক্ষ মধুময় হউক, ক্ষেত্রপতিও মধুময় হউক--আমরা সকলে যেন মিত্রভাবেই ইহাকে অনুসরণ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিঠিপত্র

মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথের পত্র*

২৩ বৈশাখ, ১২৯৩ সন,
বুধবার

ওঁ

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন----

আপনাদের রাজপরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় আছে এইরূপ শুনিতে পাই---সেইজন্য সাহসী হইয়া মহারাজকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের পূর্ব্বকার সম্বন্ধ মহারাজের স্মরণে আসে এই আমার অভিপ্রায়।

মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা-রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া "রাজর্ষি" নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। তাহার কারণ, ইতিহাস পাই নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জ্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেব বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দ মাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমতি করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিব। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য তাঁহার নির্ব্বাসিন দশায় চট্টগ্রামের কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন যদি জানিতে পাই, তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের এবং ঐতিহাসিক ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের ফটোগ্রাফ যদি পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপকার হয়।

এই পত্রের উত্তর পাইলে এবং মহারাজের সহিত আলাপ হইলে আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করিব।

প্রণত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।
যোড়াসাঁকো।
কলিকাতা।

*প্রকাশিত ঃ--'রবি' ত্রৈমাসিক পত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ (১৩৩২ বাং)

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সদনে লিখিত

মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরের পত্র (১)

শ্রীহরি

সদ্‌গুণান্বিতেষু--

আপনার পত্র পাইয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। লিখিয়াছেন, আমাদের পরিবারের সহিত আপনাদের পরিবারের যে সম্বন্ধ ছিল তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য। সে সুখের সম্বন্ধ আমি ভুলি নাই, আপনি পুনরায় তাহার গৌরব করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ আপ্যায়িত ও বাধিত হইলাম। ভরসা করি, মধ্যে মধ্যে আপনার অবসর মতে এইরূপ অমায়িক ভাবপূর্ণ পত্র পাইব।

"মুকুট" ও "রাজর্ষি" নামক দুইটী প্রবন্ধই আমি পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধে যে যে স্খলন হইয়াছে, তাহা সংশোধন করা আপনার বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।

"রাজরত্নাকর" নামে ত্রিপুর রাজবংশের একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই গ্রন্থ ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্ব সময়ে সঙ্কলিত হইতে আরম্ভ হয়। ধর্ম্মমাণিক্য * * * * ত্রিপুরা ৮৬৮ সনে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এখন ত্রৈপুর ১২৯৬ সন। উক্ত 'রাজরত্নাকরে আর একখানা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "রাজমালার" উল্লেখ আছে; সেই প্রাচীন রাজমালা এখন কোথাও অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। "রাজমালা" বলিয়া যাহা প্রচলিত তাহা রাজরত্নাকর হইতে সংক্ষিপ্ত ও সংগৃহীত এবং বাংলা পদ্যে লিখিত। সাধারণে পাঠ করিয়া যেন অনায়াসে বুঝিতে পারে এই অভিপ্রায়েই দ্বিতীয় "রাজমালা" রচিত হইয়াছে। ইহাতে মহারাজ দৈত্যের জীবনবৃত্ত হইতে বর্ণিত আছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেক রাজার ইতিহাস নাই। দ্বিতীয় বাংলা রাজমালার লেখককে আমি বালক বয়সে দেখিয়াছি। এতদ্ভিন্ন ঐরূপ বাংলা কবিতায় কেবল ৺কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজার চরিত্র অবলম্বন করিয়া একখানা ইতিহাস আছে, উহার নাম "কৃষ্ণমালা"। পার্ব্বতীয় প্রজাগণের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে, তাহারা নিজ নিজ ভাষায় রচনা করিয়া মহারাজগণের জীবন চরিতের কোন বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে গান করিয়া থাকে। সেই গানগুলি হইতে অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। মন্দিরের ফলক ও সনদপত্রাদি হইতেও যে ইতিহাসের অনেক ঘটনা সংগৃহীত হইবার সুবিধা আছে, তাহা বলা বাহুল্য।

আপনি যে ত্রিপুর ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নবন্যাস লিখিতে যত্ন করিতেছেন, ইহাতে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যে যে স্থলে ইতিহাসের সহায়তা প্রয়োজন হয়---আমি আদরের সহিত পূর্ব্বোক্ত নানা মূল হইতে তাহা সঙ্কলন করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। আপনার অপরাপর বিষয়ে প্রশংসিত প্রবন্ধগুলিতে ইতিহাসের যথাযথ ব্যাখ্যা থাকে, ইহা আমারও একান্ত বাসনা। ঐতিহাসিক কোন বিশেষ ভাগের সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ সময় মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে কেবল রাজরত্নাকর হইতে যে সহায়তা পাওয়া যায় তাহাই দিতে পারিব। একটুকু সময় থাকিতে জিজ্ঞাসা হইলে স্থানীয় অবস্থা সংগ্রহ করিয়াও জানাইতে চেষ্টা করিব। বোধ হয় শেষোক্ত প্রণালী আপনার সন্তোষজনক হইবে।

আমার পুর্ব্বপুরুষগণের উদয়পুর ব্যতীত ধর্ম্মনগর, কল্যাণপুর, অমরপুর প্রভৃতি স্থানেও রাজধানী ছিল। সেই সেই স্থলেও অনেক কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন পাওয়া যায়। আপনার প্রয়োজন হইলে সে সকল স্থানের ইতিহাস জানাইতে পারিব।

(১) প্রকাশিত---'রবি' ত্রৈমাসিক পত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দ (১৩৩২ বাং)

উদয়পুরের যে কয়েকখানা ফটো গ্রাফ আছে তাহার বিবরণ লিখিয়া ইহার পর তাহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

রাজরত্নাকরে গোবিন্দ মাণিক্যের ও তাঁহার ভ্রাতা ছত্র মাণিক্যের চরিত যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নকল করান হইয়াছে সত্বর ছাপান যাইতে পারে কি না উদ্যোগ করিতেছি; মুদ্রাঙ্কন শেষ হইলে আপনার নিকট পাঠান যাইবে। (১) "রাজর্ষি"র কোন্ কোন্ স্থলে ইতিহাস রক্ষিত হয় নাই, তহা রাজরত্নাকরে উক্ত উদ্ধৃত ভাগ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

"রাজরত্নাকর" ছাপাইবার উদ্যোগে আছি, সমুদয় আয়োজন হইয়া উঠে নাই। যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় ছাপা হইতে পারে তবে আপনাকে একখন্ড পাঠাইয়া দিব।

"রাজরত্নাকরে" পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক দুইটি ভাগ আছে। পৌরাণিক ভাগে মহারাজা দৈত্য প্রভৃতির জীবনচরিত এবং ঐতিহাসিক ভাগে যখন বাঙ্গালা যবনাধিকারে ছিল--সেই সময়ের অনেকানেক ভাগ নিতান্ত সুন্দর। সেই অংশ অবলম্বন করিয়া আপনি নবন্যাস লিখিলে অপেক্ষাকৃত অনেক প্রশংসনীয় হইবে এরূপ আমার বিশ্বাস।

এথাকার কুশল, আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন নিরাময় সংবাদদানে সুখী করিবেন। ইতি--
১২৯৬ ত্রিপুরা,--তাং ১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রণত
শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা

(১) মহারাজ বীরচন্দ্র প্রেরিত মুদ্রিত বিবরণ ৩০০-৩০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

[শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত 'রাজর্ষি' ১ম সংস্করণ-পরিশিষ্ট হইতে গৃহীত প্রতিলিপি]

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যস্য চরিতম্

কল্যাণমাণিক্যস্য মরণাৎ ষোড়শদিনে বুধবাসরে শুভতিথ্যাদিষুতে যুবরাজো গোবিন্দনারায়ণো নানাবিধমহোৎসবৈঃ স্বকুলাচারবিধিনা সিংহাসনমারুহ্য পূর্ব্বরীত্যৈকপৃষ্ঠে শিবলিঙ্গাকৃতিখচিতামপরপৃষ্ঠে স্বমহিষীগুণবতীনামাঙ্কিতাং সুবর্ণময়ীং রজতময়ীঞ্চ মুদ্রাং প্রথমমেব প্রচারয়ামাস। ততোহমাত্যাদয়ঃ সর্ব্বে যথাবিধি রাজোপহারং প্রদদুঃ। ভূপালোহপি সমাগতান্ ব্রাহ্মণান্ ভিক্ষুকাদিংশ্চ ভোজ্যদানাদিভিঃ পরিতুতোষ। অথ তস্য রাজ্যাভিষেকাদীর্ষাপরতন্ত্রস্তৎবৈমাত্রেয়ো নক্ষত্রঠাকুরো মুর্শিদাবাদাবস্থিতনবাবান্তিকং গত্বা স্বপরিচয়ং বিজ্ঞাপয়ামাস। সোহপি ত্রিপুররাজপুত্রোহয়মিতি সমাদৃত্য তং যথোপচারং স্বনগর্য্যাং স্থাপয়ামাস। নক্ষত্রঠাকুরস্তু প্রত্যহং নানাবিধকৌতুকবাক্যেন নবাবং পরিতোষিতবান্। ততঃ ক্রমেণোভয়োঃ সৌহৃদ্যে সঞ্জাতে কদাচিৎ নক্ষত্রঠাকুরো নবাবং স্বাভিলষিতং বিজ্ঞাপ্য "যদ্যহং ত্বৎসাহায্যতঃ স্বপিতৃরাজ্যং লপ্স্যে তদা প্রচুরং হস্ত্যাদ্যুপহারং তে দাস্যামী"তি প্রোবাচ। তদাকর্ণ্য নবাবঃ "বহুশোহি ত্রিপুররাজ্যমধিকর্ত্তুং কৃতযত্নোহপি পূর্ণমনোরথো নোহভবম্। পুনরিদানীং যদ্যেষামাত্মবিরোধঃ সঞ্জায়তে, তদানায়াসেনৈব তদ্রাজ্যং লপ্স্য" ইতি স্বাত্মনি বিচিন্ত্য তস্মৈ মহাবলপরাকান্তান্ সৈনিকান্ দত্ত্বা বিগ্রহৈঃ স্বরাজ্যলাভায় স্বদেশং গন্তুমাজ্ঞাপয়ৎ। সোহপি তদাজ্ঞপ্তঃ সসৈন্যস্তস্মাৎ প্রস্থায় উদয়পুর-রাজধানীসমীপমাগতঃ। তদাকর্ণ্য ত্রৈপুরাঃ সর্ব্বএব যুদ্ধোদ্যোগায় ভূপতিং পুনঃপুনর্নিবেদিতবন্তঃ। সুধীরো ভূপালস্তদাকর্ণ্য "ক্ষণভঙ্গুররাজ্যসুখভোগায় ভ্রাত্রা চিরমকীর্ত্তিকরং যুদ্ধং কদাপ্যহং ন করিষ্যামি, ঈদৃশং রাজভোগমপেক্ষ্য বনগমনমেব শ্রেয়ঃ" ইত্যাদি নীতিবচনৈস্তান্ প্রবোধ্য সত্বরং স্বমহিষ্যা গুণবত্যা ভ্রাত্রাদিভিশ্চ সহ রিয়াং দেশং গত্বা তত্রৈকাং পুরীং নির্ম্মায়োবাস। তত্রত্যা রিয়াং গণাস্তং ত্রিপুরেশং স্বজনমিব সংমেনিরে।

অত্রান্তরে কতিদিনং ছত্রমাণিক্যস্য রাজ্যাধিকারঃ, তস্মিন্ মৃতে পুনর্গোবিন্দমাণিক্যএব রাজা বভূব।

অথ রিয়াংরাজ্যাবস্থিতং গোবিন্দমাণিক্যং প্রতি তে রিয়াংগণাঃ ক্রমশো বৈরক্তিং প্রকাশয়ামাসুঃ। স চ তেষামীদৃশাচরণং দৃষ্টা স্বরাজ্ঞীং সোদরং জগদ্বন্ধুঠাকুরং সূর্য্যপ্রতাপনারায়ণ চম্পকনারায়ণরাজকুমারাভিধানান্ ভ্রাতৃপুত্রাংশ্চ গৃহীত্বা তস্মাৎ চট্টলদেশাভিমুখং জগাম। পথি জগদ্বন্ধুঠাকুরাত্মজো রাজকুমারঃ পিত্রা পুনঃপুনর্নিষিদ্ধোহপি স্বদেশং গন্তুমুপচক্রমে। তেন ধৃষ্টাচরণেনাতিক্রুদ্ধো জগদ্বন্ধুঠাকুরশ্চ তস্য শিরশ্ছিত্ত্বানয়নায় জামাতরমাজ্ঞাপয়ৎ। স কিয়দ্দূরে রাজকুমারমুপগম্য তং প্রতিনিবর্ত্তয়িতুং বহুশোহচেষ্টত। তত্র বাক্‌পারুষ্যেণ বিবদমানয়োস্তয়োর্যুদ্ধে সঞ্জাতে জগন্নাথো রাজকুমারস্য শিরশ্ছিত্বা শ্বশুরান্তিকমনয়ৎ। তচ্ছিন্নমুণ্ডমবলোক্য গোবিন্দমাণিক্যস্তং তীব্রং র্ভৎসয়ামাস। ততো মহারাজশ্চট্টলে কতি দিনমবস্থায় রসাংপ্রদেশং যযৌ। আরাকানাধিপতিস্তু স্বদেশে বন্ধোর্গোবিন্দমাণিক্যস্যাগমনং

শ্রুত্বা সত্বরং তমুপস্থায় বন্ধুজনোচিতং সৌজন্যং প্রদর্শ্য রাজধানীমুপনীয় সুখং বাসয়ামাস। অথৈকসপ্তত্যধিকদশশতত্রৈপুরবৎসরে দিল্লীশ্বরস্য দ্বিতীয়ঃ পুত্রঃ সুলতান্সুজাভিধেয়ঃ স্বভ্রাতা আওরংজেবেন পরাজিতঃ পলায়মানঃ রসাংপ্রদেশমুপাযযৌ। কদাচিৎ গোবিন্দমাণিক্যেন সহ সভায়ামুপবিষ্টে তস্মিন্নারাকানাধিপতৌ স দিল্লীশ্বরনন্দনস্তত্রৈপগম্য দণ্ডায়মান এব স্বপরিচয়ং বিজ্ঞাপিতবান্। রসাংরাজস্তু যবন ইতি তাচ্ছিল্যেন কিমপি নাচরন্ তূষ্ণীমেব স্থিতঃ। ততো গোবিন্দমাণিক্যঃ সসম্ভ্রমমুত্থায় তমভ্যর্থয়মানঃ রসাংরাজমনিচ্ছন্তমপ্যনুরুধ্য তস্মৈ মহার্হমাসনমপরং প্রদীদপৎ। ততো যথাসময়মুত্থায় সর্ব্বে যথাস্থানং গন্তুমুদ্যতাঃ। তদা সুলতান্সুজা গোবিন্দমাণিক্যস্য করং ধৃত্বা প্রোবাচ ভো ভূপতে! ভবতাহমদ্য যদ্বহুমন্যতে তন্নামরণম্ বিস্মরিষ্যামি। সম্প্রতি হ্যয়মের প্রিয়জনোপচারঃ, তদ্গৃহীত্বানুগৃহ্ণাতুমামিত্যুক্ত্বা তস্মৈ মহার্হং হীরকাঙ্গুরীয়কং প্রদদৌ। ত্রিপুরেশস্তু বারম্বারমনুরুধ্যমানএব তজ্জগ্রাহ। অথ কিয়তাকালেন স সুলতান্সুজা আরাকানাধিপস্য দুহিতরমুদ্বাহ্য পরমসুখেন তদ্রাজধান্যামুবাস। পুনঃ স দুষ্টমতির্য্যদ্যহং কেনাপ্যুপায়েন শ্বশুরং হন্তুং শক্লোমি তদেতদ্রাজ্যং সকলমেবাধিকরিষ্যামীতি নিশ্চিত্য তং হন্তুং চত্বারিংশৎ যোদ্ধৃপুরুষান্ সংজগ্রাহ। অথৈকদা স রাজকুমার্য্যাঃ পিত্রালয়গমনচ্ছলেন বহুদোলাঃ সংগৃহ্য প্রত্যেকং দোলাসু সশস্ত্রং মল্লদ্বয়ং প্রবেশ্য রাজবাট্যাং প্রস্থাপিতবান্। অথ তাসু ক্রমেণ ষষ্ঠদ্বারমতিক্রম্য সপ্তমদ্বারং প্রবেষ্টুমুদ্যতেষু দোলাসু কশ্চিদ্বৃদ্ধো দৌবারিকো বহুদোলাঃ সমীক্ষ্য সন্দিগ্ধমনা দোলাবাহকান্ তদ্দ্বার্য্যবরুধ্য একস্যা দোলায়া দ্বরমুদ্ঘাট্য মল্লদ্বয়ং দদর্শ। ততঃ ক্রমেণ সর্ব্বাভ্যো দোলাভ্যো সশস্ত্রা মল্লগণাঃ নিষ্ক্রম্য দৌবারিকগণৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধমারেভিরে। অথ কোলাহলং শ্রুত্বা চতুর্দ্দিগ্ভ্যো রাজসৈনিকাঃ সমাগত্য তান্ মল্লগণান্নিহন্যুঃ। এতদাকর্ণ্য সুলতান্সুজা ভয়েন পলায়মানঃ স্থানান্তরং যযৌ। আরাকানাধিপতিঃ কপটাচারিণস্তস্যেদৃগসদাচরণেন জাতবৈরস্তদ্বধে কৃতসঙ্কল্পোহপি ইতস্ততোহন্বিষ্য তং নাপ্তবান্।

ততশ্চতুঃসপ্তত্যধিকদশশতত্রৈ পুরাব্দে আরাকানরাজঃ ধাতুময়দেবসিংহাসনাদিকং মহার্হং বহুবিধং দ্রব্যজাতং সম্প্রদায় স্ববন্ধুং গোবিন্দমাণিক্যং স্বদেশং প্রেষয়ামাস। অথ মহারাজে ছত্রমাণিক্যে মৃতে রাজ্যমরাজকমবলোক্য রিপূপদ্রবভয়েনোদ্বিগ্নমনসস্ত্রৈপুরপাত্রমিত্রাদয়ো গোবিন্দমাণিক্যস্য চট্টলাগতিং শ্রুত্বা হর্ষব্যাকুলমনসো বিশেষজ্ঞেন দূতেন সর্ব্বমেব তস্মৈ নিবেদয়ন্ত পুনারাজ্যভারমঙ্গীকর্ত্তুং যযাচিরে। ভূপতিরপিতেষাং প্রার্থনয়া স্বরাজধানীমাগত্য তদ্বৎসরীয় আশ্বিনে মাসি শুভক্ষণে পুনর্নৃপাসনমারুরোহ। অথ দিল্লীশ্বর আওরংজেবঃ স্বভ্রাতুঃ সুলতান্সুজা-নামকস্য গুপ্তরূপেন ত্রিপুরদেশাবস্থিতিমাকর্ণ্য তং বধ্বা স্বান্তিকে প্রেরণায় ত্রিপুরেশসন্নিধিং দূতং প্রেষিতবান্। ততঃ স ভীরুস্ত্রিপুরেশো মোগলোপদ্রবভয়েন হস্তিনঃ পঞ্চ মোগলাধিপায় উপায়নং প্রদদৌ। ইতঃপূর্ব্বং কেনাপি ত্রৈপুরভূপালেনানুসৃতো নৈষ মার্গঃ। গোবিন্দমাণিক্যএব প্রথমং তদাচরৎ। ততস্তেন শ্রীমচ্চন্দ্রশেখরে মন্দিরমেকং নির্ম্মায় তৎপ্রীত্যায়োৎসসৃজে। অয়মত্র গোবিন্দসাগরোহন্যত্রাপি বহব্যঃ পুষ্করিণ্যস্তেনৈবোৎসর্গীকৃতাঃ। ততঃ স গঙ্গায়াং গত্বা কাঞ্চনতুলাপুরুষদানমনুষ্ঠায় তাম্রফলকলিখিতেন সনন্দেন ব্রাহ্মণেভ্যো বহ্বীঃ ভূমিমদাৎ। রাজ্ঞ্যা গুণবত্যা তু নুরনগরপ্রদেশে নাম্না গুণসাগরং সরঃ প্রতিষ্ঠিতম্। প্রাবৃষি গোমতীজলপ্লাবনেন মেহেরকুলপ্রদেশঃ প্রজাবাসাযোগ্য আসীৎ। গোবিন্দমাণিক্যএব তস্যাস্তীরয়োঃ সেতুং বধ্বা জলবেগং রুরোধ। তদ্যাবৎ ক্রমেণ তত্র জনাঃ বহুলং বাস-

স্থানং চক্রিরে। পুরা সুলতান্‌সুজা যদ্ধীরকাঙ্গুরীয়কং তস্মৈ প্রদদৌ স তম্মূল্যব্যয়েন "সুজামসজিদ্‌" ইত্যাখ্যমিষ্টকগৃহং সুজাগঞ্জং নাম হট্টঞ্চ স্থাপিতবান্‌। পুরারাকানাধিপতিনা চন্দ্রশেখরে যৎ পূজনাদিকার্য্যজাতং বিলুপ্তিকৃতং গোবিন্দমাণিক্যেনৈব নিজব্যয়েন তৎসর্ব্বং পুনঃ প্রতিষ্ঠিতম্‌। ইতি।

মহারাজ বীরচন্দ্র উপরোক্ত চরিত-কথা রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করেন এবং 'রাজর্ষি'র প্রথম সংস্করণে পরিশিষ্টে ইহা প্রকাশিত হয়।

নিম্নে ইহার বঙ্গানুবাদ করা হইল।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য চরিত

কল্যাণমাণিক্যের মৃত্যুর পর ষোড়শ দিবসে শুভতিথিযুক্ত বুধবারে যুবরাজ গোবিন্দনারায়ণ নানাবিধ মহোৎসবসহ স্বকুলাচার অনুসারে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বরীতিমত একপিঠে শিবলিঙ্গ এবং অন্য-পিঠে নিজমহিষী গুণবতী নামাংকিত সুবর্ণ এবং রজতময় মুদ্রা প্রথম প্রচার করিলেন। তাহার পর অমাত্য-বৃন্দ যথাবিধি রাজাকে উপহার দান করিলেন। রাজাও সমাগত ব্রাহ্মণ এবং ভিক্ষুকদিগকে ভোজ্য এবং দানের দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। ইহার পর তাঁহার রাজ্যাভিষেকে ঈর্ষাপর হইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্রঠাকুর মুর্শিদাবাদস্থিত নবাবের কাছে গিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজপুত্র জানিয়া সমাদর ও সসম্মানে নিজের নগরে স্থান দিলেন। নক্ষত্রঠাকুর প্রত্যহ নানাবিধ কৌতুক-বাক্যের দ্বারা নবাবকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাহার পর ক্রমে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হইলে একদিন নক্ষত্রঠাকুর নবাবকে নিজের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন--যদি আপনার সাহায্যে আমি পিতৃরাজ্য লাভ করি, তাহা হইলে আপনাকে হস্তী প্রভৃতি বহু উপহার দান করিব। তাহা শুনিয়া নবাব ভাবিলেন--আমি বহুবার ত্রিপুরারাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াও সফলমনোরথ হই নাই। এখন ইহাদের মধ্যে আত্মবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং অনায়াসেই সেই রাজ্য লাভ করিব। এই ভাবিয়া তিনি মহাপরাক্রান্ত সৈনিকগণকে তাঁহার সঙ্গে দিলেন এবং নিজ রাজ্য লাভের জন্য তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। নক্ষত্রঠাকুর সেই সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রস্থান করিয়া উদয়পুর রাজধানীর নিকটে আসিলেন। তাহা শুনিয়া সকল ত্রিপুরাবাসী রাজাকে যুদ্ধোদ্যোগ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। সুধীর রাজা তাহা শুনিয়া ত্রিপুরাবাসীকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন--ক্ষণভঙ্গুর এই রাজ্যসুখ ভোগ করিবার জন্য আমি কখনও ভ্রাতার সঙ্গে চিরকালব্যাপী অকীর্তিকর যুদ্ধ করিব না; এরূপ রাজ্যভোগ অপেক্ষা বন-গমন অনেক বেশী শ্রেয়ঃ। তিনি মহিষী গুণবতী এবং অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে রিয়াং দেশে গেলেন এবং সেখানে একটি নগর নির্মাণ করিলেন। সেখানকার রিয়াংগণ ত্রিপুরেশকে স্বজনের মত সম্মান করিলেন।

ইহার পর কিছুদিন ছত্রমাণিক্যের (নক্ষত্ররায়ের) রাজ্যাধিকার ছিল--তাঁহার মৃত্যুতে গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজা হইলেন।

এদিকে রিযাং রাজ্যস্থিত গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি রিয়াংগণ ক্রমে ক্রমে বিরক্ত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদের এই আচরণ দেখিয়া নিজের মহিষী এবং সহোদর জগদ্বন্ধুঠাকুর এবং সূর্যনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণ ও চম্পকনারায়ণ নামক ভ্রাতুষ্পুত্রগণসহ চট্টল দেশের দিকে রওনা হইলেন। পথে জগদ্বন্ধুঠাকুরের পুত্র রাজকুমার পিতা দ্বারা বার বার নিষিদ্ধ হইয়াও স্বদেশে যাইতে উপক্রম করিল। তাহার ধৃষ্ট আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জগদ্বন্ধুঠাকুর তাঁহার জামাতাকে উহার শিরশ্ছেদন করিয়া আনিতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি কিছুদূরে রাজকুমারের নিকট পৌঁছাইয়া তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বহু চেষ্টা করিলেন। তারপর কঠোর বাক্যসহযোগে বিবদমান এই দুইজনের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জগন্নাথ রাজকুমারের শির ছেদনপূর্ব্বক শ্বশুরের নিকট উহা আনিলেন। সেই ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া গোবিন্দমাণিক্য তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। তারপর মহারাজ চট্টলদেশে কিছুদিন থাকিয়া রসাংপ্রদেশে গেলেন। আরাকানাধিপতি নিজের দেশে বন্ধু গোবিন্দ-

মাণিক্যের আগমন সংবাদ শুনিয়া অতিশীঘ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বন্ধুজনোচিত সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে আনিয়া সুখে বসবাস করিতে স্থান দিলেন। তাহার পর ১০৭১ ত্রিপুরাব্দে দিল্লীশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা নিজের ভ্রাতা ঔরংজেবের দ্বারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং রসাং প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একদিন গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে আরাকানাধিপতি যখন সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, তখন দিল্লীশ্বর-পুত্র সুজা সেখানে উপস্থিত হইয়া নিজের পরিচয় দান করিলেন। রসাংরাজ এই লোকটি যবন এই ভাবিয়া তাচ্ছিল্যবশতঃ তাঁহার প্রতি কোনও সম্মান প্রদর্শন না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন গোবিন্দমাণিক্য সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং অনিচ্ছুক রসাংরাজকে অনুরোধ করিয়া সুজাকে মহার্ঘ আসন প্রদান করিলেন। তাহার পর যথাসময়ে সকলে উঠিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সুলতান সুজা গোবিন্দমাণিক্যের হাত ধরিয়া বলিলেন, হে রাজা, আপনি আমাকে আজ যে বহু সম্মান দান করিলেন তাহা আমি আমরণ বিস্মৃত হইব না; এখন প্রিয়জনের এই উপহার গ্রহণ করুন--এই বলিয়া তাঁহাকে মহার্ঘ হীরকাঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। ত্রিপুরেশ বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে সুলতান সুজা আরাকান অধিপতির কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার রাজধানীতে পরম সুখে বাস করিলেন কিন্তু দুষ্টমতি সুজা মনে মনে ভাবিলেন,--যদি আমি শ্বশুরকে হত্যা করিতে পারি, তাহা হইলে এই সকল রাজ্য আমার অধিকারে আসিবে। এই ভাবিয়া তিনি চল্লিশজন যোদ্ধাকে সংগ্রহ করিলেন। ইহার পর একদিন রাজকুমারী পিত্রালয়ে গমন করিবেন এই ছলনায় অনেক-গুলি পালকি সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রত্যেকটির মধ্যে দুইজন করিয়া যোদ্ধাকে স্থাপন করিলেন এবং রওনা হইলেন। তাহার পর যখন তাহারা ষষ্ঠদ্বার অতিক্রম করিয়া সপ্তমদ্বারে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল, তখন একটি বৃদ্ধ দৌবারিক অনেকগুলি পালকি দেখিয়া সন্দিগ্ধমনা হইল এবং পালকিবাহকগণকে নিবারণ করিয়া একটি পালকির দরজা খুলিয়া দুইজন যোদ্ধাকে দেখিল। তখন সমস্ত পালকি হইতে সশস্ত্র যোদ্ধাগণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া দৌবারিকগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কোলাহল শুনিয়া চারিদিক হইতে রাজসৈন্যরা আসিয়া সেই যোদ্ধাগণকে হত্যা করিল। ইহা শুনিয়া সুলতান সুজা ভয়ে পলায়ন করিয়া অন্য স্থানে গেলেন। আরাকানাধিপতি কপটাচারী সুজার ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য সংকল্প করিলেন কিন্তু তাহাকে পাওয়া গেল না। তাহার পর ১০৭৫ ত্রিঃ অব্দে আরাকানরাজ ধাতুময় এবং বহু মূল্যবান দৈবসিংহাসন এবং বহুবিধ দ্রব্য উপহার দিয়া গোবিন্দমাণিক্যকে স্বদেশে পাঠাইলেন। ছত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পর সমস্ত রাজ্য অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল এবং রিপুভয়ে উৎপীড়িত ত্রিপুরাবাসী পাত্রমিত্র প্রভৃতি চট্টগ্রাম হইতে গোবিন্দমাণিক্যের আগমনবার্তা শুনিয়া হর্ষব্যাকুল মনে বিশেষজ্ঞ দূত পাঠাইয়া গোবিন্দমাণিক্যকে সমস্ত নিবেদন করিলেন এবং পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিতে যাচ্ঞা করিলেন। রাজা তাঁহাদের প্রার্থনায় নিজ রাজধানীতে আগমন করিয়া সেই বৎসর আশ্বিন মাসে শুভক্ষণে পুনরায় রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহার পর দিল্লীশ্বর ঔরংজেব স্বভ্রাতা সুলতান সুজা গুপ্তভাবে ত্রিপুরদেশে অবস্থান করিতেছেন জানিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া নিজের কাছে পাঠাইবার জন্য ত্রিপুরেশের নিকট দূত পাঠাইলেন। তখন সেই ভীরু রাজা মুঘল উপদ্রব ভয়ে পাঁচটি হাতি উপঢৌকন স্বরূপ মুঘল অধিপতির নিকট পাঠাইলেন। ইহার পূর্বে কোনও ত্রিপুরা-রাজই এই পথ অনুসরণ করেন নাই। গোবিন্দমাণিক্যই সর্বপ্রথম এই আচরণ করিলেন। তাহার পর তিনি চন্দ্রশেখরে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া তদ্দেবতার প্রীতির জন্য উৎসর্গ করিলেন। সেখানে গোবিন্দ-সাগর এবং অন্যত্রও বহু পুষ্করিণী উৎসর্গীত হইয়াছিল। তাহার পর তিনি গদ্য তীরে গিয়া কাঞ্চনতুলাপুরুষদান অনুষ্ঠান করিলেন এবং তাম্রফলক লিখিত সনন্দের দ্বারা বহু ব্রাহ্মণকে বহু ভূমি-দান করিলেন। রাণী গুণবতী নুরনগর প্রদেশে গুণসাগর নামে সরোবর প্রতিষ্ঠা করিলেন। বর্ষা- কালে গোমতীর জলপ্লাবন নিরোধের জন্য সেতু নির্মাণ করিয়া জলবেগ রুদ্ধ করিলেন।

তখন হইতে গোমতীর তীরে বহুজন বহু বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছে। সুলতান সুজা গোবিন্দমাণিক্যকে যে হীরকাঙ্গুরীয় দান করিয়াছিলেন তাহার মূল্য দ্বারা তিনি পাকা সুজা-মসজিদ নির্মাণ করিলেন এবং সুজাগঞ্জ নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পূর্বে আরাকান-অধিপতি চন্দ্রশেখরের যে সমস্ত পূজা অর্চনাদি বিলুপ্ত করিয়া-ছিলেন, গোবিন্দমাণিক্য নিজ ব্যয়ে তাহা সমস্তই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখিত পত্রাবলী

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,

দীর্ঘকাল পরে অদ্য মহরাজের প্রীতিস্নিগ্ধ পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। গতকল্য মহারাজের ঠিকানায় একখানি কাহিনী পাঠাইয়াছি--আশা করিতেছি তাহা মহারাজের কথঞ্চিৎ প্রীতিকর হইতে পারে। কাব্যের গুণে যদি বা না হয়, ত, ঔদার্য্যগুণে।

সম্প্রতি এখানে ওলাউঠা, প্লেগ এমনকি, গ্রীষ্মেরও উপদ্রব না থাকাতে নিতান্ত চাঞ্চল্যবিহীন শান্তভাবে দিনপাত করিতেছি, এইজন্য মহারাজের নিকট প্রার্থনা মহিম ঠাকুরকে(১) একবার পাঠাইয়া দিয়া কিছু-কালের জন্য আমাদিগকে সজাগ সচঞ্চল করিয়া তুলিবেন। ত্রিপুরায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে উৎসব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি--গল্প আলোচনায় তাহার কথঞ্চিৎ রসাস্বাদনের চেষ্টা করিতে ইচ্ছা করি।

এবারে ত্রিপুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়(২) সর্ব্বদাই মহারাজের গুণগান করিতেছেন, এবং তিনি মহিম ঠাকুরেরও পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। ইতি--১৪ই চৈত্র, ১৩০৬

গুণানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,

অনেকদিনের প্রত্যাশিত পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। যুবরাজ(৩) ও যুবরাজ্ঞীর জন্য যে লোক(৪) নির্ব্বাচন করিয়াছি তাঁহারা ভদ্রবংশীয় এবং সচ্চরিত্র--একান্তমনে আশা করিতেছি তাঁহাদের জন্য কোন কারণে মহারাজের নিকট আমাকে অপরাধী ও লজ্জিত হইতে না হয়। তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকে বারম্বার উপদেশ দিয়াছি তথাপি যদি প্রকৃতিগত কোন ক্রটিবশতঃ তাঁহারা স্বপদের লেশমাত্র অযোগ্য হন তবে মহারাজ যেন তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিতে তিলমাত্র কুণ্ঠিত না হন। ইহা নিশ্চয়

---

(১) রাজপারিষদ কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা। (২) পণ্ডিত বৈকুণ্ঠ বাচস্পতি।
(৩) যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর। (৪) যতীন্দ্রনাথ বসু।

মনে জানিবেন ইঁহাদের সহিত আমার যেটুকু বন্ধুত্বের বন্ধন আছে যুবরাজের মঙ্গল আমার নিকট তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর। আমি ইঁহাদিগকে যতটা দূর জানি তাহাতে আর কোন আশঙ্কার কারণ মনে পড়িতেছে না, কেবল উঁহারা উভয়েই কিছু সৌখীন, এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিঞ্চৎ পরিমাণে বিলাসে অভ্যস্ত--পাছে বিদেশে কোন প্রকার অনিবার্য্য অসুবিধা বশতঃ তাঁহারা ভীত হন এই সন্দেহে আমার মন আন্দোলিত। যাহা হউক আমি এ সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে যথোচিত উপদেশ দিয়াছি। বস্তুতঃ, যুবরাজ্ঞীর সখী হইবার উপযুক্ত শিক্ষিত ভদ্র হিন্দু মহিলা পাওয়া বড় কঠিন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভাল মেয়ে পাওয়া যাইতে পারিত কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্তঃপুরে তাহার ব্যবহারের হয়ত অসুবিধা ঘটিত- সেইজন্য এই একমাত্র সম্ভবপর হিন্দুমহিলার কথা আমার মনে উদয় হইবামাত্র মহিম ঠাকুরকে জানাইয়াছি --এক্ষণে সেখানে তাঁহারা স্বস্থানের উপযুক্ত হইতে পারিলে আমি পরম নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

জগদীশবাবুর সেই টাকা আমার নিকট পাঠাইলে আমি আনন্দ সহকারে যথাস্থানে যথাসময়ে পাঠাইয়া দিব। ইতিমধ্যে দিনদুয়েকের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম--সেখানে জগদীশবাবুর সহিত অনেক আলাপ আলোচনা হইল। তিনি সম্প্রতি বিলাতের পণ্ডিতদের নিকট হইতে মহোৎসাহপূর্ণ যে সমস্ত পত্র পাইয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। তাঁহারা লিখিয়াছেন।--"আপনার নূতন আবিষ্কারগুলি পরমাশ্চর্য্য- জনক।"

আমরা ভাল আছি। সপরিজনে মহারাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল আশা করি। ইতি-২১শে বৈশাখ, ১৩০৭

আপনার চিরন্তন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

শিলাইদহ

বিপুল সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন,

সম্প্রতি লোকেন্দ্র পালিতের নিমন্ত্রণে খুলনায় গিয়াছিলাম সেইজন্য মহারাজের প্রীতিপরিপূর্ণ পত্র বিলম্বে পাইয়াছি। আমাকে যে অল্পকালের পরিচয়ে রাজপরিবারের একান্ত আত্মীয়ভাবে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন তাহা মহারাজের নিজ সহৃদয়তার গুণেই। মহারাজের মঙ্গল এবং ত্রিপুরার উন্নতি আমার যে কিরূপ অভিলষিত তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিলে পাছে অত্যুক্তি মনে করেন এইজন্য তাহা নীরবে হৃদয়ে পোষণ করি কেবল মাঝে মাঝে মহিম ঠাকুরকে পাইলে আলোচনা করিয়া আনন্দলাভ করিয়া থাকি।

মহারাজের পত্রে যতীর স্ত্রী ও শাশুড়ীর (১) বিষয় অবগত হইয়া বড় সুখী হইলাম। উত্তরোত্তর তাঁহারা মহারাজের প্রীতিসম্পাদন করিতে পারিবেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তাঁহাদের সম্বন্ধে মহারাজের অনুকূলভাবের অপেক্ষায় একটি অনুরোধ ও তাঁহাদের একটি আবদারের কথা মহারাজের গোচর করি নাই।

মহিমঠাকুরের সহিত যতীর বিষয়ে প্রথম আলাপ হইবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ যতীকে শিলাইদহে আনাইয়া লই। অপরিচিত রাজ্যে গিয়া চাকরী করা সম্বন্ধে তাঁহাদের যে সমস্ত ওজর আপত্তি ছিল আমি তাহা খণ্ডন করিয়া দিলাম। অবশেষে তাঁহারা আর একটি আপত্তির কথা আমাকে জানাইলেন ঃ--অনতি-

(১) যতীন্দ্রনাথ বসু কবি অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের জামাতা। শাশুড়ী দ্বারা শরৎকুমারী চৌধুরাণীকেবলা হইয়াছে।

কালপূর্ব্বে যতীর শাশুড়ীর অবস্থা ভাল ছিল, ইঁহারা সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশীয়, অবস্থান্তর হওয়ার পরেও চাকরী লওয়া সম্বন্ধে অনেক বড় ঘরের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন--কেবল আমার মুখে মহারাজের পরিচয়ে আশ্বস্ত হইয়া সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য মহিমঠাকুরের সহিত পরামর্শক্রমে ২০০ টাকা স্থির করি। এই রাজপ্রাসাদটি যদি মহারাজ যতীর নামে করিয়া দেন এবং মহিলাদিগের নাম সংযোগ হইতে মুক্তি দেন তবে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ রক্ষা পায় এবং তাঁহাদের নিকট আমি কড়ার হইতে মুক্তি পাই। ইহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের কোনপ্রকার ত্রুটি ঘটিতে পারে এরূপ আশঙ্কামাত্র করিবেন না, আমার বন্ধুত্বের প্রতি নির্ভর করিবেন, সে ভার আমি গ্রহণ করিলাম।

পূজার অবকাশে ভ্রমণে বাহির হইব এরূপ সঙ্কল্প আছে। লোকেন্দ্র পালিতের সহিত কাশ্মীরে যাইব কল্পনা করিতেছি। ত্রিপুরাতেও যতীর শাশুড়ীর নিকট হইতে আমার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে--সিমলাতেও আমার একটি আহবান আছে। এইরূপ ত্রিধার মধ্যে পড়িয়া গেছি। অবশেষে হয়ত যেখানে আছি এইখানেই থাকিয়া যাইতে হইবে।

ইতিমধ্যে মহারাজের কি কোথাও ভ্রমণের সঙ্কল্প আছে ?

আমাদের এখানকার সমস্ত মঙ্গল--মহারাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। ইতি-২০ ভাদ্র, ১৩০৭

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

বিপুল বিনয়পুরঃসর নিবেদন,

মহারাজ শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন সংবাদ পাইয়া পত্র না লিখিয়া সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় ছিলাম। গতকল্য বোলপুর হইতে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি। আজ প্রাতঃকালে পার্কষ্ট্রীটে (১) যাইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় যতী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার কাছ হইতে সমস্ত সংবাদ অবগত হইলাম।

মহারাজকে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি কিছুকাল হইতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও পীড়িত ছিলাম--যেন একটি অদৃশ্য অমঙ্গল আমার সহিত অহরহ লড়াই করিয়া আমাকে ভূলুণ্ঠিত ও পিষ্ট করিতেছিল--এইরূপ একই সময়ে দুঃসময় অস্বাস্থ্য বিদ্যালয় বঙ্গদর্শন ও বিষয়ের ভারে আমি মাথা তুলিতে পারিতেছিলাম না--মনে হইয়াছিল এবারে ছুটি লইতে হইবে। কিন্তু টিকিয়া গেলাম বলপূর্ব্বক উঠিয়া পড়িয়াছি--মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছি--দুর্দ্দিন চিরকালের নয় এবং দুর্দ্দিন দেখিয়া ডরাইলেও চলিবে না--যে অবস্থাতেই পড়ি চিত্তকে জয়যুক্ত রাখিতে হইবে--দীনতা ও অবসাদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া লুটাইয়া পড়া কাপুরুষতা। শরীরটাকেও অনেকটা খাড়া করিয়াছি--কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আমার কাজ করিবার তেমন ক্ষমতা নাই--লেখাপড়ায় তেমন উৎসাহ পাই না, সেজন্য মনটা কিছু বিমর্ষ হইয়া পড়ে। যদি মাস পাঁচ ছয় সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম তবে বোধ হয় আর একবার জীবনের আর এক পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিতে পারিতাম। এখন মাঝে মাঝে কেবলি মনে হয় যেন জীবনটার উপসংহার ও পরিশিষ্ট লইয়া আছি। কিন্তু বৃথা আক্ষেপ করিতেছি--এ মেঘ কাটিয়া যাইবে--আমার কাজ বাকি আছে--আমার যাহা সঞ্চয় আছে এখানো তাহার বিতরণ শেষ হয় নাই--ঈশ্বর আমাকে অসময়ে অকৃতার্থ করিবেন না--

(১) মহারাজের তৎকালীন বাসভবন।

আমার যে সকল গান গাহিবার আছে তাহা দুঃখ রজনীর অবসান প্রতীক্ষা করিতেছে--নূতন ঊষালোকের আভাস পূর্ব্বদিক্‌প্রান্তে দেখা দিবে--আমি নূতন বলে নূতন আনন্দে নূতন গান আরম্ভ করিব। সে সমস্ত আমার হৃদয়ে অছে--এখনো কণ্ঠে আসে নাই।

জগদীশকে(১) মহারাজ যে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়াছে। মহারাজের উদার মহত্ত্ব বারম্বার অনুভব করিয়াছি, তাহা চিরকাল মনে রহিবে, মুখে প্রকাশ করিব কি করিয়া? ঈশ্বর আপনাকে সর্ব্ব বিষয়ে জয়ী করিয়া আপনার জীবনকেসার্থক করিবেন। মহারাজের ঔদার্য্য কালক্রমে সর্ব্বপ্রকার বাধামুক্ত হইয়া আমাদের স্বদেশকে সফলতার পথে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কীর্ত্তিক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার প্রারম্ভেই মহারাজ যে সকল ব্যাঘাত ভোগ করিতেছেন তাহা নিঃসন্দেহই বিধাতার আশীর্ব্বাদে মহারাজের দ্বিগুণতর মঙ্গলের কারণ হইবে। বিঘ্নের আঘাতে গূঢ় অকল্যাণগুলি সম্পূর্ণ উন্মূলিত হইয়া যায়, শত্রু-মিত্রের পরিচয় হয় এবং কোন্‌খানে নিজের বল ও ছিদ্র তাহার অভিজ্ঞতা জন্মে। পরিণামে মহারাজের জীবনকে বিশেষরূপে কৃতকার্য্য করিবার জন্যই ঈশ্বর তাহার অভ্যুদয় কালকে বিঘ্নবিপত্তির দ্বারা বেষ্টন করিয়াছেন।

আমি আগামীকল্য কুষ্টিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়া কয়েকদিন বোটে ভ্রমণ করিয়া আসিব। বিরলতা ও বিশ্রামের জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দাবদাহের ত্রস্ত হরিণ যেমন জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে আমি তেমনি পদ্মার গর্ভে ঝাঁপ দিলাম। পদ্মার শীতল ক্রোড় আমার চিরপরিচিত।

মহারাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। ইতি--২৪শে শ্রাবণ, ১৩০৯।

অনুরক্ত ভক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

জোড়াসাঁকো

বহুল সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন--

অনেকদিন পরে মহারাজের প্রণয়লিপি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আগামীকল্য আমার কন্যাকে মজঃফরপুরে তাহার পতিগৃহে পৌছাইয়া দিতে যাত্রা করিব--সেজন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি।

মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্রে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে যে পরিচ্ছেদ আছে তাহাতে হিন্দুরাজার কর্ত্তব্যের আদর্শ দেওয়া আছে। ঐশ্বর্য্য ও সিংহাসন অধিকার যে রাজার চরম কর্ত্তব্য নহে, তাহা সংহিতা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়--আমাদের রাজার রাজত্ব কর্ত্তব্যের অধিকার, ঐশ্বর্য্যের অধিকার নহে--প্রাচীন বয়সেপুত্রকেরাজ্যভার দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনের প্রথার দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। জীবনের এক এক ভাগে রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে--রাজত্বভার কেবল তাহার প্রকাশ মাত্র। য়ুরোপে রাজত্বই রাজার সমস্ত। প্রাচীন ভারতে ভোগ এবং ক্ষমতার হিসাবে না দেখিয়া রাজত্বকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য হিসাবে দেখা হইত। নিজের ঐশ্বর্য্যকে নহে, পরন্তু সমাজবিহিত ধর্ম্মকে সকল প্রকার আক্রমণ ও ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই রাজা দুর্ভর রাজদণ্ডভার গ্রহণ করিতেন। সম্প্রতি বিদেশী সম্রাট ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আছেন বলিয়াই স্বদেশী সমাজের আদর্শ উন্নত ও সবল করিয়া রাখা দেশীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে দ্বিগুণতর কর্ত্তব্য হইয়াছে। এখন হিন্দুসমাজ বাহিরের আক্রমণের দ্বারা জড়ভাবে তাড়িত ও চালিতহইতেছে। কোন্‌ ধ্বংসের পথে যাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। রাজারা যদি জাগ্রত থাকেন ও দেশের

(১) বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

জ্ঞানী মনীষিবর্গকে জাগ্রত করিয়া রাখেন তবেই সচেতনভাবে হিন্দুসমাজ উন্নতির পথে চলিতে পারে। রাজারাই দেশের বুধমণ্ডলীকে রাজসভায় আকর্ষণ করিয়া লইয়া মনুষ্যত্বের হিতসাধনকল্পে সকল প্রকার ধর্ম্মালোচনাকে সজীব করিয়া রাখিবেন--এবং হিতকর প্রথা সযত্নে প্রচলিত করিয়া স্বরাজ্যে এবং চতুর্দ্দিকে সামাজিক উচ্চ আদর্শ প্রবর্ত্তন করিবেন। মহীশূরে কতকটা এরূপভাবে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এবং পরলোকগত বম্বাইবাসী মহাত্মা রাণাড়ের প্রবন্ধাদি পাঠে জানা যায় যে মারাঠি পেশোয়াগণ সমাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। শ্রাবণ মাসের আগামী সংখ্যক বঙ্গদর্শনে "হিন্দুত্ব" প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি সমাজই হিন্দুর হিন্দুত্ব এবং রাজা ব্রাহ্মণ বণিক্ শূদ্র সেই সমাজকেই নানাদিক হইতে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। এই কারণেই প্রথম বয়সে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কঠোর শিক্ষায় স্ব স্ব কর্ত্তব্যের আদর্শ গ্রহণ ও পালন করিবার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত হইতে হইত। আমাদের স্মৃতিসকল হইতে সারোদ্ধার করিয়া তাহার সাময়িক অংশ বর্জ্জন ও নিত্যকালীন অংশ গ্রহণ করিয়া "হিন্দুর রাজধর্ম্ম" সম্বন্ধে মহারাজ যদি কিছু আলোচনা করেন ত সে অত্যন্ত উপাদেয় হইবে। আশা করি মহারাজের কুশল। শ খানেক আম ও মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছিলাম মহারাজের ভোগে আসিয়াছে কি?

[সম্ভাব্য তারিখ
আষাঢ়ের শেষ, ১৩০৮]

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন--

অনেকদিন পরে মহারাজের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

মহারাজের সহিত আমি এমন কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না যাহাতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির অপবাদ দিতে পারে। আমার সাধ্য যৎসামান্য হইলেও এবং উদ্দেশ্য লোকহিতকর হইলেও, যে কাজ নিজের হাতে লইয়াছি সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লইব না ইহা আমি স্থির করিয়াছি। কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন মহৎ কর্ম্মের মূল্য থাকে না--আমার যতদূর সাধ্য আছে বঙ্গদর্শন পরিচালনায় তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গৌরব লাভ করিব। এবারে জগদীশবাবুর পত্র পড়িয়া এই বিষয়ে মনে মনে বল লাভ করিয়াছি--জগদীশবাবু প্রতিভায় পাণ্ডিত্য এবং সহৃদয়তার আশ্চর্য্য মিলন হইয়াছে বলিয়া এ সকল ব্যাপারে তাঁহার মত আমার কাছে সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি লিখিয়াছেন ঃ--

'তুমি পুনরায় সম্পাদকের ভার লইয়া তোমার সময় নষ্ট করিবে মনে করিয়া প্রথম প্রথম দুঃখিত হইয়াছিলাম। তারপর দুই সংখ্যা বঙ্গদর্শন পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আর, সমস্ত লেখাতে একটি নূতন ভাব দেখিয়া অতিশয় আশান্বিত হইয়াছি। এতদিন পরে যদি আমাদের চক্ষের আবরণ ঘুচিয়া যায় এবং আমরা আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কিছুই অভিপ্রেত হইতে পারে না। তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়। আর, তুমি যে সব দুরূহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা যেন রক্ষা করিতে সমর্থ হও। আমার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন এ সব দেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন্ দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন্ জাতি অনার্য্যকে আর্য্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পূণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে? তবে আজকাল জ্ঞান লইয়া সভ্যাসভ্যের বিচার হয়। তোমরা মুর্খ তোমরা কেবল নকল করিতে পার ইত্যাদি কথা বিদেশী কেন, স্বদেশীয় অনেকের নিকট শুনিয়াছি। এই এক কথা শুনিয়া সমস্ত দেশের লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আছে। তুমি স্নেহগুণে আমার অনেক অযথা প্রশংসা করিয়াছ। যদি কিছু প্রশংসার থাকে তবে এই যে আমি এই

মন্ত্রপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি যে, অন্যে যাহা করিয়াছে তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন তাহা আমাদের জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন সেই Eternal lie, যাহা দ্বারা আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উৎসাহ নির্ম্মূল হইয়াছে--সেই ঘোর মিথ্যাপাশকে চিরকালের জন্য ছিন্ন করিতে পারি।"

জগদীশবাবুর এই পত্র আমার পক্ষে পারিতোষিক। আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। হিন্দুর যথার্থ গৌরব কি, এবং হিন্দুর উন্নতি সাধনের প্রকৃত পথ কোন্ দিকে বঙ্গদর্শনে তাহাই সম্যক আলোচিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। হিন্দুত্ব কি তাহাই আমি ক্রমশঃ দেখাইতেছি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাইতেছি যে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় যাহাকে ন্যাশনাল মহত্ত্ব বলে তাহাই মহত্ত্বের একমাত্র আদর্শ নহে। আমাদের বিপুল সামাজিক আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও উচ্চ ছিল। এই আদর্শকে যদি জড়ত্ববশত আমরা নষ্ট হইতে দিই তবে য়ুরোপীয় মতে নেশন্‌ও হইব না অথচ আত্মপ্রকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল হইব।

জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি--আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনাদোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্ব্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্য্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক--এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তত।...... আমি মহারাজের নির্জ্জন খাস দরবারের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশী--আমি মহারাজের প্রতি নিতান্তই উপদ্রব করিব, মন্ত্রীবর্গ দ্বারা প্রতিহত হইব না। মহরাজের পরিচরবর্গ নানা কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সঙ্কুচিত করিবে, কিন্তু আমি তাহা শিরোধার্য্য করিব। মহারাজের নিকট পূর্ব্ব হইতেই আমার এই নিবেদন রহিল। মহারাজের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই আমি অকুণ্ঠিতভাবে সকল কথা বলিলাম। যদি ধৃষ্টতা হইয়া থাকে তবে মার্জ্জনা করিবেন। এবং আমাবে ব্যক্তিগত হিসাবে মার্জ্জনা করিয়া আমার একান্ত আন্তরিক মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি রক্ষা করিবেন।

আজ আমার মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী রেণুকার বিবাহ। পাত্রটি মনের মত হওয়ায় দুইতিন দিনের মধ্যেই বিবাহ স্থির করিয়াছি। ঠিক দিনেই মহিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

আশা করি মহারাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। ইতি--২৪শে শ্রাবণ, ১৩০৮।

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ ডাকযোগে একটি ইংরেজী কাগজ পাঠাইতেছি তাহাতে প্যারিসের কয়েকজন সুবিখ্যাত শিল্পীর সোনার কাজের নক্‌সা দেখিতে পাইবেন।

একটি তারিখ-বিহীন পত্র
(ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন)

বিপুল সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন--

সমস্ত অবস্থা আমার কাছে যেরূপ প্রতিভাত হইতেছে খোলাসা করিয়া বলিবার চেষ্টা করি।

মহারাজ গবর্মেন্টের যোগে ঋণ সংগ্রহ করেন ইহা এখানকার কয়েকজনের বিশেষ আগ্রহের বিষয় হইয়াছে দেখিতেছি।

গবর্মেন্ট যে লোককে ঋণ শোধের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিবে শুনিতেছি সে লোকটি প্লান্টার শ্রেণীয়--তাহাকে আয়ত্ত করা স্যাণ্ডস্(১) প্রভৃতি লোকের পক্ষে কঠিন হইবে না।

তাহা হইলে নাগপাশে এ রাজ্যকে রীতিমত বেষ্টন করিতে পারিবে এবং গবর্মেন্টের ভারপ্রাপ্ত লোকের সহিত যদি মহারাজের স্বার্থনিষ্ঠ কর্ম্মচারীদের যোগ ঘটে তবে মহারাজকে নিতান্ত দুর্ব্বল হইতে হইবে।

কলিকাতায় বিরলে মহারাজকে লইয়া সেখানে গবর্মেন্টের সেক্রেটারি প্রভৃতির দোহাই দিয়া মহারাজকে এ সম্বন্ধে একটা বন্ধনে আবদ্ধ করিবে।

যদি এরূপ উদ্দেশ্য না থাকিত তবে স্যাণ্ডসের মত লোক কদাচ আমার নিকট আসিয়া চিকিৎসা উপলক্ষে মহারাজকে কলিকাতায় যাইতে অনুরোধ করিবার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন করিত না। স্যাণ্ডস্ বিনা অভিপ্রায়ে কাহারো সহিত ভদ্রতা করিতে আসে না।

ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল হইতে ঋণ পাওয়া যাইবে না, অন্য কোন প্রাইভেট ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে এ কথাটা সন্দেহজনক।(২)

প্রাইভেট ব্যাঙ্কের সহিত গোপন স্বার্থের সম্বন্ধ স্থাপন করা সহজ। এমন কি, গবর্মেন্টের উচ্চ কর্ম্মচারীর পক্ষেও তাহা দুঃসাধ্য নহে।

রমণীমোহনকে(৩) আমি মহারাজের সহায়তার জন্য নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছি একথা এখানে কেহ কেহ জানিয়াছে।

আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দলে লইবার জন্য বলিতেছে, এ প্রস্তাব অতি উত্তম। তাহারা বলিতেছে রমণীকেই ঋণ শোধের ব্যবস্থার জন্য গবর্মেন্টের সম্মতি লইয়া নিযুক্ত করিলে সকল দিক রক্ষা হইবে।

যাহাতে রমণীকে গবর্মেন্ট মনোনীত না করে তাহার তদ্বির করা নিতান্ত সহজ।

রমণী সুযোগ্য কর্ম্মচারী কিন্তু ম্যুনিসিপালিটির যে সংস্কার কার্য্য লইয়া গবর্মেন্টকে নিতান্ত অপদস্থ হইতে হইয়াছে তাহার মূলে রমণী এবং নীলাম্বরবাবু(৪) ছিলেন গবর্মেন্ট তাহা জানেন।

রমণীর কর্ত্তব্যকার্যে যদি লেশমাত্র গলদ বাহির করিতে পারিত তবে রমণীকে পদচ্যুত করিতে বিলম্ব হইত না--কিন্তু রমণীর মত সুযোগ্য কর্ম্মচারী ম্যুনিসিপালিটিতে নাই।

যাহাই হৌক্ রমণীর প্রতি ফ্রেজারের(৫) কি পরিমাণ অনুগ্রহ আছে তাহা জানি না।

প্রকৃত কথা মহারাজের এমন একজন লোক চাই, যাহাকে স্বার্থপর লোকেরা ভয় মৈত্রের দ্বারা স্বপক্ষে আনিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই একমাত্র মহারাজের পক্ষে থাকিবে। এই সঙ্কটের সময় মহারাজকে এই উপায়েই সকল চক্রান্তজাল হইতে মুক্ত করা যাইতে পারে।

রমণীর নাম করিতে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করি। আত্মীয় বলিয়া নহে। রাজ্যের সঙ্কটের সময় কোন ব্যক্তির নাম করিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করা অত্যন্ত কুণ্ঠা-জনক। আমি নিতান্তই সুহৃদের কর্ত্তব্য স্মরণ

(১) মহারাজের একান্ত সচিব মিঃ স্যাণ্ডিস্

(২) ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল হইতেই অবশেষে ঋণ গৃহীত হইয়াছিল।

(৩) মন্ত্রীপদের জন্য প্রস্তাবিত রমনীমোহন চট্টোপাধ্যায় তৎকালে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন।

(৪) নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

(৫) স্যর এনড্রু ফ্রেজার, বাংলার ছোট লাট।

করিয়া সঙ্কোচ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি নিশ্চয় জানি রমণী এখানে নিযুক্ত হইলে অনেক গ্লানি আমাকে স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু রমণীকে না হউক্ কোনো একজন দৃঢ়চিত্ত যোগ্য লোককে মন্ত্রীপদে রাখিতেই হইবে।

যদি ঋণ গ্রহণের জন্য মহারাজকে গভর্মেন্টের সর্ত্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেই হয় তবে জমিদারী শাসনের জন্য গবর্মেন্টের লোককে অগত্যা গ্রহণ করিয়া মহারাজের নিজের নির্ব্বাচিত একজন সুদক্ষ লোককে মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন--দুইয়েতে মিশাইবেন না।

ইহা অনুভব করিতেছি একটা জাল বয়ন হইতেছে--লেশমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া মহারাজ মনস্থির করুন--দ্বিধামাত্র করিবেন না--এই জাল ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করুন। যতই বিলম্ব হইবে ততই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন।

(সম্ভবত ১৩১১ সনের শেষভাগে লিখিত)

একান্ত অনুগত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

জোড়াসাঁকো

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,--

মহারাজের নিকট অধ্যাপক বসুর একটি প্রার্থনা জানাইবার নিমিত্ত এই পত্র লিখিতেছি।

অধ্যাপক মহাশয় উদ্ভিদের বর্দ্ধন পরিমাপের জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই বর্দ্ধনতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন।

ত্রিপুরায় যে মুলীবাঁশ জন্মে--শিশু অবস্থায় তাহার বৃদ্ধি অতিশয় দ্রুত। এই গাছের চারা তাঁহার পরীক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক হইয়াছে। সদ্য অঙ্কুরিত মুলীবাঁশের চারা মহারাজ যদি সত্বর তাঁহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া দেন তবে তাঁহার বিশেষ উপকার হইবে। পথের মধ্যে অঙ্কুরাগ্র দলিত হইয়া গাছগুলি মরিয়া না যায় সেজন্য প্যাকবাক্সে শিকড় সমেত গাছগুলি মাটিতে বসাইয়া তাহার উপরে খাঁচার আবরণ দেওয়া আবশ্যক হইবে। আপাতত প্রায় ২০। ২৫টি গাছ তাঁহার প্রয়োজন হইবে। পরীক্ষার উপদ্রবে এ গাছগুলি মারা গেলে অন্য তাজা গাছের পুনশ্চ প্রয়োজন হইবে--তখন মহারাজ পুনর্ব্বার আদেশ করিয়া দিবেন। কলিকাতার নিকটে এই গাছের সন্ধান করিয়া না পাওয়াতে তাঁহার পরীক্ষা অসমাপ্ত হইয়া আছে।

মহারাজকে গত পরশ্ব একখানি রেজেষ্ট্রি পত্রে কাজের কথা লিখিয়াছি বোধ করি পাইয়া থাকিবেন।

আমাদের বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া কলিকাতায় পড়িয়া আছি--আশা করিতেছি আর সপ্তাহ খানিকের মধ্যে শেষ করিয়া আপাতত কিছুকালের মত ছুটি পাইব।

মহারাজের কুশল কামনা করি। ইতি--২রা আষাঢ় ১৩১২

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৺মহারাজ রাধাকিশোরকে লিখিত

ওঁ

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন--

জাহাজে বসিয়া মহারাজকে পত্র লিখিতেছি-- গোয়ালন্দে যতীর(১) ঠিকানা লেখা লেফাফার মধ্যে এই পত্র পাঠাইব।

(১) যতীন্দ্রনাথ বসু।

ম্যাজিষ্ট্রেটের(১) পত্র দেখিয়াছি। দেখিয়া ইহাই বুঝিলাম তাহাকে মহারাজের অভিপ্রায় ঠিকমত বুঝান হয় নাই--তাহাকে এমন করিয়া বলা হইয়াছে যাহাতে সে বিরক্ত হয়। গবর্মেন্টকৃত সাহায্য উপেক্ষা করিয়া মহারাজ যে স্বচেষ্টায় ঋণ সংগ্রহের জন্য উদ্যত হইয়াছেন একথা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইবার কথা নহে। চাকলা রোশনাবাদ সমগ্রভাবে নূতন লোকের হস্তে ঋণশোধের জন্য আবদ্ধ রাখা অনাবশ্যক, তাহার একাংশ-মাত্র রাখাই মহারাজের অভিপ্রেত ইহাই ম্যাজিষ্ট্রেটকে বুঝাইয়া বলিবার কথা ছিল। কিন্তু যে সকল লোকের দ্বারা গবর্মেন্টের সহিত মহারাজের কথা চলিতেছে মহারাজের সহিত তাহাদের অভিপ্রায়ের পার্থক্য থাকাতে সমস্তই পন্ড হইয়া যাইতেছে--কেবল তাহাই নহে চেষ্টাপূর্ব্বক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মহারাজকে বিরক্তিভাজন করা হইতেছে। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম শ্রীযুক্ত শরৎ বসুকে(২) পদচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে মহারাজের জমিদারীকে মহারাজের আয়ত্তভ্রষ্ট করার উদ্যোগ চলিতেছে। শরৎবাবু কিরূপ লোক কিছুই জানি না--তাঁহাকে বিদায় করা যদি শ্রেয়স্কর হয় তবে মহারাজ স্বয়ং বিবেচনা করিবেন কিন্তু এই সামান্য কারণে এতবড় চক্রান্ত প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। রোশনাবাদের ম্যানেজারি স্বপক্ষভুক্ত লোককে দিবার জন্য একদল লোকের আগ্রহ বুঝা যাইতেছে।

বস্তুত বিশ্বাসযোগ্য সুযোগ্য লোককে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে গবর্মেন্টের সঙ্গে মহারাজ কোনো কথা চালাইবেন কি করিয়া আমি তাহাই ভাবিতেছি। যাঁহারা ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা প্রতিকূলভাবে চলিতেছেন।

কলিকাতায় মহারাজের আসা উচিত কিনা পরামর্শ করিয়া পত্র লিখিব অথবা আবশ্যক হইলে টেলিগ্রাফ করিব। যাহারা মহারাজের সঙ্গে আসিবে তাহাদিগকে ভয় করি--তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কিভাবে কি কথা কহিবে জানি না।

ঋণ সংগ্রহ যদি অনিবার্য্য হয় এবং গবর্মেন্টের সর্ত্ত যদি গ্রহণ করিতে হয় তবে এই কাজের ভার ইহাদের দিবেন না। দশ লাখ টাকার যে কমিশন প্রাপ্য তাহা মহারাজের নিজের তহবিলেই আসা উচিত। অগ্রে ভাল লোক নিযুক্ত করিয়া পরে এই কাজে হাত দিবেন।

যদি রমণীকে (৩) কাজ দেওয়া স্থির করেন তবে তাহাকে ছুটির জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। মহারাজ যেরূপ বিবেচনা করেন জানাইবেন--একথা কোনোমতেই মনে করিবেন না যে রমণীকে নিযুক্ত না করিলে ক্ষুন্ন হইব। মহারাজের বাধাবিঘ্নের কথা আমি সমস্তই জানি--নানাদিক বিচার করিয়া মহারাজকে কাজ করিতে হয়--ইচ্ছা হইলেও তাহাকে সত্বর কার্য্যে পরিণত করা রাজনীতিতে সম্ভবপর নহে।

কলিকাতায় গিয়া মহারাজকে পত্র লিখিব। ইতি--মঙ্গলবার

(১৩১২ সনে সম্ভবত
১৭ আষাঢ়ের পর লিখিত)

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পতিসর
আত্রাই

বিপুল সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন--

মহিমের পত্রে মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হইলাম। কলিকাতায় আসিয়া রমণীর সহিত কথা কহিয়াছি। তাঁহাকে মন্ত্রীপদের ধার্য্য বেতনে দুই বৎসরের ছুটিতে মহারাজের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিব। তিনি

(১) ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেট (পদাধিকার বলে পলিটিক্যাল এজেন্ট)।
(২) শরচ্চন্দ্র বসু--চাকলা রোশনাবাদের দেওয়ান।
(৩) রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়--দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা। ইনি এক সময়ে ত্রিপুরায় রাজমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষিত নহেন। তিনি যশ ও দক্ষতার সহিত মহারাজের রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধান ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিলে নিজকে সার্থক বোধ করিবেন। বস্তুত তিনি অর্থাদি সম্বন্ধে নিরাসক্ত লোক--এমন কি, আর তিন বৎসর পরেই তাঁহার পেন্সন পাইবার সময় উপস্থিত হইবামাত্রই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বাধীন হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক যদি মহারাজ মনস্থির করেন তবে রমণীকে এখনি ছুটির জন্য আবেদন করিতে হইবে। ছুটি পাইতে তাঁহার তিনমাস লাগিবার সম্ভাবনা।

আমার আর একটি প্রার্থনা এই যে, রমণীর প্রতি এমন অব্যাহতভাবে কর্ম্মভার অর্পণ করিবেন যাহাতে তিনি কোনো অংশে ব্যর্থ না হন এবং সম্পূর্ণভাবে দক্ষতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র পান। তিনি বলিতেছিলেন আজ পর্য্যন্ত কোনো কর্ম্ম লইয়া তিনি অকৃতকার্য্য হন নাই, ত্রিপুরায় অধিকারের সঙ্কীর্ণতাবশত পাছে বিফলকাম হন এই তাঁহার আশঙ্কা হয়। রমণীর প্রতি যথার্থরূপ কর্ম্মভার অর্পণ করিলে মহারাজকে কোনোদিন অনুতাপ করিতে হইবে না একথা মহারাজ নিশ্চয় জানিবেন।

আমি আগামী শনিবার প্রত্যূষে কলিকাতায় পৌঁছিব। সেখানে কাজকর্ম্মে কিছুকাল থাকিতে হইবে। ইতিমধ্যে যদি সেখানে মহারাজের শুভাগমন হয় তবে সকল কথা আলোচনা হইতে পারিবে। যদি বিলম্ব হয় তবে আমি যেখানে থাকি সংবাদ পাইলেই চলিয়া আসিব। মহারাজের রাজ্যে ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইবে ঈশ্বর ইহা ব্রত স্বরূপ আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন তাহা আমি অনুভব করিতেছি; আমার চিত্ত কর্ম্ম হইতে অবকাশ লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি মহারাজের এই কাজ আমাকে সাধন করিতে হইবে, আমি ইহাতে ধর্ম্মে বাধ্য--মহারাজও আমাকে ইহা হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিবেন না। আমাদের বর্ত্তমান বৈষয়িক সমস্ত ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও মহারাজের রাজ্যের চিন্তা আমাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতেছে না। কেবল মহারাজকে নহে, আমার নিজকে উদ্বেগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমাকে মহারাজের কর্ম্মে চিত্ত নিয়োগ করিতে হইবে। ত্রিপুরার ইতিহাসে আমার পিতামহের যে যোগ ছিল সেই যোগ আমাকেও রক্ষা করিতে হইবে বিধাতার এই অভিপ্রায়বশতই অকস্মাৎ স্বর্গীয় মহারাজ বিনা পরিচয়েই আমাকে ত্রিপুরার সহিত আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইতি ২৮শে আষাঢ় ১৩১২

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকো

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন--

যতীর হস্তে মহারাজের পত্র পাইয়াছি।

এ কয়দিন রমণীকে লইয়া প্রত্যহ আলোচনা করা গিয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ যতীর নিকট পাইবেন। আপাতত রমণীর নিয়োগ সম্বন্ধে কেবল সংক্ষেপে দুটি কথা মহারাজকে জানাইতেছি।

১। তিনি এখানে ১২৫০ টাকা পাইয়া থাকেন। মহারাজের নিকট তিনি ১৫০০ টাকা আশা করিয়া থাকেন।

২। ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন রক্ষণ বিচার প্রভৃতি সকল কর্ম্মের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার হস্তে দিতে হইবে।

এই দুই বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিয়া মহারাজ তাঁহাকে স্বাক্ষরিত পত্রে কর্ম্মে আহবান করিবামাত্র তিনি ছুটির জন্য দরখাস্ত করিবেন। সম্ভবত ছুটি পাইতে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না কিন্তু নভেম্বরের পূর্ব্বে ছুটি পাওয়া সম্ভবপর নহে।

দুই বৎসর ছুটি লইয়া রমণী যখন কাজ করিবেন তখন মহারাজ তাঁহার দক্ষতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবেন। ইতিমধ্যে যদি কোনো কারণে সুবিধা না ঘটে তবে ইঁহাকে অবসর দিতে মহারাজের সঙ্কোচের

কোন কারণ থাকিবে না।--কেবল মাত্র এই দুই বৎসর কাল মহারাজ তাঁহাকে কাজে রাখিবেন এই কথা স্বীকার করিলেই রমণীর পক্ষ নিশ্চিন্ত হইবেন।

দুই বৎসর তাঁহার কাজে যদি সন্তুষ্ট হন তবে তাঁহাকে স্থায়ীরূপে মহারাজের কর্ম্মে রাখিবার জন্য মহারাজ বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিবেন--এখন সে সকল কথা ভাবিবার প্রয়োজন হইবে না।

ঋণ সংগ্রহের কাজটা রমণীকে নিয়োগের পূর্ব্বে স্থগিত রাখিলেই ভাল হয়। এখন এ কাজে হাত দিতে গেলে লুব্ধ লোকদের দ্বারা মহারাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

মহারাজকে আমি পুনশ্চ জানাইতেছি রমণীকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিলে তাঁহার বিশ্বস্ততা, দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও সহৃদয়তাগুণে মহারাজ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট এবং সর্ব্বতোভাবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। ছদ্মবেশী শত্রুদলের সঙ্কটজাল হইতে মহারাজকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দান করিতে পারিলে আমিও চরিতার্থ হইব।

ঈশ্বর মহারাজকে নির্ব্বিঘ্ন করুন। ইতি--৯ই শ্রাবণ, ১৩১২

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বিপুল সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন---

মহারাজ, সমস্ত সঙ্কোচ দূর করিয়াও কয়েকটি কথা মহারাজকে নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি ধৃষ্টতা হয় ক্ষমা করিবেন।

রাজকার্য্যে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা নানা লোকের নিকট হইতে আমার কর্ণগোচর হয়। আমি দূরে থাকি, আমার পক্ষে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করা কঠিন - তথাপি আমি উদাসীন থাকিতে পারি না। আমার বুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হয় মহারাজের হিতকল্পে তাহা যদি না জানাই তবে আমার পক্ষে অধর্ম্ম হইবে।

বর্ত্তমানে ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব এরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আলোচ্য বিষয় হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে সকল পক্ষের তর্কই আমাকে শুনিতে হইয়াছে।

একপক্ষে শুনিয়াছি, একযোগে গবর্মেন্টের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া খুচরা দেনা একেবারে শোধ করিয়া ফেলাই শ্রেয়স্কর। সে প্রস্তাব অনুসারে গবর্মেন্টের নির্ব্বাচিত একজন ইংরেজ পরিদর্শকের হস্তে মহারাজের জমিদারীশাসন ও কতক পরিমাণে আয়ব্যয় নিয়ামনের ভার অর্পিত হইবে।

অপরপক্ষে শুনা যায়—সুব্যবস্থার দ্বারা, পাওনাদারদের রাজি করিয়া কিস্তিবন্দীর দ্বারা দেনাশোধ করা অসম্ভব নহে। বিশেষত পাওনাদারগণ উচ্চহারে সুদের দাবী করিতে পারে এমন সুযোগ তাহাদের হস্তে নাই।

আমি যে এরূপ পরস্পর-বিরোধী জনশ্রুতি মাত্র শুনিয়া মতস্থির করিতে পারি এরূপ সাহস আমার নাই। মহারাজ নিঃসন্দেহেই সকল কথা তলাইয়া দেখিয়াছেন। আমার কেবল অনুমানমাত্র সম্বল--তথাপি তাহাও যদি মহারাজের কাজে লাগে এই সম্ভাবনার উপরে নির্ভর করিয়া সকল কথা নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গোড়াতেই ইংরেজের নাম শুনিয়া ভয় হয়। ঐ জাতের হস্তে নিশ্চিন্তমনে আত্মসমর্পণ করা কোনোমতেই চলে না। অবশ্য যদি নিতান্ত বাধ্য হইতে হয় তবে কথাই নাই।

শ্রীশ্রীহরি।

প্রাণের
খুকী।

তুমি লিখিয়াছ অনেক দিন পর আমার চিঠী পাইয়া মনের তৃষ্ণা দূর হইয়াছে, আর আর লিখিয়াছ আমি বিদেশে তোমাকে ভুলিয়া কি থাকিতে পারা যায় আর কথা স্ত্রীলোক মাত্রেই সন্দেহ বাতিকা থাকে ইহা স্ত্রীজাতির স্বভাব ধর্ম মনে থাকুক আর না থাকুক, যাহা হৌক তোমার পত্র পাইয়া বড় সুখী হইলাম এই মত প্রেমসুধা বর্ষন করিয়া চিত্ত চকোরের তৃষ্ণা তৃপ্তি করিবা।

কবিতা।

পত্রের উত্তরে বড় সুখী কৈলে মোরে,
রত্নের অধিক জত্নে রাখিব অন্তরে।
তুমি মম আমি তব যদি হয় তাই,
ইহা হতে সুখ তিনভুবনে ও নাই।

লিখিয়াছ ভুলাবার কি কথা মিলে মনে মনে গাঁথা, ভুলিতে কি পারি তব বিমল মুখকমল? দিবাকর সরোজিনী অন্তরে বেঁধেবল। ভিন্ন দেহ এক প্রাণ, গুনিজল আমি মীন, বারি বিনে চাতকিরা কি আছে বল সম্বল। ইত্যাদি ধরাধরা কেবা সার কম

আর কিছু নাহি চাহে পেলে প্রেম রস,
চিরকাল থাকে লো হইয়ে তারি বশ।
এতদিনে চির আশা চির আকিঞ্চন,
পাইলাম আজি আমি মনের মতন।

এ সুখের স্মৃতি মম জাগ্রতে স্বপনে,
সদত জাগিয়া প্রিয়ে থাকিবেলো মনে।

তুমি যে ছেরির জন্য বলিয়াছ তাহা আমি ভুলিনাই এবারবাড়ী যাইবার সময় সঙ্গেকরিয়ানিব আমাকে কি ইনাম দিবে উত্তরেজানাইবা

এখানে আমরা সকলেই জগদীশ্বরকৃপায় ভাল আছি আশাতে তোমারকুশল লিখিয়াবিদেশীকে সুখীকরিবা ॥

আশীর্ব্বাদক।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মন।

৪৯। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের লিপি নিদর্শন

[illegible]

যথা —

১- [illegible]

২- [illegible]

৩- [illegible]

৪- [illegible]

৫- [illegible]

৬- [illegible] ইত্যাদি —

৫০। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের লিপি নিদর্শন

৫১। রাজমন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লিপি নিদর্শন (শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

TIPPERAH STATE

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন

আগরতলার ২৯শের সংবাদ পাইলাম

কতিপয় ষড়যন্ত্রকারী চেষ্টা করিতেছিল যে

মহারাজ আমার সাথে লইয়া কলিকাতা আসিতে

যেন না আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য নিযুক্ত হইয়াছেন

আমার নির্দিষ্ট কবিতার কারণ আমি একজন

স্বদেশী movement এর নেতা। Belvedere

এ যে "গার্ডেন পার্টি" হইয়াছে আমি তাহার

নিমন্ত্রিত। আমার কলিকাতায় আসিয়া

পারে মহারাণী "ইঙ্গ-মাতা" পার্টিতে

উপস্থিত হইল। উহার গৌরব বৃদ্ধি করে

এই অভিপ্রায়ে আমি মহারাজাকে আমার

সঙ্গে আনা সমুদয় নিযুক্ত করিয়াছি।

তদনন্তর Political agent এর কাছে

৫২। মহারাজ বীরচন্দ্রের
একান্ত সচিব রাধারমন ঘোষের লিপি নিদর্শন

[illegible]

৫৩। কর্ণেল মহিম ঠাকুরের লিপি নিদর্শন

নিবেদন— মহাশয় [illegible]

শ্রীশ্রীযুত [illegible]

[illegible] হইলাম।

বিশেষ— [illegible] শ্রীশ্রীযুত

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] হইবেক, [illegible]

[illegible] নিবেদন ইতি

১৩০৭ ত্রিং ১৩ জ্যৈষ্ঠ।

[illegible]

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ

৫৪। রাজমালা লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহের লিপি নিদর্শন



৫৫। লিপি নিদর্শন —
মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের
পত্রাংশ (তৎকালীন মন্ত্রী মহারাজকুমার
শ্রী ব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখিত)

যাঁহারা মহারাজের কর্ত্তৃত্ব এতদূর পর্যন্ত খর্ব্ব করিয়াও একযোগে সমস্ত দেনা শোধের জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহারা এতটা ব্যাকুলতার তেমন সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারিতেছেন বলিয়া বোধ হইতেছে না। দেনা অবিলম্বে শোধ না করিলে শতকরা বারোটাকা হারে সুদ দিতে হইবে ইহা কি সত্য? যদি যথানিয়মে কিস্তিবন্দী করিয়া দেনা ৫।৬ বৎসরের মধ্যে শোধ করা যায় তবে পাওনাদারগণ রাজি হইবে না ইহা কি নিশ্চয় সত্য? রাজি না হইয়া তাহাদের মধ্যে অন্য কোনো উপায় আছে কি? এইরূপ একযোগে ঋণের দ্বারা ঋণশোধ করিলে যদি মহারাজের কোনো কর্ম্মচারীর পাওনাদারের নিকট হইতে কোনো পুরস্কারের প্রত্যাশা থাকে তবে এরূপ স্বার্থপর পরামর্শের মধ্যে আশঙ্কার কারণ আছে কিনা তাহাও বিচার্য্য। শেষোক্ত যে কথাটি বলিলাম তাহা সম্পূর্ণ অমূলক হইতে পারে—কাহাকেও সন্দেহ করিবার যোগ্য কোনোই প্রমাণ আমার সম্মুখে নাই—কিন্তু রাজকার্য্যের বৃহৎ ব্যাপারে আনুমানিক সন্দেহও আলোচনার যোগ্য--ইহাতে যদি নিরপরাধের প্রতি অবিচার করিতে বাধ্য হই তবে আমি কর্ম্মনীতি অনুসারে ক্ষমা আশা করিব।

কিন্তু যখন কোনো কথা জোর করিয়া বলিবার মত অবস্থা আমার নহে তখন আমি একান্ত সানুনয়ে এই কথা মাত্র বলিব যে মহারাজের রাজ্য পরিচালনার সাহায্যকার্য্যে এমন একজন অর্থনীতিজ্ঞ কর্ম্মকুশল দূরদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, উৎসাহী লোককে নিযুক্ত করুন যাঁহার বুদ্ধি ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রতি মহারাজ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে পারেন। তাঁহার প্রতি যথার্থরূপে কর্ত্তৃত্বভার দিতে হইবে। নানা পক্ষের নানা মত নানা স্বার্থের দ্বারা রাজ্যের মঙ্গলকে প্রতিপদে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতে দিবেন না। মহারাজের হৃদয় নিতান্ত কোমল, এই জন্যই নিজের ক্ষমাগুণ হইতে নিজের ঔদার্য্য হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে একজন সুদক্ষ মন্ত্রীর সুদৃঢ় সহায়তা মহারাজের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। আমি দেখিতে পাইতেছি নানা পক্ষের নানা বিরোধ ও সংঘর্ষ মহারাজকে নিয়তই উৎপীড়িত করিতেছে, আশঙ্কা হইতেছে পাছে ক্রমশই জাল জটিল হইয়া পড়ে ও মহারাজকে কোনো প্রকার অসম্মানের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িতে হয়। পরের বন্ধনে একদিন ধরা দেওয়ার চেয়ে নিজের শাসনে নিজকে সুকঠিনভাবে বদ্ধ করা কর্ত্তব্য। মহারাজের শরীর দীর্ঘকাল হইতে অসুস্থ হইতেছে দেখিয়া আমার মন উদ্বিগ্ন হইতেছে। ঈশ্বর আপনাকে নিরাময় নির্ব্বিঘ্ন করুন এই আমি একান্তমনে প্রার্থনা করি। নানা লোকের আকর্ষণে বিক্ষিপ্তচিত্ত না হইয়া যে কোনো একজন ব্যক্তির উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে মহারাজ শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি পূর্ব্বে যাঁহার নাম করিয়াছিলাম তাঁহাকেই রাখিবার জন্যই যে অনুরোধ করিতেছি তাহা নহে--আমার বক্তব্য এই যে একজনের প্রতি অব্যাহত কর্ত্তৃত্বভার না দিলে কোনোমতে রাজকার্য্যে শৃঙ্খলা ঘটিতেই পারে না। বর্ত্তমানে মহারাজের মন্ত্রী নিম্নতন কর্ম্মচারী প্রভৃতির দ্বারা কেবলই ব্যর্থ ও অপমানিত হইতেছেন ইহাতে মহারাজেরই রাজ্যশ্রী অপমানিত হইতেছে যদি ইহাঁকে মন্ত্রীপদে রাখেন তবে মহারাজের অবিচলিত রাজক্ষমতার দ্বারা মহারাজই ইহাঁকে স্বপদে সুদৃঢ় রাখিবেন নতুবা অকল্যাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে--অনুরক্ত সুহৃদের এই সানুনয় বাক্যে কর্ণপাত করিয়া তাহার সমস্ত প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন--আশা করি আমি যাহা বলিলাম ধর্ম্ম-বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়াই বলিয়াছি।*

একান্ত অনুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনশ্চ--

পত্রখানি দয়া করিয়া অবিলম্বে নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। ইতি

---

* সম্ভবত ১৩১২ সনে লিখিত।

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন--

কিছুদিন হইতে আমার মনের মধ্যে একটি গ্লানি জন্মিয়াছে তাহাই দূর করিবার জন্য মহারাজকে অদ্য এই পত্র লিখিতেছি।

মহারাজের পত্রের মধ্যে.......চিঠি ও টেলিগ্রাম পাইবার পর হইতেই আমার মনের মধ্যে একটি বেদনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা কিছুতেই দূর হইতেছে না।

ত্রিপুরারাজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে আমি অনেকদিন হইতেই আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়া থাকি একথা নিশ্চয় জানিবেন। এই উপলক্ষ্যে জনশ্রুতি ও অন্যান্য কারণে মাঝে মাঝে........ প্রতি আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে। একবার দার্জ্জিলিঙে এই সন্দেহের কথা...........স্পষ্ট জানাইয়াছি।

কিন্তু এসকল সন্দেহ দৃঢ়ভাবে মনে স্থান পায় নাই। তাহার কারণ, আমি ত্রিপুর-রাজ্য সংক্রান্ত প্রকৃত ঘটনা সকল নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা জানি না...........সম্বন্ধে কোনো বিরুদ্ধ ধারণা মনে স্থান দিবার অধিকার আমার নাই--বিশেষত তাহার সহিত আমি যখন কোনে কাজে লিপ্ত নহি তখন তাহার বিচার ভারও আমার উপর নাই।

আর এক কারণ, ...সঙ্গে যখন রাজ্য সংক্রান্ত আলোচনা করি তখন তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া প্রত্যেক বারেই আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াছি...........বুদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত এবং তীক্ষ্ণ, তাহার ধারণাশক্তি প্রবল, এবং ত্রিপুররাজ্যের হিতসম্বন্ধে তাহার যে উৎসাহ নাই তাহাও নহে।

কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার দুর্বলতাও আছে। সে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ একেবারে ভুলিতে পারে নাই এই আমার বিশ্বাস। এই দুর্ব্বলতা না থাকিলে সে সবলে ত্রিপুরার উন্নতিসাধন করিতে পারিত।

ত্রিপুরার উন্নতি সম্বন্ধে আমি যখন........সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি ....উন্নতির পক্ষে নানা অনিবার্য্য ব্যাঘাতের কথা উত্থাপন করিয়া আক্ষেপ করিয়াছে। সেই উন্নতির একটা বাধা তাহার নিজের দুর্ব্বলতা একথা সে নিজেকে জানিতে দিয়াছে কিনা জানি না। বস্তুত.......... যেরূপ বুদ্ধি এবং ইচ্ছা আছে সেরূপ যদি তাহার নির্লোভ নিঃস্বার্থ স্বভাব এবং চরিত্রের দৃঢ়তা থাকিত তাহা হইলে ত্রিপুরার পক্ষে মঙ্গল হইত।

মহারাজের সহিত আমার যে একটা আন্তরিক সম্বন্ধ বিধিবশে স্থাপিত হইয়াছে তাহা উত্তরোত্তর প্রবল-তরভাবে মনের মধ্যে অনুভব করি। এই সম্বন্ধের অনুসারী কর্ত্তব্যও নিশ্চয় আছে। সেই কর্ত্তব্যপালন না করিলে অধর্ম্ম হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে কারণেই হউক এবার স্থির করিয়াছিলাম যে ত্রিপুরার হিতসাধনের জন্য সমস্ত সঙ্কোচ পরিহার করিয়া আমাকে নিযুক্ত হইতে হইবে।

অথচ এখন আমার ঠিক কর্ম্মের সময় নহে। এখন সংসারের সমস্ত জাল গুটাইয়া লইবার জন্য মন প্রায়ই ব্যাকুল হয়। ঠিক এই সময়ে বিবিধ চক্রান্তসঙ্কুল জটিল রাজসভার ব্যাপারে ঈশ্বর যে কেন আমাকে কালের জন্যও আকর্ষণ করিলেন তাহা তিনিই জানেন। এই কর্ম্মের পথ যেমন দুর্গম তেমনি কন্টকা-কীর্ণ। এই পথে পা ফেলিবামাত্র চক্রান্ত কাহাকে বলে তাহার স্বাদ আমাকেও পাইতে হইল।

প্রথমত ঘোরতর সংশয়ের মধ্যে আমাকে দিশাহারা হইয়া দাঁড়াইতে হইল। মহারাজ যে কোন্‌দিক হইতে কি সঙ্কটে পড়িয়াছেন তাহা স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু স্পষ্টরূপে সমস্ত ব্যাপার বুঝিবার সময় ও সুযোগ আমার হাতে ছিল না---কারণ, আমি মহারাজের কর্ম্ম-চক্রের বাইরে আছি---কেবল ক্ষণকালের সংশ্রবে যেটুকু আভাস পাওয়া যায় তাহার উপরে নিশ্চয় নির্ভর করা যায় না। অথচ যে যে স্থানে বিপদের আশঙ্কামাত্রও অনুমান করা যায় তাহা মহারাজের কাছে গোপন

করা আমি উচিত বোধ করি নাই। ভিতরকার অবস্থা মহারাজ আমার অপেক্ষা অনেক বেশি জানেন---বিচার বিবেচনা মহারাজ ঠিকমত করিবেন এই.......করিয়া আমার সম্মুখে যাহা কিছু উপস্থিত হইয়াছে তাহা মহারাজের সম্মুখে নিবেদন করিয়াছি। বস্তুত কোন্‌টা গোপনীয় কোন্‌টা প্রকাশ্য কোন্ জিনিষ প্রয়োজনীয় কোন্‌টা তুচ্ছ, কাহার তাৎপর্য্য কি তাহা আমার সম্পূর্ণ বিচার করিবার সাধ্য ছিল না। এই অক্ষমতাবশতই মহারাজের সম্মুখে সমস্তই উপনীত করিয়াছি।

কিন্তু ইহার মধ্যে যে সমস্ত কাজ আমাকে অন্যায়পূর্ব্বক করিতে হইয়াছে তাহার গ্লানি আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

............র ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে আমার বারম্বার সন্দেহ জন্মিলেও তাহাকে বন্ধু হিসাবে আমি পরিত্যাগ করি নাই। সুতরাং তাহার সহিত আমার বিশ্বাসের সম্বন্ধ আছে। গোপনে এই বিশ্বাসকে ভঙ্গ করা আমার পক্ষে নিরতিশয় গর্হিত কার্য্য হইয়াছে--সেজন্য আমি অন্তর্য্যামীব নিকটে দন্ডভোগ করিতেছি। অতএব মহারাজ দয়া করিয়া আমার এই পত্রখানি ....দেখাইবেন। আমি যদি অবসর পাইতাম তবে ....সম্মুখেই কোনো না কোনোদিন আমি আমার মনের সমস্ত খেদ ও সংশয় স্পষ্ট করিয়া জানাইতাম কিন্তু সেরূপ অবকাশ আমি পাই নাই আমার যা বক্তব্য তাহা আমি আজ পরিষ্কার করিয়া বলি

আমি স্যান্ডস্ সাহেবকে (১) তিলমাত্র বিশ্বাস করি না। আমি নানা স্থান হইতে শুনিয়াছি যে স্যান্ডস্ নানা কৌশলে মহারাজের অর্থ শোষণ করে।

যখন হইতে দেখিয়াছি ....স্যান্ডস্ সাহেবের সহিত নিজকে জড়িত করিয়া রাখে তখন আমি বুঝিয়াছি... দ্বারা নিস্বার্থভাবে মহারাজের রাজ্যের হিতসাধন হইবে না।

মহারাজের দশ লক্ষ টাকার ঋণ একযোগে পরিশোধ করার অত্যাবশ্যকতা যখন আমি বুঝিতে পারি নাই অথচ যখন এই বিষয়ে.......স্যান্ডস্ প্রভৃতির আগ্রহ দেখা গেল তখন স্বভাবতই আমার মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল একথা..... নিকট গোপন করা আমার পক্ষে অন্যায়।

........নিজেকে এইরূপে ভুলাইতে পারে যে, যখন ঋণশোধ করিতেই হইবে তখন রাজ্যের হিতের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুবিধা সাধন করিতে দোষ কি ?

কিন্তু এই উপলক্ষ্যে মহারাজকে পরের অধীন করিবার চেষ্টা আমার ভাল লাগে নাই।

সে সম্বন্ধেও...........নিজেকে এরূপে হয়ত ভুলাইয়া থাকিবে যে, কিছুদিন দায়ে পড়িয়া এইরূপে কর্তৃপক্ষের জবাবদিহির অধীনে থাকিলে তাহাতে মহারাজের ও রাজ্যের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমি এই পলিসির পক্ষপাতী নহি। ....নিজে যদি সম্পূর্ণ খাঁটি ও সবল হইত এবং ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিত তাহা হইলে এসমস্ত কৌশলের প্রয়োজন হইত না।

ত্রিপুরায় গিয়া আমি ইহা দেখিলাম যে সেখানে দলাদলি খুব প্রবল হইয়াছে -এরূপ অবস্থায় মহারাজের তরফে তাকানো কোনো দলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না --অপর দলকে ব্যর্থ করা ও নিজের দলের জন্য বল সংগ্রহ করা ইহাই প্রত্যেক পক্ষের প্রধান চিন্তনীয় হয়। এমনস্থলে মহারাজের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। আমি অল্পদিনে কোনোমতেই বুঝিতে পারি নাই--কাহারা মহারাজের যথার্থ সুহৃদ। আমার মনে কেবলি এই কথা জাগিয়াছে যে, মহারাজ সঙ্কটজালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধারের জন্য আমি.....প্রতি নির্ভর করিতে সাহস করি নাই-- কারণ, আমি নিশ্চয় জানি না ...কি ইচ্ছা করিতেছে। ইচ্ছা হয়ত ভালই করিতে পারে কিন্তু দুর্ব্বলতাবশত সে নিজেই বা কোন্ চক্রের সহিত কতদূর জড়িত হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাও দেখিলাম গভর্ণমেন্টের সহিত মহারাজের সমস্ত কথাবার্ত্তা.......স্যান্ডস্ প্রভৃতি দুই একজন লোকের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। তাহারা ইচ্ছা করিলে এই ক্ষমতার এমন অপব্যবহার করিতে পারে যে

(১) ই, এফ্, স্যান্ডিস্, মহারাজের একান্তসচিব।

তাহা মহারাজের পক্ষে বিপজ্জনক--এমনস্থলে লেশমাত্র সন্দেহের কারণ থাকিলেও অতিমাত্র সাবধান হওয়া রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য। এই জন্যই আমি মনে করিয়াছিলাম স্থানীয় দলাদলির সহিত সম্পর্কশূন্য, নিস্বার্থ সুশিক্ষিত, সুদক্ষ লোক মহারাজের সম্প্রতি একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমি যতদূর জানি রমণীর ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি দুলর্ভ এই মনে করিয়া রমণীর নাম করিয়াছিলাম।

কিন্তু সেজন্য আমি এখন আর ব্যগ্র নহি। আমি........সম্বন্ধে যে সকল সন্দেহ মনে পোষণ করিয়াছি তাহা....গোপন করা আমার পক্ষে অধর্ম্ম বোধ করিতেছি। এই পত্রখানি পড়িলে........আমার মনের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

.........সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছে তাহা সম্ভবত অমূলক এবং সেই অমূলকতার সম্ভাবনা মনে রাখিয়াই তাহার সহিত বন্ধুভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হয় না। কিন্তু মহারাজের কাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে এখনো এই সন্দেহ মনে রাখিয়া আমাকে কাজ করিতে হইত। কারণ, কাজ নষ্ট হইয়া গেলে আর সুযোগ ফিরিয়া পাওয়া যায় না।

.........সম্বন্ধে আমি নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হইয়া আছি--মহারাজ সকল কথা পরিষ্কার করিয়া আমার এই লজ্জা দূর করিয়া দিবেন। আমি লজ্জাবশতই তাহার কয়েকখানি পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই।

ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকারে মহারাজকে নির্ব্বিঘ্ন করুন। ইতি--১৬ই শ্রাবণ, ১৩১২

চিরানুরক্ত ভক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্রষ্টব্য ঃ--সাধারণ সৌজন্যে চিঠিতে উল্লিখিত রাজপুরুষ বিশেষের নাম উদ্ধৃত হইল না।

ত্রিপুরার বজেট সম্পর্কে মহারাজ রাধাকিশোরের নিকট রবীন্দ্রনাথের উপস্থাপিত নোট

ওঁ

বজেটের বিস্তারিত আলোচনার পূর্ব্বে কয়েকটি মূলনীতি সম্বন্ধে মহারাজের নিকট নিবেদন।।

বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে কিছুকাল কৌন্সিল ও কিছুকাল উমাকান্তবাবুর দ্বারা রাজ্য পরিচালনার পরীক্ষা হইয়া গেছে। সেই পরীক্ষা নিষ্ফল হইয়া এক্ষণে রাজ্যের সঙ্কট অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

যে কারণে পূর্ব্ববর্ত্তী পরীক্ষাগুলি সফল হইতে পারে নাই তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

আমার বিবেচনায় তাহার প্রধান কারণ, রাজ্যশাসনের মধ্যে আদ্যোপান্ত অখন্ড সামঞ্জস্য ছিল না। শাসনতন্ত্রের মধ্যে আত্মবিরোধ ছিল। যাঁহারা কর্ণধার ছিলেন তাঁহারা একটি হাল ধরিয়া সমস্ত রাজ্য-ব্যাপারকে এক পথে এবং এক লক্ষ্যাভিমুখে চালনা করিবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং তাঁহাদের অবলম্বিত কর্ম্মনীতি বারম্বার বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। এইরূপ বিশৃঙ্খলতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে কোনো মতে উপস্থিত কাজ চালাইয়া যাওয়াই তাঁহারা যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন।

ইহার পরিণাম ভয়াবহ। এই বিভীষিকা হইতে রাজ্যকে রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে সমস্ত রাজ্য- ব্যাপারের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে--একটি অপ্রতিহত শাসনতন্ত্রে সমস্ত রাজ্যকে বাঁধিয়া তুলিতে হইবেই।

এমনস্থলে মহারাজের রাজক্ষমতাকে কোনো একটি কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত করিতেই হইবে। মহারাজ ইহার উত্তরে বলিতে পারেন "আমি ত বর্ত্তমান মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যচালনার স্বাধীন ভার অর্পন করিয়াছি।"

কিন্তু স্বাধীন ভার গ্রহণ করার যে প্রতিবন্ধক আছে তাহা দূর করিয়া দিতে হইবে। কি করিলে দূর হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমি সরলভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি--আশা করি মহারাজ আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

রাজ্যের মধ্যে দুইটি স্বাভাবিক ভাগ আছে। একটি মহারাজের স্বকীয়, আর একটি রাষ্ট্রগত। উভয়কে জড়ীভূত করিয়া রাখিলে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে---এই উপলক্ষ্যে প্রভূত অনিষ্ট উৎপন্ন হয়--এবং এই দুই বিভাগের সন্ধিস্থলে নানা প্রকার দুষ্ট চক্রান্তের অবকাশ থাকিয়া যায়।

যাহা মহারাজের স্বকীয়--অর্থাৎ সংসার বিভাগ, নিজ তহবিল, পরিচরবর্গ এবং মহারাজের ভ্রমণাদি ব্যাপার যাহার অন্তর্গত--তাহার উপরে মন্ত্রী বা আর কাহারো হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দেওয়া চলে না। এইজন্য মহারাজার স্বকীয় বিভাগকে মন্ত্রীর অধিকার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া মন্ত্রীর প্রতি রাষ্ট্রবিভাগের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করা আবশ্যক হইবে।

মহারাজের স্বকীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিভাগের সীমা যদি সুনির্দ্দিষ্ট হয় তবে মন্ত্রী তাঁহার বিভাগের অর্থ ও সামর্থ্যের পরিমাণ নিশ্চিতরূপে জানিয়া তদুপযোগী ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং মহারাজের আশ্রিত ও আশ্রয় প্রত্যাশীগণ রাষ্ট্রবিভাগকে নিজের স্বার্থ সাধনক্ষেত্র নহে নিশ্চয় জানিয়া সেদিক হইতে লুব্ধদৃষ্টি প্রত্যাখ্যান করিবে।

মহারাজের স্বকীয় বিভাগের ব্যয় পরিমাণ সম্পূর্ণ নিরূপণ করিয়া দিলে রাজস্বের অবশিষ্ট অংশদ্বারা মন্ত্রী ঋণশোধ ও রাষ্ট্রচালনার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন।

মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মহারাজা নিজের রাজক্ষমতার সঙ্কোচ করিতেছেন একথা যাহারা নানা কৌশলে ও নানা আভাসে মহারাজের মনে মুদ্রিত করিতেছে তাহারা স্বার্থান্বেষী ও মহারাজের শত্রুদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক। মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিজের নিয়মের দ্বারা নিজকে সংযত করাই

রাজোচিত---তাহাই রাজধর্ম্ম। মহারাজ রাজ্যের সমস্ত ভার যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে মন্ত্রীকে কেবলমাত্র মন্ত্রণাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া চলে--নতুবা তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ ভারার্পণ না করিলে কোনোমতেই রাজ্যের মঙ্গল হইবে না এবং রাজকার্য্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকিবে না। যখনি মন্ত্রীকে এই ভার গ্রহণের অনুপযুক্ত বোধ করিবেন সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে নিষ্কৃতি দান করিবেন--কিন্তু যতক্ষণ তিনি মহারাজের মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন ততদিন কোনোমতেই তাঁহাকে সাধারণের নিকট লেশমাত্র খর্ব্ব করিয়া নিজের সমুন্নত রাজপ্রতাপকে অবমানিত হইতে দিবেন না। ইহাতে কর্ম্মের বিঘ্ন হয় মর্য্যাদারও হানি ঘটে।

আমি সানুনয়ে মহারাজের নিকট নিবেদন করিতেছি যে অনুচরবর্গ নানা অবকাশে অনেক মিথ্যা, অনেক অর্দ্ধসত্য, অনেক অত্যুক্তি মহারাজের কর্ণগোচর করিয়া থাকে। এবং অনেক সময় অনেকে হিতৈষাবশতও মহারাজের নিকট রাজকার্য্যের সমালোচনা করিয়া থাকে। এই সকল আলোচনার ফল মনের মধ্যে গোপন রাখিবেন না। অথবা এই সকল অনধিকারচর্চ্চার প্রতি নির্ভর করিয়া অকস্মাৎ বিচলিত হইবেন না। ছোট বড় সকলপ্রকার সংশয়স্থলেই মন্ত্রীর বক্তব্য শুনিবেন--ক্ষুদ্রতম কন্টকটিকেও হৃদয়ের প্রান্ততম দেশে পোষণ করিবেন না। মন্ত্রীর সহিত মহারাজের সম্বন্ধ যদি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয় তবে কোনদিন তজ্জন্য অনুতাপ করিতে হইবে না।

কর্ম্মে ভুল করিবে না, এমন মানুষ নাই--রমণী*ও ভুল করিবেন। কিন্তু একেবারে ভুল করিতে না দিবার উপায়, কর্ম্ম করিতে না দেওয়া। অতএব সর্ব্বপ্রকার কপট ও অকপট সমালোচনার মধ্যেও মহারাজের চিত্ত যদি অচঞ্চল থাকে--যদি ক্ষণে ক্ষণে সংশয় সঙ্কোচ ও বিঘ্ন ব্যাঘাতের দ্বারা প্রতিহত হইতে না থাকে তবেই রাষ্ট্রীয় কর্ম্মসূত্র অবিছিন্ন থাকিয়া রাজ্যে উত্তরোত্তর কল্যাণ সঞ্চয় ও শৃঙ্খলা স্থাপন হইতে পারিবে।

যাহাই হৌক ঈশ্বরই মঙ্গল করিবার একমাত্র কর্ত্তা ইহাই একান্ত নিশ্চয় জানিয়া অনাবশ্যক আগ্রহাধিক্য হইতে চিত্তকে নির্ম্মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিব--আমার কোনো অধিকার নাই কোনো ক্ষমতাও নাই, মহারাজ ধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন এবং ধর্ম্মই মহারাজকে রক্ষা করিবেন।।

ওঁ

বিপুল সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন--

কলিকাতার জনতার মধ্যে আমি শরীরে মনে একেবারে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি এই কারণে মহারাজের নিকট অবসর প্রার্থনা করিয়া অদ্যই অপরাহ্নের মেলে আমি বোলপুরে ফিরিব স্থির করিয়াছি।

মহারাজের রাজ্যশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য গতকাল মুখে জানাইয়াছি।

কৌন্সিলের দ্বারা কোথাও কাজ চলে না। কৌন্সিলকে সহায়স্বরূপ করিয়া একজন কর্ত্তা কাজ করিয়া থাকেন। কিন্তু সে স্থলেও কৌন্সিলের সদস্যগণকে নিস্বার্থ হিতৈষিতার সহিত অধিনায়কের বাধ্যতা স্বীকার করিতে হয়। নচেৎ কূট চক্রান্ত পরস্পর বিরোধ ও উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা থাকে না। মহারাজের বর্ত্তমান পারিষদবর্গের প্রতি মহারাজের কি যথার্থ শ্রদ্ধা আছে? ইহারা কি এতবড় দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য? ইহাদের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া কি মহারাজের মঙ্গল হইবে ? মহারাজ নিয়ত প্রশ্রয় দিয়া ইহাদের বলবৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন, কোথায় ধীরে ধীরে সেই বল খর্ব্ব করিবেন, নিজেকে স্বার্থপর দীনচরিত্র ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তিদের জাল হইতে মুক্ত করিবেন, না, রাজ্যশাসনভার ইহাদের হাতে সমর্পণ করিয়া ইহাদের প্রলয়-শক্তিকে দুর্জয় করিয়া তুলিবেন?

ম্যাক্‌মিন সাহেবকে(১) শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করা আর এক প্রস্তাব। আমার নিকট ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। ম্যাক্‌মিন কর্ত্তৃপক্ষদিগকে শান্ত করিতে পারিবেন--কিন্তু চিরদিন তাঁহাকে পাইবেন না---এমন স্থায়ী ব্যবস্থা করিতেই হইবে যাহাতে শাসনকার্য্যে কোনো ত্রুটি না

*তৎকালীন রাজমন্ত্রী

(১) মহারাজের জমিদারী চাকলা রোশনাবাদের ম্যানেজার (চট্টগ্রাম বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার) মিঃ সি. ডব্লিউ ম্যাক্‌মিন্, আই. সি. এস্।

থাকে, যাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অপদস্থ হইবার কোনো আশঙ্কা মাত্র না ঘটে। যদি নিজেকে নিরাপদ জ্ঞান করিয়া কখনো নিশ্চিন্ত থাকেন তবে বিপদ তখনি ঘনীভূত হইয়া উঠিবে। মহারাজের নিকট আমার সানুনয় প্রার্থনা এই যে ত্রিপুরা রাজ্যকে চিরদিনের মত দায়গ্রস্ত ও পঙ্গু হইতে দিবেন না। এখন ইহাকে কঠোর ব্যবস্থায় খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে। মহারাজের চারিদিকে যাহারা রহিয়াছে তাহারা মহারাজের মঙ্গল লইয়া খেলা করিতেছে--- তাহারা তাড়াতাড়ি, রাজ্যের পতনের পূর্ব্বেই নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে আমার এই বিশ্বাস। এ বিশ্বাস যদি মিথ্যা হয় তবে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু যেমন করিয়াই হৌক ইহারা কোনোপ্রকার গুরুতর দায়িত্ব লইবার যোগ্য নহে--- কারণ ইহারা লঘু-চরিত্রের লোক--- ইহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকিতে পারে কিন্তু বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য নাই---এইজন্যই আমি মহারাজকে অনুনয় করিতেছি ইহাদের হাতে নিজেকে ধরা দিয়া অনুতাপের কারণ ঘটাইবেন না। বন্ধন রচনা করা সহজ, ছেদন করা অত্যন্ত কঠিন। এখন যদি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া না দেখেন পরে আর সময় পাইবেন না।

রমণীর(১) দ্বারা মহারাজের কার্য্যসাধন হইবে কি না জানি না---তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে কি না তাহাও বলিতে পারি না---তাহার সম্বন্ধে যেমনি ব্যবস্থা হউক তাহাতে কোনো অসুবিধা হইবে না। কিন্তু যে করিয়া হউক একজন সক্ষম ধর্ম্মভীরু মহারাজের একান্ত হিতৈষী ব্যক্তির আবশ্যক---তাহাকেই সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া রাজ্য চালনা করিতে হইবে। এমন লোকের প্রয়োজন যে ব্যক্তি রাজ্যের শত্রুদের সহিত বা কোনোপ্রকার স্থানীয় দলের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বলের সহিত কাজ করিয়া যাইতে পারিবে---যাহাদিগকে দলন করা আবশ্যক তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে দলিত করিতে পারিবে। আমি মহারাজকে অত্যন্ত সরলভাবে এবং ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া এই সকল কথা বলিলাম। যদি কোনো কথা রূঢ় হইয়া থাকে মহারাজ ক্ষমা করিবেন। আমি আমার সংসারের সমস্ত জালবন্ধন ছিন্ন করিয়া নিষ্কৃতিলাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি---মহারাজের সহিত তিনিই আমার সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন, এই সম্বন্ধের দ্বারা আমার সাধ্যমত মঙ্গল সাধন না হইলে আমার ক্ষমা নাই এইজন্যই আজ আমি মহারাজের পারিষদবর্গের আলোচনার বিষয় হইয়াও এই সমস্ত জটিল ব্যাপারের মধ্যে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়াছি। মহারাজকে সকল কথা জানাইবার অবকাশ পাই না---আজ পত্রে নিবেদন করিলাম। এক্ষণে ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রায় তাহাই সিদ্ধ হইবে। আমি কেবল মহারাজের মঙ্গল কামনা করিতে পারি তাহার অধিক আমার ক্ষমতা নাই। মহারাজের স্নেহঋণে আমি বদ্ধ, তাহা আমি কোনোদিন বিস্মৃত হইতে পারিব না। এক্ষণে মহারাজ অনুমতি করুন আমি আমার কর্ম্মস্থানে গমন করিয়া শান্তিলাভের সাধনা করি। ঈশ্বর মহারাজের নিয়ত কল্যাণ করুন। ইতি ১৪ই পৌষ ১৩১৩

একান্ত অনুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগ্রহ---শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

(১) রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য লিখিত পত্রাবলী

শ্রীহরিঃ

প্রিয় রবীবাবু !

শ্রীমান মহিমের(১) পত্রে আপনার দার্জ্জিলিং যাওয়ার সংবাদে প্রীত হইলাম। বিখ্যাত হিমালয়ে আপনাকে পাইলে তথাকার কয়েকদিনের বাস আমার পক্ষে যে কত সুখের হইবে বলিতে পারি না। কলিকাতার নানা অন্তরায় উচ্চ হিমশৃঙ্গে না থাকারই কথা ।

সেখানে দুইটী বাড়ী নিয়াছি একটি Wood Vine Villa আর একটি Lounge: আমি ৬ই আশ্বিন বাড়ী ছাড়িব এবং ৮ই তথায় পৌছিব। ৭ই কুষ্টিয়ায় চট্টগ্রাম মেইলে পৌছিবার কথা । ঐ সময় আপনার সঙ্গে কি সাক্ষাৎ হইতে পারিবে!

আমরা ভাল আছি। মহর্ষির নিকট আমার প্রণাম জানাইবেন। দার্জ্জিলিং যাইয়া তাঁহার সকাশে পত্র লিখিব। ইতি সন ১৩০৯ ত্রিং, ২রা আশ্বিন।

আপনার চিরন্তন
শ্রীরাধাকিশোর দেববর্ম্মা

শ্রীহরিঃ

প্রিয় রবিবাবু !

শ্রীমান যুবরাজের(২) বিবাহ ৮ই ফাল্গুন সম্পন্ন করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু হঠাৎ এখানে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় আগামী ২৪শে ফাল্গুন উক্ত শুভকার্য্য সম্পাদন করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমার ইচ্ছা ছিল আগামী শীত ঋতুতে সময় নিরূপণ করি কিন্তু পাত্রীপক্ষ 'ফলদানের' পর আর অপেক্ষা করিতে নারাজ। বিগত ৩রা 'ফলদান' ও 'ফলগ্রহণ' কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। মনে করিয়াছিলাম এ শুভ ব্যাপারে বিদেশীয় ভদ্রলোকগণকে নিমন্ত্রণাদি করিয়া সুখী হই কিন্তু বর্ত্তমান সময় ক্রমশঃ গরম পড়িতেছে বিধায় পাছে তাঁহাদের কষ্টের কারণ হয় ভাবিয়া দুঃখের সহিত বিরত হইলাম। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁহাদের পাইলে এ শুভ ব্যাপার আনন্দে সম্পন্ন হয় তাঁহাদের কয়েকজনকে পাইলেই সুখী হইতে পারি। তাই আপনি, জ্যোতি বাবু(৩), গগনবাবু (৪),আশুবাবু (৫) ও যদি সুবিধা থাকে জগদীশবাবুকে (৬) এখানে দেখিতে ইচ্ছা করি। জগদীশবাবুর বিজ্ঞানশালা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আমার স্মরণ আছে। ভরসা করি উপরি উক্ত শুভ ব্যাপারে আপনি ত নিশ্চয়ই আসিবেন; সেই সময় আলাপ করিয়া যাহা সাব্যস্ত হয় সেরূপ করিতে প্রস্তুত রহিলাম। জগদীশ্বর সমীপে যাচিঞা করি জগদীশবাবু দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া ভারতের মহিমা বৃদ্ধি করুন।

জ্যোতিবাবু প্রভৃতির নিকট পৃথক পত্র লিখিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিশ্চয়ই আসিতে পারিবেন তাঁহাদিগকে একটু আগে জানাইতে পারিলে বড় সুবিধা হয়।

কাহিনী গ্রন্থের সহিত আমাব নাম সংস্রব (১) রাখিতে আপনি ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহাতে আমার অমত হইতে পারে কি? ছাপা হইবামাত্র ১০/১২ কপি পাঠাইয়া সুখী করিবেন ।এখানকার বন্ধুবান্ধবদিগকে বিতরণ করিব।

---

(১) রাজ্যপারিষদ কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা
(২) যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর
(৩) জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর
(৪) গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৫) আশুতোষ চৌধুরী
(৬) আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু
(৭) 'কাহিনী' কাব্যের উৎসর্গীকরণ সম্বন্ধে।

আমি সপরিবারে ভাল আছি। আপনাদের কুশল সংবাদ পাইলে সুখী হইব। ইতি সন ১৩০৯ ত্রিং ১৫ই ফাল্গুন।

নিয়ত আপনার
শ্রীরাধাকিশোর

পুনশ্চ---

পত্রখানা তাড়াতাড়ি লিখিলাম। বড় ব্যস্ত আছি।

রাধাকিশোর বর্ম্মা।

শ্রীহরিঃ

প্রিয় রবিবাবু !

গত বিবাহ ব্যাপারে বড় ব্যস্ত ছিলাম। এক্ষণে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। আপনার পুত্রটির হঠাৎ অসুস্থতার দরুন আপনি বিবাহ উৎসবে উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত আছি। যাহা হৌক শ্রীমানের সুস্থ সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

শীকার ব্যপদেশে বনে যাইয়া একটু নির্জ্জন বিশ্রাম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, ঝড় শিলাবৃষ্টির এমনই প্রকোপ যে ভিজিয়া ভিজিয়া বাড়ী ফিরিতে হইয়াছিল। তাই আপনাকে এতদিন লিখিতে পারি নাই। এত বড় বড় শিলাবৃষ্টি আমি আর কখনও দেখি নাই !! কোন কোনটি অন্ততঃ এক পোওয়ারও বেশী হইবে !!

পন্ডিত মহাশয়ের(১) যোগে আপনার বস্ত্রোপহার পাইয়াছি। বস্ত্রখানা শ্রীমতী বধূমার উপযুক্তই হইয়াছে। আপনার আশীর্ব্বাদস্বরূপ শ্রীমতী বধূমাকে দিয়াছি। ইহা শ্রীমতীর ব্যবহারে লাগিয়াছে।

মহিম আপনার নাম করিয়া ছুটি পাইবার ফিকিরে আছে। তাহার সম্বন্ধে আপনার হুকুম কি ? আমারও ইচ্ছা একবার তাহাকে আপনার সদনে পাঠাই । পাছে উৎপাত না জন্মায়। কিন্তু মাঝে মাঝে একটু অশান্তি ভাল লাগে বইকি!! আপনার অনুকূল উত্তর পাইলেই সে 'পাঁচ-হাতিয়ার'(২) বাঁধিতে পারে।

এখানে বেশ প্রকৃতি অনুকূল গরমের পর এক্ষণে আরাম বোধ করিতেছি। আপনাদের ওখানে এখন কেমন? আপনার সপরিবারের মঙ্গলসমাচার পাইতে অভিলাষ করি। ইতি সন ১৩০৯ ত্রিং ১১ই চৈত্র।

আপনার
শ্রীরাধাকিশোর বর্ম্মা।

শ্রীহরিঃ

প্রিয় রবীবাবু !

ক্রমে আপনার দুইখানা পত্র পাইয়াছি। প্রথম পত্র সহ 'কাহিনী' পাইয়া সাগ্রহে পাঠ আরম্ভ করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত অর্দ্ধেকের বেশী অগ্রসর হইতে পারি নাই। সলিতামামি নিকটবর্ত্তী কি না! আর তাড়াতাড়িতে বই পড়া হয় না তার সমস্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হয়। অন্ততঃ আমার এই স্বভাব।

বন্ধুত্বের খাতিরেই যে একটা অযথা প্রশংসা করিতে হইবে ইহার অর্থ কি? বাস্তবিক কবিতার গাম্ভীর্য্য রক্ষা বিষয়ে আপনি সিদ্ধহস্ত। অথবা ইহা আপনার স্বাভাবিক শক্তির নৈপুণ্য। এই গাম্ভীর্য্যের সহিত মধুরভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া পুলকিত হইয়াছি। নায়কনায়িকার পদোচিত ভাব ও ভাষা অতি পরিপাটি হইয়াছে। পৌরাণিক প্রস্তাব প্রসঙ্গাদি অবলম্বন করিয়া আধুনিক সময়ে যে কয়খানি কাব্যাদি রচিত হইয়াছে

(১) পন্ডিত বৈকুণ্ঠ বাচস্পতি।

(২) পাঁচ হাতিয়ার---ক্যামেরা, বন্দুক ইত্যাদি।

সেগুলিতে প্রায় উক্ত পদোচিত সম্মান ও গাম্ভীর্য্য রক্ষার্থে ভাষা ও ভাবের বিশেষ কোন নৈপুণ্য দেখিতে পাই না। আপনার গ্রন্থসকল সে দোষ বর্জ্জিত। আমার বিশ্বাস ঐ সকল যথাযথ রক্ষিত হইলেই গ্রন্থের জীবন্যাস করা হইল।

মহিম শীঘ্রই আপনার হুকুম তামিল করিবে। এখানে কিছুদিন শান্তি দিয়া সে আপনাদের সজাগ সঞ্চালন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সঙ্গে ক্যামেরা, বন্দুক ইত্যাদি আরো কি কি আছে। ইংরেজ গোরা সিপাইদের ন্যায় মানুষ না শিকার করে এই ভয়। তাহাকে বন্দুক ব্যবহার করিতে না দেওয়াই ভাল নয় কি? আর এক কথা শুনিতে পাই। মহিম নাকি গান টান এমনি কিছু রচনা করে। তাহার ঐ সকল রচনা একবার মাত্র দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। শ্রীমান মহিমচন্দ্র নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়া সেগুলি দেখিতে দিতেছে না। সেগুলি আপনি উশুল করিতে পারেন না কি? আরো শুনিতে পাই যক্ষে ভর না করিলে তাহার রচনা ভাল আসে না। বেচারী সঙ্গ দোষে মাঠে মারা যাইবার পথে দাঁড়াইয়াছে !!!

এখানে যথারীতি ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এবার বোধ হয় বর্ষার ঘোটকে আগমন। ফল কি হয় বলিতে পারি না। কিন্তু ছোট ছোট আম্রগুলির দফা রফা হইয়াছে। চাটনী বা টক্ খাইবারও রহিল না!! বড় আপসোষ্ !!!

আমরা ভাল আছি।

আপনি সপরিবারে কেমন আছেন ? প্লেগ নাকি চারিদিকে ছিটিয়া পড়িতেছে। তজ্জন্য চিন্তিত আছি। ইতি সন ১৩০৯, ২১শে চৈত্র।

গুণানুরাগী
শ্রীরাধাকিশোর বর্ম্মা।

শ্রীহরিঃ

প্রিয় রবীবাবু !

আপনার দুখানা পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া এ পর্য্যন্ত একখানিও লিখিতে পারি নাই। সেজন্য দুঃখিত আছি।

যতীন্দ্রবাবুকে(১) দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত আলাপে সুখী হইয়াছি। আপনি যখন স্বয়ং বাছনি করিয়া শ্রীমান ও শ্রীমতীর(২) জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন তখন আমার আর কি বলিবার আছে। যতী ও তাহার স্ত্রীতে মিলিয়া একই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থাকিলে আশানুরূপ ফল প্রত্যাশা করা যায়। যতীন্দ্রবাবু চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত শেষ আলাপ হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় শীঘ্রই সস্ত্রীক ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহাদের বাসার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আসিবামাত্রই তাঁহার কার্য্যারম্ভ হইবে।

জগদীশবাবুর কথা আমার স্মরণ আছে। তাঁর বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বকথিত সাহায্য করিব। জগদীশবাবুর সহিত এ বিষয়ে কোনও আলাপ হয় নাই। অতএব আপনার বরাবরে মণিঅর্ডার করিতে ইচ্ছা করি। আর বোধ হয় ইহাই সুবিধা হইবে।

অধ্যাপক বসুর নূতন তত্ত্বালোচনার বিষয় মহিমের প্রমুখাৎ কতক বুঝিতে পারিয়াছি। এবং তাঁর প্রেরিত একটি ক্ষুদ্র যন্ত্রেও কতক আবাস পাইয়াছি। মহিমের ভাষায় এবং তাহার ব্যাখ্যায় ইহার স্পৃহা কি পূর্ণ হয়?

একবার দার্জ্জিলিং অঞ্চলে যাইতে ইচ্ছা করি। ভয়, পাছে সেবারকার মত পথে বিচিকিচ্ছে বাধা না পাই। একটা দিন স্থির হইলে অবশ্য আপনাকে লিখিব।

মহিমের নেওয়া এবারকার ছবিগুলি মন্দ হয় নাই। সেগুলি এক এক প্রস্ত ছাপাইয়া পাঠাইয়া দিতেছি। মহিম আপনার ওখান হইতে আসিয়া বাকি অত্যাচারগুলি এখানে পুরাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আরো

(১) যতীন্দ্রনাথ বসু একসময়ে মহারাজের একান্ত সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যুবরাজের সহযোগী শিক্ষকরূপে প্রথম নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কবির 'সাহিত্যের সঙ্গী অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের জামাতা ছিলেন।

(২) শ্রীমান ও শ্রীমতী---যুবরাজ এবং যুবরাজ্ঞী।

কিছুদিন তাহাকে ধরিয়া রাখিলে ভালই হইত।

আমরা ভাল আছি। আপনারা ভরসা করি ভাল আছেন। ইতি সন ১৩১০ ত্রিং ১৪ই বৈশাখ।

আপনার চিরন্তন
শ্রীরাধাকিশোর বৰ্ম্মা।

শ্রীহরিঃ

প্রিয় রবীবাবু,

আমি এখানে কয়েকদিনের জন্য শ্রীমান যুবরাজকে সহ বাস করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে নানা কারণে ব্যস্ত ছিলাম। পত্র লিখিতে পারি নাই।

শ্রীমতী বধূর শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যতীর শাশুড়ী (১) ও পরিবারকে বেশ উৎসাহী দেখিলাম। ভরসা করি ইহাদের দ্বারা উত্তম ফল লাভ হইবে। এমন ভদ্রপ্রকৃতি এবং বুদ্ধিমতী মহিলাদের উপর বধূর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া অবশ্য নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

ইতিমধ্যে এই দুইদিনের তরে পরিজনদিগকে দেখা দিবার নিমিত্ত বাড়ী গিয়াছিলাম। দেখিলাম যতীর শাশুড়ী ও উমারাণী (২) বধূর সঙ্গে বেশ ভাব করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মাঝে আর কোন প্রতিবন্ধক বা অসুবিধা দেখিলাম না। আপনি ইতিমধ্যে যদি কখন এ অঞ্চলে আসেন দেখিয়া শুনিয়া যাইতে পারিবেন।

যতীর নিকট আপনার একখানা পত্র দেখিয়াছি। শ্রীমানের উন্নতিকল্পে আপনি যেরূপ বিশদভাবে শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে আপনার ঐকান্তিকতা প্রতিফলিত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। বন্ধুরূপে যিনি এমন সহৃদয়তা দেখাইতে পারেন জগতে তাঁহার মত বন্ধু দুর্ল্লভ। আপনার ন্যায় বন্ধুর অবিশ্রান্ত সহায়তার সহিত যতী ও তাঁহার পরিবারকে এসময়ে এইভাবে পাওয়া বাস্তবিক চিরস্মরণীয়। আপনার উপদেশগুলি যাহাতে যথাযথ প্রতিপালিত হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীমান যতীবাবুকে সাহায্য করিব। এখানে আর কিছুকাল থাকিয়া বাড়ী যাইতেছি। তখন দৈনিক তাঁহাদিগকে দেখিতে পারিব।

আমরা ভাল আছি। আপনাদের কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিবেন। ইতি--১৩ই ভাদ্র, ১৩১০।

আপনার চিরন্তন
শ্রীরাধাকিশোর বৰ্ম্মা।

শ্রীহরিঃ

প্রিয় রবীবাবু,

আপনার পত্র পাঠে আপনি দার্জ্জিলিং যাইতে ইচ্ছুক আছেন জানিতে পারিয়া বড় সুখী হইলাম। অনেক দিনের পর এখানকার ঝঞ্ঝাটগুলি এক প্রকার সুবিধা করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছি। এক্ষণে কিছুদিনের জন্য যথাসাধ্য বিশ্রাম লাভের চেষ্টায় আছি। হিমালয়ের মহান্ সৌন্দর্য্যের সহিত আপনার কবিতা ও সঙ্গীত সংযোগে আমার অবসরকালের বিশ্রাম কত যে মধুময় হইবে তাহাই ভাবিয়া উৎসাহিত আছি। আপনার কবিতার খাতা ও দুই একখানা বই সঙ্গে লইবেন। আমিও দু'চারখানা সঙ্গে আনিতেছি। যাহা

(১) কবি অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিতা শরৎকুমারী চৌধুরাণী। আমিষ ও নিরামিষ আহার, শুভবিবাহ ইত্যাদি গ্রন্থ রচয়িত্রী।

(২) উমারাণী---যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্নী।

হৌক এক্ষণে গৃহিনী ঠাকুরাণী(১)আপনার আরজ মঞ্জুর করিলেই হয়। নতুবা মহিম বলা নাই কহা নাই হঠাৎ 'অনধিকার প্রবেশ' করিয়া বগলে পুরিবার চেষ্টা করিতে পারে। ২৩শে তারিখ সোমবার এখান হইতে যাত্রা করিব। মঙ্গলবার বিকালবেলা অনুমান ৪।।টার সময় কুষ্টিয়া ষ্টেশনে পৌছিব। তথা হইতে আমরা একত্রে যাইতে পারি। দার্জ্জিলিংএ আমাদের জন্য যে বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সকলেরই সঙ্কুলন হইবে।

বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রকাশের সংবাদ অতি সুসংবাদ। প্রসিদ্ধ লেখকদের উৎসাহ আরো সুসংবাদ। আমার মতে আপনি অগৌণে এবং অবিচারিত চিত্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করুন এবং আমাকে কি কি করিতে হইবে বলুন। আমি সর্ব্বতোভাবে ইহার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।

যতীর পত্রে জানিলাম চৌধুরাণীর(২) সহিত আপনার ভারি হাঁকাহাঁকি কুন্দল গিয়াছে? সে কেলেঙ্কার আবার আমার পত্র উপলক্ষ্য করিয়া? কিন্তু স্মরণ রাখিবেন উনি আমাদের মধ্যস্থ! মধ্যস্থকে চটাইলে বন্ধু বিচ্ছেদের আশঙ্কা উপস্থিত হওয়া বড় একটা বিচিত্র হইবে না।

পলিটিকেল এজেন্টের পরামর্শে মহিম ও যতীকে তাড়াতাড়ি আজমীর পাঠাইলাম না। ভালই হইয়াছে। আপনার সহিত পরামর্শ করিবার সুবিধা পাইয়াছি।

এখানে পুনঃ পুনঃ শিলাবৃষ্টিপাত হইতেছে! বাড়ীর চারিদিকে কেবলই ইঁট, সুরকি, রাবিশ, কাদা! বড় উত্যক্ত আছি।

আমরা ভাল আছি। ভরসা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন। ইতি—১৪ই বৈশাখ, ১৩১১ ত্রিং।

আপনার চিরন্তন
শ্রীরাধাকিশোর বর্ম্মা

শ্রীহরিঃ

প্রিয় রবীবাবু!

আপনার কুষ্টিয়ার পত্রখানা পাইয়াছি। তৎপাঠে আপনার নিরাময় সংবাদ অবগত হইয়া সুখী হইলাম। পাছে আপনার অসুখের দরুন গৃহিণীর নিকট অনুযুক্ত হইতে না হয় তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম কিন্তু দেখিতেছি আপনার বিরহ কালের আবদারটী সুদ সমেত আদায়ের সুবিধা পাইয়াছেন ইহা আমার আনন্দের বিষয় বটে।

বিস্তার কিছু লিখিতে পারিলাম না। আবার আজ তিনটার সময় L.G. র(৩) সহিত দেখা হইবে। ছেলের শিক্ষা বিষয়ে আপনার ও কুচবিহারে মহারাজের(৪) মতই L.G. গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইয়াছিল। তিনি কুচবিহারের কোন ভাল একজন ইংরাজ টিউটার নিযুক্তের জন্য পরামর্শ দিতেছেন। তদনুসারে কুচবিহারের মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিয়াছি। বোধ হয় তিনি বিলাতে শীঘ্রই চিঠি লিখিবেন।

আপনার উদ্‌যোগে উক্ত মহারাজের সহিত আমার দেখাসাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে।

L.G. র সহিত রাজকীয় বিষয়ে আলাপের ফল ভালই হইয়াছে। বর্ত্তমান L.G. বড় অমায়িক এবং রাজজনোচিত বহুদর্শী বটে। আজও আমাদের অনুকূলেই আলাপ ও তৎফল ভাল হইবে এরূপ ভরসা করি।

---

(১) কবির পত্নী মৃণালিনী দেবী।
(২) যতীন্দ্রনাথ বসুর শাশুড়ী শরৎকুমারী চৌধুরাণী।
(৩) Lieutenant Governor.
(৪) কুচবিহারাধিপতি মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর।

আমি আগামীকাল বাড়ী ফিরিতেছি। কুষ্টিয়াতে আপনার দর্শন পাইলে সুখী হইব। এই পত্র পাইবার পূর্ব্বে আমার টেলি-ই বা পান তাহা অসম্ভব নহে। কিন্তু আমার পরামর্শ আপনি একটু সাবধান থাকেন। বিবাহ নিকটবর্ত্তী। আপনার কোন শারীরিক অসুখ না করে।

যতী আপনাকে যত্ন করায় আমার সন্তোষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ছেলেমানুষ তাহার অত্যাচার কতক সহ্য করিতেই হয়।

মহিমটাকে এখানে ছাড়িয়া গেলাম। সে পরে আসিবে। অথবা আনাইতে হইবে। বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে লিখিবেন।

আমরা ভাল আছি। বাড়ী পৌছিয়াই যেন আপনার পত্র পাই। আমিও লিখিব।

চিরন্তন
শ্রীরাধাকিশোর বর্ম্মা

পুনশ্চ---

যতীর পত্র গতপরশু পাইয়াছি। তাহারা ভাল আছে। এ পত্রে অনেক কথাই ছিল।

শ্রীহরিঃ

প্রিয় রবীবাবু!

আমার আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও শ্রীমতী বেলার(১) বিবাহে উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না! দার্জ্জিলিং হইতে আসিয়াই মহারাণীর চিকিৎসাকার্য্যে ব্যস্ত আছি। আমারও শরীর তত ভাল নহে, আজ ৪।৫ দিবস যাবৎ গলায় বেদনা হইয়া কতক অসুবিধা ভোগ করিতেছি।

শ্রীমান মহিমকে শুভবিবাহ ব্যাপারে পাঠাইতেছি, সে আমার হইয়া উক্ত কার্য্যে যোগদান করিবে। তাহাকে আপনি চালাইয়া লইবেন।

এই শুভ ব্যাপার সমাধা হইলে সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবেন। আর কি লিখিব---আপন প্রিয়তর সন্তানের জন্য ভগবানের নিকট লোকে যেরূপ মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন আমিও উক্ত নব দম্পতির জন্য তাহাই করিতেছি। ইতি--২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১।

আপনার চিরন্তন
শ্রীরাধাকিশোর বর্ম্মা

পুনশ্চ--

ইতিমধ্যে স্বনামখ্যাত প্রফেসার শ্রীযুক্ত জগদীশবাবুর দুইখানা পত্র পাইয়াছি। তাঁহার আবিষ্কার চমৎকার। 'জড়ের অনুভব শক্তি'! তাঁহার বক্তৃতা ইলেকট্রিসিয়ানে দেখিয়াছি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যকে লিখিত পত্র

(অপ্রকাশিত)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বহুমানভাজনেষু,

মহারাজ, আপনার পত্রে নবীনকর্ত্তার(২) মৃত্যু সংবাদ পাইয়া ব্যথিত হইলাম। শোকার্ত্ত স্বজনগণের মনে ভগবান সান্ত্বনা বিধান করুন এই কামনা করি।

(১) কবিকন্যা মাধুরীলতা।
(২) ত্রিপুরার রাজকুমার নবীনকিশোর দেববর্ম্মা।

অবকাশমত কোনো এক সময়ে মহারাজ আশ্রম দর্শন করিতে আসিবেন মনে এই আশা রহিল। ইতি--১৩ই মাঘ, ১৩২৬।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগ্রহ---শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বহুমানভাজনেষু,

মহারাজ, বুদ্ধিমন্ত সিংহকে (১) আশ্রমে পাঠাইয়াছেন সেজন্য আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। ছেলেরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার নিকট নাচ শিখিতেছে। আমাদের মেয়েরাও নাচ ও মণিপুরী শিল্প কার্য্য শিখিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছে। মহারাজ যদি বুদ্ধিমন্ত সিংহের স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবার আদেশ দেন তবে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। আমাদের দেশের ভদ্রঘরের মেয়েরা কাপড়বোনা প্রভৃতি কাজ নিজের হাতে করিতে অভ্যাস করে ইহাই আমাদের ইচ্ছা । এইজন্য আসাম হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী এখানকার মেয়েদের তাঁতের কাজ শিখাইতেছে। কিন্তু শিলেটে আমি মণিপুরী মেয়েদের যে কাজ দেখিয়াছি তাহা ইহার চেয়ে ভাল। আমি বুদ্ধিমন্তের নিকট আমার প্রস্তাব জানাইয়াছি। সে মহারাজের সম্মতি পাইলেই তাহার স্ত্রীকে আনাইয়া এখানকার মহিলাদিগকে মণিপুরী নাচ ও শিল্পকার্য্য শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে এরূপ বলিয়াছে। এইজন্য এসম্বন্ধে মহারাজের সম্মতি ও আদেশের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ভগবান আপনার কল্যাণ করুন এই কামনা করি। ইতি--১৯শে মাঘ, ১৩২৬।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোরকে লিখিত

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

আমার শরীর ভাল নাই। কুমিল্লায় তোমাকে প্রবেশ করান হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ইহা যে তোমার পক্ষে কষ্টকর হইবে তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এই বিজাতীয় বর্ব্বরগুলার অশিষ্ট ঔদ্ধত্য এবং কদর্য্য আচার অত্যন্ত পীড়াদায়ক। বিশেষতঃ তাহারা আমাদিগকে চায় না আমাদিগকে অবজ্ঞা করে, অথচ আমরা তাহাদের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াই ইহাই আমাদের পক্ষে অবমানকর। আমাদের সমস্ত জাতিকে যাহারা ঘৃণা করে আমাকে তাহারা সম্মান করিবে কি করিয়া, এবং করিলেই বা তাহা আমি গ্রহণ করিব কেন? অপমানিত জাতির পক্ষে এই সাহেবের সোহাগ লইবার চেষ্টা--এমন লজ্জাকর দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না। যাহা হউক তুমি সহ্য করিয়া থাক---এবং মনে মনে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কর---এরূপ হইলে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তুমি নিজের তেজ রক্ষা করিতে পারিবে। যাহা শিখিবার তাহা শিক্ষা কর, যাহা দেখিবার তাহা চুপ করিয়া দেখ এবং যাহা মনে রাখিবার তাহা চিরদিন মনে পোষণ করিয়া রাখ। ঈশ্বর তোমাকে বিজাতির মোহ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ইতি--শুক্রবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১) আগরতলা নিবাসী মণিপুরী নৃত্য ও কারুশিল্পী বুদ্ধিমন্ত সিংহ রাজকুমার।

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার অধ্যয়নের সুব্যবস্থার জন্য আমার পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। শুনিলাম সম্প্রতি ত্রিপুরায় একটা গোলযোগ বাঁধিয়াছে--সেইজন্য আমি এ সময়ে মহারাজের কাছে কোন প্রস্তাব করিলাম না। যতীকে (১) বলিয়া দিবে সেখানকার বিপ্লব শান্তি হইলে আমাকে যেন সংবাদ দেয়। মহারাজ যদি বা আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হন তথাপি পারিষদবর্গ যদি সম্মান ও ব্যয়বাহুল্যের দোহাই দিয়া আপত্তি প্রকাশ করে তবে কি দাঁড়াইবে বলা কঠিন। এরূপ অবস্থায় কোনপ্রকার সদভিপ্রায় সাধন প্রায় অসাধ্য বলিয়া আমার মনে এক এক সময় নৈরাশ্য উপস্থিত হয়--এবং ঐশ্বর্য্যশালীদের দ্বার হইতে বহুদূরে থাকিয়া যথাসাধ্য নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে ইচ্ছা বোধ করি। লক্ষ্মীমান পুরুষেরা নিজে মহদাশয় হইলেও ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তিদের দ্বারা এমন পরিবেষ্টিত যে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদের শুভ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহাদিগকে পৃথিবীর শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত করা অসম্ভব। ইতি--১৮ই শ্রাবণ, ১৩০৮

শুভার্থী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। কাল শান্তিনিকেতনে আসিয়াছি--কলিকাতা হইতে সর্দ্দিকাশি সঙ্গে আনিয়াছি--এখানে আসিয়া আরোগ্যলাভ করিতে বিলম্ব হইবে না আশা করিতেছি। মহারাজকে পত্র লিখিয়াছি--তোমার এখানে আসিতে কোন বাধা হইবে না বলিয়াই ভরসা করি। রথী তোমার জন্য আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। আসিবার সময় তোমার যন্ত্রাদি অর্থাৎ carpentry, fretwork প্রভৃতির হাতিয়ার সঙ্গে আনিয়ো। বাইসিকল্ ও ঘরে পড়িবার বই প্রভৃতিও আনিতে পার। আমরা একজন সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত করিতেছি তিনি সর্ব্বপ্রকার হাতের কাজে সুনিপুণ--তিনি ফটোগ্রাফি প্রভৃতিও ভাল জানেন। তুমি আসিলেই* আমি বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করিয়া দিব। অগ্রহায়ণ মাস উত্তীর্ণ হইতে দিয়ো না। আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি--১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

যে অবস্থায়, যে সঙ্গে, যে শিক্ষার মধ্যে পতিত হও না কেন, ভারতবর্ষের আদর্শকে কোনমতেই হৃদয় হইতে ম্লান হইতে দিয়ো না। ইহা নিশ্চয় মনে রাখিয়ো য়ুরোপীয় বর্ব্বরেরা ভারতবর্ষের যথার্থ মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করে। সে উপহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়ো। তোমার শিক্ষক যদি ভারতবর্ষকে নিন্দা করে তুমি সে নিন্দাকে নিরুত্তরে অবজ্ঞা করিয়ো। আমার বিদ্যালয়ে তোমার হয়ত না আসাই

(১) যতীন্দ্রনাথ বসু--যুবরাজের সহযোগী শিক্ষক এবং একান্ত সচিব।

*শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাক্রমে ছাত্ররূপে মহারাজকুমারের যাওয়ার কথা ছিল।

ভাল। কারণ আমি নিভৃতে লোকের আলোচনার বাহিরে আমার কাজ করিতে চাই। তুমি এখানে আসিলে অজস্র কথার সৃষ্টি হইয়া হট্টগোলের মধ্যে পড়িতে হইবে; তাহাতে আমার কাজের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জ্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্ম্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই--তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাহিরে না হৌক অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর। মনে দৃঢ়রূপে জান যে, দারিদ্র্যের অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি আস্‌বাবের অভাবে লেশমাত্র অসভ্যতা নাই। যাহারা ধনসম্পদ বাণিজ্য ব্যবসায় আসবাব আয়োজনের প্রাচুর্য্য যে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে তাহারা বর্ব্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্দ্ধা করে। শান্তিতে, সন্তোষে, মঙ্গলে, ক্ষমায়, জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমত সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধনমুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও। তুমি মুখে কোন বাদ প্রতিবাদ করিয়া অনর্থক সংঘর্ষে বল নষ্ট করিয়ো না--স্তব্ধমৌনভাবে অটল নিষ্ঠার সহিত ভারতবর্ষের নিকট একান্তচিত্তে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কর। তোমার বর্ত্তমান শিক্ষা ও সঙ্গ এই ভাবের প্রতিকূল বলিয়াই এই বিরোধের সংঘাতে তোমার দৃঢ়তা আরো দ্বিগুণতর হইবে। এই বিরোধই তোমার শিক্ষার কারণ হইবে। আমি জানি তোমার অন্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের সহজ মাহাত্ম্য আপনি বিরাজ করিতেছে--সে তোমাকে এতকাল অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে--এখনো সে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। ইংরাজ শিক্ষক তোমার এই স্বাভাবিক তেজকে ম্লান ও নির্ব্বাপিত করিবার অনেক চেষ্টা করিবে--সেই প্রতিকূল চেষ্টায় তোমার তেজ বর্দ্ধিত হইয়া এ দুরূহ পরীক্ষা হইতে তোমাকে উত্তীর্ণ করুক। ভারতবর্ষের আশীর্ব্বাদ তোমাকে রক্ষা করুক, ঈশ্বরের অভয় হস্ত তোমাকে রক্ষা করুক, তোমার নিজের প্রতিভা তোমাকে রক্ষা করুক। বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়ো। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" মাঝে মাঝে পত্র লিখিয়া আমাকে সুখী করিবে। আগামী নববর্ষে তুমি নবতেজে নববলে ভারত-সন্তান হইবার ব্রত গ্রহণ কর--সেই ব্রতকে প্রাণের চেয়ে বড় করিয়া মরণান্তকাল পালন করিয়ো। ইতি--
২৪শে চৈত্র, ১৩০৮

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

বৎস, তুমি ক্ষত্রিয় তাহা কদাপি বিস্মৃত হইয়ো না। কোন শিক্ষায় কোন সঙ্গে তোমার তেজবীর্য্য ও শ্রদ্ধা যেন অভিভূত না হয়। বিদেশীর উপদেশে যদি আমরা নিজেদের হীন বলিয়া মনে করি তবেই আমাদের যথার্থ পরাভব। ইংরাজের শিক্ষায় ক্রমাগতই আমাদের নিজের প্রতি বিশ্বাস ও সম্ভ্রম চলিয়া গিয়া আমাদের মন য়ুরোপের ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছে। সেইজন্য বেশভূষা আহার বিহার গৃহসজ্জা বিলাস উপকরণে আমরা কেবলই ইংরাজের উচ্ছিষ্ট ভোগ করিতেছি। অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম্ম, অনাচার হইতে দেশকে সমাজকে রক্ষা করা ইহাই ক্ষত্রিয়ের কুলব্রত। এমন পবিত্র উন্নত ব্রত আর কিছুই হইতে পারে না, ভয় ত্যাগ করিয়া মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া দুঃখকে বরণ করিয়া, দৈন্যকে উপেক্ষা করিয়া, আত্মমর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতবর্ষে ক্ষাত্রধর্ম্মের আদর্শকে পুনরায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবার ভার তুমি গ্রহণ কর। সেই ভার গ্রহণ করিতে

হইলে নিজের সমস্ত তেজকে হোমাগ্নির ন্যায় হৃদয়ের গোপন গুহায় অহরহ প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতে হইবে। মহাভারতের ভীষ্ম, অর্জ্জুন ও কর্ণ ক্ষত্রিয়ের আদর্শ। সেই আদর্শটি গ্রহণ করিয়ো। মূল মহাভারতে কালে কালে অনেক বাজে জিনিস প্রক্ষিপ্ত হইয়া এই মহাকাব্যকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সমস্ত বাদ দিয়া ইহার মূল কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া চলিলে প্রাচীন ক্ষত্রিয় সমাজের সহিত পরিচিতি হইতে পারিবে। মহাভারত যে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাব্য এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

ভারতবর্ষের যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে--দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি। এই দুই সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিলেই--ভারতবর্ষ পুনরায়--সংজ্ঞা লাভ করিতে পারিবে। আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো। ব্রাহ্মণের শান্ত সমাহিত সাত্ত্বিক ভাবকে তোমরা বরণ করিলে চলিবে না। বলবীর্য্য তেজ সমাজে কে রক্ষা করিবে ? সেই ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায় ? ব্রাহ্মণের শান্তি কাহার অটল বলের উপরে নিজেকে রক্ষা করিবে ? সমাজে ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শকে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও বিঘ্ন হইতে সুরক্ষিত করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যই ক্ষাত্রতেজের মাহাত্ম্য। স্বেচ্ছাচার, বিলাস, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পারিষদগণের চাটুবাক্যে শূণ্য অহঙ্কারে পরিস্ফীত হইয়া থাকা সুমহৎ ক্ষাত্রধর্ম্ম নহে। এইরূপে আমাদের ক্ষত্রিয়দের তেজ নষ্ট, বুদ্ধি ভ্রষ্ট, চরিত্রবল চূর্ণ হইয়া তাহারা অবনতির পঙ্কের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে এবং সর্ব্বপ্রকার অবমাননায় অসাড় হইয়া কেবল কলুষিত প্রমোদে উন্মত্ত হইয়াছে। যাহারা সমস্ত সমাজের আশ্রয় ছিল তাহারা আজ পশুর মত হীনতা ও অবমাননায় লুণ্ঠিত হইয়া দিন যাপন করিতেছে। ইহা অপেক্ষা কি মৃত্যু শ্রেয় নহে ? ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ জীবন কি চরমতম দুর্গতি নহে ? বাঁচিয়া কি হইবে যদি এমন করিয়াই বাঁচিতে হয় ? নিজেকে ও নিজের সমাজকে বীর্য্য দাও, অভয় দাও, আশ্বাস দাও, ধর্ম্ম রক্ষা ও আর্ত্তত্রাণ ব্রতে দীক্ষিত করো--তোমার জীবন চরিতার্থ হউক--ঈশ্বর তোমার ললাটে ক্ষাত্র মাহাত্ম্যের তিলক স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়া দিন্। ইতি--৭ই বৈশাখ, ১৩০৯।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

পুঃ--বৈশাখের বঙ্গদর্শনে আমার 'নববর্ষ' প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিয়ো। তাহা ব্রাহ্মণের মনের কথা। তাহা ক্ষত্রিয়ের জন্য লিখি নাই। তথাপি তাহাতে চিন্তার বিষয় পাইবে।

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

আমার শরীর কিছুকাল হইতে অসুস্থ ও দুর্ব্বল আছে। ইতিমধ্যে শিলাইদহে গিয়া কতকটা ভাল ছিলাম। কিন্তু শরীর একবার ভাঙ্গিলে তাহাকে টানিয়া খাড়া করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

আমি আমার বিদ্যালয়ের কাজ লইয়াই ব্যাপৃত আছি। বেশ শান্তির সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ চলিয়া যাইতেছে। কেবল অর্থাভাবে ও যন্ত্রাভাবে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। তুমি কাঠের কাজ অভ্যাস করিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম।

আমার এখানে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার নাম হোরি--নিজেকে সে চিদানন্দ নাম দিয়াছে। বড় নম্র শান্ত প্রকৃতি--তাহার অধ্যবসায় দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। স্বদেশ ও স্বজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া এই দুরদেশের প্রান্তে মাঠের মধ্যে একাকী সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নের কঠোর চেষ্টা বড় বিস্ময়কর। তাহার সৌম্যমূর্ত্তি ও বিনীত ব্যবহারে এখানকার ভৃত্যেরাও মুগ্ধ হইয়াছে। বৌদ্ধ শাস্ত্র মূল সংস্কৃত গ্রন্থে অধ্যয়ন করাই তাহার উদ্দেশ্য। সংস্কৃত শিখিতে তাহার

সুদীর্ঘকাল লাগিবে । কারণ সংস্কৃত শব্দ সে উচ্চারণই করিতে পারে না--বার বার বিফল হইয়াও সে হতোদ্যম হয় না। মধ্যে তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছিল কিন্তু তাহার উৎসাহ হ্রাস হয় নাই। তুমি যদি এখানে থাকিতে, এই জাপানী ছাত্রের সহিত নিশ্চয় তোমার বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইত ।

আশা করি তোমার পড়াশোনা অগ্রসর হইতেছে। আগামী মাসের বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষের ইতিহাস নামে আমার একটি প্রবন্ধ বাহির হইবে, মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিয়ো।

আশীর্ব্বাদ করি তুমি সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা লাভ করিয়া জীবনকে সার্থক কর।

ইতি--১৩ই শ্রাবণ, ১৩০৯।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

আলমোড়া

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। cadet corps(১) এ প্রবেশ করিয়া তুমি ক্ষত্রিয়সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবে ইহা কল্পনা করিয়া আমার আনন্দ হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজপুত্র ইংরাজ শিক্ষক সংসর্গে আপন জাতীয়ত্ব, এমন কি, মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে--তাহারা আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়াছে, স্বদেশীর প্রতি বীতরুচি হইয়াছে, স্বজাতীর ভাষা সাহিত্য শিল্পের প্রতি তাহাদের অবজ্ঞা জন্মিয়াছে। দিবারাত্রি জুয়া খেলিয়া, মদ খাইয়া, নাচিয়া ইংরেজের প্রমোদসভায় অহোরাত্র উন্মত্তভাবে সঞ্চরণ করিয়া নিজেকে সর্ব্বতোভাবে হেয় করিয়াছে--ইহারা বিজাতীয় স্পর্দ্ধায় স্ফীত হইয়া রক্তবর্ণ বিস্ফোটকের মত ভারতবর্ষের বক্ষশোণিত বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। তোমাকে এরূপ মত্ততা কখনই অভিভূত করিবে না, তাহা আমি নিঃসন্দেহে জানি। তুমি সংযত অপ্রমত্ত থাকিয়া সুদৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে, যাহা গ্রহণ করিবার তাহা একাগ্রমনে গ্রহণ করিবে কিন্তু সংসর্গের আকর্ষণে নিজেকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়ো না। কাহারো স্তুতিনিন্দায় ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়া ধৈর্য্যের সহিত স্তব্ধভাবে নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে ভারতবর্ষীয় পবিত্র ক্ষাত্রধর্ম্মের নির্ম্মল হোমানলকে সর্ব্বপ্রকার ইন্ধনের দ্বারা সর্ব্বদাই জাগ্রত রাখিবে--তোমার সেই চিরসঞ্চিত তেজ কেবল তোমার অন্তর্যামীর এবং তোমার অন্তর্দৃষ্টির গোচর থাকিবে সে আর কেহ জানিবে না। সেইখানেই তোমার ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠা, সেইখানেই তোমার ইষ্টমন্ত্রের সাধনা। ত্রিভুবন দেবতার যে তেজ জ্যোতিরূপে সমস্ত বিশ্বজগতে বিকীর্ণ হইতেছে এবং যে তেজ বৃদ্ধিও চেতনারূপে তোমার অন্তঃকরণে দীপ্যমান রহিয়াছে প্রাতঃকালে গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা তোমার অন্তর্বহির্ব্যাপী সেই মহাতেজকে স্মরণ করিবে, অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিবে,--সেই তেজের দ্বারা প্রতিদিন তোমার অভিষেক হইবে--প্রাতঃকালে সূর্য্যের যে আলোক দেখিবে তাহা যেন প্রতিদিন তোমার অন্তঃকরণকে নির্ম্মল ও উজ্জল করিয়া তোলে, তাহাকে সমস্ত দিনের মত তোমার দেহমনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিবে--তোমাকে কোন পাপ স্পর্শ করিবে না, কোন গ্লানি তোমাকে আক্রমণ করিবে না, চতুর্দ্দিকের সমস্ত ধুলিপঙ্কের মধ্যেও সুরধুনিধারাস্নাত তরুণ দেবকুমারের মত তুমি অম্লান সুন্দর নির্ম্মলতা লইয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারিবে--তোমার গৌরব কিছুতেই ক্ষুন্ন হইবে না--ঈশ্বরের কাছে তোমার জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা করি ।ইতি--১৬ই শ্রাবণ [১৩০৯]

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১) লর্ড কার্জ্জন প্রবর্ত্তিত ইন্ডিয়ান ক্যাডেট কোর।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। তুমি মহৎ হইবে, বীর হইবে, তুমি আমাদের আর্য্য পিতামহদিগের ঋণ পরিশোধ করিবে এই ইচ্ছা আমি সর্ব্বদাই হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিয়াছি। আমি বঙ্গদর্শনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যখন কিছু লিখি তুমি আমার স্মরণপথে জাগরুক থাক। তোমাকে আমি নিকটে রাখিতে পারি নাই কিন্তু আমার হৃদয়ের স্নেহের দ্বারা তোমাকে আমি অভিষিক্ত করিয়াছি। তোমার জীবন সার্থক হউক ঈশ্বরের কাছে আমি এই প্রার্থনা করি। ইতি--১লা কার্ত্তিক, ১৩০৯

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্রখানি পাইয়া আমার হৃদয় স্নিগ্ধ হইল। তুমি অল্পদিন এখানে থাকিয়াই তাঁহার (১) স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছ। তাঁহার স্বভাব মাতৃভাবে পূর্ণ ছিল এবং তিনি তোমাকে আপন সন্তানের চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। এখানকার বিদ্যালয়ে তুমি আসিবে এবং তাঁহার যত্ন শুশ্রূষার অধীনে থাকিবে ইহার জন্য তিনি ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। তুমি তাঁহার কাছে থাকিলে কখনো মাতার অভাব এক মুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করিতে পারিতে না ইহা নিঃসন্দেহ।

ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন সেই শোককে তিনি নিষ্ফল করিবেন না--তিনি আমাকে এই শোকের দ্বার দিয়া মঙ্গলের পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।

তোমার কল্যাণ-কামনা আমার হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে--তুমি সকল বাধাবিপত্তি সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাক, স্বদেশের হিতানুষ্ঠানের জন্য আপনার জীবনকে প্রস্তুত করিয়া তোল ইহাই আমি একান্তচিত্তে কামনা করি । ইতি--১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। দীর্ঘকাল হইতেই আমার মেঝ মেয়ে রোগ ভোগ করিতেছে সেইজন্য উদ্বেগে আছি। হয়ত বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে লইয়া হাজারিবাগ প্রভৃতি কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরে আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি--সুখ দুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ হইব না এই আমার সাধনার লক্ষ্য।

আশা করি অধ্যয়নে তুমি ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছ। এখানে আমার বিদ্যালয় উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে। ইহার প্রতি সাধারণের অনুকূল দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে।

কিছুদিনের মত আমি ভ্রমণে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি--আমার রুগ্না কন্যার সম্বন্ধে একটা কোন সুব্যবস্থা করিতে পারিলেই আমি বাহির হইয়া পড়িব। ঈশ্বর সর্ব্বদা তোমাকে কল্যাণ পথে রক্ষা করুন। ইতি--১লা ফাল্গুন, ১৩০৯

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১) কবি-গৃহিণীর মৃত্যুর পর লিখিত। কবি-গৃহিণী মহারাজকুমারকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ছাত্ররূপে যাইবেন শুনিয়া কবি-গৃহিণী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ওঁ

হাজারিবাগ

কল্যাণীয়েষু,

পীড়িত শরীর ও পীড়িতা কন্যাকে লইয়া হাজারিবাগে আসিয়াছি। আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল।

তুমি ক্যাডেট কোরে যোগ দিয়া মীরাটে শিক্ষালাভ করিতে যাইতেছ এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। ইহাতে তোমার সর্ব্বপ্রকারে উপকার হইবে আশা করি। ঈশ্বর সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল করুন।

আমি সংসারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করিয়া আমার একটি মাত্র কাজে জীবনকে উৎসর্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এইরূপে লোকহিতের পথ দিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া যদি দুইদিনের মানব জীবনকে সার্থক করিতে পারি তবে ধন্য হইব। আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। ঈশ্বর আমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে প্রত্যহ অযাচিতভাবে সার্থক করিতেছেন। এক সময়ে যখন সংসারীদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া অনেক লাঞ্ছনা ও কদাচিত মুষ্টিভিক্ষা লাভ করিতাম সে এক দুঃখের দিন ছিল। এখন ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছি। এখন সহায়তা আপনি আসিতেছে। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ১৫০ টাকা মাত্র বেতন পান--কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া তাঁহাকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়--তিনি একদিন বোলপুরে আসিয়া নিঃশব্দে আমাকে ১০০০ এক সহস্র টাকা দিয়া গেলেন। ([১]) ঈশ্বর অক্ষমকে দিয়াই নিজের কার্য্য আশ্চর্য্যরূপে অভাবনীয়রূপে সম্পন্ন করান, ইহাতেই তাঁহার মহিমা প্রকাশ পায়। এই ঘটনার পর হইতে আমি ভিক্ষার ঝুলি ফেলিয়া দিয়া নিজের প্রাণপণ যত্নে প্রভুর কাজ বলিয়া আমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছি। পূর্ব্বে ভয় হইত খরচ কুলাইবে কি করিয়া-- এখন আর ভয় করি না। ছেলেদের থাকিবার ঘর বাড়াইয়া দিয়াছি--ইংরাজী শিখাইবার জন্য ইংরেজ অধ্যাপক রাখিয়াছি--কারখানার উপযোগী একটি বড় ঘর বানাইতেছি--একজন বন্ধু আমাকে Engine ও অন্যান্য যন্ত্র দিবেন কথা দিয়াছেন। এত ব্যয় যে কি করিয়া করিলাম ও কি সাহসে করিতেছি তাহা নিজেই জানি না--কিন্তু ঈশ্বর আশ্চর্য্য উপায়ে আমার অভাব পূরণ করিয়া দিবেন।

আমার শরীর অত্যন্ত অপটু কেবল আনন্দের আবেগে তোমাকে এতখানি পত্র লিখিলাম। আমি জানি তোমার প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি আছে-- মঙ্গলের প্রতি তোমার নিষ্ঠা, স্বদেশের প্রতি তোমার ভক্তি আছে--এই জন্যই আমার আনন্দের কথা তোমাকে জানাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।

মহারাজকে ([২]) আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া আমার সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়ো। তাঁহার স্নেহঋণে আমি বদ্ধ কিন্তু নিজের ক্ষীণ শক্তিকে ঈশ্বরের কাজে নিযুক্ত রাখিয়া অনেক সময় বন্ধুকৃত্য পালনের অবকাশ পাই নাই । আমাকে যেন তিনি নিজ ঔদার্য্যগুণে মার্জ্জনা করেন। ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করি। ইতি--৭ই চৈত্র, ১৩০৯

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

এখনো জাপানী ছুতারকে এখানে মাস দুই-তিন রাখিতে হইবে। তাহার পরে যদি তোমাদের প্রয়োজন থাকে ত আগরতলায় পাঠাইয়া দিব। ইতিমধ্যে সে বাংলা আরো খানিকটা শিখিয়া লইবে।

(১) আশ্রমের অধ্যাপক এবং কর্ম্মী মোহিতচন্দ্র সেন।

(২) মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য।

ওঁ

অরুণ (১) কাগজে দেখিলাম তোমাদের জন্য একটি বিশেষ বিদ্যালয়ের (২) স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, আশা করি সেটা ভাল নিয়মে উপযুক্ত লোকের দ্বারা চালিত হইবে। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্রগুলা অব্যবহারে অনাদরে ও চৌর্য্যে যেন নষ্ট না হইয়া যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়ো--তোমাদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাটা ভাল করিয়া প্রচলিত হয় এই আমার ইচ্ছা।

আমাদের বিদ্যালয়ের কাজ সুন্দর চলিতেছে। কেবল একটি কারখানা ও ল্যাবরেটরি হইলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম--ঈশ্বরের প্রসাদে ধীরে ধীরে আমাদের অভাব দূর হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

তোমার শরীর এখন ভাল আছে ত ? যতী এখনো আগরতলায় গেল না দেখিয়া তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছি । তাহার সংবাদ ভাল ত ?

মহারাজকে (৩) সাদর অভিবাদন জানাইবে । তুমি আমার একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে।

ইতি--৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২

শুভৈষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

আলমোড়া

কল্যাণীয়েষু,

আলমোড়ায় আসিয়া আমার কন্যার শরীর কতকটা ভাল আছে। কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার অনেক বিলম্ব আছে। এখনো প্রত্যহ জ্বর আসিতেছে।

এদিকে আমার বিদ্যালয়ের জন্য সর্ব্বদাই আমার চিত্ত উদ্বিগ্ন আছে। সেইজন্য কাল এখান হইতে কিছু কাজের জন্য আমি রওনা হইতেছি। কলিকাতায় কিছুকাল কাটাইয়া বোলপুর যাইব।

মহারাজকে এখান হইতে একজোড়া ভাল চমরীপুচ্ছ পাঠাইয়াছি পাইয়াছেন কিনা খবর পাই নাই। যতীকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়ো। তাহাকে বলিয়ো যেন আমাকে কলিকাতায় পত্র লেখে।

ঈশ্বর নিয়ত তোমার মঙ্গল করুন। ইতি--১৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০

শুভৈষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

কল্যাণীয়েষু,

বোলপুর ঘুরিয়া তোমার পত্র আমার হাতে আজ আসিয়া পৌঁছিল--পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।

তুমি যে বিষয়ে লিখিয়াছ যতীর মুখে আমি তাহা আভাসে মাত্র শুনিয়াছিলাম এবং শুনিয়াও আমি তোমার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হই নাই । আজ তোমার পত্র পড়িয়া জানিলাম যে তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে যথার্থ কর্ত্তব্য পালন হইয়াছে--এইরূপ না হইলে অন্যায় অবিচার হইত এবং সমাজ তোমাকে নিন্দা না করিলেও তুমি ধর্ম্মে পতিত হইতে। সেই জন্যই তোমার চিঠিখানি পড়িয়া আমার হৃদয় বড়ই স্নিগ্ধ হইল--তুমি যখন ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া আছ ঈশ্বর তোমাকে কখনও দুর্ব্বল করিবেন না--তিনি তোমার মঙ্গল করিবেনই--তিনি সুখেও তোমার মঙ্গল করিবেন, দুঃখেও তোমার মঙ্গল করিবেন। তোমার মঙ্গল তোমার জীবনে তোমার অন্তরে ঘটিবে। আমি আমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি--তুমি সংসারের সমস্ত ভালয় মন্দয় সমস্ত লাভে ক্ষতিতে মনুষ্যত্বের পরম সার্থকতা লাভ কর--তোমার অন্তর্যামীর প্রসন্ন দৃষ্টির সম্মুখে তুমি ধন্য হও।

(১) আগরতলা হইতে প্রকাশিত তৎকালীন সাপ্তাহিক পত্র

(২) আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত রাজকুমার বোর্ডিং স্কুল।

(৩) মহারাজ রাধাকিশোর মানিক্য।

আমি পদ্মার উপরেই সপরিজনে বাস করিতেছি। শরীর মন সুস্থই আছে। মনে করিয়াছি আগামী বৈশাখে এখান হইতে বোলপুরে যাইব। আজ মহিমের ([১]) পত্রে সংবাদ পাইলাম যে ঢোলপুরের সেই কন্যাটির সহিত শীঘ্রই তোমার বিবাহ হইবে। ঈশ্বর তোমাদের মিলনকে সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণময় করুন এই আমি একান্ত মনে প্রার্থনা করি। ইতি--১৩ই ফাল্গুন, ১৩১৪।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

পরম কল্যাণীয়েষু,

তুমি ত্রিপুরা রাজ্যের কর্ত্তৃপদে ([২]) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ এইজন্য পণ করিয়াছিলাম যে কখনো সেখানকার কোন কাজের জন্য কোনো কর্ম্মপ্রার্থীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তোমার কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে বিঘ্ন আনয়ন করিব না। সে পণ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ভাঙ্গিতে হইল। তোমাদের ওখানে একজন জজের পদ খালি হইয়াছে। সম্ভবতঃ তোমরা কোনো বৃদ্ধ পেন্‌সন্‌জীবী *** জীবকে রাখিবে এবং তৎপরে চিরদিন অনুতাপ করিবে। যদি সেরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা না থাকে এবং যদি অল্পবয়স্ক, উদ্যমশীল, আইনজ্ঞ সজ্জনের স্থান থাকে তবে আমি পত্রবাহক **কে তোমার অবগতিগোচর করাইতে চাই। ইনি বুদ্ধিমান এবং *দশ বৎসর ওকালতি করিয়াছেন কিন্তু যে সদ্গুণ থাকিলে ওকালতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা কঠিন, ইঁহার তাহা বহুল পরিমাণে আছে বলিয়াই ইনি অন্য ক্ষেত্র অন্বেষণ করিতেছেন। বিচারকের কাজ ইঁহার দ্বারা ভালরূপ চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমি তোমাকে যখন কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কোন অনুরোধ করিব তখন একথা কোনো মতেই মনে করিওনা যে, যে-করিয়াই হউক অনুরোধ পালন করিতে হইবে। কর্ম্মের সুবিধা বুঝিয়া সকল দিক বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবে। তবে একথা নিশ্চয় জানিবে যাঁহার সততা সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দিগ্ধ না হইব তাহার সম্বন্ধে আমি কখনই তোমার নিকট অনুরোধ করিব না।

অদ্য নববর্ষের প্রথম দিন। ঈশ্বর তোমার কর্ত্তব্যক্ষেত্রকে প্রশস্ত করিয়াছেন, আমি আশীর্ব্বাদ করি তিনি তোমার শক্তিকে উদ্বোধিত করুন এবং তোমার সমস্ত শুভ ইচ্ছাকে তিনি সকল বাধার উপরে জয়ী করিয়া দিন। ইতি--১লা বৈশাখ, ১৩১৫।

একান্ত শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

তোমার এই পরম দুঃসময়ে ([৩]) তোমার ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবেন।

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদিবাপ্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসিত হৃদয়েনাপরাজিতা--

সুখই হউক দুঃখই হউক প্রিয় হউক অপ্রিয়ই হউক যখন তাহা উপস্থিত হইবে তখন অপরাজিত হৃদয়ে তাহাকে গ্রহণ করিবে, আমাদের শাস্ত্রের এই উপদেশ। তোমার মনে সেই শক্তি আছে--তুমি সকল অবস্থাতেই অবিচলিত চিত্তে ধর্ম্মের মধ্যে মঙ্গলের মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, ইহা নিশ্চয় জানি বলিয়া আমার মন তোমার সম্বন্ধে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন আছে।

(১) কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা।
(২) মহারাজের একান্ত সচিব পদে থাকা কালে।
(৩) পিতৃবিয়োগ জনিত দুঃসময়।

এখন তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ যে, ত্রিপুরার রাজ্যভার যাঁহার (১)প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে কায়মনোবাক্যে তাঁহার আনুকূল্যে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে--কারণ, তোমাদের রাজ্যের কল্যাণ তোমাদের সকলের কল্যাণ। রাজ-সিংহাসনের চারিদিকে অনেক শত্রু আছে, এই সময়ে তোমাদের নূতন রাজাকে তাহাদের কপট বন্ধুতা হইতে সাবধানে রক্ষা করিবে। এক্ষণে তুমিই তাঁহার সকলের চেয়ে নিকটতম আত্মীয়--তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মঙ্গল সম্বন্ধ যেন কিছুমাত্র বিচ্ছিন্ন না হয়--তাহা হইলে বাহিরের শত্রুরা সুযোগ পাইয়া বসিবে। তাহারা তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রর্থনা করি তাহাদের সেরূপ কুচক্রান্ত যেন কোনোদিন সফল না হয়--তোমার অবিচলিত হিতৈষিতার প্রতি রাজার মনে কেহ যেন কোনো দিন সন্দেহ না জন্মাইতে পারে--তোমার স্বাভাবিক সত্যপ্রিয়তা সততার দ্বারা তুমি যেন সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের উপরে জয়ী হইয়া তোমাদের রাজ্যের হিতসাধনে তোমার শক্তিকে নিযুক্ত করিতে পার।

তোমাদের রাজ্যের হিতসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমাকে অত্যন্ত সহিষ্ণু হইতে হইবে। ঘটনাক্রমে অনেক অন্যায় অবিচারও তোমাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইবে--তখন তোমার তেজস্বিতা যেন তোমাকে আত্মবিস্মৃত না করে। নীরবে অনেক আঘাত সহ্য করিতে হইবে--নিজের দিকে না তাকাইয়া নিজের কর্ত্তব্যের দিকেই লক্ষ্য রাখিবে। তোমাদের রাজাকে ও রাজ্যকে যাহাতে কোনো প্রকার দুর্ব্বলতা আক্রমণ করিতে না পারে--ক্রমে ক্রমে সুযোগ বুঝিয়া যাহাতে সমস্ত জঞ্জাল দুর করিতে পার সেজন্য তোমাকে অত্যন্ত সতর্কভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। হঠাৎ যাহাতে কোন বিপ্লব বাঁধিয়া না উঠে, সেজন্যও বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক হইবে। আমার একান্ত মনের কামনা এই যে, রাজার সঙ্গে তুমি অভিন্নহৃদয় হইয়া ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে লইয়া যাও। তুমি যদি তোমার সমস্ত শক্তি তাঁহার আনুকূল্যে নিযুক্ত করিবার সুযোগ পাও তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গল হইবে। তোমার পিতা ও পিতামহের নিকট অকৃত্রিম স্নেহের ঋণে আবদ্ধ হইয়া আছি সেইজন্য তোমাদের রাজ্যের কল্যাণ সাধনে কোনোদিন আমি উদাসীন থাকিতে পারি না। দূরে থাকিয়াও আমি ত্রিপুরার মঙ্গল কামনায় বিরত থাকিব না। যখন দেখিব তোমরা দুই ভ্রাতায় দৃঢ়ভাবে মিলিত হইয়া তোমাদের সিংহাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং রাজলক্ষ্মীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছ--দেখিব তোমাদের রাজকোষ সচ্ছল, তোমাদের প্রজাগণ সুখী, সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং সিংহাসনের চারিদিকে কোনো কলুষ নাই তখন আমার অনেকদিনের বাসনা পূর্ণ হইবে। তোমার প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ, সুখে দুঃখে ঈশ্বর তোমাকে মঙ্গলে দৃঢ় রাখুন, কর্ত্তব্যে অটল করুন।

ইতি--১০ই চৈত্র, ১৩১৫

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

তুমি যে সঙ্কল্প করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছ--তাহা সিদ্ধ হউক আমি একান্ত মনে এই কামনা করি। আশুকে (২) মধ্যবর্ত্তীরূপে লইয়াছ। ইহাও ঠিক হইয়াছে। তোমাদের এই সংকট কাটিয়া গেলেই তোমরা জোরের সহিত কাজ করিতে পারিবে--রাজ্যের সমস্ত জঞ্জাল দূর করিতে কোনো বাধা থাকিবে না। যেমন করিয়া হোক্ কতকটা ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই কাজটা সারিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

---

(১) মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য।

(২) আশুতোষ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার।

তোমার পত্র পড়িয়াই ইচ্ছা হইতেছিল একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি। কিন্তু প্রথমত এখানে নানা কাজে আবদ্ধ আছি--দ্বিতীয়ত আমি এ সময়ে তোমার কাছে গেলেই লোকে কল্পনা করিবে তোমাদের রাজকার্য্যে আমি নিজেকে জড়িত করিতেছি এবং তাহাই লইয়া নানা কথার সৃষ্টি করিবে। এখনকার দিনে কাহারও মনে কোনো অমূলক সংশয় না জন্মানই শ্রেয়। আমিও আজকাল কাজের জালে জড়িত হইবার অবস্থায় নেই--আমার এই বিদ্যালয়টিই একমাত্র কাজ--ঈশ্বর করুন এই কাজের দ্বারাই তাঁহার কাজ সম্পন্ন করিতে পারি। কিন্তু একথা মনে নিশ্চয় জানিয়ো তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমার মন সর্ব্বদাই উৎসুক হইয়া আছে। ঈশ্বর তোমাদের রাজ্যের কল্যাণ করুন অনেকদিন হইতে এই কামনা আমার মনে জাগিয়া আছে--তোমার পিতা ও পিতামহের অহেতুক বন্ধুত্ব আমি কদাচ ভুলিব না--তাহার পরে যেদিন হইতে তোমাকে জানি তোমার প্রতি আমার স্নেহ ক্রমশই প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে। তোমার সম্বন্ধে আমার হৃদয়ের মধ্যে এই আশ্বাস দৃঢ় আছে সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই তোমার ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবেন--তোমার ভয় নাই তোমার পরাজয় নাই--তোমাকে কখনই অসত্য ও অন্যায় পারভূত করিতে পারিবে না--অতএব ক্ষতি লাভ সম্পদ বিপদ সকল অবস্থায় সকল ঘটনাতেই তোমার আত্মাকে তুমি অপরাজিত রাখিবে। তোমারা দুই ভ্রাতায় অভেদাত্মা হইয়া ত্রিপুরা রাজ্যকে কল্যাণে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কর এই আমি একান্তমনে আশীর্ব্বাদ করি।

তোমার দাদাকে (১) উপদেশ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছি। পাইয়াছেন কি ?

ঈশ্বর তোমাদের কুশলে রক্ষা করুন। ইতি--২৬শে চৈত্র, ১৩১৫

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ। প্রয়োজন হইলে রমণীমোহনের (২) পরামর্শ গ্রহণ করিয়ো।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

নববর্ষের পত্রখানি পাইয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম।

আমি আজকাল সংসার হইতে ক্রমশই দূরে সরিয়া পড়িতেছি। রথী বিষয়কর্ম্মের ভার লইয়াছেন, সেদিক হইতে ঈশ্বর আমাকে নিস্কৃতি দিয়াছেন--এখন আমি তাঁহারই দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছি--কখনও তাঁহার দরবারে আমার ডাক পড়িবে। আর কিছুতেই আমি ভাল করিয়া মন দিতে পারি না।

এবারে ছাত্র ও অধ্যাপকদের লইয়া ১লা বৈশাখের প্রত্যুষে ঈশ্বরের নাম লইয়া আমরা যে বৎসর আরম্ভ করিয়াছি তাঁহার প্রসাদে তাহা সার্থক হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে বড় আশা করিতেছি। আমাদের সেই বর্ষারম্ভের আনন্দ ও মঙ্গল, সেই একান্ত আত্মনিবেদনের আবেগ তোমাকেও স্পর্শ করুক এই আমার কামনা। তোমাদের সঙ্গে আমার বাহিরের দেখাশুনা ও যাতায়াতের সম্বন্ধ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু তোমার প্রতি আমর অন্তরের স্নেহ অক্ষুন্ন আছে। চিরদিনই আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। ঈশ্বর তোমার প্রকৃতির মধ্যে যে মঙ্গল উপকরণ দিয়া সংসারে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তোমার জীবনে প্রতিদিন তাহা সার্থক হইতে থাক--সমস্ত সুখ দুঃখ ও লাভ ক্ষতির উৰ্দ্ধে তোমার মনুষ্যত্ব পুণ্যেরতেজে দীপ্যমান হইয়া উঠুক--তোমার প্রতি যে কর্ম্মেরই ভার পড়ুক তাহারই মধ্য হইতে তুমি ধর্ম্মের জ্যোতিকে প্রকাশ করিতে থাক। রাজকার্য্যের বহুতর গ্লানি তোমার অন্তরকে যেন স্পর্শ না করে, সেখানে তুমি নিয়ত মুক্ত ও পবিত্র থাকিয়া আপনার জীবনকে প্রতিদিন উপরের দিকে বিকশিত করিতে থাক এই আমার একান্ত মনের কামনা।

(১) মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর।

(২) প্রাক্তন রাজমন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় মহারাজ (১) বর্ত্তমান থাকিতে প্রতি বৎসর পূজার ছুটির পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের বার্ষিক দান পাঠাইতেন। কেবলমাত্র গত বৎসরই তাহা পাওয়া যায় নাই । যদি এ টাকাটা দেওয়া সম্ভব হয় তবে বিশেষ উপকার হইবে। কারণ, ছাত্রদের জন্য নূতন গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে অনেক ব্যয় করিতে হইতেছে। ছাত্র এখন ১২০ জন--আর স্থান দিতে পারিতেছি না । তোমাদের স্বর্গীয় পিতার দানেই দুঃসময়ের সমস্ত আঘাত কাটাইয়া এই বিদ্যালয় আজ এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছে--নহিলে ইহা কখনই এতদিন রক্ষা পাইত না। এই দানের সূত্রে তোমাদের সঙ্গে আমার শুভানুষ্ঠানের যোগ থাকে এই আমার ইচ্ছা। পূর্ব্বের ন্যায় এখন অভাব তেমন প্রবল নাই--সাহায্য হিসাবে টাকার এখন তত অধিক প্রয়োজন নাই--কিন্তু একথা মনে স্থির জানিয়ো তোমাদের স্বর্গীয় পিতার এই দানটি যদি রক্ষা কর তবে তাহাতে আমাদের উভয়েরই মঙ্গল আছে।

ঈশ্বর সর্ব্বতোভাবে তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন। ইতি--৮ই বৈশাখ, ১৩১৭

একান্ত শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পরম কল্যাণীয়েষু,

আমার শরীর মন কিছুদিন হইতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য নিজের পরিবেষ্টন হইতে কিছুকালের মত সুদূরে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য মন অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে। তাই বিলাত হইয়া ক্রমে আমেরিকা ও জাপান ঘুরিয়া পৃথিবীটা প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম তোমাকেও আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ডাকিব। সে আমার পক্ষে পরম আনন্দের বিষয় হইত। কিন্তু আমি জানি তোমার অসংখ্য বাধা ; সেই জন্য প্রস্তাবটা উত্থাপন করিতেও নিরস্ত হইলাম। শীতকালটা ফ্রান্সের দক্ষিণে কোন সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকিয়া বসন্তের আরম্ভে ইংলণ্ডে যাইব। তাহার পরে যেমন ভাল লাগে সেই অনুসারে ভ্রমণের সঙ্কল্প স্থির করিব। আমার সঙ্গে রথী ও বৌমাও(২) যাইতেছেন। যদি ইচ্ছা হয় ও বিঘ্ন না থাকে তবে তুমি গেলে তোমার শরীর যে বেশ ভাল হইয়া আসিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, চিন্তা করিয়া দেখিও।

আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে এবং বৌমাকেও জানাইবে। ইতি--২৩শে আশ্বিন, ১৩১৮

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ--বিদ্যালয়ের বার্ষিকের জন্য কি বিদ্যালয় হইতে মহারাজকে পত্র লেখা আবশ্যক ? না, সে সম্বন্ধে কোনো বন্দোবস্ত পাকা হইয়া গিয়াছে ?

ওঁ

পরম কল্যাণীয়েষু,

তুমি বোধ হয় জান সাহিত্য-পরিষদ হইতে আমার সম্বর্দ্ধনার আয়োজন কিছুদিন হইতে চলিতেছে। আমি তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিয়া বিলাত পালাইবার উদ্যোগ করিতেছি শুনিয়া কাল তাঁহারা দলে বলে আমার পথরোধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা কোনো মতেই আমাকে নবেম্বরের শেষে ছাড়া ছাড়িয়া দিতে চান না । কিন্তু ডিসেম্বরের আরম্ভে বিলাত যাত্রার চেষ্টা বাতুলতা--অতএব ফাল্গুনের পূর্ব্বে আমার যাত্রা সম্ভবপর হইবে না। এই খবরটা তোমাকে জানাইবার কারণ এই যে মনে বড় আশা রহিল যে সে সময়ে হয়তো কোনো উপায়ে তোমাকে ভ্রমণের সঙ্গীরূপে পাওয়া যাইতে পারে। এখন হইতে যদি

(১) মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য।
(২) শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী।

মন স্থির কর ও পথ পরিস্কার করিতে প্রবৃত্ত হও তবে হয়ত সে সময়ে বাহির হইয়া পড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইতেও পারে। একবার এইরূপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পারিলে তোমার শরীর মনের যথেষ্ট উন্নতি হইবে ইহা আমি নিশ্চয় জানি--এই জন্য আমি এত আগ্রহ অনুভব করিতেছি।

বৌমাকে (১) আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়ো, আশা করি তাঁহার শরীর এখন সুস্থ হইয়াছে। ঈশ্বর তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন। ইতি--২রা কার্ত্তিক, ১৩১৮

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

এ পর্য্যন্ত দেবতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। সমুদ্র প্রশান্ত ছিল এবং আমরা কোনো প্রকার কষ্ট পাই নাই। সোমেন্দ্রের (২) হঠাৎ পরশু জ্বর হইয়াছিল কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যেই জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।

সমুদ্রযাত্রা কাল আমাদের সমাধা হইবে। কাল প্রাতে মার্সেল্‌সে পৌঁছিব, কালই ট্রেনে করিয়া রওনা হইব এবং পরশু লণ্ডনে পৌঁছিতে পারিব।

আমার বার বার কেবল এই কথা মনে হয় যে তুমি যদি দুই এক বৎসরের মত একবার য়ুরোপে ভ্রমণ করিয়া যাইতে পার তবে তোমার বিস্তর উপকার হয়। ইহাকে একেবারে অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করিয়ো না--যেমন করিয়া পার একবার এদিকটা ঘুরিয়া যাইতে হইবে।

সোমেন্দ্র যাহাতে তোমাদের রাজ্যের কাজে লাগে এমন একটা শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে। তোমাদের রাজ্যে বিস্তর অরণ্য পড়িয়া রহিয়াছে। কাজে লাগাইতে পারিলে তাহা বিশেষ লাভবান সম্পত্তি হইয়া উঠিবে। এই জন্য সোমেন্দ্রকে Foresty শেখানো যাইতে পারে। শুনিয়াছি তোমাদের রাজ্যে ভাল Kaolin মাটি বাহির হইয়াছে--সোমেন্দ্র যদি Ceramics শিখিয়া আসে তবে এই মাটি কাজে লাগিতে পারিবে। কিন্তু ইহার কলকারখানা বহুব্যয়সাধ্য। এ সম্বন্ধে যদি তুমি কিছু চিন্তা করিয়া থাক আমাকে জানাইবে।

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার মঙ্গল কামনা করি। ইতি--৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

G/o. Messrs.Thomas Cook & Son
Ludgate Circus, London
Butterton Vicaragc, New Castle,
Staffordshire

৬ আগষ্ট, ১৯১২

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। সোমেন্দ্রের শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি যেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ সেইরূপই হইবে। উহাকে Ceramics শিক্ষাতেই প্রবৃত্ত করিয়া দিব। তোমাদের ওখানে যখন উৎকৃষ্ট মাটি আছে তখন সেটাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা এখন হইতেই করা উচিত হইবে। সোমেন্দ্র সেপ্টে ম্বরের আরম্ভেই আমেরিকায় রওনা হইবে, তাহার পূর্ব্বে জাহাজে স্থান পাওয়া যাইবে না--কারণ, এই সময়েই আমেরিকায় যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

(১) মহারাজকুমারের পত্নী।
(২) সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা।

এখানকার লেখকমণ্ডলীর মধ্যে আমি সমাদর লাভ করিয়াছি--সে সংবাদ হয়ত ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছ। এ সময়ে তুমি এখানে উপস্থিত থাকিলে আমাদের এই সম্মানে আনন্দলাভ করিতে পারিতে। এখানকার গুণী ও জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন এই আমার আন্তরিক কামনা। ইতি--

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

পরম কল্যাণীয়েষু,

আমার নোবেল পুরুস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে আগরতলায় যে অভিনন্দন-সভা আহূত হয় সেজন্য সেখানকার সর্ব্বসাধারণকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইবে।

আমার সম্মানে তোমরা যে আন্তরিক আনন্দ বোধ কর ইহাই আমার যথার্থ পুরস্কার। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি। ইতি--১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

পরম কল্যাণীয়েষু,

তুমি মন্ত্রী (১) পদ গ্রহণ করিবে ত্রিপুরার পক্ষে ইহা অপেক্ষা কল্যাণকর আর কিছুই হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত তোমাদের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যত প্রকার প্রস্তাব হইয়াছে এইটেই সকলের চেয়ে ভাল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। যাহাতে পূর্ণশক্তিতে তুমি কাজ করিতে পার সেইরূপ অধিকার তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পদে পদে বাধা পাইয়া যাহাতে অকৃতকার্য্য না হও পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা পাকা করিয়া লইবে। কর্ম্মপ্রণালী ও কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে সমস্ত পুরাতন জঞ্জাল জমিয়া আছে তাহা দৃঢ়তার সহিত অথচ সময় বুঝিয়া সম্পূর্ণভাবে দূর করিয়া দিবে। তোমাদের রাজ্যশাসনটিকে তোমরা ধর্ম্মসাধনরূপে পালন করিও--কোথাও কোনো অন্যায় বা শৈথিল্য ঘটিতে দিও না। কোনো যথার্থ বড় কাজ কখনই কেবল তীক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা হইতেই পারে না, ধর্ম্মবুদ্ধির প্রয়োজন। তোমাদের ন্যায়বিচারের প্রতি সর্ব্বসাধারণের যেন অবিচলিত শ্রদ্ধা জন্মে। তাহারা একথা যেন নিশ্চিত বুঝিতে পারে তোমরা যে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিবে সে নিয়মকে তুমি বা রাজা বা কেহই কোনো মতেই লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। যাহার প্রতি তোমরা বিরক্ত হইবে তাহার প্রতিও যথানিয়মে সদ্বিচার করিতে হইবে--মনে ক্রোধ জন্মিলে বা কোথাও কিছু অসুবিধা ঘটিলে তখনি নিয়ম ডিঙাইয়া যাইবার কথা যেন মনেও উদয় না হয়। যাহার হাতে ক্ষমতা আছে ক্ষমতাকে বিধানের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবার ভার তাহারই উপরে।

তোমাকে এত কথা বলাই বাহুল্য--কেন না আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি নির্ব্বিশেষে সকলের সম্বন্ধেই সত্যরক্ষা ধর্ম্মরক্ষা করিয়া চলিবে। তোমার হাতে ত্রিপুরার রাজ্যব্যবস্থা উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিবে একদিন ইহাই দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম কারণ ইহাতে সমস্ত বাংলা দেশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। তোমাদের দেশের ভূগর্ভে অরণ্যে কান্তারে অনেক সমৃদ্ধি প্রচ্ছন্ন আছে--লক্ষ্মী তোমাদের ওখানে ধরাশয়নে সুপ্ত হইয়া রহিয়াছেন--তাঁহাকে জাগরিত কর--দেশের সর্ব্বত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বিস্তারিত কর---

(১) ত্রিপুরা রাজ্যের রাজমন্ত্রী।

প্রজাদের প্রতি তোমাদের যে কর্ত্তব্য বহুকাল অননুষ্ঠিত রহিয়াছে তুমি তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে সাধন কর তাহাতে তোমার জীবন সার্থক হইবে।

ঈশ্বর তোমাকে কর্ম্মের ক্ষেত্রে শক্তি দিন, কল্যাণের পথে গতি দিন, জীবনের সাধনায় সাহস দিন--বাধাবিপত্তিতে কোনোদিন তোমার মন অবসন্ন না হউক--শুভ ইচ্ছা নিশ্চয়ই সফল হইবে এই ভরসা মনের মধ্যে দৃঢ় করিয়া স্তুতি নিন্দা ক্ষতি লাভে বিক্ষুব্ধ না হইয়া অবিচলিত অধ্যবসায়ে কাজ করিয়া যাইবে এবং সকল কর্ম্মই বিশ্ববিধাতাকে উৎসর্গ করিবে। ইতি--১১ই ফাল্গুন, ১৩২০

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের (১) প্রধান জজের পদ খালি হইয়াছিল তাহা আমি জানিতাম না--সে পদে প্রবীণ লোককে বসানই কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি আজ হইতে আরম্ভ হইল। আগামী আষাঢ় হইতে বিদ্যালয়ের কাজে অ্যাণ্ডুজ ও পিয়ারসন সাহেব যোগ দিবেন--তাঁহাদের দ্বারা আমাদের প্রভূত উপকার আশা করি। এরূপ সহৃদয় ভারতহিতৈষী আমি ত দেখি নাই।

আমি কলিকাতায় সপ্তাহখানেক থাকিয়া আলমোড়ার নিকট রামগড় পাহাড়ে যাইবার সংকল্প করিয়াছি। সেইখানেই ছুটি যাপন করিয়া আসিব।

ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার কল্যাণ কামনা করি। ইতি--১৬ই বৈশাখ, ১৩২১

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি আমার অন্তরের শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। তুমি যে বৃহৎ কর্ম্মভার লইয়াছ তাহা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিবার শক্তি ঈশ্বর তোমাকে দান করুন। তুমি বিজয়ী হও, তোমার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ হউক্। ইতি--১৫ই আশ্বিন, ১৩২১

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

নদীয়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

আমি শিলাইদহে নদীতে কিছুদিন হইতে আছি। তোমাদের ত্রিপুরার রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা কিরূপ কিছুই জানিতাম না। এমন সময় একজন আত্মীয় আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন তোমরা মন্ত্রীপদের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ খুঁজিতেছ এবং ইতিমধ্যেই অনেক ডেপুটি উমেদারী করিতেছেন।

(১) ত্রিপুরা রাজ্যের বিচারাদালতের।

সংবাদটি কি সত্য ? তুমি কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছ (১) ? ইহাতে নিশ্চয়ই তুমি মনের শান্তি পাইবে। কিন্তু আমি একান্ত আশা করি এই ব্যাপারে তোমার সাংসারিক গুরুতর ক্ষতি কিছুই ঘটিবে না। গবর্ণমেন্টের সহিত তোমার কিরূপ কথাবার্ত্তা এবং মহারাজের সহিত তোমার কিরূপ বন্দোবস্ত হইল তাহা জানিবার জন্য আমি উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম।

একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ এই পদের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন--তাঁহাকে জানি--লোকটি যোগ্য বটেন। কিন্তু আমার ত কিছুই করিবার নাই। তারপরে ওখানকার অবস্থা কিছুই জানি না। তোমরা কি অবশেষে ডেপুটি লওয়াই স্থির করিয়াছ ? তোমাদের জেলায় এ বৎসর বন্যা প্রভৃতি কারণে দুর্বৎসরের আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। ইতিমধ্যে তোমাদের রাজ্যের মধ্যে এই সকল অব্যবস্থার আসন্ন সম্ভাবনা--ইহাতে মনে উৎকণ্ঠা অনুভব করিতেছি।

একান্ত মনে তোমার কল্যাণ কামনা করি। ইতি--৪ঠা শ্রাবণ, ১৩২২

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

পোর্টসৈয়েদ

কল্যাণীয়েষু,

য়ুরোপের পালা সাঙ্গ হ'ল। আজ বিকালে এখান থেকে ভারতবর্ষের দিকে পাড়ি দেব। আমরা হিসাব করেছিলেম যে ঠিক ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই আশ্রমে পৌঁছতে পারব। কিন্তু শুনতে পাচ্ছি কলম্বো পৌঁছলেই ৩রা পৌষ হবে। কোনোমতে হয়ত ৮ই পৌষে শান্তিনিকেতনে গিয়ে হাজির হতে পারি। কিন্তু মনে বড় দুঃখ বোধ হচ্ছে। জার্ম্মান জাহাজ এখান থেকে কলম্বো যেতে ১৬ দিন লাগাবে। পিএনো জাহাজে এর চেয়ে দ্রুত যেতে পারতুম। কিন্তু হাড়পাকা এংলো-ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে এক জাহাজে বাসা করতে আমার রুচি হয় না। যাক্, দেশে ফিরে গিয়ে আশা করি তোমার সঙ্গে দেখা হবে। স্বরাজ্য থেকে নেমে একবার শান্তিনিকেতনে দেখা দিয়ো। এবার য়ুরোপের একপ্রান্ত থেকে আর এক-প্রান্ত আলোড়ন করে বেড়িয়েছি। সম্মান অভ্যর্থনা যথেষ্ট পাওয়া গেছে। কিন্তু তোমারি মত মনের অবস্থাটা ছিল--মনটা অহোরাত্র দেশের দিকে উড়ু উড়ু করেছে। বোম্বাই-ওয়ালা জাহাজ পেলে সুখী হতুম--কলম্বো দিয়ে যেতে অনেক হাঙ্গামা।--এবার য়ুরোপে তোমার ভ্রমণ হল বটে কিন্তু শরীরটা সারাতে পারলে না এই আমার বড় আক্ষেপ রইল। আশা করি দেশে গিয়ে যথোচিত সেবা শুশ্রূষায় ভাল বোধ করচ। আমি মাঝে মাঝে রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তাতে একটা এই সুবিধা হয়েছে যে আমার রাশিয়ায় যাওয়াটা বন্ধ হল। সেখানকার শীত এবং ভ্রমণের দুঃখ আমার কিছুতে সইত না।

প্রশান্ত ও রাণী(২) আরো চারমাসের জন্য য়ুরোপে রয়ে গেল। আমার সঙ্গ পেয়ে তারা য়ুরোপটা খুব ভাল করে দেখে নিতে পেরেছে। ইজিপ্টে এ কয়দিন বেশ কেটেছে--অনেক দেখবার জিনিষ ছিল--আদর যত্ন ও প্রচুর পাওয়া গেছে। বিস্তৃত বিবরণ দেশে গিয়ে আলোচনা করা যাবে। আমার সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ। ইতি--৩ ডিসেম্বর, ১৯২৬

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১) মহারাজকুমারের মন্ত্রিত্বপদ হইতে অবসর গ্রহণের বিষয়।

(২) শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবিশ ও তৎপত্নী রাণী দেবী

ওঁ

জোড়াসাঁকো
কলিকাতা

পরম কল্যাণীয়েষু,

অনেকদিন পরে আজ তোমার চিঠিখানা পাইয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি। বিদ্যালয়ের দান সাহায্য (১) জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিয়ো না। যখন তোমাদের সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়ো কিছুমাত্র তাড়া করিয়ো না। আপাতত তোমাদের রাজকার্য্যে শৃঙ্খলা-বিধান ও শান্তিস্থাপন হইয়াছে সংবাদ পাইলে আমি নিরুদ্বিগ্ন হইব। তোমার দ্বারা তোমাদের রাজ্যের মঙ্গল বিধান হইতেছে এমন সুসংবাদ আমার পক্ষে অতি অল্পই আছে। নিঃসন্দেহই ঈশ্বরের ইচ্ছায় বাধাবিঘ্ন সমস্ত কাটিয়া যাইবে। গোড়াতেই বিঘ্নের সহিত তোমাকে যে সংগ্রাম করিতে হইতেছে ইহাতে মঙ্গলই আশা করি। পথ সহজ হইলে জড়তা আক্রমণ করে। তোমাদের মাথার উপরে প্রকাণ্ড ঋণভার আছে এবং ঘরের বাহিরে তোমাদের শত্রুর অভাব নাই--ইহাতে মহারাজকে অনেকটা পরিমাণে সংযত ও সতর্ক করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই--এই সকল উপসর্গ না থাকিলে বাধাহীন সুযোগ হয়ত দুর্গতির পথকেই প্রশস্ত করিত। যেমনি হউক তোমার জীবন ব্যর্থ হইবে না এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে। ঈশ্বর তোমার শুভচেষ্টাকে সফল করিবেন। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি--চূড়াতেই তোমার জীবনের সার্থকতা প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সর্ব্বতোভাবে তোমাকে পরিপূর্ণতা দান করুন এই আমার হৃদয়ের গভীরতর কামনা জানিবে।

নববর্ষে তোমার পত্র পাইয়া তখনি তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। তোমাকে আমার অন্তরের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইতে আলস্য করিব এমন কখনই ঘটিতে পারে না। পত্র না পাইতে পার এই আশঙ্কাতেই গতবারে তোমাকে রেজিষ্ট্রি-ডাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম--এবারেও তাহাই করিব।

রথীন্দ্র দেশে ফিরিয়াছে। তাহাকে কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারিলেই সংসারে আমার ছুটি মিলিবে। গগনের(২) কাছে শুনিলাম তোমার শীঘ্র কলিকাতায় আসিবার সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলে তোমার সহিত অনেক কাল পরে সাক্ষাৎ হইতে পারিবে এই আশ্বাস মনে রহিল। রথীর জন্য কিছুদিন আমাকে কলিকাতায় যাপন করিতে হইবে। ইতি--২৭শে ভাদ্র, ১৩১৬

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঁমহিম ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

মহিমার্ণব,

আমার পত্র নিশ্চয়ই পূর্ব্বেই পাইয়াছেন। ইতিমধ্যে সর্ব্বানন্দের হস্তে পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। মহারাজার জন্য সর্ব্বানন্দের হস্তে একটী সাদা রেশমের থান উপহার পাঠাইলাম।

আপনার জন্যও রাজসাহী শিল্প বিদ্যালয় হইতে মট্‌কার থান প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে উপহার পাঠাইব--ইহার প্রস্তুত এক সুট সাজ পরিয়া আমার সহিত শিলাইদহে যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন বিশেষ আনন্দলাভ করিব।

(১) ত্রিপুরা রাজ্যসরকার হইতে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য নিয়মিত বার্ষিক অর্থসাহার্য্য।

(২) গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিল্প বিদ্যালয়কে উৎসাহ দিবার জন্য সেখান হইতে আমি সর্ব্বদাই রেশমের বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকি--দোষের মধ্যে লোক ও সামর্থ্য অল্প হওয়াতে তাহারা শীঘ্র ও অধিক পরিমাণে কাপড় যোগাইতে পারে না,---বন্ধুদের নিকট আমার এই সকল বস্ত্র উপহার কেবল আমার উপহার নহে তাহা স্বদেশের উপহার। অতএব আশা করি আপনারা তুচ্ছ বলিয়া ইহাকে অনাদর করিবেন না। ইতি--৩০শে চৈত্র, ১৩০৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

নানা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। স্কুলের বন্দোবস্ত লইয়াও অনেক সময় গেছে। আমাদের বিদ্যালয়ে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা করা যাইতেছে। কেমিষ্ট্রি ও ফিজিক্যাল্ সায়ান্সে এম্-এ পাস করা একটি সুযোগ্য লোক পাওয়া গেছে তিনি নানা প্রকার শিল্পকার্যেও দক্ষ। তাঁহার অধীনে ছেলেদের শিক্ষা পরীক্ষা ও আমাদের জন্য একটি ছোটখাট Workshop খোলা যাইবে।

হেস্‌কে (১) দুই সপ্তাহ বাড়ি ছাড়িবার কথা বলিয়া রাখিয়াছি। আমার পত্র পাইয়াই, কবে তাহাকে বাড়ি খালি করিতে হইবে দিন স্থির করিয়া টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়ো-- তাহা হইলে বেচারা আগে হইতে প্রস্তুত হইতে পারিবে।

মহারাজকে শান্তিনিকেতনের সমস্ত সংবাদ দিয়াছ--আশা করি তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পিতাঠাকুর রাজকুমারের (২) আগমন সংকল্পে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি এ কয়দিন প্রত্যহ প্রাতে এই বিদ্যালয় লইয়া আমার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। পাছে শীঘ্র বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ না হইলে তাঁহার জীবিত কাল অতিক্রান্ত হয় এই তাঁহার আশঙ্কা। এই কাজটিকে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্যরূপে দেখিয়া যাইতে চান। মহারাজ তাঁহার এই কাজে আত্মীয়ভাবে যোগ দিয়েছেন বলিয়া তিনি অন্তরের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।*

জগদীশবাবুর সেই টাকাটা সুরেনকে(৩) ১৯ নং ষ্টোর রোড্ বালিগঞ্জের ঠিকানায় অবিলম্বে পাঠাইয়া দিয়ো সে বিলাতে যথাস্থানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। এই কাজে তোমরা অসাবধানবশতঃ দেরি করিয়ো না। যত সময় যাইবে ততই জগদীশবাবু বিপন্ন হইবেন এবং তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত হইবে।

আমি আজ এখনই বোলপুরে রওনা হইতেছি। সকালের প্যাসেঞ্জারের ছাড়িব। এখন ভোর সাড়ে চারটে। আলো জ্বালিয়া তোমাকে লিখিতেছি। তুমি এতক্ষণে নাসিকাগর্জ্জনে তোমার শয়নাগারের ভিত্তি কম্পান্বিত করিয়া তুলিয়াছ। তোমার সেই লেখা অবিলম্বে পাঠাইয়ো--প্রেসে লেখা দিবার সময় আসিয়াছে তোমার হারা ক্যামেরা পাইয়াছ ত ? হারানই উচিত ছিল । --ইতি--১লা অগ্রহায়ণ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১) বিখ্যাত চিত্রকর শশীকুমার হেশ।

(২) মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর।

(৩) সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

*আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মহর্ষিদেবের উৎকণ্ঠা ও মহারাজ রাধাকিশোরের আত্মীয়ভাবে যোগদান আরও পরিস্ফুট হইয়াছিল মহারাজের বিদ্যালয় পরিদর্শনে। ইহা গ্রন্থের ১১০ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। এই পরিদর্শনের স্মৃতি ব্যক্ত করিয়াছেন ত্রিপুরার শিক্ষার্থী ও আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র প্রাচীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়। কর্ণেল মহিম ঠাকুর, ডাক্তার অমিয়মাধব মল্লিক, দেওয়ান বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ পারিষদবর্গসহ মহারাজ শান্তিনিকেতনে একরাত্রি বাস করিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বর্দ্ধমান হইতে নেওয়া বড় বড় হাঁড়িভর্ত্তি মিঠাই মহারাজকর্ত্তৃক আশ্রমবালকদের মধ্যে বিতরণ, কলিকাতা হইতে নীত জুড়ি ঘোড়ায় টানা ব্রুহাম গাড়ীতে মহারাজের বোলপুর ষ্টেশন হইতে আশ্রমে গমন আগরতলার বালকগণকে কবি কর্ত্তৃক বিশেষভাবে রাজসকাশে উপস্থিত করা প্রভৃতি ঘটনা অধ্যাপক মহাশয়ের স্মরণে এখনও সুস্পষ্ট হইয়া আছে।

প্রিয়বরেষু,

কিছু মনে করিয়ো না। আমার প্রতি এই বিশ্বাস রাখিয়ো যে স্বদেশের কাজের জন্য আমার হৃদয় একান্ত উৎসুক--যদি কোন হিতকর কর্ম্ম উপলক্ষে কখনও শুনি যে স্বার্থসাধনই আমার গোপন অভিপ্রায় তবে তাহা মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠে। এরূপ সংশয় মাত্র যদি কেহ মনে জাগাইয়া দেয় তবে অসহ্য বোধ হয় তাই একদিন তোমাদের প্রতি মন অত্যন্ত বিমুখ হইবার উপক্রম করিয়াছিল। তোমার সহৃদয় পত্র পাইয়া সে সমস্তই মন হইতে দূর করিয়া দিলাম।

কাল আমার জামাতাকে আমেরিকায় রওয়ানা করিয়া দিতেছি, তাই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আছি। আমাদের বোলপুর আশ্রমের সেই বিদ্যালয়টা স্থাপন করিবার আয়োজনেও ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। সকালে বাহির হইয়াছিলাম। আহার করিয়া আবার এখনি বাহির হইতেছি--গাড়ী দ্বারে উপস্থিত। একটি ভাল অধ্যাপকের খবর পাওয়া গেছে।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বেচারা সম্প্রতি অর্থকষ্ট ভোগ করিতেছেন। তোমাদের কাছে তাঁহার যে টাকা পাওনা আছে-- একটু জল্‌দি পাঠাইয়া দিলে তাঁহার বিশেষ সাহায্য হয়। মজুমদার কোম্পানীকে সত্বর পাঠাইয়ো। নহিলে তাহাদিগকে নিজ হইতে ধার করিয়া এই টাকা গোস্বামী মহাশয়কে দিতে হইবে। মহারাজকে কাল চিঠি লিখিব। আমি বোধ হয় শীঘ্র একবার ত্রিপুরায় যাইব। জগদীশবাবুর ও রমেশ দত্তের পত্র পাইয়াছি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

তোমার চিঠি পাইয়া খুসী হইয়াছি। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র নীতুর পীড়া অত্যন্ত সংশয়াপন্ন অবস্থায় আসিয়াছে সেইজন্য ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে ও দুশ্চিন্তায় শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

*হেশ বেচারাকে মহারাজ বালিগঞ্জের বাড়িতে থাকিতে দিয়া বড় ভাল করিয়াছেন, সে বোধ হয় এতদিনে তোমাকে চিঠি লিখিয়া থাকিবে।

আমাদের শান্তিনিকেতনের বোর্ডিং বিদ্যালয়ে রথীকে পড়াইব, সেইজন্য লরেন্সকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বিদায় দিতে হইতেছে। যদি তোমাদের আগরতলায় ঠাকুরদের স্কুলে তাহাকে ইংরেজী অধ্যাপক নিযুক্ত কর তবে তোমাদেরও উপকার তাহারও উপকার। এরূপ সুযোগ আর পাইবে না। লরেন্স পড়াইবার বিদ্যা যেমন জানে এমন অল্প লোককেই দেখিয়াছি। ও আমাকে এখনও ছাড়িতে চায় না কিন্তু উপায় দেখি না । জগদীশবাবুর নেগেটিভ পাঠাইতে দেরী করিয়ো না।

আমি পূজার পরেই ত্রিপুরায় যাওয়া স্থির করিয়াছি। সম্প্রতি আমি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া বিশাম লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেখানে বিদ্যালয়টি যাহাতে আদর্শ বিদ্যালয় হইতে পারে এই আমার একমাত্র চেষ্টা।

তোমার প্রবন্ধের কোন উচ্চবাচ্য নাই কেন জানিতে চাই। আর বিলম্ব করিয়ো না।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের মূল্যের জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার আর্থিক অভাব ঘটিয়াছে। সে টাকাটা পাঠাইতে দেরী করিয়ো না। ইতি--১৮ই ভাদ্র, ১৩০৮

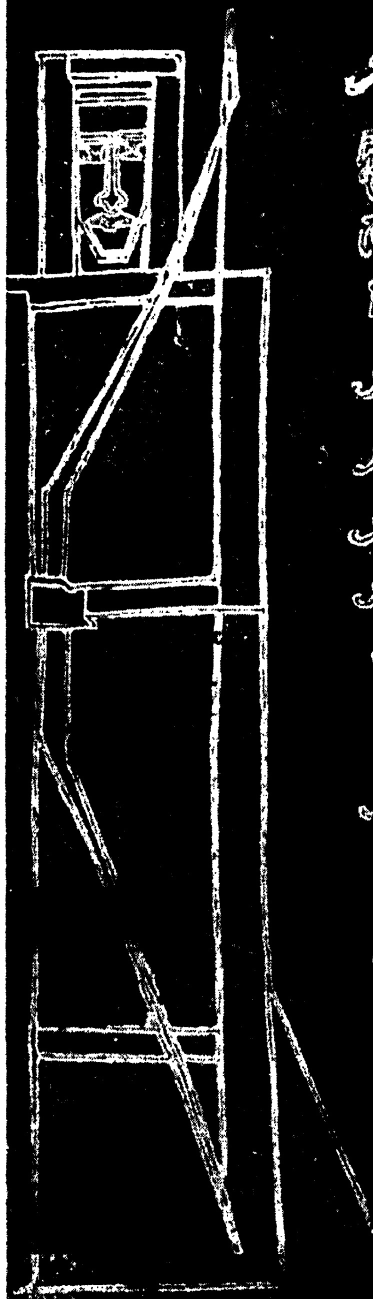
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

' হেশ--বিখ্যাত চিত্রকর শশীকুমার হেশ।

৫৭। শ্রী ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মা
ও শ্রীমতী সরযূ দেবীকে প্রেরিত
অঙ্কিত চিত্রসহ বিজয়ার আশীর্ব্বাদ

কল্যাণীয় ধীরেন
এবং সরযূ — তোমরা
দুজনে আমার বিজয়ার
আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো।
ইতি বিজয়াদশমী
১৩৪৫ শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





৫৮। "এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে" — কবির লিপিচিত্র

শান্তিনিকেতন
২৭/৩/৩২

৫৯। শিল্পী শ্রী নলিনীকান্ত মজুমদার অটোগ্রাফ খাতায়

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

অদ্য সরলার(১) পত্রে দেখিলাম, মোক্ষদাবাবু (২) তাহাকে বলিয়াছেন যে তুমি মোক্ষদাবাবুকে জানাইয়াছ যে তোমরা ভারতীকে সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে আমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছি। এরূপ ঘটনা কবে হইল মনে পড়িতেছে না। মহারাজা আমাকে সরলার পত্র পড়িতে দিয়াছিলেন মাত্র--তখন প্রথম সংখ্যক বঙ্গদর্শন ছাপা প্রায় শেষ হইয়াছে। কিন্তু ভারতীকে সাহায্য করিবার কথা কবে হইয়াছিল জানাইবে।

আগরতলার অবস্থা কি, তোমরা কেমন আছ জানিতে উৎসুক আছি। তোমর সে লেখা আমাবে কেন পাঠাইলে না? শ্রাবণের বঙ্গদর্শন যে প্রায় ছাপা শেষ হইল ।

ছবিগুলির কোন খরব পাইয়াছ ?

লরেন্স আমাকে ছাড়িতে চায় না। আমরা আবার শিলাইদহে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতেছি। কলিকাতায় আমার দ্বারা লেখাপড়ার কাজ একেবারেই চলে না। আধুনিক একজন সুলেখক বিজ্ঞানবিদ্ জগদানন্দ রায়ের লেখা পড়িয়া থাকিবে। লোকটির যেমন পড়া--শুনা তেমনি নিরীহ সাধু স্বভাব--কিছু কাল কৃষ্ণনগরে স্কুলে গণিত পড়াইয়াছিলেন, যদি ভাল লোক এবং ভাল শিক্ষক চাও ত তাঁহাকে দিতে পারি। কিন্তু তোমাদের আগরতলার অবস্থার মধ্যে পড়িয়া পাছে বেচারার অনিষ্ট হয় এই জন্য আশঙ্কা করি। আপাততঃ রথীকে অঙ্ক শিখাইবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছি। তিনি অত্যন্ত সৎপ্রকৃতির লোক।

বৃষ্টি পড়িতেছে। রীতিমত বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এ অঞ্চলে শস্যের অবস্থা বেশ ভালই দেখা যাইতেছে।

শিলাইদহে আসিয়াছি। দুই চারি দিনের মধ্যে কলিকাতায় ফিরিব। তোমার লেখা শীঘ্রই দিয়ো। বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে যদি তোমাদের মনে লেশমাত্র দ্বিধা থাকে আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিয়ো না--তোমাদের প্রতিশ্রুতি হইতে আমি তোমাদিগকে প্রসন্ন মনে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দান করিব--আমি মহারাজকে কোন বিষয়ে লেশমাত্র সঙ্কটে ফেলিতে চাই না। তাঁহার সুপ্রসন্ন সৌহার্দ্যই আমি চাই ; আর সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করি ।
মঙ্গলবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

আমি তোমাকে সকল কথা খোলসা করিয়াই বলিতেছি। বঙ্গদর্শন যখন আমার হাতে আসিল তখন উহাকে সর্ব্বাংশে প্রথম শ্রেণীর কাগজ করিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। সেজন্য যে ব্যয় এবং চেষ্টার প্রয়োজন দুভার্গ্যক্রমে আমার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। সেই ব্যগ্রতায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই আমি বঙ্গদর্শন চালনায় মহারাজের সাহায্য চাহিয়াছিলাম। নানা কারণে ধারনা হইয়াছে যে তোমরা ইহাতে আমার স্বার্থাভিসন্ধি কল্পনা করিয়াছ। আমি ভাবিলাম তোমরা রাজ-পারিষদ । লোকের সাধু উদ্দেশ্যে তোমাদের বিশ্বাস নাই--সকলকেই তোমরা সন্দেহ চক্ষে দেখ--মহারাজের স্বাভাবিক ঔদার্য্যকে তোমরা আচ্ছন্ন করিয়া আছ। বস্তুতঃ মহারাজের মত লোকের সহিত সংস্রব রাখিলেই সাধারণ লোকে সন্দেহের চক্ষেই দেখে। সাধারণের কাছে আমার প্রতিপত্তি আছে--আমি স্বার্থপরভাবে ভিক্ষুভাবে মহারাজের দ্বারে গমনাগমন করি এ অপবাদ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি।

(১) সরলা দেবী

(২) মোক্ষদাবাবু--মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের শিক্ষক।

মহারাজ আমাকে মান্যবন্ধু ভাবে দেখিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে নিজে স্বভাবতঃই ইচ্ছুক কিন্তু শুনিতে পাই তোমরা তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে সুদূরে রাখিতে চেষ্টা কর--সুতরাং মহারাজের সহিত আমার প্রিয়সম্বন্ধ লোকচক্ষে হীন করিয়া তুলিতেছ। এই সকল কারণে মহারাজের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সত্ত্বেও আমি ক্রমশঃ দূরে নির্লিপ্ত থাকিবার চেষ্টায় ছিলাম। কেবল জগদীশবাবুর কার্য্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না--লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং আমি যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব--ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য্য নহে, স্বদেশের কার্য্য। সুতরাং ভিক্ষুভাবেই আমি এবার অসঙ্কোচে মহারাজের দ্বারে দাঁড়াইব। আমি ধনীর পুত্র ধনী নহি--অন্তরে ঈশ্বর যে সকল শুভ সংকল্প প্রেরণ করেন তাহা সাধনের ক্ষমতা আমার হাতে দেন নাই--সুতরাং শুভকর্ম্মের অন্তরায় স্বরূপ সমস্ত অভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। জগদীশবাবুর জন্য তাহাই দিব । তাহার পরে যদি পারি তবে সংসারের সমস্ত স্তুতিনিন্দা হইতে নিজেকে দূরে লইয়া গিয়া শান্তচিত্তে স্বচেষ্টায় নিজের কর্ত্তব্য পালন করিব।

বেলার বিবাহ সম্বন্ধে তুমি যে পথ লইয়াছিলে তাহাতে আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন জানিবে। বস্তুতঃ আর কোন রকম ব্যবস্থা হইলে কিছুতেই ভাল হইত না। তুমি যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া যথা কর্ত্তব্য করিয়াছ।

আমি যাহা লিখিলাম তাহাতে কিছু মনে করিয়ো না, সকলের প্রকৃতি একরূপ নহে, আমার অন্তঃকরণের পরিচয় যদি তোমার কাছে না থাকে তবে সেজন্য আক্ষেপ মন হইতে দূর করিয়া দিব। সর্ব্বাংশেই মিল না লইলে যে বন্ধুত্ব হয় না তাহা নহে। তুমি আমাকে সরল হৃদয়ে যতটুকু প্রীতিশ্রদ্ধা দিতে পার আমি ততটুকুই বন্ধুভাবে গ্রহণ করিব--যে অংশে তুমি আমাকে ভুল বুঝিবে, বা না বুঝিবে সে অংশ তোমার কাছে অগোচর থাকিবে, এই মাত্র ।

পূজার সময় তোমাদের ওখানে যাইব কল্পনা ছিল। কিন্তু সে সময়ে বেলা ও আমার জামাতা এখানে আসিবে--তাহাদের ফেলিয়া যাইতে পারিব না। অতএব যদি যাওয়া স্থির করি আর কোন সময়ে যাইব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

প্রিয়বরেষু,

ছবির কি হইল বল দেখি ? যেটি ছিল সেইটি ফেরৎ পাইলেই আপাতত আমি নিশ্চিন্ত থাকিব।

তোমাকে আর একটা কাজের কথা বলিতে চাই । তোমরা রাজসভাসদ, মনোযোগ করিবে কিনা জানি না কিন্তু আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমাদের বোলপুর বিদ্যালয়ের একটা বড় ঘর তোমাদের দেশের মুলিবাঁশের দরমার দ্বারা ছাউনি করিতে চাই। খবর পাইলাম কুমিল্লা হইতে ছাইবার উপকরণ সস্তায় পাওয়া যায়। কিনিতে কত দাম পড়ে এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে আমাদিগকে জোগাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবে কিনা শীঘ্র জানিতে ইচ্ছা করি। বোলপুর পর্যন্ত ষ্টীমারে ও রেলগাড়ীতে কত খরচ পড়া সম্ভব তাহা কি আনুমানিক কতকটা জানা যাইতে পারে ? আমাদের হেড মাষ্টারবাবু বলিতেছেন তোমাদের দেশের বাঁশের কাজ আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে অতি সুন্দর ও স্থায়ী হইবে। এ সম্বন্ধে তোমার পরামর্শ জানিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু চিঠির উত্তরটা যদি একটু তৎপরতার সহিত দিতে পার তবে ভাল হয়।

সমস্ত স্কুলটি শিলাইদহে আনিয়াছি সে খবর বোধ হয় পাইয়াছ। ইহাতে বিস্তর ব্যয় ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে--তাহাই লইয়া এখনো বিব্রত আছি। ১৫ই বৈশাখ পর্য্যন্ত বিদ্যালয় এখানে থাকিবে।

যতীর(১) শাশুড়ী যতীর জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। সেজন্য যতীর সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া মহারাজকে একখানা চিঠি লিখিয়াছি। ফল হইবার আশা আছে কি ? লাহোরিণী (২) বড়ই ধরিয়া পড়িয়াছেন।

"হরিদাস ঠাকুর" প্রভৃতির গ্রন্থকার অঘোরনাথ(৩) তোমাকে পত্র লিখিয়াছেন। তোমাদের নিকট সাহায্য লাভের আশা করিয়া তিনি আমাকে পত্র লিখিতেছেন।

একপত্রে অনেকগুলি দরবার উপস্থিত হইল--এইখানেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত। ইতি--৭ই ফাল্গুন, ১৩১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু,

আজ এইমাত্র তোমার চিঠি পাইলাম ও পড়িয়া সুখী হইলাম। তোমার প্রতি বিশ্বাস দূর করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন--সেইজন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গল সাধনের জন্য আমি বারম্বার তোমার দিকে তাকাই। এই রাজ্যের সঙ্গে আমার যেন ধর্ম্মের সম্বন্ধ বাধিয়া গেছে--আমি যতই ইচ্ছা করি ইহার সম্বন্ধে আমি মনকে উদাসীন করিতে পারি না। এক এক সময় অভিমান করিয়া তোমাদের সংস্রব হইতে একেবারে দূরে সরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে--কারণ রাজা মাত্রেরই চারিদিকের আবহাওয়া এমনতর, এত চক্রান্ত ও চক্রীদের দ্বারা রাজাকে সর্ব্বদা বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয় যে তাহার মধ্যে দুর্দ্দৈববশত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলে মনের মধ্যে বারম্বার গ্লানি জন্মিতে থাকে। কিন্তু বিধাতা কেন আমাকে এখানে টানিয়াছেন জানি না--মহারাজের সঙ্গে তিনি আমার একটি মঙ্গল সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন। এখন আর আমার দ্বারা তো মহারাজের বিশেষ কোন উপকারের সম্ভাবনা দেখি না--আমার সাধ্যও নাই, সময়ও নাই, সুযোগও নাই--তোমাদের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই নিজের কোন দুর্ব্বলতাবশত তোমাদের রাজ্যের হিতসাধনে নিজেকে অক্ষম করিয়ো না। তোমার উপর যে মহৎ দায়িত্ব আছে তাহা ঠিকমত সাধন করিয়া যাইতে পারিলে তুমি জীবন সার্থক করিবে। সার্থকতার এত বড় ক্ষেত্র ও অবসর সকলের জীবনে ঘটে না--ঈশ্বর তোমাকে যথেষ্ট বুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়াছেন এবং তোমার মনে একটা উচ্চ আদর্শও আছে।.....অতএব তোমাদের রাজ্যের মঙ্গলব্রত তোমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে--তাহা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য কিন্তু যদি নিজের লাভক্ষতি ও আরামের দিকে লেশমাত্র না তাকাইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পার তবে কিছুই অসাধ্য নহে। তোমার ছেলেকে আমি বিলাসের নাগপাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া পুরুষোচিত গুণে ভূষিত করিতে চাই যাহাতে বড় হইয়া সে নিজের অভ্যাস ও সংস্কারে পদে পদে জড়িত হইয়া কর্ত্তব্যের পথে নিজেকে অচল করিয়া না ফেলে। আশা করি সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তোমাদের রাজ্যের পক্ষে একটি লাভস্বরূপে গণ্য হইবে। ইতি--৬ই চৈত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১) যতীন্দ্রনাথ বসু।

(২) লাহোরিণী--যতীন্দ্রনাথ বসুর শাশুড়ী শরৎকুমারী চৌধুরাণী।

(৩) অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী।

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

বেচারা দীনেশবাবু (১) বারম্বার তাঁহার দীনতা জানাইয়া আমাকে পত্র লিখিতেছেন। তিনি এই দুর্ভিক্ষের দিনে বড়ই কষ্টে পড়িয়াছেন--বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে যা হয় কিছু পাঠাইয়া দিয়ো। আমি অবশেষে বোলপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন কিছুকাল আর নড়িবার ইচ্ছা নাই। খুব গরম পড়িয়াছে। কিন্তু রেণুর (২) শরীর বেশ ভালই আছে।

আশা করি রাজকার্য্যের নূতন বিধানে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই । কুমিল্লায় যে অল্পকাল ছিলাম তাহার মধ্যেই অনেক জল্পনা-কল্পনা ও ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়াছি। মন্ত্রীকে অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় সাহায্য করিয়ো তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

বোর্ণ সেফার্ডকে সেই নেগেটিভগুলি দিয়াছি কবে ছবি তুলিয়া দিবে জানি না। লালু(৩) ত কুমিল্লা হইতেই ফিরিয়াছিল। তাহার শরীরের জন্য আমি উদ্বিগ্ন আছি ; তাহাকে কার্সিয়াং পাঠাইবার ব্যবস্থা কতদূর অগ্রসর হইল ?

আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানিবে এবং গৃহিণীকেও জানাইবে। আশা করি নবকৃষ্ণ ঠাকুরের খেলায় কোন বিঘ্ন ঘটে নাই । ইতি- ৯ই বৈশাখ, ১৩১৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বোলপুর

প্রিয়বরেষু,

যতী রমণীরা আমাকে আজকাল চিঠি লেখেই না--তোমাদের রাজ্যের কোন খবর পাইনে। বিলিতি একটা প্রবাদ আছে যে No news is good news । আমি তাই মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি । তা ছাড়া দূরে থেকে তোমাদের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত মনে করিনে। প্রায় সকল কর্ম্ম থেকেই আমি অবসর নিয়েছি--এখন কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াচ্ছি। তোমার রেণু আমার ক্লাসে বাংলা পড়ে। যাই হোক তোমাদের কাছ থেকে খবর পেলে আমি যথাসাধ্য রমণীকে সতর্ক করে দিতে চেষ্টা করতে পারি।

ছুটীর সময়ে রেণুকে একটু বিশেষ সাবধানে রাখা দরকার হবে। সেই দীর্ঘ অবকাশের সময় যাতে সে তার পুরাতন সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে আবার সকল বিষয়ে আলগা হয়ে না যায় বিশেষ দৃষ্টি রেখো।

এখানে যতটা পারি তাকে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল ও সবল করে নিতে চেষ্টা করা যাচ্ছে। কিন্তু অল্পদিনের শৈথিল্যে অবহেলায় সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ছুটীর সময়ে যদি মোক্ষদাবাবু রেণুকে এবং তাঁর ছেলেকে নিজের কাছে রেখে এখানকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক অল্প করে নিজে পড়াতে থাকেন তাহলে ভাল হয়। তোমাদের বাড়ীতে সমস্ত হট্টগোল--তুমি সকল সময়ে দেখবার সময় পাও না--এবং নানা কর্ত্তা ও কর্ত্রীপক্ষে মিলে ছেলেদের মনকে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত করে দিলে বড়ই অনিষ্ট হয়। যেমন করেই পার ছুটীর তিনমাস যাতে রেণু সুসঙ্গে সংযমে এবং সুশিক্ষায় রক্ষিত হতে পারে তার প্রতি

---

(১) দীনেশবাবু--দীনেশ চন্দ্র সেন।

(২) রেণু--সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা

(৩) লালু--মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর।

সবিশেষ মনোযোগী হ'বে। তোমাদের সব খবর দিয়ো। মহারাজ কেমন আছেন লিখো--তাঁকে আমার সাদর অভিবাদন জানিয়ো। ইতি--২রা আষাঢ়, ১৩১৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যতীন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত

ওঁ

বোলপুর

যতী,(১)

নববর্ষে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস ও মঙ্গলের প্রতি নির্ভর রক্ষা করে তুমি সংসারের সমস্ত পঙ্কিলতার মাঝখান দিয়ে নির্ম্মল চিত্তে চলে যাও। ঈশ্বর তোমার জীবনকে পূণ্যের মধ্যে সার্থক করুন।

সেদিন সেই ছেলেটি আমার সঙ্গে আসতে পারেনি। তার বাপ তাকে চৈত্র সংক্রান্তিতে কোনোমতে বেরতে দেয়নি। হয়ত আস্ছে শনিবারে আসতে পারে। এবং যদি নাই আসে তাতেই বা কি ? আমি ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে মনকে অকারণ উৎকণ্ঠা থেকে রক্ষা করতে চাই।

এখানে এসে দেখি বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে হঠাৎ পানবসন্ত দেখা দিয়েছে। এতগুলি ছেলেকে নিয়ে ছোঁয়াচ সামলানো বিষম ব্যাপার। বোধ হচ্চে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলিকেই শয্যা আশ্রয় করতে হবে। আমার ক্ষুদ্র সংসারটির বাইরে যে বৃহৎ সংসার ফেঁদে বসেছি এই সব তার সমস্যা।

আমার গদ্য গ্রন্থাবলীর প্রথম সংখ্যা (বিচিত্র প্রবন্ধ) ছাপা হয়ে গেছে। এই বইয়ের স্বত্ব বিশেষভাবে বোলপুরে দিয়েছি। যদি কিছু বিক্রি হয় তবে আমার কিঞ্চিৎ ভার লাঘব হবে। তুমি যদি মহারাজকে দিয়ে কয়েক খণ্ড কেনাতে পার তবে আমার উপকার হয়। (২) তুমি যে কয়েকখানা তাঁর কেনা সম্ভব মনে করো সেই কয়খানা যদু কিম্বা শৈলেনের কাছ থেকে একেবারে নিয়ে যেয়ো--এবং একখানা বাঁধানো বই আমার উপহার স্বরূপে মহারাজকে দিয়ো। তোমার জানাশোনা আর কোন লোককেও এই বই বেচবার চেষ্টা করো। বিদ্যালয়ের ভার আজকাল অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছে। ইতি--৩রা বৈশাখ, ১৩১৪

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর নিকট লিখিত

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

মাননীয়াসু,

আপনার রচিত "শোকগাথা" ও "কনিকা" উপহার পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনার এই কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের একটি স্বাভাবিক সৌরভ অনুভব করি। ইহাদের সৌন্দর্য্য বড় সরল এবং সুকুমার অথচ কলানৈপুণ্যও আপনার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ--এই নৈপুণ্য আপনার শেষ কাব্যগ্রন্থটিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

আপনি নিশ্চয় জানেন আপনার পিতা(৩) আমাকে স্নেহ করিতেন এবং আপনার ভ্রাতা স্বর্গীয় মহারাজও(৪)আমাকে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, আপনাদের পরিবারের সহিত আমার এই আন্তরিক

(১) মহারাজের একান্তসচিব যতীন্দ্রনাথ বসু।

(২) ত্রিপুরা রাজ্য সরকার কয়েকশত পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন।

(৩) মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য।

(৪) মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য।

প্রীতি সম্বন্ধ আছে বলিয়া আপনার কবিত্ব পরিচয়ে আমি বিশেষভাবে তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আপনার এই কবিত্ব শক্তির পূর্ণবিকাশের মধ্যে আপনার জীবনের সমস্ত দুঃখ বেদনা সার্থকতা লাভ করুক এই আমার কামনা। ইতি--১৭ই শ্রাবণ, ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যোগেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত

ওঁ

কলম্বো

কল্যাণীয়েষু,

যোগীন, আমি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলুম বলে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পারিনি। এখনো দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্চি বিশ্রামের সময় পাচ্চিনে। আজই আর কিছুক্ষণ বাদে এখান থেকে ত্রিবাঙ্কুরে রওনা হতে হবে, তারজন্য প্রস্তুত হতে হচ্চে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

শুভাকাঙ্ক্ষী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মাকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

প্রবাসের পালা শেষ করে আবার আমাদের সেই আশ্রমে এসে বসেছি। কত আরাম সে আর বল্‌তে পারিনে। দেশে বিদেশে সম্মান সম্বর্দ্ধনা ত অনেক পেয়েছি কিন্তু এখানকার খোলা আকাশের এই নির্ম্মল আলোকে প্রতিদিন যে অভিষেক হয় তার কাছে কিছুই লাগে না। আশ্রম জননীর স্তন্যধারায় যে কি অমৃতক্ষরণ হয় সে কথা দূরে থাক্‌তে মাঝে মাঝে ভুলে যাই--সেখানকার কারখানাঘরের কৃত্রিম তৈরী কেমিক্যাল ফুড খেয়ে মনে হয় আর কিছুর বুঝি কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রয়োজন যে কত সুগভীর তা এখানে এলে তখনি বোঝা যায়--মনে হয় বেঁচে গেলুম বেঁচে গেলুম।

এখন বিদ্যালয়ের ছুটি--ছেলেরা সবাই বাড়ি গেছে কেবল এন্ট্রেন্স ক্লাসের ছেলেরা এবং পুরাতন ছাত্রদের কেউ কেউ এখানে আছে। আমি সম্মানের তাড়ায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে এখানে নির্জ্জনে আশ্রয় নিয়েছি। এখন পূজার ছুটি বলে আপাতত অনেক উৎপাত থেকে রক্ষা পেয়েছি কিন্তু শুনতে পাচ্চি ছুটির পরে নবেম্বর মাসে আমাকে সং সাজিয়ে টাউন হলে একটা সমারোহ করবার জন্য ষড়যন্ত্র এবং চাঁদা আদায় চলচে--সুতরাং নবেম্বরের কয়েকদিন পূর্ব্বেই আমাকে বাংলাদেশ ছেড়ে কোথাও যেতে হবে। আজকাল বাংলাদেশের বাইরেও আমার পক্ষে নিরাপদ স্থান নেই, মনে করচি হরিদ্বারের কাছে আর্য্য-সমাজীদের যে গুরুকুল আছে সেইখানে কিছুদিন অজ্ঞাতবাস যাপন করে আসব।

তোকে আর কি বলব--তুই তোর শিক্ষা সমাধা করে আয়, বড় হয়ে আয় পূর্ণ হয়ে আয়, বিশ্ব-পৃথিবীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে আয়--ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের মোহ তোকে না ধরে, বিলাসের প্রলোভন তোকে না ভোলায়, জনতা আবর্ত্তের টানের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে তোর আপনাকে যেন একেবারে তলিয়ে না দিস্। --ইতি-২৬ আশ্বিন, ১৩২০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু,

সোমেন্দ্র, তোর চিঠিখানি পেয়ে খুব খুসী হলুম। তোদের ওখানে কাজ করবার বাধা যে কত প্রবল সে আমি জানি। কিন্তু সেই বাধার সঙ্গে লড়াই করাই ত গৌরবের কথা। আমার মনে একটা ভয় ছিল পাছে কিছুদিন চেষ্টার পরে হাল ছেড়ে দিয়ে শেষ কালে তুই ওখানকার পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যাস্ কিন্তু কিছুতেই হার মানিসনে রে ! ও যে তোরই দেশ--আর তোর জীবনের দায়িত্ব যে তোর আপনারই। হারতে হারতে মার খেতে খেতে একদিন তোর জিৎ হবেই-- কিন্তু বরাবর সিধে থাকিস্--যারা তোকে আঘাত করবে তারাও যেন মনে মনে তোকে শ্রদ্ধা করে। লালুকে (১) তাঁর কোণের ভিতর থেকে টেনে বের কর ! তিনি পরাভবের আশঙ্কা করে পলায়ন করলে চল্‌বে না । আগরতলার কলঙ্ক মোচন করবার দায়িত্ব তাঁরই--তাঁর সে শক্তিও আছে--জোর করে তাঁকে তাঁর আপনার স্থানটি অধিকার করতে হবে--

বদ্ধ দুয়ার দেখলি বলে
অমনি কি তুই আস্‌বি চলে ?
বারে বারে ঠেলবি দুয়ার
হয়ত দুয়ার টলবে না--
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না ।

বেলার(২) শরীর ত ভাল নেই। তাকে যে রোগে ধরেচে তাতে সারবার আশা করিনে--তবে যে কয়দিন বেঁচে থাকে যাতে কম কষ্ট পায় এইটেই দেখতে হবে।

তোদের দেশ থেকে গোটা দশ বারো বাঁশের বাঁশি আমাকে পাঠিয়ে দিস । কিন্তু তাতে ছিদ্র করে দিস্‌নে--ছিদ্র এইখানেই করিয়ে নেব--তোদের Scale হয়ত বিশুদ্ধ না হতে পারে ।

তোর বাবা(৩) যদি শান্তিনিকেতনে এসে আশ্রয় নেন ত ভালই হয়। কোথায় কিরকম ভাবে বাড়ি করতে চাস একবার তোরা নিজেরা এসে দেখেশুনে ঠিক করে যাস। এখানে জমি পাবার কোন বাধা হবে না।--ইতি ১১ই ভাদ্র, ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোর কাজকর্ম্মের কথা শুনে খুব খুসী হলুম। দেখা হলে আরও খুসী হব। বিদেশে একরকম সম্মানের সঙ্গে কাটিয়ে এলুম--দেশে বোধ হয় মানরক্ষা হবে না--নানাভাবের বাঁকা কথা এখন থেকেই শোনা যাচ্ছে। সে কথাগুলো বিশেষ শ্রুতিমধুর বলে বোধ হচ্ছে না। তোর বাবাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাস। ---ইতি ৯ই শ্রাবণ, ১৩২৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

সমস্ত ছুটি এখানেই কাট্‌বে কিনা এখনো তা স্থির করতে পারিনি--অনেকটা অংশই এখানে থাকব। তোমাদের মহারাজা কি ঠিক করলেন এখনো তাঁর কোন সংবাদ পাইনি। তাঁর মনে বোধ হয় দ্বিধা আছে।

---

(১) মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর ।
(২) কবিকন্যা।
(৩) কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা ।

Griffithsএ অজন্তার ফাল্‌তো কপির পরে যদি তাঁর বিশেষ আসক্তি (১) থাকে তা হলে সে সম্বন্ধে তিনি নিরুত্তর থাকলেই আমি তাঁর মনের ভাব বুঝে নিতে পারব ; হাঁ না কিছুই বলতে হবে না--ইতি ১৩ই আশ্বিন, ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট লিখিত

Hotel Algonquin
New York

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তুমি যে কাজে আমাকে আজ আমন্ত্রণ করিয়াছ সে কাজ আমি পঞ্চাশ বছরেরও উপর হইল গ্রহণ করিয়াছি। আমি যখন বাংলা লিখিতে শুরু করিয়াছি তখন আমার বয়স সাত। বাংলা ভাষাকে ব্যাপক করিবার একমাত্র উপায় বাংলা সাহিত্যকে মহীয়ান করিয়া তোলা। সেই কাজে যদি আমি কিছুমাত্র সফলতা লাভ করিয়া থাকি তবে ভারতে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি। বীজবপন করা আমাদের হাতে আছে--কিন্তু গাছ যখন বাড়িয়া উঠে তখন শিকড় ছড়াইবার এবং ডাল মেলিবার ভার সে আপনিই গ্রহণ করে। গান্ধী মহাত্মা হিন্দী ভাষা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলনের জন্য নানা চেষ্টা বিস্তার করিয়াছেন, সে চেষ্টা যদি বা আজ জাগিয়া উঠে কাল তাহা ম্লান হইবার কোন বাধা নাই। কিন্তু বাংলা ভাষা ভারতের সকল প্রদেশের লোক আপনি শিখিতেছে- কেহ তাহাদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করে নাই। যতদিন বাংলাদেশে প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইতে থাকিবে ততদিন বাংলা ভাষা আপনার আলোকে আপনি দশদিক উদ্ভাসিত করিবে। ইতি--৭ই পৌষ, ১৩২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয়বরেষু,

তোমাদের ক্যাপ্টেন সাহেবকে(২) বলো আজ একশো বৎসরের ঊর্দ্ধকাল ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করছে--অথচ আমার রচনা পাঠ করে, তার সৌন্দর্য্য অনুভব করে, এমন ইংরেজ যদি একজনও ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে না থাকে তবে য়ুরোপের কোথাও যে বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞ ও অনুরাগী কেউ আছেন একথা সহসা বিশ্বেস করতে পারিনে। অবশ্য জার্ম্মান জাতি যদিচ কখনো ভারতবর্ষে পদক্ষেপ করেনি ;তবু ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু খোঁজ করতে হলে ইংরেজী ভাষা ছেড়ে জার্ম্মান ভাষার আশ্রয় নিতে হয়, তেমনি হয়ত আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে এখন থেকে সুইডেনে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে-- কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে পাকা খবর কিছুই জানিনে। ইতি-৯ই অগ্রহায়ণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

মাদ্রাজ

তোমার পিতৃদেবের(৩) মৃত্যু, সংবাদে ব্যথিত হলুম। কিন্তু যাঁরা আত্মার শান্তি পেয়েছেন মৃত্যুর শোচনীয়তা তাঁরা দূর করে দিয়ে যান--তাঁদের জীবনের সফলতা মৃত্যুতে পরিপূর্ণ হয়। এই কথা স্মরণ করেই তোমরা সান্ত্বনা লাভ করো এই আমি কামনা করি। ইতি--৩১ অক্টোবর, ১৯৩৪।

শুভার্থী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১) গ্রন্থটি তৎসময়ে সংগৃহীত হইয়া আজও রাজপ্রাসাদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হইতেছে।
(২) ত্রিপুরার তৎকালীন পলিটিক্যাল এজেন্ট ।
(৩) শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ, বিদ্যানিধি।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মাকে লিখিত

ওঁ

Observatory,
Alipur

কল্যাণীয়েষু,

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুসী হলুম। আমার শরীর অসুস্থ, সমস্ত দিনই কেদারায় হেলান দিয়ে পড়ে আছি।

ভগবানের পূজা সম্বন্ধে তুই যা লিখেছিস তা সত্য। নিজের চিত্তের মধ্যে হোক, বাহিরের রূপের মধ্যে হোক্ সবজায়গাতেই তাঁর আসন আছে। সেই আসনে তাঁর আবির্ভাব যে দেখেছে সেই ধন্য হয়েছে। যে না দেখেছে সবজায়গাতেই তার ফাঁকা। পৌত্তলিক তাকেই বলি, যে মানুষ আসনকেই সত্য বলে জানে সেই আসনে দেবতা দেখে না, যে মানুষ অপরূপকে বাদ দিয়ে রূপকে নিয়ে থাকে, যার কাছে মন্ত্র রয়েছে কিন্তু মন নেই, বাক্য রয়েছে অর্থ নেই। রূপের সঙ্গে ভাবের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের মিল করে' তবে পূজা। তোরা দুজনে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস্।

আগামী আগষ্ট মাসে য়ুরোপ যাব, তার পূর্ব্বে কি তোরা দুজনে আশ্রমে আসতে পারবি নে ?

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Santiniketan,
Bengal

কল্যাণীয়েষু,

ধীরেন, এবার বসন্ত উৎসবের অভিনয়ে তোর এসরাজের ছড়ির কথাটা বার বার মনে এসেছিল। তোরাই ত এতদিন এখানে ছিলি বসন্তরাজের দলবল, তোরা এখান থেকে দূরে চলে গেলে শালের মঞ্জরী বৃথাই ফুটবে। রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন হয়েছিল প্রাসাদ থেকে বনে, তোর নির্ব্বাসন হ'ল বন থেকে প্রাসাদে কিন্তু তোর কতদিন মেয়াদ ? চোদ্দ বছর হ'লে ত চলবে না। তোকে এমন করে বন্দী করে নিয়ে গেলে লালুকর্ত্তার (১) সঙ্গে আমাদের লড়াই বাধবে। এখানে তোদের থাকবার কি রকম ব্যবস্থা হতে পারবে ছুটীর পরে এসে সেটা দেখে যাস্। লালুও স্বয়ং যদি একবার এসে দেখে যান ত ভাল হয়।

বৈশাখের প্রায় মাঝামাঝি হ'ল, কিন্তু একটুও গরম পড়েনি। প্রায়ই থেকে থেকে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসছে, আর "বায়ু বঁহী পূরবৈয়া"। আমি ঠিক করেছি সমস্ত ছুটি এখানেই কাটাব।

তোর নববধূকে আমি নাতনী বলে জানি--এই কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিস্। আর তোরা উভয়ে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস্। ইতি--১০ই বৈশাখ, ১৩৩২

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১) শিল্পী ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্ম্মার শ্বশুর মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা।

ওঁ

Santiniketan,
Bengal

কল্যাণীয়েষু,

ধীরেন, ভয় নেই তোর। সাহস করে এখানে এসে পড়, কোনো বিপদ ঘটবে না। অর্থসমস্যার কথা ভাবছিস্। তার সহজ সমাধান হচ্ছে তোর কাছে অর্থের দাবী না করলেই হোলো। তুই কলাভবনে কাজ করবি--বৃত্তি পাবি, ছবি আঁকবি, গান গাবি--তোকে আর কিছু ভাবতে হবে না। ইতি--১২ই বৈশাখ, ১৩৩২

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, শান্তিনিকেতন

আমার আশীর্ব্বাদ। অর্ধপথে অসুস্থ শরীরে কোকনদ থেকে ফিরে এসেছি। নাচের শিক্ষক (১) পাওয়া যাবে শুনে খুব খুসী হলুম। মৃদঙ্গ করতাল কলকাতায় কি কিন্‌তে পাওয়া যাবে ? যদি তোমাদের ওখানে কেনবার সুযোগ থাকে, তাহ'লে দাম জানালে টাকা পাঠিয়ে দেব। এবার বাঁশের বাঁশি আনতে ভুলো না।

লালুকর্ত্তাকে চিটি লিখেছি। এতদিনে নিশ্চয় পেয়েছেন। তিনি শীতের সময় আশ্রমে এলে খুসি হব। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা পড়ে আসচে। আকাশে নির্ম্মল আলো, আর মাটির উপরে শিউলি ফুলের আস্তরণ। ইতি--১৬ই আশ্বিন, ১৩৩২

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

ধীরেন তুই সহসা চলে গেলি বলে তোর উপরে রাগ করিনি। আমি জানি, মন মাঝে মাঝে নীড় ছেড়ে আকাশে উড়ে আসতে চায়। তাতে ক্ষতি হয় না। নিজের সত্য পরিচয় পাবার জন্য চিরাভ্যস্ত পরিবেষ্টন থেকে দূরে যাওয়ার দরকার আছে। তা ছাড়া, আশ্রমে তোর যে জীবনের আরম্ভ হয়েছে, চিত্তের যে বিকাশ হয়েছে, দূরে গেলেও সেটা তো দূরে যায় না। অন্তরে যা নিয়ে গেছিস্, তার মধ্যেই আশ্রম তোর অন্তরেই থাকবে।

দোল পূর্ণিমার উৎসব নিয়ে ব্যস্ত আছি। গাছ পালার বসন্তের যে প্রকাশ, মানুষের মধ্যেও যদি তার জবাব থাকে তা' হলেই উৎসব পূর্ণ হয়। তাই এখানে কেউ বা কবিতা, কেউ বা ছবি, কেউ বা নৃত্য গান অভিনয় উৎসর্গ করচি--তুই যদি বসন্তের একটা বাণী তোর ছবিতে ব্যক্ত করে পাঠাস্ খুসি হব। মস্ত একটা কিছু করার দরকার নেই--আমাদের কলাভবনের বসন্তের ডালায় কোন একটা অর্ঘ্য এসে পড়লেই হোলো। তোরা দুজনেই আমার স্নেহ আশীর্ব্বাদ জানবি। আর কাজরীর (২) ললাটেও আমার স্নেহ চুম্বন রইল। লালু ও আর সকলে কেমন আছে খবর দিস্। ইতি--৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৪

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১) নৃত্যশিল্পী ঠাকুর শ্রীনবকুমার সিংহের মনোনয়ন সম্পর্কে।
(২) শিল্পীকন্যা।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

আমার শরীর ভাল নেই চিকিৎসা উপলক্ষে কাল শনিবারে কলকাতায় যাচ্চি। কিন্তু লালুর শরীরের অবস্থা শুনে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন রইল। তিনি রাজকার্য্যের জালে নিজেকে জড়িত করে শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি--সেজন্য তখন থেকেই আমার মন উৎকণ্ঠিত ছিল। এখন বোধ হয় স্বাস্থ্যকর জায়গায় তাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। যা হোক্ মাঝে মাঝে আমাকে খবর দিতে ভুলো না। ইতি--২৭ জুলাই, ১৯২৮

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম। কিন্তু ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তুমি বিলাতে যাচ্চ এ সংবাদে আমি কিছুমাত্র আনন্দবোধ করচিনে। (১) যদি বিজ্ঞান শিখতে যেতে আপত্তি করতুম না। কিন্তু চিত্রকলা ? এইটেই কি প্রমাণ করতে যাবে যে, এই হতভাগ্য দেশে কোন বিভাগেই নিজের মধ্যে নিজের শক্তির উদ্ভাবন নেই। পিঠে ওদের দাগা নিয়ে তবে আমরা পণ্যের মতো হাটে বিকোতে যাব। জ্ঞান শিক্ষায় নম্রতার প্রয়োজন, কিন্তু সৃষ্টিশক্তির প্রতিভা মাথা হেঁট করার দ্বারা যে আত্মাবমাননা করে, তাতে তার শক্তির হ্রাস হয়। ম--তার পরিচয় দিয়েচে। তবে কিনা টাকার থলি পূরণ হয়, সেকথা মানি। অজন্তার চিত্রীদের সম্বন্ধে এই গৌরব চিরদিনই করব যে তারা সম্পূর্ণ আমাদেরই--সাউথ কেন্সিঙটনের লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত নয় তারা। কিন্তু তোমরা কোন্ প্রলোভনে কোন্ মোহে এই অগৌরবের দাগা স্বীকার করতে চললে যাতে ইতিহাসে চিরদিন ঘোষিত হ'তে থাকবে যে, তোমার খ্যাতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের খ্যাতিরই উচ্ছিষ্ট। এমনি করে নিজের প্রতিভার জাত মেরে তার পরিবর্ত্তে অর্থ পাবে, কিন্তু স্বদেশকে একেবারে অন্তরে অন্তরে বঞ্চিত করবে সেকথা মনে রেখো। আমাদের অপিসে পরোপজীবীদের দল আছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরের ছাত্রদের ভিড়, কিন্তু ভারতে ভারতীয় রাজ্যে কোথাও কি একটা জায়গা থাকবে না, যেখানে বীণাপাণির বীণার অন্ততঃ একটি তারও এখানকারই খনির খাঁটি সোনায় তৈরী ! সর্ব্বত্রই বিলাতি হাটের এইট্টিন ক্যারেট চালাতে হবে? দুর্ভাগ্য দেশে মজুররা যায় পরের দ্বারে অন্নের জন্য, কিন্তু সেই দেশ তার চেয়ে আরো দুর্ভাগা যেখান থেকে গুণীরাও বিদেশী ধনীর কাছে সেলাম ক'রে বলে, তোমার হাতের তিলক কপালে যদি আঁকি তবেই আমার জয় হবে! সাউথ কেন্সিঙটনের দাগা দেশের আশীর্ব্বাদকে ব্যর্থ করবে এমন জেনে তোমার বিদেশ যাত্রায় আমি প্রসন্নতা প্রকাশ করি কেমন করে ? ইতি--২৩ শ্রাবণ, ১৩৩৬

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হলুম। বিলিতি মাষ্টারের হাতে তোমরা যে ছাত্র বনে যাবে না এটা ভাল কথা। ওখানকার চিত্রকলা ভালো করে দেখবে, বিচার করবে, তার থেকে যেটুকু সম্পূর্ণভাবে আপনার করে নিতে পারো সে চেষ্টাও ছাড়া উচিৎ নয়--কেবল নিজের মুন্ডুটা নিজের কাঁধেরই উপরে যেন থাকে এই হলেই হলো। ম--র দুরবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেছি।

---

(১) লন্ডনে ইন্ডিয়া হাউস অলংকরণ কার্য্যে যাত্রার প্রাক্‌কালে প্রাপ্ত.

এখানে শরতের অবসান হয়ে এল, শীত পড়েচে। দুপুর বেলার আতপ্ত হাওয়াটি বেশ লাগচে ভালো মাঠের প্রান্তে সুদূর বনরেখাটি দিক্‌লক্ষ্মীর নীল অঞ্জন দেওয়া চক্ষু পল্লবের মতো দেখা যাচ্চে। মাঠে বর্ষার রসপুষ্ট ঘাস এখনো ঘন সবুজ আছে, গোরুগুলি অলসভাবে চড়ে বেড়াচ্চে--কোথা থেকে ঘুঘুর ডাক শুনতে পাচ্চি। সামনে ঐ লাল রাস্তা দিয়ে চলছে গোরুর গাড়ি--আকাশে পাণ্ডুবর্ণ ছিন্ন মেঘের স্তবক, যেন দ্যুলোকের ধেনুর পাল--মন্থর গমনে পরিপুষ্টদেহে চ'রে বেড়াচ্চে।

প্রবাসে তোমার সাধনা সম্পূর্ণ সার্থক হোক এই আমি কামনা করি। ইতি--১১ নভেম্বর, ১৯২৯

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, শান্তিনিকেতন

ধীরেন, আমার কাছ থেকে রঙীন আশীর্ব্বাদ দাবী করেছিস্। কিছুদিন থেকে রঙের পথে আমার লেখনীর চলাফেরা বন্ধ হ'য়ে গেছে, সুরের পথও দূরে পড়েচে। হঠাৎ শেষ বয়সে প্রোফেসারির দায় চেপেছে আমার স্কন্ধে, আমাকে ঘোরাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিকে--সে বিশ্ববিদ্যালয় সরস্বতীর শতদল পদ্ম নয়--বক্তৃতা দিতে হয়, বীণা গুঞ্জনের সঙ্গে তার সুর মেলে না। মানস সরোবরে যদি বা যাই, মধু সংগ্রহের জন্য নয়, কাঁদা ঘেটে মাছ ধরবার জন্য, হাটের দাবী মেটাতে হবে।

আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ নিস্ এবং অন্তঃপুরে বাঁটোয়ারা করে দিস্। ইতি--১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, সিংহল

মৈসুরের রাজার সঙ্গে পরিচয় মাত্র আছে, কিন্তু হৃদ্যতা নেই। তাঁকে চিঠি দেওয়া সম্ভব হবে না। এখানে একটা বড় মন্দির ভিত্তি চিত্রিত করবার ভার এরা নন্দলালকে দিয়েছে। অনেকখানি কাজ--পাঁচ ছ' মাস লাগবে--সেই কাজে তোমাকেও আহবান করবেন স্থির করেচেন। যদি সম্মত হও, তা'হলে নামও হবে অর্থও হবে। নন্দলাল জুনের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ দেশে পৌছবেন। তাঁর সঙ্গে মোকাবিলায় সকল বিবরণ সুস্পষ্ট হবে। এ সুযোগ হারিয়ো না--রাজপ্রাসাদের চেয়ে বড়ো কাজ এবং এর গৌরব অনেক বেশি স্থায়ী। ইতি--২১শে মে, ১৯৩৪

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan
Bengal

কল্যাণীয়েষু,

তোমার বিজয়ার প্রণামখানি পেয়ে খুসি হলুম। তোমার বৌঠান তো এখনো আসেননি তিনি আরো তিন সপ্তাহ কিম্বা একমাস পরে আসবেন। এখন তাঁরা সমুদ্রে। তুমি আমার হাতের অক্ষর চেয়েচ--তোমার কাছে আমার হাতের অক্ষরের অভাব কিসের ? এই তো আমার হাতের অক্ষর আমার স্নেহ বহন করে চলেচে তোমার ঠিকানায়। তবু তোমার খাতায় যদি কিছু লেখা চাও তো দেব।

আমার শরীর এখনো ক্লান্ত আছে--কলকাতা থেকে এখানে এসে কতটা ভাল আছি।

ধীরেন যখন আসবে তোমার উচিত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে আসা। যদি আসো তবে আমিও এখানে ছবির প্রদর্শনী করব সব আমার ছবি দিয়ে। শীতের সময় যদি আশ্রমে আসতে পারো তোমার ভালো লাগবে--আমাদেরও ভাল লাগবে।

তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি--শুক্লাদ্বাদশী কার্ত্তিক, ১৩৩৫

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(চিঠিখানা শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মার পত্নী শ্রীমতী সরযু দেববর্ম্মাকে লিখিত)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোর চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। একথা সত্য আমাদের বর্ত্তমান চিত্রকলা দীর্ঘকাল মৃত যুগের কবরস্থানে দিন কাটাচ্চে। তাকে জীবিতকালের প্রাঙ্গণে উদ্ধার করে আনবার সময় হয়েচে। শান্তিনিকেতনের কলাভবন এই ভারটি গ্রহণ করে সেই আমার একান্ত কামনা। সেইজনাই তোকে এখানে টেনে আনবার অভিপ্রায়ে আমার মন উৎসুক আছে। কাল নন্দলালের সঙ্গে কথা কয়েছি--সেও আগ্রহ প্রকাশ করলে। অর্থের যথেষ্ট অসচ্ছলতা, তবু সে ভাবচে। একটা কিছু সুযোগ করে নেবার চেষ্টা করবে। অন্তত কিছুদিনের জন্যও যদি তোকে এখানে রাখতে পারি তাতেও কাজ হবে। আশা করে রইলুম এটা সম্ভবপর হতে পারে। লালুকে (১) আমার বিজয়া দশমীর আশীর্ব্বাদ জানাস্--অনেককাল তাকে দেখিনি--দেখবার ইচ্ছা মনে জাগে। ইতি--বিজয়া দশমী, ১৩৪০।

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্তকে লিখিত

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিখানি পড়ে আনন্দিত হলুম। আমার প্রবাসকালীন ভক্তবন্ধুদের কারো কারো সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়েছে শুনে খুশি হলুম। তাঁরা অনেকে ছড়িয়ে পড়েছেন অনেকে তাঁরা পরলোকে।

(১) মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর।

জানিনে আইনষ্টাইনের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে কিনা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ স্মরণীয়। আমি দূর বিদেশীয়দের কাছ থেকে যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পেয়েছি সে তোমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। আমার শরীর ক্লান্ত, পত্র ব্যবহার যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি--১২/২/৪০

শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশৈলেশচন্দ্র দেববর্ম্মাকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

শৈলেশ, এইমাত্র তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশী হয়েছি। তোমার ম্যালেরিয়া ধরেছে জেনে চিন্তিত হলেম। দুই একদিন হোল সোমেন্দ্রের একটি চিঠি পেয়েছি--তাতে তোমার অসুখের খবরটুকুও ছিল। এখন কেমন আছ জানাবে। এ রোগের তাড়নায় এবার তোমার পড়াশুনায় বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নেই। সোমেন্দ্র হয়তো তোমার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করেচে। ছেড়ে উঠতে পারলেই এদিকে চলে আসবার চেষ্টা করবে।

এখানে বেশ শ্রাবণের ধারা নেমেচে। আমাদের আশ্রমের ছেলেরা বেশ আনন্দে খোঁয়ায়ের মাঠে ভিজচে। এ খবরে তোমার মনটাও হয়তো একটু সাড়া দিয়ে উঠ্‌বে। আশ্রমের খবর সব ভাল। তুমি ও সোমেন্দ্র আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ঈশ্বর তোমাকে এ রোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করুন একান্ত মনে কামনা করি। ইতি--৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩৪।

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan
Bengal, India

কল্যাণীয়েষু,

শৈলেশ, তোমার নববর্ষের অঙ্কিত কার্ড ছবিখানি পেয়ে খুব ভাল লেগেছে। দেশেই হয়তো মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করচ। তুমি এ বয়সে এখনো ছবি আঁকার চর্চ্চা করচ দেখে খুব আনন্দিত হলুম। বিদ্যালয়ের পড়াশুনার মধ্য দিয়ে এইভাবেই যদি শিল্প সাধনায় ডুবে থাক্‌তে পার, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে পারবে। সোমেন্দ্র কেমন আছে ? দেখা হলে তাকে বল্‌বে, সে এদিকে আসবার সময় যেন আমার জন্য তোমাদের দেশের খাঁটি মধু নিয়ে আসে। আশ্রমের খবর সব ভাল। তুমি ও সোমেন্দ্র আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ করুন। ইতি--৬ই বৈশাখ, ১৩৩৫

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তুমি আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। ইতি--৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩৪

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan
Bengal

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হলুম। ৭ই পৌষের আয়োজন চলেচে। এবারে বোধ হয় লোক সমাগম বেশি হবে। তোমরা সকলেই এই উৎসবে মিলিত হতে পারলে খুশী হতুম। আমার শরীর এখনো দুর্ব্বল আছে।

তোমার মঙ্গল কামনা করি। ইতি--৫ই পৌষ, ১৩৩৫

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Uttarayan
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণীয়েষু,

তোমার মামীর (১) অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছি। হতভাগ্য সোমেন্দ্রের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। ভগবান তাহাকে এই শোক বহন করিবার শক্তি দিন একান্তমনে এই কামনা করি। ইতি--৩০ ফাল্গুন, ১৩৩৮

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,　　　　মংপু

তোমার ছবিখানি খুব ভালো লাগল। বুঝতে পারচি তুলিতে এখনো তোমার নৈপুণ্য আছে। আশা করি তোমার সাধনায় বাধা পড়বে না। ইতি--২৯/১০/৩৯

শুভার্থী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Uttarayan
Santiniketan
Bengal

কল্যাণীয়েষু,

আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি--১০/১০/৩৮

শুভার্থী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গুরুদেব অঙ্কিত ত্রিবর্ণ চিত্রসহ) (২)

(১)　সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মার পত্নী।
(২)　গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ত্রিবর্ণ চিত্র দ্রষ্টব্য।

শ্রীগিরিজানাথ চক্রবর্ত্তীকে লিখিত

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, শান্তিনিকেতন

অকস্মাৎ তোমার পিতৃমাতৃবিয়োগের নিদারুণ সংবাদে ব্যথিত হইলাম। ঈশ্বর তোমার সংসারে শান্তি ও তোমার সন্তপ্তচিত্তে সান্তনা বিধান করুন এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি--৭ ভাদ্র, ১৩২১

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসন্তকুমার গুপ্তকে লিখিত

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

সাদর সম্ভাষণমেতৎ,

আজ আগরতলা হইতে যতীর (১) পত্র পাইয়াছি। তাহাতে আশা হইতেছে মধ্যমঠাকুরের (২) শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার সময় ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে। মহারাজ কোন একটা সুবন্দোবস্ত করিবেন।

কলিকাতায় প্লেগ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। আপনি কি সেখানেই আছেন ? আমি অদ্য বোট হইতে শিলাইদহ কুঠিতে ফিরিয়া আসিতেছি--সেই খবর দিবার জন্য আপনাকে লিখিতে বসিয়াছি। এখন যদি ব্যাঘাত না থাকে তবে এখানে কিছুকাল যাপন করিয়া গেলে আপনার শরীর কতকটা ভাল হইতে পারে। আপনার লিভারের অবস্থা কিরূপ ?

* * * *

নাটোরের মহারাজা আমাদের এখানে কিছুকাল আতিথ্যভোগ করিয়া কলিকাতায় গেছেন। তিনি তাঁহার কোন একটি এষ্টেটের নায়েব চান--আপনি এরূপ কার্য্যে সম্মত আছেন ? তিনি মনিব ভাল। ইতি--১০ই চৈত্র, ১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

প্রিয়বরেষু,

* * * *

২৩শে বৈশাখ ত্রিপুরার মহারাজ দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবেন। যুবরাজ ও মধ্যমঠাকুরের অধ্যাপনা সম্বন্ধে পরামর্শ লইবার জন্য আমাকেও বিশেষ করিয়া আহবান করিয়াছেন। বৈশাখের শেষভাগে আমাকে যাইতে হইবে।

আপনি কেমন আছেন লিখিবেন। ইতি--১২ই বৈশাখ, ১৩০৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

(১) যতীন্দ্রনাথ বসু।

(২) ত্রিপুরার মধ্যম মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর। ত্রিপুরায় তৎকালে এই চলতি পরিচয়টি কবির পত্রে এই সর্ব্বপ্রথম পাওয়া গেল।

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

প্রিয়বরেষু,

আগামী মঙ্গলবার মহারাজের নিমন্ত্রণে দার্জ্জিলিং যাইতেছি--সেখানে কিরূপ স্থির হয় জানিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে শিলাইদহ আসিলে অল্পদিনের মধ্যেই চলিয়া আসিতে হইবে। দার্জ্জিলিং হইতে ফিরতে বিলম্ব হইবে না।

শরতের সহিত বিবাহপ্রস্তাব (১) এখনো সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই । হরিবিলাসের বিবাহ হইয়া গেছে খবর পাইয়াছি।

নিশিকান্তর পীড়ার সংবাদে দুঃখিত হইলাম-- দেখা হইলে সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিব। যদি সৎপাত্রের সন্ধান থাকে খবর নিতে ভুলিবেন না। ইতি--১৯শে বৈশাখ [১৩০৮]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

প্রিয়বরেষু,

আগরতলা এখনো জলমগ্ন। জল অল্প অল্প করিয়া কমিতেছে সংবাদ পাইয়াছি---কিন্তু লোকের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আর সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করিয়া চিঠি পাঠাইবেন।

এখানকার পুণ্যাহ সমাধা হইয়া গেছে--ইতিমধ্যে যদি বেলাকে মজঃফরপুরে পৌঁছিয়া দিবার জন্য ডাক না পড়ে তবে কালিগ্রামের পুণ্যাহ সম্পন্ন করিবার জন্য সেখানে রওনা হইব। সেখানে ২৪শে আষাঢ় দিন স্থির হইয়াছে। ইতি--১৪ই আষাঢ়, ১৩০৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

অত্যন্ত ব্যস্ত। অদ্যই রেণুকার বিবাহ। আপনি আসিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম। পাত্রটির নাম সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য--ডাক্তার। স্বভাব নির্দ্দোষ। দেখিতেও প্রিয়দর্শন।

প্রিয়র(২) সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। বোধ হয় তাঁহারা লোক রাখিবেন না। প্রিয় নিজেই তাঁহার ছেলেকে পড়াইতেছেন। ত্রিপুরার কোন খবর নাই। মহিম (৩) আসিয়াছে। সুস্থ হইলেই আসিবেন। ২৪শে শ্রাবণ [১৩০৮]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু,

শিলাইদহ

মহারাজকে ও মহিমকে আপনার সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া দিলাম--আপনি মহিমের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছি--কি ফল হয় বলিতে পারি না। অদ্য রবিবারে আপনার পত্র পাইলাম।

* * * *

আশাকরি যথাসময়ে এ চিঠি পাইবেন। ২৯শে ফাল্গুন [১৩০৮]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১) কবি কন্যা বেলার বিবাহপ্রস্তাব উপলক্ষে।
(২) প্রিয়নাথ সেন।
(৩) কর্ণেল মহিম ঠাকুর।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের পত্র (মহিম ঠাকুরকে লিখিত)

Presidency
College
5.4.1904

প্রিয় মহিম বাবু,

আপনি যে সুন্দর নল ও পাটী পাঠাইয়াছেন তাহা পাইয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। এই রূপ ধূমপান যে অতি আরামজনক এখন বুঝিতেছি।

আমি গত কয় সপ্তাহ একটি নূতন অনুসন্ধান লইয়া অতিশয় ব্যস্ত ছিলাম। গতকল্য শেষ করিয়া বিলাতে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছি। মহারাজকে (১) বলিবেন যে এই সন্ধানটি 'উদ্ভিদের উপর আলোকের প্রভাব' লইয়া। মহারাজ কলিকাতা আসিলে অনেকগুলি নূতন বিষয় দেখাইতে পারিব।

রবিবাবু মজফরপুর আছেন। সেখানে গিয়া অনেক ভাল আছেন।

নিং
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

ঠাকুর শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মাকে লিখিত*

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে সুখী হলুম। আমাদের ছুটি নিকট--শারদোৎসবের অভিনয় হবে তাই বড়ই ব্যস্ত আছি। বিশেষতঃ এই বইটি অনেকখানি নতুন করে লেখা হয়েচে, আর যে সব ছেলে অভিনয় করবে তারা অনেকেই নূতন--তাই অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হচ্চে। যখন তোমার সুযোগ হবে কোনো সময়ে এখানে এসো। ইতি--১৪ই আশ্বিন, ১৩২৮

শুভাকাঙ্খী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১) মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য।

* শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সমিতি

পৃষ্ঠপোষকবর্গ

শ্রীনাগরীমোহন পট্টনায়ক
আই-এ-এস্

মহারাজা শ্রীকিরীটবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর

মাতা মহারাণী শ্রীমতী কাঞ্চনপ্রভা দেবী

সভ্যগণ

মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা
সভাপতি

কুমার শ্রীরমেন্দ্রকিশোর দেববর্মা
সহ-সভাপতি

শ্রী কে, আর, কৃপালনি
(কেন্দ্রীয় শতবার্ষিকী সমিতির
সম্পাদক, পদাধিকার বলে)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
--কোষাধ্যক্ষ

শ্রীগোবিন্দনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
--সম্পাদক

ডক্টর হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
--যুগ্ম সম্পাদক

মহারাজকুমার শ্রীআদিত্যকিশোর দেববর্মা
শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ
শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ
শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দেববর্মা
শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী
শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত
শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
শ্রীসুশান্তকুমার চৌধুরী
শ্রীইন্দ্রকুমার রায়
ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

শ্রীসত্যরঞ্জন বসু
শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
শ্রীশিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত
শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীশৈলেশকুমার সেন
শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ শর্মা
শ্রীঅমূল্যকুমার লোধ
শ্রীফণীন্দ্রমোহন মজুমদার
শ্রীকৃষ্ণপদ দত্ত
শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সমিতি

(পুর্নগঠিত/৮৩)

শ্রীদশরথ দেব, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা	সভাপতি
শ্রীঅমিতকিরণ দেব, উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা ও শিক্ষা কমিশনার, ত্রিপুরা সরকার	সদস্য
শ্রীঋতেন চক্রবর্তী, সহ-অধ্যাপক, মহিলা কলেজ আগরতলা	সদস্য
শ্রীগুরুপদ সাউ, অধিকর্তা, তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার ত্রিপুরা সরকার,	সদস্য
ডঃ জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত আযুক্তক আধিকারিক শিক্ষামূলক প্রকাশনা, ত্রিপুরা সরকার,	আহবায়ক

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

প্রচ্ছদের নক্‌শাটি ত্রিপুরায় একদা প্রচলিত ও অধুনা অবলুপ্তপ্রায় 'রিয়া' (রমণীর বক্ষাবরণ) বয়নশিল্পের সূক্ষ্ম সোনালী ও রূপালী কারুকার্যের নিদর্শন।

রিয়াশিল্পনিপুণা ত্রিপুররমণীগণ রাজমহিষী হিসাবে গৃহীতা হইতেন-এইরূপ বহু কাহিনী 'রাজমালা'তে এবং অরণ্যপ্রদেশে প্রচলিত লোকসঙ্গীত ও রূপকথায় পাওয়া যায়। রাজমহিষীগণের ব্যবহৃত রিয়ার পূজা, শুভকার্যে মাঙ্গলিক-চিহ্ন হিসাবে রিয়া প্রদর্শন, মাতৃস্থানীয়াগণের প্রদত্ত রিয়া শিরোপা—স্বরূপ গ্রহণ ইত্যাদি প্রাচীন প্রথা আজ ইতিহাসে পর্যবসিত।

মহারাজকুমারী কমলপ্রভা ও কুমার রমেন্দ্রকিশোরের সৌজন্যে প্রাপ্ত প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন একটি রিয়া বস্ত্রখণ্ডের আলোকচিত্র প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হইল।

রবীন্দ্রনাথ

ও

ত্রিপুরা

।। ১৩৬৮ ।।